রাষ্ট্রবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

(Political Theory)

[ত্রি-বার্ষিক স্নাতক (*Pass Course*) শ্রেণীর পাঠ্য]

অধ্যাপক মহাদেব চট্টোপাধ্যায়,
এম. এ. (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস), এল-এল-বি,
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর (বীরভূম);
পরীক্ষক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয

কর্তৃক প্রণীত

ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী
ব্যানার্জী পাবলিশার্স
৫।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৩৬৩

মূল্য : সাত টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড,
কলিকাতা-৬

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺কিরণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

—মহাদেব

ভূমিকা

ত্রি-বার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম অনুসারে রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। আমার শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার্থীদের একান্ত সান্নিধ্য হেতু তাদের পঠিতব্য বিষয় আয়ত্তকরণের পথে যে সুবিধা ও অসুবিধা লক্ষ্য করেছি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই গ্রন্থ রচনা করলাম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর জটিলতা অনেক সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হওয়ার অন্তরায় হয়। প্রাঞ্জল ভাষা এবং স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিবেগ তাদের বোধগম্যতাকে সহজতর করে তোলে। তাই বিষয়বস্তুর সরলীকরণের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে আমি ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সাবলীলতা আনবার চেষ্টা করেছি। মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান একান্ত বাঞ্ছিত হলেও, ভাষার অপ্রতুলতাহেতু বিষয়-বস্তুর বিকৃতি যাতে না ঘটে সেদিকেও সাধ্যমত লক্ষ্য রেখেছি। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে প্রতি অধ্যায়ের শেষে সংক্ষিপ্তসার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পুস্তক রচনায় যে সব পুস্তকের সাহায্য নিয়েছি তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল :

Laski-র Grammar of Politics, Communism, Liberty in the modern State, *Gilchrist*-এর Principles of Political Science, *Garner*-এর Political Science and Grammar, *Gettell*-এর Political Science, *Strong*-এর Modern Political Constitutions, *Dunning*-এর A History of Political Theories, Vol. II & III, *Sabine*-এর A History of Political Theories, *Barker*-এর Political Thought in England (*1848 1914*), *Davidson*-এর Political Thought in England (*The Utilitarians*), *Coker*-এর Recent Political Thought, *Wheare*-এর Federal Government, *Dr D. N. Banerjee*-র The future of Democracy and other Essays, *Appad Rai*-এর Substance of Politics, *Smith*-এর Public Opinion, *Dr. Anil Banerjee*-র Constitutional Document, (Vol II), *Albig*-এর Public Opinion, *Amar Nandi*-র An Intro-duction to Political Science, Presidential Address by Dr. *Bhaskaran* (*23rd Indian Political Science Conference Patra*), *J S Mill*-এর Representative Government, On Liberty, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকান্ত মৈত্র—পৃথিবীর ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের—আত্মশক্তি (রবীন্দ্ররচনাবলী : ২য় খণ্ড), Nationalism;

অন্নদাশঙ্কর রায়রেষু—'যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা' প্রবন্ধ ('দেশ' পত্রিকা: ১০ই নভেম্বর, '৬২ সংখ্যা) ইত্যাদি গ্রন্থ।

এই পুস্তক রচনার কাজের পূর্বে গ্রন্থগুলিকে যেমন অনুধাবন করেছি অন্যদিকে আবার শিক্ষক জীবনের অভিজ্ঞতা ও ছাত্রজীবনে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকমণ্ডলীর নির্দেশিত অন্যান্য পুস্তকগুলির সাহায্য গ্রহণে কার্পণ্য করিনি।

এই গ্রন্থ প্রণয়নের কাজে যাঁরা আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন তাঁদের কথা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বিশ্বভারতীর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক পূজনীয় শ্রীসৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি যত্নসহকারে দেখে ও প্রয়োজনানুযায়ী পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করে তাঁর স্নেহার্দ্র হৃদয়ের অশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার এই ঋণ অপরিশোধ্য। এর পর আর একজনের অকুণ্ঠ সাহায্যের কথা স্মরণ থাকবে—তিনি হলেন বোলপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীঅশোক বক্সী। তাঁর সুপরামর্শ, সক্রিয় সাহায্য ও অকুণ্ঠ সহযোগিতা বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। এঁরা ছাড়া আর যাঁরা আমাকে সাহায্য করে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন তাঁরা হলেন আমার সহকর্মী বন্ধু শ্রীহৃদয়রঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীরঞ্জিত মিত্র, শ্রীবিভূতিভূষণ মহাত্মা, শ্রীহরিপ্রসাদ মিত্র, শ্রীনবনীধর মিত্র, শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনেপাল মজুমদার এবং শ্রীচণ্ডীদাস রায়। সব শেষে এই গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীসূর্যকুমার ব্যানার্জী ও মুদ্রাকর শ্রীগঙ্গারাম পালকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কারণ তাঁদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, অকুণ্ঠ ধৈর্য ও পরিশ্রমের জন্যই এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল; এজন্য আমি দুঃখিত ও লজ্জিত। তবে আশা রাখি, পরবর্তী সংস্করণে এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি যথারীতি সংশোধন করে দেব। আমার সহকর্মী বন্ধুদের কাছে অনুরোধ—তাঁরা এ গ্রন্থের উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য তাঁদের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনের সুচিন্তিত অভিমত জানালে বিশেষ বাধিত ও সুখী হব।

পরিশেষে একটি কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এ গ্রন্থ যাদের জন্য লেখা, তারা এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে মনে করব।

শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়

SYLLABUS

CALCUTTA, BURDWAN AND NORTH BENGAL UNIVERSITY

THREE-YEAR DEGREE COURSE

POLITICAL SCIENCE

Pass Course

POLITICAL THEORY

Paper I

Definition and scope of Political Science—Relation of Political Science to other Sciences—Methods of Political Science

Definition of State—Difference between State, Government and other Associations

Leading Theories of the Origin and Nature of the State—Theory of Divine Origin—Theory of Force—Theory of Social Contract—Views of Hobbes Locke and Rousseau—Evolutionary Theory of the Origin of the State—Organic Theory about the nature of the State—The Idealist Theory—Marxist conception of the State

Nature and characteristics of Sovereignty—Legal and Political Sovereignty—De jure and De facto Sovereignty—Doctrine of Popular Sovereignty—Austinian Theory of Sovereignty—its critical estimate—Theory of Limited Sovereignty Attacks upon the Monistic Theory of Sovereignty

Definition and nature of Law—Different kinds of Law—Sources of Law Distinction and relation between law and morality Relation between law and Liberty—The Concept of Liberty—Safeguards of Liberty in a modern State—Concept of Natural Law and Natural Right

Meaning of Nationality—Nation and Nationalism—Essential elements of Nationality—Right of Self Determination—Mono National State *Vs.* Poly National State—Dangers of Nationalism—Nationalism and Internationalism

Citizens and Aliens—Modes of acquiring citizenship—Rights and Duties of citizens—Hindrances to good citizenship—Relation between Rights and Duties

Unions of State and Forms of Government—Personal and Real Union—Confederation Federal Union—Nature and types of Federation—Chief features and conditions of Federation—Merits and defects of Federation—Alliance—Distinction between Unitary and Federal Governments

Forms of Governments—Monarchy, Aristocracy, Oligarchy and Democracy — Types of Democracy— Strength and weakness of Democracy— Comparison

between Democracy and Dictatorship—Conditions essential to the success of Democracy—Parliamentary and Presidential Governments, their strength and weakness

Structure of Government—Organisation and functions of Legislature, Executive and Judiciary—Bicameralism, its merits and defects—Separation of Powers.

Functions of Government—Individualism and Socialism,—their comparative merits and defects—Types of Socialism

Constitution—Different kinds of constitutions—their strength and weakness

Party systems—Its advantages and disadvantages—Two party system *Vs* Multiple-party system—One party Rule

Public opinion—Its nature and its Importance in Popular Government—Agencies for the formation of Public Opinion.

Electorate—Universal Suffrage—Methods of minority of representation—Direct and Indirect election—Relation between the representative and his constituency

GOVERNMENT OF GREAT BRITAIN, U S A , U S S R and SWITZERLAND

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

বিষয় পৃষ্ঠা

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা ক্ষেত্র
(Definition and Scope of Political Science)

১। সংজ্ঞা ও আলোচনা ক্ষেত্র (Definition and Scope) :

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সামাজিক জীবন-যাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আলেক্‌জাণ্ডার সেলকার্কের মুখ দিয়ে কবি মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিকেই বোধ হয় ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এমনিভাবে ব্যক্ত করেছেন।—

O Solitude ! where are thy charms
That sages have seen in thy face ?

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক জীব

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল্ মানুষকে এক স্বভাবসিদ্ধ সামাজিক জীব বলে আখ্যা দিয়েছেন। বস্তুতঃ, মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিই তাকে পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি ও রাষ্ট্র গঠন করে সামাজিক জীবন যাপন করার প্রেরণা দিয়ে আসছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে।

জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তায় সমাজ

কেবলমাত্র সামাজিক প্রবৃত্তি নয়, জীবন ধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের তাগিদেও মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে হয়েছে। সৃষ্টির আদি অবস্থায় প্রতিকূল পরিবেশে ঘেরা মানুষ একান্তই অসহায় ছিল। প্রাথমিক ভোগ্যবস্তুর সংস্থানে এককভাবে তার জীবন কঠোর ও দুঃখময় ছিল। কালক্রমে সে এককভাবে ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা অনুভব করে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করল। শিকার, পশুপালন অথবা কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জনের সমস্যাকে সহজতর করে তোলে পারস্পরিক সহযোগিতা। তাই মানুষ অপরের সঙ্গে জোট বাঁধল—সমাজবদ্ধ হল।

সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান

স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মানবসমাজ ক্রমে ক্রমে মানুষের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্নমুখী অভাবকে পরিতৃপ্ত করার জন্য আজকের দিনে এক ব্যাপক ও জটিল সমাজ ব্যবস্থায় এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে। মানুষের বিভিন্নমুখী অভাববোধকে পরিতৃপ্ত করার প্রয়োজনে সৃষ্ট মানব-সমাজের মধ্যমণি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থার প্রধান নিয়ামক। রাষ্ট্রের এই নিয়ন্ত্রণ শক্তির জন্যই মানুষের পক্ষে সমাজবদ্ধ জীবনযাপন করা সম্ভব হয়েছে।

মানুষ চায় নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা। কিন্তু এই অবাধ স্বাধীনতাকে সে উপভোগ করতে চায় সামাজিক জীব হিসেবে। একাধারে সে সামাজিক জীব এবং পক্ষান্তরে সে অবাধ স্বাধীনতাকামী। মানুষের এই দুটি প্রবৃত্তি কিন্তু বিপরীতমুখী। অবাধ স্বাধীনতাকে উপভোগ করতে হলে তার পক্ষে সামাজিক জীবন নির্বাহ করা সম্ভব নয়, আবার সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে হলে তাকে অবাধ স্বাধীনতা কিছুটা পরিত্যাগ করতে হয়।

সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা

মানুষের এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য একান্ত স্বাভাবিক কারণেই সৃষ্টি হল রাষ্ট্রের। রাষ্ট্র মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে কিছুটা খর্ব করে তার সমাজ জীবনকে সম্ভব করে তুলল। মূলতঃ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিত করে তার বিকাশের পথকে প্রশস্ত করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের এই উদ্দেশ্যকে সরকারের সাহায্যে কার্যকরী করা হয়। সরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কাজে পরিণত করার একটি যন্ত্রমাত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র তার নিয়ম-কানুনের দ্বারা সমাজ জীবনে পারস্পরিক সম্পর্ককে সুনিয়ন্ত্রিত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজ-জীবন সম্ভব করে তোলে। সুতরাং রাষ্ট্রের স্বরূপ, প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে যেমন জানা দরকার, যে যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সে তার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করে তার কার্যপ্রণালী, গঠন ও প্রকৃতিকে তেমনি বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা জানা দরকার। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু রাষ্ট্র। বিশেষ করে জার্মান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু : রাষ্ট্র ও সরকার

মতের পরিপোষক। অপর পক্ষে, ল্যাস্কি, গেটেল প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র এবং সরকারকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতী। বস্তুতঃপক্ষে রাষ্ট্রের তাত্ত্বিক এবং সাংগঠনিক—এই উভয়দিক আলোচনা না করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, স্বরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি তত্ত্বগত দিক এবং তার উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য তার সাংগঠনিক দিক—এই উভয়দিকই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করব।

প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের এবং তার সংগঠনের বর্তমান অবস্থাই আলোচনা করে না, তার অতীত এবং ভবিষ্যৎও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি, তার ক্রমবিকাশের ধারা, তার সংগঠন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির বিশ্লেষণ ও বিবরণ এবং সর্বোপরি

এই বিশ্লেষণ ও বিচারের মাধ্যমে আগামী দিনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শ রূপরেখা নির্ণয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য ক্ষেত্র। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সবকিছুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য ও নির্ণেয় ক্ষেত্র। অধ্যাপক গার্ণার (*Garner*) যথার্থই বলেছেন—"সাধারণভাবে বলতে গেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যাগুলির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু হচ্ছে প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও প্রকৃতি নির্ণয়; দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলির প্রকৃতি, ইতিহাস ও গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে অনুসন্ধান এবং তৃতীয়তঃ, সেই সব থেকে যতদূর সম্ভব রাষ্ট্রনৈতিক বৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশের সূত্রগুলি আবিষ্কার করা।"[1]

রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে

অধ্যাপক গেটেলের (*Gettell*) মতে "রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও মতবাদগুলির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করাই রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।"[2]

সিজউইক (*Sidgwick*), জেলিনেক (*Jellinek*), পোলক (*Pollock*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সিদ্ধান্তমূলক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Applied)—এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। সিদ্ধান্তমূলক বা তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্র ও তৎ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপত্তি, গতি-প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে, আর ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি সরকারের বিভিন্ন শ্রেণী, তার কার্যপ্রণালী, আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করে।

সিদ্ধান্তমূলক ও ব্যবহারিক রাষ্ট্রনীতি

২। রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা (Utility of the study of Political Science):

রাষ্ট্র সমাজের শ্রেষ্ঠতম প্রতিষ্ঠান। কোন এক নিয়ন্ত্রণ শক্তির অভাব থাকলে সমাজজীবন নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা

1 "In a general way its fundamental problems include, first, an investigation of the origin and nature of the state, second, an inquiry into the nature, history and forms of political institutions, and third, a deduction therefrom, so far as possible, of the laws of political growth and development" —*Garner*

2 "Political Science is the study of the state in the past, present and future, of political organisation and political function, of political institutions and political theories". —*Gettell*

স্থাপন করে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করে। সুতরাং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কার্যপ্রণালী আমাদের আলোচনা করা দরকার। এই আলোচনার ফলে আমরা সামাজিক জীব হিসেবে আমাদেব অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে পারি। আমরা বুঝতে পারি, সমাজজীবন নির্বাহ করার জন্য আমাদের শুধু অধিকার সম্বন্ধে সজাগ হলেই হবে না, সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্যও পালন করা দরকার। কর্তব্যপালনের দায়িত্ববোধ মানুষকে ক্ষুদ্র স্বার্থের উর্ধ্বে দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ করে দেয়।

দেশ ও সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনীয়তায় মানুষ সামাজিক সমস্যাগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করে এবং তাদের সমাধানকল্পে চিন্তাপ্রসূত অভিমত পোষণ করতে শেখে। এই চিন্তাশীলতা এবং দেশ ও দশের স্বার্থে যথাকর্তব্য পালন করার প্রেরণাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার উপযোগিতা।

৩। নামকরণ (Nomenclature):

আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলতে যে শাস্ত্রকে বুঝি তার যথার্থ নামকরণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। অনেকে এই শাস্ত্রটিকে রাষ্ট্রনীতি (Politics) বলে অভিহিত করে থাকেন। অনেকে আবার রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে এই শাস্ত্রটির বিষয়-বস্তুকে সাধারণভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) বলে আখ্যা দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রদর্শন বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল এই শাস্ত্রটির নামকরণ করেছেন রাষ্ট্রনীতি। প্রাচীন গ্রীসে জনসাধারণের সামাজিক জীবন নগররাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। স্বভাবতই রাষ্ট্রনীতি বলতে নগররাষ্ট্রগুলির নীতি এবং নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে নাগরিক জীবনের ক্রিয়াকলাপকে বোঝাত। বর্তমানকালে রাষ্ট্রনীতি বলতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যাগুলিকেই বোঝায়। কাশ্মীর সমস্যা, চীন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্ত সমস্যা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রধান সমস্যাগুলির অন্যতম। কাজেই এই সমস্যাগুলি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনীতিরই অন্তর্গত। কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রনীতিতে উৎসাহী বললে আমরা বুঝি যে সেই

রাষ্ট্রনীতি বলতে কি বোঝায়

ব্যক্তি দেশের প্রধান সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উৎসাহী। এই অর্থে ব্যবহার করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে যায়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, স্বরূপ প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান ও মূল আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলিকে তাহলে এই শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। বস্তুতঃ, আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় রাষ্ট্রনীতি বলতে যা বুঝে থাকি তা এই শাস্ত্রের প্রকৃত আলোচনার ক্ষেত্র থেকে পৃথক এবং অনেক বেশী বিস্তৃত।

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার রাষ্ট্রদর্শন (Political Philosophy) শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এই শাস্ত্রটিকে রাষ্ট্রদর্শন বলে অভিহিত করলেও এর আলোচনার ক্ষেত্রটিকে সংকুচিত করা হয়। রাষ্ট্রদর্শন বলতে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের তত্ত্বগত দিকটিকেই বোঝায়। রাষ্ট্রের উৎপত্তি, স্বরূপ, উদ্দেশ্য ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদর্শনের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যে পদ্ধতি বা নিয়মকানুনের মাধ্যমে কোন এক রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকে রাষ্ট্রদর্শন বলা যেতে পারে না। যেমন, ভারতবর্ষের সংবিধানকে আমারা রাষ্ট্রদর্শনের বিষয়ভুক্ত করতে পারি না। কিন্তু তাই বলে রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি ও নিয়মকানুনগুলিকে আমাদের শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়বস্তু থেকে বাদ দিলে অন্যায় করা হবে। রাষ্ট্রদর্শন এবং রাষ্ট্রের শাসনপদ্ধতি—উভয়ই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু।

রাষ্টদর্শন বলতে কি বোঝায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এই বিস্তৃত পরিধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সিজউইক (*Sidgwick*), পোলক (*Pollock*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই শাস্ত্রটিকে তত্ত্বগত (*Theoretical*) এবং ফলিত (*Applied*) এই দুই ভাগে আলোচনা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তত্ত্বগত রাষ্ট্রনীতি বলতে রাষ্ট্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত বিষযবস্তুসমূহকে বোঝায়। কিন্তু রাষ্ট্রের এই তাত্ত্বিক দিকটি ছাড়া তার একটি ব্যবহাবিক দিক আছে, যথা—বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থা, শাসনতান্ত্রিক আইন. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করলে রাষ্ট্রের এই তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয় দিকটিই তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং রাষ্ট্রদর্শন বা রাষ্ট্রনীতি এইরূপ নামকরণ না করে সাধারণভাবে এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দুইটি দিক : তত্ত্বগত এবং ফলিত

কোন কোন ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় কতকগুলি শাস্ত্রের সমষ্টি বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে সমাজবিজ্ঞান (Sociology), রাষ্ট্রীয় অর্থতত্ত্ব (Political Economy), শাসনতান্ত্রিক আইন (Constitutional Law) প্রভৃতি শাস্ত্রগুলি রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় বিষয়গুলি আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকার সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয় সাধারণভাবে আলোচনা করলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞান পূর্বোক্ত শাস্ত্রগুলির মত রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় একটি শাস্ত্র এবং এদের মতই সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অতএব ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে এই সমস্ত বিষয়গুলিকে একযোগে রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সমষ্টি বা *Political Sciences* বলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

Political Sciences আখ্যা দেওয়ার যৌক্তিকতা

৪। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য? (Is Political Science a Science ?):

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন। পরবর্তীকালে মঁতেস্কু, হব্‌স্, লর্ড ব্রাইস, পোলক প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান পদবাচ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন।

স্যার ফেড্রারিক পোলকের মতে যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলতে রাজী নন, তাঁরা বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় জানেন না। অপরপক্ষে, মেটল্যাণ্ড (*Maitland*), কঁৎ (*Comte*) প্রভৃতি রাষ্ট্র বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করার বিরোধী ছিলেন। মেটল্যাণ্ড বলেছেন—"রাষ্ট্রবিজ্ঞান শিরোনাম দিয়ে কোন প্রশ্নপত্র যখন তিনি দেখেন তখন প্রশ্নগুলির জন্য তার দুঃখ হয় না—দুঃখ হয় ঐ শিরোনামটির জন্য।"

পোলকের অভিমত

মেটল্যাণ্ডের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিজ্ঞান নয়

উভয়পক্ষের এই বিরোধী মতের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা তা আমাদের আলোচনা করা দরকার।

সর্বপ্রথম আমাদের দেখা দরকার বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি। বিশেষরূপ জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলে। পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী বিভক্তিকরণের সাহায্যে কোন এক বিশেষ বস্তুর উপর আমরা যে সুসংবদ্ধ জ্ঞানলাভ করি, সেইটিই হচ্ছে বিজ্ঞান। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বিজ্ঞানের এই মাপকাঠিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা চলে?

বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায়

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের জন্য চাই পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণী বিভক্তিকরণ। এইগুলির মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক কোন এক বিশেষ বিষয়বস্তুর উপর কতকগুলি সিদ্ধান্ত বা সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেন যেগুলি অভ্রান্ত এবং সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য।

এখন আমাদের দেখা দরকার এই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞানগুলির ক্ষেত্রে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। কারণ, এই জাতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষার উপাদানগুলি অপরিবর্তনীয় থাকার জন্য বৈজ্ঞানিক সেগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করে পরীক্ষণ-নিরীক্ষণের দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন সেগুলি অভ্রান্ত এবং সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতঃ, গবেষণার উপাদানগুলি অপরিবর্তনীয় ও স্থির থাকলে গবেষণাকারী তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মানুষ। মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বস্তুগত বিজ্ঞানগুলির গবেষণার উপাদানগুলির মত স্থির ও অপরিবর্তনীয় নয়। সুতরাং তার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তগুলি সর্বক্ষেত্রে অভ্রান্ত নাও হতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু অনিশ্চয়তা-পূর্ণ

পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞানগুলির গবেষক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে নির্ভর করতে হয় বাহ্যিক পরিবেশের উপর। এই বাহ্যিক পরিবেশ পরিবর্তনশীল এবং তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আয়ত্তের বাহিরে। গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া, গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা বাঞ্ছনীয়ও নয়। এই কারণে রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীকে তার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করতে হয় বলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনেক সময় তর্কের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার পরিবেশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আয়ত্তাধীন নয়

ভৌতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি প্রতিষ্ঠিত করতে যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ-কারবার মানুষকে নিয়ে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারের প্রশ্ন উঠতে পারে না।

ভৌতিক বিজ্ঞানের অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে অভিহিত করা সম্ভব না হলেও, বিজ্ঞানের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য আমরা এই শাস্ত্রকে বিজ্ঞান বলেই অভিহিত করব। রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়সমূহকে শ্রেণী বিভাগ ও বিশ্লেষণ করে তার থেকে সাধারণভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। আরিস্টটল ১৫৮টি সংবিধানের শ্রেণী বিভাগ করে সংবিধান সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন আজ তা সর্বজনগ্রাহ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে শ্রেণী-বিভাগ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব

আজকের দিনে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করে লর্ড ব্রাইস গণতন্ত্র সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার গুরুত্ব অপরিসীম। লর্ড ব্রাইস যথার্থই বলেছেন যে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক আচরণে তারতম্য থাকলেও তার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সুসংবদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব।

আবহবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্রেও সঠিক সিদ্ধান্তে অনেক সময় উপনীত হওয়া সম্ভব হয় না। তাই বলে এগুলিকে আমরা বিজ্ঞান না বলে পারি না। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এই বিজ্ঞানগুলির মত পরিপূর্ণ বিজ্ঞান না হলেও বিজ্ঞান। সে কারণে, লর্ড ব্রাইস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে আবহবিদ্যার মত একটি অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করে তার থেকে বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তা সর্বাবস্থায় সমভাবে প্রযোজ্য না হলেও তার মধ্যে একটি সুসংবদ্ধতা এবং শৃঙ্খলা আছে। রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে সেগুলিকে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সুসংবদ্ধ জ্ঞানের সাহায্যে রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান সম্ভব

৫। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি (Methods of Political Science):

প্রত্যেক বিজ্ঞানেই তার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তুগুলি স্থির করার জন্য কতকগুলি অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ বিজ্ঞান

না হলেও বিজ্ঞান পদবাচ্য। সুতরাং রাষ্ট্র ও তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, স্বরূপ ইত্যাদি আলোচনার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলির মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি প্রধান :

(ক) **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি** (Experimental Method),

(খ) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি** (Historical Method) ;

(গ) **তুলনামূলক পদ্ধতি** (Comparative Method) ;

(ঘ) **দার্শনিক পদ্ধতি** (Philosophical Method) ;

(ক) **পরীক্ষামূলক পদ্ধতি** (Experimental Method) : সমগ্র রাষ্ট্রই একটি বিরাট পরীক্ষাগার। এখানে নতন আইন প্রণীত হতে পারে, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ধর্মীয় সংস্কার প্রবর্তিত হতে পারে আবার যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি চুক্তি সংগঠিত হতে পারে। রাষ্ট্রীয় জীবনে এইরূপ প্রতিটি ঘটনাই পর্যবেক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষার বিষয়বস্তু হতে পারে যেগুলি থেকে তার কার্যকারিতা সম্পর্কে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ : মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের (Montagu-Chelmsford Report) ফলে ভারতবর্ষে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষেত্রে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয় নেতাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার পরিচালনার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকার জন্যেই নাকি পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। বর্তমানে বলবন্ত মেটা কমিটির সুপারিশ অনুসারে সারা ভারতে পঞ্চায়েতী-রাজ প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী বিরাট পরীক্ষা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক দলপ্রথার অস্তিত্ব লোপ করে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে (Basic Democracy) পাকিস্থানেও এক নূতন রাজনৈতিক পরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

সমগ্র রাষ্ট্রই একটি বিরাট পরীক্ষাগার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এই সমস্ত ঘটনাগুলি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা সেখান থেকে কতকগুলি সূত্র বা নিয়ম আবিষ্কারের চেষ্টা করে যেগুলি সাধারণভাবে প্রযোজ্য। বেলজিয়ামের লোকেরা ফ্লেমিশ ও ফরাসী ভাষাভাষী হয়েও যখন এক জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হল, সুইজারল্যাণ্ডের লোকেরা

যখন তিনটি পৃথক ভাষা ব্যবহার করেও এক জাতীয়তার ভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে পারল, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তখন সূত্র আবিষ্কার করল যে, ভাষা জাতীয়তাবোধের একটি উপাদান হতে পারে তবে ভাষার পার্থক্য থাকলে জাতীয়তাবোধ জন্মাবেনা এমন কোন কথা নয়। ভাষার পার্থক্যকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষে যে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে তাতে অনেকে ভারতের জাতীয় ঐক্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তাদের অভয় দিতে পারেন সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করেন

তবে এই জাতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত যাতে পূর্ব ধারণা বা বিভ্রান্তিকর অনুরূপ ঘটনা প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হবে।

যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন সত্ত্বেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নির্ভুল না হতেও পারে। কারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে কেবলমাত্র অনুরূপ উপকরণ নিয়ে পরীক্ষা চালান সম্ভব নয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর আয়ত্তের বাহিরে বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় তার পরীক্ষার ক্ষেত্র পরিবর্তিত হতে পারে। রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি জড় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক তাঁর পরীক্ষাগারে নিজের সুবিধামত অনুরূপ উপকরণ বেছে নিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে তাঁর পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয় এবং তা বাঞ্ছনীয়ও নয়। পরীক্ষার উপকরণগুলি খুঁজে বেছে নিয়ে সেগুলিকে পরীক্ষাগারে স্থাপন করাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর পক্ষে সাধ্যাতীত। এই কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির অবকাশ থাকলেও তার সিদ্ধান্ত রসায়ন, পদার্থ, বা অন্যান্য জড় বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলির মত নির্ভুল না হতেও পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কেবলমাত্র অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে পরীক্ষা চালানো সম্ভব নয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যন্ত্রের প্রয়োগ সম্ভব নয়

(খ) **ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method):** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক পদ্ধতি এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সিলি (*Seeley*), ফ্রিম্যান (*Freeman*) প্রভৃতি ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতের সমর্থক। এই পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাদের উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও

সিলি, ফ্রিম্যান প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতের সমর্থক

অগ্রগতির ইতিহাসটিকে জানা দরকার। বর্তমানকে সঠিকভাবে জানতে হলে অতীতকে জানা চাই—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে সেই কথা প্রযোজ্য। কোন্ বিশেষ পরিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্র বা তার প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম হয়েছিল, কোন্ বিশেষ সামাজিক বা অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই বা তাদের বিশেষ ধরনের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়গুলি জানতে না পারলে তাদের বর্তমান রূপকেও আমরা ঠিক মত বুঝতে পারব না।

রাষ্ট্রের বর্তমান স্বরূপ বুঝতে হলে তার উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও অগ্রগতির ইতিহাস জানতে হবে

সিজউইক (*Sidgwick*) এই পদ্ধতি সম্পর্কে দুটি বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইতিহাস কোন প্রতিষ্ঠানের চূড়ান্ত মান নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। প্রতিষ্ঠানের অতীতকে আমরা জানতে পারি তার ইতিহাস পর্যালোচনা করে কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি ভাল কি মন্দ তা আমরা ইতিহাসের সাহায্যে নির্ণয় করতে পারি না।

সিজউইকের সতর্কতা—অতীতকে জানলেই বর্তমানের ভাল-মন্দ নির্ণয় করা যায় না

দ্বিতীয়তঃ, কোন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান স্বরূপ কতটা ঐতিহাসিক বিবর্তনের পরিণতি স্বরূপ, ইতিহাস সঠিকভাবে তা নির্ণয় করতে সক্ষম নয়। প্রত্যেক যুগেরই বিশেষ সমস্যা ও অসুবিধা থাকতে পারে এবং বর্তমান পরিস্থিতি তার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে। সুতরাং অতীতের বিশেষ অবস্থার পর্যবেক্ষণ যে বর্তমানকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে—এ ধারণা ভ্রমাত্মক।

বর্তমান কি পরিমাণে অতীতের পরিণতি তা জানা দরকার

(গ) **তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ঃ** রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তুলনামূলক পদ্ধতি ঐতিহাসিক পদ্ধতির পরিপূরক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তুলনামূলক পদ্ধতিতে অতীতের রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া বর্তমানের প্রতিষ্ঠানগুলিও পর্যবেক্ষণ করা হয়। অতীতে এবং বর্তমানে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে যে নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয় সেগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর আমরা কোন বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির কার্যকারণ নির্দেশ করতে পারি। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল ১৫৮টি শাসন ব্যবস্থার তুলনামূলক বিচার করে তাঁর রাষ্ট্রনীতির (Politics) সিদ্ধান্তগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বর্তমান কালে জেমস্ ব্রাইস (*James*

কোন রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতির কার্যকারণ জানতে হলে অনুরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন

Bryce) কয়েকটি গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করে শাসন-ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের মূল্য নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।

তুলনামূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন আদর্শ বা প্রতিষ্ঠানের মূল্য নির্ধারণ করতে হলে সমসাময়িক আদর্শ বা প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে সংবাদপত্র, ইতিহাস, সরকারী রিপোর্ট, পত্রিকা ইত্যাদি মারফত তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তুলনীয় বিষয়বস্তুগুলি যথার্থই অনুরূপ কিনা বুঝতে হলে তাদের অর্থ নৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক—এমনকি ভৌগোলিক পটভূমিকায় সেগুলি বিচার করার প্রয়োজনীয়তা আছে। স্থৈর্যের অভাব অথবা অসাবধানতাজনিত গৃহীত তুলনামূলক তথ্য ভুল সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই পদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

তুলনীয় বিষয়-বস্তুগুলিকে বিভিন্ন পটভূমিকায় বিচার করা প্রয়োজন

(ঘ) দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method): রুশো (*Rousseau*), মিল (*Mill*) এবং সিজউইক (*Sidgwick*) প্রভৃতি লেখকগণ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই সকল লেখকেরা মানুষের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অমূর্ত (abstract), অভিজ্ঞতা পূর্ব (*apriori*) ধারণা নিয়ে শুরু করে সেখান থেকে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য এবং কাযকলাপ সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেন। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং কাযাবলী সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার পর তাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন। এই পদ্ধতি স্পষ্টতই অবরোহধর্মী।

রুশো, মিল প্রভৃতি দার্শনিকেরা মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি অমূর্ত ধারণা নিয়ে শুরু করে সেখান থেকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও কাযকলাপ সম্বন্ধে মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন

এই পদ্ধতি স্বভাবত অতিমাত্রায় ধারণাকেন্দ্রিক। রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের যে কোন ঘটনা তাঁরা তাদের ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার চেষ্টা করেন। প্লেটো, রুশো, হেগেল, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকেরা রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যকে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ ধারণার মাপকাঠিতে বিচার করার চেষ্টা করেছেন, ফলে অনেক ক্ষেত্রে সেগুলি অবাস্তব এবং ধারণাসর্বস্ব মতবাদে পর্যবসিত হয়েছে।

এই পদ্ধতি অতিমাত্রায় ধারণাকেন্দ্রিক

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে তার প্রতিপাদ্য বিষয় বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু এক বিশেষ আদর্শ এবং নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এই ঘটনাবলীর যাথার্থ বিচারের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা চলে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতিগুলি মোটামুটি আলোচনা করা গেল। অনেক জার্মান এবং ফরাসী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আরো কতকগুলি অনুসন্ধান পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। যথা—সমাজ-বিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method), জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি (Biological Method) মনস্তাত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method) এবং আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical, Method)। এই পদ্ধতিগুলিকে প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধান পদ্ধতি বলে গণ্য না করাই উচিত। এগুলি হচ্ছে এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ, যার সাহায্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়গুলি আলোচিত হয়।

জীববিদ্যামূলক পদ্ধতি (Biological Method) রাষ্ট্রের সঙ্গে জীবদেহের তুলনা করে এবং রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে।

সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological Method) অনুসারে ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিবর্তনের পটভূমিকায় রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনাগুলি পর্যালোচনা করা হয়।

মনস্তাত্বিক পদ্ধতি (Psychological Method) মনস্তত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। কারণ মানুষ যে উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে কাজ করে তা তার সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে।

আইনমূলক পদ্ধতি (Juridical Method) অনুসারে রাষ্ট্রকে এমন একটি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করা হয় যেটি নাকি কতকগুলি আইনসংগত অধিকার এবং বিবর্তনের সমষ্টিমাত্র। আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত আইনের বাইরে কোন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা ক্রিয়াকলাপকে এই পদ্ধতির সমর্থকেরা স্বীকার করতে রাজী নন, ফলে এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী সংকীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ।

৬। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ

(Relation of Political Science to other Sciences):

কোন শাস্ত্রকে ভালভাবে জানতে হলে অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক অনুধাবন করা উচিত। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য নীতিশাস্ত্র, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার জন্য এই বিভিন্ন শাস্ত্রগুলি একযোগে সমাজবিজ্ঞান বা মানবীয় বিজ্ঞানের (Social or Human Science) অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানও এইরূপ মানবীয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত একটি শাস্ত্র। সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত শাস্ত্রগুলি নানা ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে ভালভাবে জানতে হলে এই শাস্ত্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক জানা দরকার। তাছাড়া, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক শাস্ত্র মানব-জীবনকে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত করে। তাই এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন শাস্ত্রের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধও অনুধাবন করা প্রয়োজন। বস্তুতঃ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ অনুধাবন না করলে কোন শাস্ত্রেরই ফল সম্পূর্ণ হয় না। এক্ষণে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা যাক:

(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান (Political Science Sociology) : সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সমাজ-বিজ্ঞান মানবসমাজের উৎপত্তি, বিবর্তন এবং তার বর্তমান স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করে কতকগুলি সাধারণ সূত্র বা তত্ত্ব নির্ধারণ করে এবং বিবর্তনের প্রতি স্তরে মানুষের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, অভ্যাস ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে তার মূল্য নির্ণয় করে।

সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু রাষ্ট্র। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ইতিহাস, স্বরূপ এবং তৎসংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলির গঠন ও কার্যপ্রণালী নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ঐতিহাসিক অগ্রগতির কথা জানতে হলে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। তাছাড়া, মানুষের সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনও একটি দিক। সুতরাং সমাজবিজ্ঞানের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ না হয়ে পারে না। তবে সমাজবিজ্ঞান এমনি একটি শাস্ত্র যার আলোচনার ক্ষেত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যাপক। সমাজ-বিজ্ঞান মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করে কিন্তু মানুষের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জীবনই কেবল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র ব্যাপক

অধ্যাপক গিডিংসের (*Giddings*) মতে যাঁরা সমাজ-বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি জানেন না, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান অসম্পূর্ণ। অধ্যাপক মরগ্যান (*Morgan*), ম্যাকলেনান (*Mclennan*), গিডিংস্ (*Giddings*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির সূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে অনিবার্য ভাবে সমাজবিজ্ঞানের আলোচ্য পরিধির মধ্যে এসে পড়েছিলেন।

অধ্যাপক গিডিংসের এই মতকে আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি স্বাধীন এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান। এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন শাস্ত্র পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। নীতিবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি সমাজ-বিষয়ক বিজ্ঞানের (Social Science) কোন শাস্ত্রকেই এককভাবে এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত অন্য শাস্ত্র থেকে পৃথক ভাবে আলোচনা করা চলে না। সমাজ-

উভয় বিজ্ঞানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল সূত্রকে না জানলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান যেমন অসম্পূর্ণ থেকে যায়; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কয়েকটি অধীত তথ্যকে বিশেষভাবে না জানলে তেমনি সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞানও শেষ হয় না।

(খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস (Political Science and History): রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস থেকে তার মালমশলা সংগ্রহ করে কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। যেমন, ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দী থেকে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। এর পরিণতি ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে স্বৈরাচারতন্ত্রে। তাই ইংলণ্ডে টিউডর রাজাদের আমলে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তি এবং ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে স্বৈরাচারতন্ত্রের স্বরূপ বিচার করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রকে ইতিহাসের সাহায্য নিতে হবে।

রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হলে ইতিহাস থেকে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে

রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। শুধু তাই নয়, একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। ইতিহাস-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ধারণাসর্বস্ব কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্বে পর্যবসিত হতে বাধ্য। অধ্যাপক সিলি (*Seeley*) বলেছেন—ইতিহাসকে বাদ দিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে তার মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় আর ইতিহাস থেকে রাষ্ট্রনীতিকে বাদ দিলে ইতিহাসের কোন অর্থই থাকে না।

সিলির মত

"Politics without History has no root
History without Politics has no fruit"

রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুলির জন্য প্রধানতঃ ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল হলেও ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর একমাত্র অনুসন্ধান ক্ষেত্র নয়। ইতিহাসের যে সমস্ত উপকরণের সাথে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সূত্রগুলির কোন সম্পর্ক নেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গবেষণাকারী সেগুলি সযত্নে বাদ দিয়ে কাজ করবেন। কোন উপকরণগুলি প্রয়োজন এবং কোন্‌গুলি নিষ্প্রয়োজন তা ঠিক করতে হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীকে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কাজেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমন অনেক মতবাদ আছে, যেমন—আদর্শবাদ, হিতবাদ প্রভৃতি মতবাদ, যেগুলি ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত না হলেও রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্ণয়ে এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্য নিরূপণে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সেদিক থেকে বিচার করলে এই মতবাদগুলির অবদান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মূল্যবান।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাসের অনুসন্ধান ক্ষেত্রের পার্থক্য

পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে, ইতিহাস শুধু মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ইতিহাস নয়; ইতিহাস মানব সভ্যতার ইতিহাস। মানব সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবন সব কিছুই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়বস্তু। তবে বর্তমান যুগে ইতিহাস যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাছে অনেকাংশে ঋণী একথাও স্বীকার করতে হবে। কেননা, গত দুই মহাযুদ্ধের মধ্যে জার্মানী এবং ইতালীর ইতিহাস যথাক্রমে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসীবাদকে কেন্দ্র করেই। দুই বিবদমান শক্তিগোষ্ঠীর আদর্শবাদকে কেন্দ্র করে আজকের দিনের পৃথিবীর ইতিহাস গড়ে উঠছে।

(গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি (Political Science and Economics): গ্রীক দার্শনিকদের থেকে শুরু করে অনেক প্রাচীন লেখকেরা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অংশ বলে মনে করতেন। গ্রীক দার্শনিকেরা *Political Economy* শব্দটি ব্যবহার করতেন। কি উপায়ে রাজস্ব সংগ্রহ করে রাষ্ট্রকে অধিকতর শক্তিশালী করা যায় সেইটিই ছিল এই শাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, অষ্টাদশ শতকে আডাম স্মিথও (*Adam Smith*) অর্থনীতির আলোচনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার দিকটি বিশদভাবে বিবেচনা করেছেন।

গ্রীক দার্শনিকেরা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা বলে মনে করতেন

বর্তমান কালে অবশ্য অর্থনীতিকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। অর্থনীতির আলোচনার ক্ষেত্র আজ শুধু রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত নয়; ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রেও এই শাস্ত্রের বিস্তৃতি ঘটেছে।

অর্থনীতি হচ্ছে ধনের বিজ্ঞান অর্থাৎ ধনের উৎপাদন, ব্যবহার, বিনিময়, বণ্টন ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের যাবতীয় কাজ-কর্ম ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু। অর্থনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির যথাযথ এবং বিশদ্ আলোচনার জন্য অর্থনীতিকে একটি পৃথক শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করার প্রয়োজনীয়তাকে আজ অস্বীকার করা চলে না।

ধনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু

অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র আজ পৃথক হলেও এই দুইটি শাস্ত্র পরস্পরের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

রাষ্ট্রনৈতিক কাঠামো আজ উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে। এমন এক দিন ছিল যখন দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করা এবং দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্ট্রের

একমাত্র কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। আজকের দিনের এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হতে চলেছে। শ্রমিক যদি পুঁজিবাদী কর্তৃক শোষিত হয়, ধনী যদি এক বিশেষ সমাজব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে দরিদ্রকে তার ভোগবিলাসের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, নাগরিক জীবন তাহলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পুঁজিবাদী এবং ধনিকশ্রেণীর এই অবাধ-স্বাধীনতার অধিকার পৃথিবীর প্রায় সকল রাষ্ট্রেই আজ অস্বীকৃত হতে চলেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে শুরু করে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রই আজ জাতীয় সম্পদের উৎসগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে ধনবণ্টন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির কথা বাদ দিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিও আজ নির্জলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের পথকে বর্জন করেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি রাষ্ট্রে শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। ধন বণ্টনের বৈষম্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্যদেশ আজ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ডীল (*New Deal*) পরিকল্পনা এই প্রকার একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ভারতবর্ষের সংবিধানে চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে (*Directive Principles of State Policy*) ধন বণ্টনের বৈষম্যের ক্ষেত্রে সমতা আনয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে

রাষ্ট্র যেমন দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থনৈতিক কাঠামোও তেমনি দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শাসকশ্রেণীর গঠন, প্রকৃতি, নির্বাচন প্রথা—এমন কি সরকারের স্থায়িত্ব পর্যন্ত অনেকাংশে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্র পৃথক হলেও দুটি শাস্ত্র পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে অর্থনীতি অথবা অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্যক আলোচনা সম্ভব নয়।

(ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান (Political Science and Ethics): নীতিবিজ্ঞান এমনই একটি শাস্ত্র যার কাজ মানুষের আচরণের ভাল-মন্দ বিচার করা। আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, উচিত-অনুচিত—এই শব্দগুলি প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভাল-মন্দ বা ন্যায়অন্যায় বিচারের মাপকাঠি কি? কোন্ নীতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কোন কাজকে ভাল বা

নীতিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মন্দ, ন্যায় বা অন্যায় বলে আখ্যা দিয়ে থাকি? এই ঔচিত্য বা অনৌচিত্য নির্ধারণের কাজে পথ নির্দেশ করে নীতিবিজ্ঞান। অধ্যাপক ম্যাকেঞ্জির (*Mackenzie*) মতে মানুষের কাজের ভাল বা ঔচিত্যের আলোচনা নীতি-বিজ্ঞানের কাজ।[1]

মানুষের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা যদি নীতিবিজ্ঞানের কাজ হয় তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে তার সম্পর্ক সুস্পষ্ট। ইটালীর বিখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলির (*Machiavelli*) মতে লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যে কোন উপায় অবলম্বন করাই যুক্তিসংগত। তিনি বলেন, বিশ্বাসরক্ষা করা যদি শাসকের স্বার্থের পরিপন্থী হয় তবে, তার মতে শাসকের বিশ্বাস ভঙ্গ করাই যুক্তিযুক্ত।[2] লক্ষ্য সাধন করার জন্য রাজাকে তিনি সিংহের মত সাহসী এবং শৃগালের মত ধূর্ত হবার নির্দেশ দিয়েছেন।

উদ্দেশ্য মহৎ হলে পথকেও মহৎ হতে হবে কি? রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক নৈতিক প্রশ্ন

এই পথই কি যথার্থ পথ? ঈপ্সিত বস্তুকে লাভ করার জন্য রাষ্ট্রনায়কের বিশ্বাসভঙ্গের কাজকেও কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমর্থন করবে? মহাত্মা গান্ধী বলতেন—উদ্দেশ্য মহৎ হলে তার উপায়কেও মহৎ হতে হবে। অসৎ উপায় অবলম্বন করে মহান লক্ষ্যে পৌছনো যায় না। লর্ড অ্যাকটনের (*Lord Acton*) মতে সরকার কি করছে এটিই শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্যা নয়—সরকারের কি করা উচিত সেটিও তার বিচার্য বিষয়। ফক্স (*Fox*) বলেছেন—নীতির দিক থেকে যা অন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে তা কখনও ন্যায় বলে বিবেচিত হতে পারে না।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের মতে ভাল জীবন যাপনকে সম্ভব করে তোলার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের তরফ থেকে সব সময় এমন এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা উচিত যেখানে মানুষ তার সুন্দর জীবনযাত্রা নির্বাহকে সম্ভব করে তুলতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলতঃ নৈতিক

1 "Ethics may be defined as the study of what is right or good in conduct' —*Mackenzie* A Manual of Ethics

2 "A prudent ruler ought not to keep faith when by doing so it would be against his interest, and when the reasons which made him bind himself on longer exist"—*Machiavelli* The Prince.

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে নীতিবিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাদের আলোচনার ক্ষেত্র এক নয়। নীতিশাস্ত্র মানুষের আচরণের যাথার্থ নির্ণয় করতে গিয়ে মানুষের চিন্তা ও বাহ্যিক আচরণ—এই দুটি দিক নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র মুখ্যতঃ মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারো অনিষ্ট করা বা অনিষ্ট চিন্তা করা নীতিবিজ্ঞানের দিক থেকে অন্যায় কিন্তু অনিষ্ট করা চিন্তার পর্যায়ে থাকলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার আলোচনার পরিধিকে সেখানে বিস্তৃত করার চেষ্টা করবে না। কিন্তু চিন্তিত বিষয়কে কাজে পরিণত করতে গেলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান এগিয়ে আসবে পারস্পরিক অধিকার এবং কর্তব্যের প্রশ্ন নিয়ে, যেগুলি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক তথা সমাজনৈতিক জীবনযাত্রা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র

(ঙ) **রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (Political Science and Psychology):** ইংলণ্ডের ম্যাক্‌ডুগাল (*McDougall*), ফ্রান্সের লেবঁ (*LeBon*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনোবিদ্যার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা করেছেন।

মানুষের অনেক রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কার্যাবলী অনেকাংশে তার মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করে। কোন সরকার জনপ্রিয়তা হারালে তার পক্ষে বেশী দিন ধরে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় না। গণ-বিক্ষোভের ঢেউ যখন কোন দেশকে আন্দোলিত করতে থাকে তখন কোন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক বৈষম্যই যে তার কারণ হবে এমন কথা নয়। সাধারণ মানুষ অনেক সময় নিছক ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাসের বশীভূত হয়েও প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টি করে। তাই গণমানসের বিশ্লেষণ এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

রাষ্ট্র ব্যবস্থায় মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব

বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হওয়ার ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক কার্যাবলীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় কোন সরকার জনমতের বিরুদ্ধে বেশীদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। তাই জনমতের স্বরূপ এবং তার বিশেষ ধরনের অভিব্যক্তির কারণগুলি যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করা আজকের দিনে

জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের এক প্রয়োজনীয় কর্তব্য। এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করার পর সরকার জনমতকে স্বপক্ষে রাখার জন্য নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন।

(চ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল (Political Science and Geography): অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের মতে গ্রীসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার ভৌগোলিক অবস্থান। বঁদা (*Bodin*), রুশো (*Rousseau*) মঁতেস্কু (*Montesquieu*) প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা মানুষের রাজনৈতিক জীবনের উপর ভৌগোলিক প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

ভৌগোলিক প্রভাবের উপর বিশ্বাসী লেখকগণ

বঁদা (*Bodin*) মনে করতেন, ভৌগোলিক অবস্থান ও জল-হাওয়া রাষ্ট্রনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে। তার *Methodus* এবং *De Republica* নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, পৃথিবীর উত্তর অঞ্চলের লোকেরা শরীরের দিক থেকে শক্তিশালী আর দক্ষিণ অঞ্চলের লোকেরা বুদ্ধিবৃত্তিতে শক্তিশালী। মধ্য অঞ্চলের লোকদের মধ্যে এই উভয় গুণের সমন্বয় হওয়ার জন্যই তারা রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ পরিচালনায় শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে।

বঁদার অভিমত

ঐতিহাসিক বাক্‌লে (*Buckle*) বলেছেন, মানুষের কার্যাবলী অনিবার্যভাবে ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' নামক গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষ এবং সমাজ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা নিজেদের পরিচালিত করে না। আবহাওয়া, খাদ্য, স্থান প্রভৃতি বস্তুগত পরিবেশই মানুষের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে।

বাকলের মত

আধুনিক দৃষ্টান্ত

বাক্‌লে মানুষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন বলে মনে হয়। দার্শনিক হিউম জাতীয় চরিত্রের উপর ভৌগোলিক প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন। বাক্‌লে জাতীয় চরিত্রের উপর ভৌগোলিক প্রভাবের অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলেও জাতীয় জীবন যে অনেক ক্ষেত্রেই তার প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভরশীল—একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বর্তমানে ভারতবর্ষের উপর চীন আক্রমণের কারণকেও এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করা হয়েছে। পূর্বে চীনকে

তার উত্তরাঞ্চলের রুশ, মঙ্গল প্রভৃতি শত্রুভাবাপন্ন জাতিগুলির উপর দৃষ্টি রাখতে হত। বর্তমানে চীন এবং তার উত্তরাঞ্চলীয় দেশে একই আদর্শে বিশ্বাসী কমুনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় চীন তার সম্প্রসারণমূলক নীতি দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলির দিকে প্রসারিত করতে চলেছে। ভৌগোলিক পরিবেশ জাতীয় ইতিহাসকে প্রভাবিত করার এটি একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

(ছ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা (Political Science and Biology): জীববিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক প্রশ্নের অবতারণা করেছে।

জীবজগতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ডারউইন তাঁর বিবর্তনবাদ প্রচার করেন। তাঁর এই মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্বরূপ এবং ইহার কার্যাবলী সম্বন্ধে অনেক তত্ত্বকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর মতে রাষ্ট্র যদি উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়ন করে তার কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে চলে তাহলে সে শক্তিমানের শ্রেষ্ঠতর শক্তিকে নিরুৎসাহ করে দুর্বলের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবে। জীবজগতে আমরা দেখতে পাই যে, শরীরিক শক্তি এবং বুদ্ধির দিক থেকে যে বলবান সেই শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে আর দুর্বল ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। রাষ্ট্র তার তথাকথিত সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদির মধ্য দিয়ে জীবজগতের এই শাশ্বত নিয়মটির যদি বিরুদ্ধে যায় তবে শক্তিমানকে আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর ব্যক্তিদের নিয়ে বলিষ্ঠ সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি কোন দিনই সম্ভব হবে না। সুতরাং কেবলমাত্র শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা ছাড়া রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের যুক্তি

জীবজগতের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দৃষ্টান্ত দিয়ে জার্মান দার্শনিক নীটশে (*Nietzche*) এবং ট্রিটসকে (*Treitschke*) রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের বিরোধকে এক স্বাভাবিক ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সমর্থন করেছেন।

নীটশে ও ট্রিটসকের মত

হার্বার্ট স্পেন্সার (*Herbert Spencer*), ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*) প্রভৃতি লেখকেরা জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে রাষ্ট্রের স্বরূপ এবং কার্যাবলী ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব জীববিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, যেখানেই জীববিদ্যার কোন উৎস থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার আলোচনার সূত্র সংগ্রহ করেছে, সেখানেই এক চূড়ান্ত বিতর্কমূলক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। হাবার্ট স্পেন্সারের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বা নীটশের যুদ্ধবাদ আজকের দিনে সুস্থ রাজনৈতিক আদর্শ বলে বিবেচিত হয় না।

জীববিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুস্থ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই

(জ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব (Political Science and Anthropology) ঃ রাষ্ট্র এবং তার আইন-কানুনগুলির বিজ্ঞানসম্মত কারণগুলির অনুধাবন করতে হলে নৃতত্ত্বের সাহায্য গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। স্যার হেনরী মেইন (*Henry Maine*), লুই মরগ্যান (*Lewis Morgan*), স্যাভিংনি (*Savigny*), জেংকস্ (*Jenks*) প্রভৃতি লেখকগণ নৃতত্ত্ব থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই সকল লেখকেরা প্রাচীন অনুন্নত সমাজগুলির গঠন, সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির সূত্র অনুধাবন করে সভ্যতা তথা রাষ্ট্রনৈতিক অগ্রগতির সূত্রটি আবিষ্কার চেষ্টা করার করেছেন।

মরগ্যান, স্যাভিংনি, জেংকস্ প্রভৃতি লেখকেরা নৃতত্ত্ব থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তির উপকরণ সংগ্রহ করেছেন

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ নৃতত্ত্বের কাছে অনেকাংশে ঋণী। কোন এক রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপ বুঝতে হলে তার অতীত সমাজ-ব্যবস্থার রীতিনীতি, অনুশাসন ইত্যাদি আলোচনা করা কর্তব্য।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা ক্ষেত্র ঃ

মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তায় রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্রের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সমাজজীবনে শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

নামকরণ ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নামকরণ নিয়ে মতবিরোধ আছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রদর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান—এই বিভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য পরিধি ও ব্যাপকতার প্রয়োজনীয়তায় এই শাস্ত্রকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে অভিহিত করাই যুক্তি সঙ্গত।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য ? ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ভৌতিক বিজ্ঞানগুলির মত সুসম্পূর্ণ বিজ্ঞান না হলেও যেহেতু এই শাস্ত্রে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ এবং শ্রেণীবিভক্তিকরণের সাহায্যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব তজ্জন্য একে বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুসন্ধান পদ্ধতি :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন অনুসন্ধান পদ্ধতির মধ্যে (১) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি, (২) তুলনামূলক পদ্ধতি, (৩) ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও (৪) দার্শনিক পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্বন্ধ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান :

সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র অপেক্ষা ব্যাপক। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক প্রভৃতি সকল দিকেই কিছু না কিছু আলোকপাত করে, অপরদিকে মানুষের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জীবনই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস :

রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বুঝতে হলে ইতিহাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। তাই বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের অনুসন্ধান ক্ষেত্র এক নয়। ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা ক্ষেত্র অপেক্ষা বিস্তৃত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্ত মূলতঃ তাত্ত্বিক বলে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতি :

গ্রীক দার্শনিকেরা অর্থনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শাখা বলে অভিহিত করেছেন। উভয় শাস্ত্রে আলোচনার বিষয়বস্তু পৃথক। অথচ রাষ্ট্রনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো পরস্পরকে প্রভাবিত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান :

সামাজিক জীবনে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচারের প্রশ্ন উভয় শাস্ত্রই করে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্র মুখ্যতঃ মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে জড়িত। কিন্তু নীতিশাস্ত্র মানুষের চিন্তা ও বাহ্যিক উভয় আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান :

রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপ মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার জন্য বিশেষ করে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনমতের স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ভূগোল :

বদাঁ, রুশো প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে ভৌগোলিক প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক বাকলের মতে ভৌগোলিক পরিবেশ মানুষ্য জাতির জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। বাকলের মতবাদে অতিশয়োক্তি থাকলেও জাতীয় জীবনের উপর প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যা :

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, আদর্শবাদী ও যুদ্ধবাদীরা জীববিদ্যা থেকে তাঁদের প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। জীববিদ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন সুস্থ আদর্শ স্থাপন করতে পারে নাই।

Exercise

1. Discuss the scope of Political Science (*C. U. 1959*

2. Discuss whether Political Science can be called a Science.

3. To what extent is Politics a Science ? Give reasons for your answer.

4. Discuss the relation of Political Science to History and Ethics.

5 "History without Political Science has no fruit, Political Science without History has no root."—Seeley. Examine the statement (*C. U. 1950, '59*)

6. Define Political Science Indicate the relation of Political Science to (*a*) Sociology, (*b*) Economics and (*c*) Ethics.

(*C. U. 1940, '58, '60*)

7 Bring out the relation between (*a*) Political Science and History (*C. U 1957, '58,*) and (*b*) Political Science and Economics. (*C U. 1958*)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র
(The State)

১। রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও উপাদান (Definitions of the State and its essential elements) :

মানুষের সমাজ জীবনে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটল থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা তাঁদের পৃথক দৃষ্টিভংগী থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (*Woodrow Wilson*) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—"একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে আইনানুগ ভাবে সংঘবদ্ধ জনসমষ্টিই রাষ্ট্র" (A State is a people organised for law within a definite territory)। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড ল্যাস্কির (*Harold Laski*) মতে আধুনিক রাষ্ট্র হল এমন একটি ভৌগোলিক সমাজ, যেটি শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিভক্ত এবং যেখানে শাসক তার নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখার মধ্যে অন্যান্য সংস্থাগুলির উপর প্রভুত্ব দাবি করে" ("The modern state is a territorials society divided into Government and subjects claiming, within its allotted physical area, a supremacy over all other associations.")।

রাষ্ট্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা

অধ্যাপক ল্যাস্কি ছিলেন বহুত্ববাদী। বহুত্ববাদের সমর্থক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরস্থিত সংস্থাগুলির উপরই তার প্রভুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন।

রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করতে গিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্র সম্পর্কে যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তার মধ্যে অনেকের মতে অধ্যাপক গার্ণার (*Garner*) প্রদত্ত সংজ্ঞাই সর্বোৎকৃষ্ট। প্রকৃত পক্ষে, যে সমস্ত বিভিন্ন উপাদান নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত তার সব কটিই গার্ণারের সংজ্ঞার মধ্যে স্থান পেয়েছে। অধ্যাপক গার্ণার বলেছেন, "রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং আইনের ধারণা হিসেবে রাষ্ট্র বলতে এমন এক অতি বা নাতিবৃহৎ জনসমাজকে বোঝায়, যে জনসমাজ অন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্র থেকে প্রায় বা সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত হয়ে একটি সরকার গঠন করে

এবং ঐ সরকারের প্রতি উক্ত জনসমাজের অধিকাংশ চিরকালীন আনুগত্য স্বীকার করে" ("The state, as a concept of political science and public law, is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which the great body of inhabitants render habitual obedience."—*Garner.*)। গার্ণারের এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে আমরা রাষ্ট্রে চারটি উপাদানের অস্তিত্ব দেখতে পাই: যথা, **(ক) জনসংখ্যা (খ) নির্দিষ্ট ভু-খণ্ড (গ) সরকার এবং (ঘ) সার্বভৌমিকতা।**

রাষ্ট্রের উপাদান

(ক) জনসংখ্যা (Population): জনসমষ্টি ব্যতিরেকে কোন রাষ্ট্রের কল্পনা করা যায় না। কোন এক রাষ্ট্রে সমগ্র জনসমষ্টির মধ্যে মূলতঃ তিনটি শ্রেণীর অস্তিত্ব দেখা যায়, যথা—নাগরিক, প্রজা ও বিদেশী। এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে নাগরিক সম্প্রদায়ই সংখ্যাধিক এবং রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যারা রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে ও কর্তব্য পালন করে এবং রাষ্ট্রের কাছ থেকে পৌর ও রাজনৈতিক সকল অধিকার উপভোগ করার অধিকারী, তারাই হল নাগরিক। শিশু, পাগল এবং জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি, যাদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, অনেকে তাদের 'প্রজা' আখ্যা দিয়ে থাকেন। কোন রাষ্ট্রের নাগরিক কোন কারণবশতঃ স্বরাষ্ট্রে বাস না করে যদি সাময়িকভাবে অন্য রাষ্ট্রে বাস করে তবে ঐ অন্য রাষ্ট্রের কাছে তারা বিদেশী। বিদেশীদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না।

জনসংখ্যার বিভিন্ন উপাদান

রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। দক্ষিণ আমেরিকার অনেক রাষ্ট্রের জনসংখ্যা অল্প। আবার চীন, ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বিরাট জনসংখ্যা সমন্বিত রাষ্ট্রও রাষ্ট্র।

জনসংখ্যার বাঁধাধরা নিয়ম নেই

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতানুসারে ৫০৪০ সংখ্যক জনসমষ্টি রাষ্ট্রের আদর্শ জনসংখ্যা। প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা সুচারুরূপে পরিচালিত হয় এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার

যে, এই উভয় দার্শনিকের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা তদানীন্তন নগর-রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাই তাঁদের পক্ষে, রাষ্ট্রের আদর্শ জনসংখ্যাকে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সীমায় নির্দিষ্ট করার প্রবণতাই স্বাভাবিক। সে-কারণে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) কম জনসংখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন।

কম জনসংখ্যার সুবিধা অসুবিধা

জনসংখ্যা কম হলেই যে রাষ্ট্র সু-শাসিত হবে বর্তমান যুগে এই ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় আজকাল কেবলমাত্র জনবহুলত্বের জন্য কোন রাষ্ট্রকেই শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না।

বৃহৎ জনসংখ্যা আজকের দিনে কোন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে না

(খ) নির্দিষ্ট ভু-খণ্ড (Territory) : সমাজের আদি অবস্থায় মানুষকে যখন জীবিকা সংস্থানের চেষ্টায় অথবা আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হ'ত, তখন তারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নেই। মানুষ যখন তার ভ্রাম্যমাণ অবস্থা ত্যাগ করে কোন এক বিশেষ ভু-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করতে লাগল—রাষ্ট্র সৃষ্টির দিকে তখনই হল তাদের প্রথম পদক্ষেপ। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন—কোন এক জনসমাজের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভু-খণ্ডের স্থায়ী সম্পর্ক। সুসভ্য ইহুদী জাতি যতদিন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল—ততদিন তাদের কোন রাষ্ট্র ছিল না। যখন থেকে তারা বর্তমান ইস্রেল নামক ভু-খণ্ডের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারল—তখন ইস্রেল হল একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড বলতে ভৌগোলিক সীমানা ছাড়া তার ভূ-গর্ভস্থ সম্পদ, আকাশপথ এবং উপকূলবর্তী সমুদ্রের কিয়দংশকেও বোঝায়।

জনসংখ্যার সঙ্গে নির্দিষ্ট ভুখণ্ডের স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন রাষ্ট্রের প্রথম প্রয়োজন

জনসংখ্যার মত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আয়তন নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে। তবে আমাদের স্মরণ রাখিতে হবে যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সব চাইতে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ও শক্তিশালী রাষ্ট্র দুটির—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট ইউনিয়ন—ভৌগোলিক সীমারেখা বেশ বড়।

ভৌগোলিক সীমারেখার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই

বড ভৌগোলিক সীমারেখা প্রত্যেক রাষ্ট্রের পক্ষেই কাম্য। জার্মান দার্শনিক ট্রিট্স্কে (*Treitschke*) রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্বকে তার অভিশাপ বলে আখ্যা দিয়েছেন। ক্রমাগত বর্ধিত জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইটালির নেতা মুসোলিনী চেয়েছিলেন—"আরও জমি"।

ট্রিট্স্কের অভিমত

প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নাগরিক জীবনের মান উন্নয়ন করতে চায় তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে। খনিজ ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিচালনার মাধ্যমে তার নাগরিক জীবনের মান উন্নততর করা সহজ হয়। তা ছাড়া, বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে তার প্রতিরক্ষা সংগঠনকে দৃঢ়তর করাও সম্ভব হয়। বর্তমান যুগে সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বৃহৎ ভৌগোলিক সীমার সুবিধা

তবে ভৌগোলিক সীমারেখার বিস্তৃতির উপরে রাষ্ট্রের মহত্ত্ব নির্ভর করে না। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স তাদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সীমারেখা নিয়ে আজও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিক থেকে পৃথিবীর অনেক জাতির তুলনায় তারা অগ্রগামী। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখা ক্ষুদ্রতর হলে নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশপ্রেম বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়। শাসন সংক্রান্ত সমস্যাও সহজতর হয়ে ওঠে। গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল এই কারণে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রতর সীমারেখার পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমানে ভারতবর্ষে জাতীয় সংহতির সমস্যা যে প্রবল আকার ধারণ করেছে তার থেকেই আমরা এই মতের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি।

ভৌগোলিক সীমারেখার উপর রাষ্ট্রের মহত্ত্ব নির্ভর করে না

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এবং বস্তুর উপর রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকলেও সমস্ত রাষ্ট্রই আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের সুবিধার জন্য বিদেশী জাহাজ, রাষ্ট্র প্রধান এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিবৃন্দের উপর রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করে না।

(গ) সরকার (Government): এক নির্দিষ্ট সংখ্যক জনসমষ্টি কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে বাস করলেই রাষ্ট্র গঠিত হয় না। শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনযাত্রা সম্ভব করার জন্যেই রাষ্ট্র। এইজন্য নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির প্রয়োজন হয় একটি যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠানের যার সাহায্যে মানুষ

তার সমাজ-জীবনের প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। সরকার হচ্ছে এমনি এক যন্ত্র বা প্রতিষ্ঠান যার সাহায্যে সামাজিক শৃঙ্খলাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, সরকারই রাষ্ট্রের জনসমষ্টিকে আইনকানুন পালন করে সুসংবদ্ধ সমাজ জীবন-যাপন করতে সাহায্য করে।

সরকার একটি যন্ত্রের মত যার সাহায্যে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়

শাসনকার্যে অংশগ্রহণকারী জনসমষ্টি সরকার পরিচালনা করে। অতীতে গ্রীস এবং রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে সমস্ত স্বাধীন নাগরিকেরা সরাসরিভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেত। কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা ও সীমারেখা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য সমস্ত নাগরিকের পক্ষে সরাসরিভাবে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান যুগে শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব অনিবার্যভাবে স্বল্পসংখ্যক জনসমষ্টির হাতে ছেড়ে দিতে হয়।

(ঘ) সার্বভৌমিকতা (Sovereignty): রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—সার্বভৌমিকতা। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে বোঝায় চূড়ান্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রের হাতে এমন এক চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকবে যা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করতে সক্ষম হবে এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হবে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে ভারতবর্ষ রাষ্ট্র পদবাচ্য হতে পারে নাই, এর কারণ ভারতবর্ষ তখন বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল।

সার্বভৌমিকতা বলতে কি বোঝায়

এখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা প্রয়োজন। নিম্নে সেগুলি একে একে আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথমতঃ, এই ক্ষমতা রাষ্ট্রের সমস্ত জনসাধারণ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করতে সমর্থ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না যা কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার উপর তার এই চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত ক্ষমতাকে আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলা যেতে পারে।

সার্বভৌম ক্ষমতা কোন আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়

এই ক্ষমতা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হতেও মুক্ত। বস্তুতঃ, যে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে, তাকে বহিঃশক্তির

নিয়ন্ত্রণ থেকেও অবশ্য মুক্ত হতে হবে। কোন রাষ্ট্রের কার্যাবলী যদি বাইরের কোন শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় তবে তাকে রাষ্ট্র পদবাচ্য বলা যেতে পারে না। ভারতবর্ষ এই জন্যই ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেনি।

সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যে আলোচনা করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে আমরা আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে পারি।

সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য

সার্বভৌম ক্ষমতাকে অনেক লেখক অবিভাজ্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। একটি বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে সার্বভৌম ক্ষমতার তুলনা করা যেতে পারে। বর্গক্ষেত্রকে ভাগ করা যায় না, ভাগ করলে তার বৈশিষ্ট্যই নষ্ট হয়ে যায়। সার্বভৌম ক্ষমতার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। সার্বভৌম ক্ষমতাকে ভাগ করলে তার সার্বভৌম ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে যায়।

হস্তান্তর যোগ্যতার অভাব

এই ক্ষমতার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি কখনও হস্তান্তর যোগ্য নয়। যে ব্যক্তি বা সংস্থা এই ক্ষমতার অধিকারী তা চিরকাল ধরে এই ক্ষমতা অধিকার করে। কিছুদিন সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার করে অন্যের কাছে তা হস্তান্তর করা যায় না।

বহুত্ববাদীদের মত

বর্তমান কালে বহুত্ববাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী লেখকেরা রাষ্ট্রের এই চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন না। প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ হ্যারল্ড ল্যাস্কি (*Harold Laski*) বলেছেন, সার্বভৌমিকতার ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে খারিজ করে দিতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

অধ্যাপক বার্জেশ উল্লিখিত আরও তিনটি বৈশিষ্ট্য

এই বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া, অধ্যাপক বার্জেশ (Burgess) রাষ্ট্রের আরও তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে: ব্যাপকতা (all-comprehensiveness), অন্তর্ভুক্তিকরণ ক্ষমতা (exclusiveness) এবং স্থায়িত্ব (permanence)। ব্যাপকতা বলতে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর তার কর্তৃত্বকে বোঝায়। অন্তর্ভুক্তিকরণ ক্ষমতা বলতে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটিমাত্র সংগঠন অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিচালনাকারী সংগঠনকে বোঝায়। স্থায়িত্ব বলতে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতাকে বোঝায়। সরকার পরিবর্তনশীল কিন্তু রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান—তার বিনাশ নাই।

২। সমাজ ও রাষ্ট্র (Society and State):

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল বলেছেন মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, জৈবপ্রেরণা, জীবিকা সংস্থান এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে মানুষ আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। পরিবার ও বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে অতীতের সহজ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে মানুষের উন্নততর চিন্তা এবং বিভিন্নমুখী প্রয়োজনীয়তার তাগিদে এই সমাজ এক বৃহত্তর রূপ লাভ করেছে। তাই বর্তমানের সমাজব্যবস্থায় আমরা দেখতে পাই—ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং বৃত্তি বা জীবিকার ভিত্তিতে নানাপ্রকার সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই সমাজ ও রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। গ্রীক দার্শনিকেরা এবং রাষ্ট্র সম্বন্ধে আদর্শবাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে একটি সংগঠনমাত্র। এক বিশেষ সার্বভৌম ক্ষমতায় অভিষিক্ত রাষ্ট্র প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে অন্যান্য সামাজিক সংগঠন অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। তাই বলে সমাজ ও রাষ্ট্র এক জিনিস নয়। রাষ্ট্রনৈতিক জীবন মানুষের বিভিন্নমুখী জীবনের একটি দিক। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করলে সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করা হয় না। রাষ্ট্রের আইনগুলিকে মেনে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করলে, নিয়মিত কর দিলে বা রাষ্ট্র নির্দিষ্ট নির্বাচন ইত্যাদি কতকগুলি সাধারণ কাজে অংশ গ্রহণ করলে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা হয়। কিন্তু মানুষের জীবনের এই কর্তব্য শেষ বা চরম কর্তব্য নয়। আজকের দিনে সামাজিক মানুষ যেমন এক পরিবারের সদস্য তেমনি কোন কোন বৃত্তিমূলক, সংস্কৃতিমূলক বা শিক্ষামূলক সংস্থারও সদস্য হতে পারে। এই সংস্থাগুলি তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। মানুষের আনুগত্য তাই বহুমুখী। রাষ্ট্রনৈতিক কর্তব্যকে তাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করলে চরম ভুল করা হবে। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক। মানুষের বহুমুখী আকাঙ্খাকে সমাজ তার বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু রাষ্ট্রের কাযকারিতা সেই তুলনায় সীমাবদ্ধ।

সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষা ব্যাপক

স্বাভাবিক প্রয়োজনের তাগিদে সমাজের সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রের আগে। জৈব প্রেরণা বা প্রাথমিক ভোগ্যবস্তু সংস্থানের তাগিদে অথবা নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তায় মানুষ প্রথম থেকেই সমাজবদ্ধ। কোন না কোন সামাজিক সংগঠনে মানুষ বাস করে

রাষ্ট্রের আগে সমাজ

আসছে সৃষ্টির আদিকাল থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তনমুখী সমাজের এক বিশেষ স্তরে। সমাজের আদি অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্র-সৃষ্টির সম্ভাবনা নিহিত থাকতে পারে, কিন্তু সেই আদি সমাজ ব্যবস্থা রাষ্ট্র নয়।

কতকগুলি অনিবার্য প্রাকৃতিক প্রভাবে সামাজিক সংগঠনগুলি সৃষ্টি হলেও সমাজবন্ধনের মূল ভিত্তি পারস্পরিক সহযোগিতা। স্নেহ, প্রীতি, সম্বন্ধবোধ প্রভৃতি পারস্পরিক সম্বন্ধ মানুষকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের মধ্যে গ্রথিত করে রাখে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় সংগঠনের ভিত্তি মূলতঃ রাষ্ট্রের শক্তি। রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক আইন-কানুন মানুষকে রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে।

শক্তির দ্বারা রাষ্ট্র চালিত হয়, সমাজ চালিত হয় সহযোগীতার ভিত্তিতে

রাষ্ট্রীয় সংগঠন পরিচালিত হয় সরকারের সাহায্যে। রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে বাস্তবে কাযকরী করার জন্যই সরকারের প্রয়োজন। কিন্তু সমাজের এই জাতীয় কোন শাসনযন্ত্র থাকে না। সমাজ আপনার থেকেই তার নিজস্ব প্রয়োজনীয়তার তাগিদে পরিচালিত হয়।

সমাজের সরকার নেই

কোন এক ভূ-খণ্ড নিয়ে রাষ্ট্র। ভূ খণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজের ধারণা কোন ভূ-খণ্ডের সঙ্গে জড়িত নয়। মানুষ যে সমাজ-জীবন নির্বাহ করে তার ক্ষেত্র কোন বিশেষ ভূ-খণ্ডের সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে।

সমাজের কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নেই

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্রের গভীর সম্পর্ক আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সমাজের ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রই সমাজ-জীবনের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। সমাজ-জীবনের পরিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র সমাজের ক্রিয়াক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সমাজ-জীবনের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। সামাজিক সংগঠনের সুস্থ এবং সার্বজনীন নীতিগুলিকে সমর্থন করে রাষ্ট্র মানুষের সমাজ জীবনকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ

৩। রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) :

সাধারণ কথাবার্তায় রাষ্ট্র ও সরকার একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। রাষ্ট্রের চারিটি উপাদানের মধ্যে সরকার একটি

উপাদান। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার জন্য সরকার একটি যন্ত্র মাত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্র তার সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি—রাষ্ট্র একটি ভাবগত ধারণা। রাষ্ট্র বলতে কি বোঝায়, আমাদের ধারণার মধ্যে থাকলেও আমরা তাকে চোখে দেখতে পাই না। সরকার বাস্তব জিনিস। এই বাস্তব যন্ত্রের সাহায্যেই রাষ্ট্র তার ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করে।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃহৎ। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র অধিবাসীদের নিয়ে রাষ্ট্র। কিন্তু দেশের সমগ্র জনসাধারণ সরকার পরিচালনা করে না। গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণের তরফ থেকে নির্বাচিত স্বল্প সংখ্যক প্রতিনিধিরা শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত করে। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অল্প সংখ্যক ব্যক্তি শক্তির জোরে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সরকার পরিচালনা করে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু সরকার পরিবর্তনশীল। সরকারের উত্থান পতন হয়। গনতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে একনায়ক-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে, রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এই পরিবর্তন রাষ্ট্রের পরিবর্তন সূচিত করে না। সরকারের উত্থান-পতন এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, তার পরিবর্তন নেই।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে অন্যতম পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্রের সার্ব-ভৌমিকতা আছে, সরকারের নেই। সরকার যে ক্ষমতা পরিচালনা করে তা রাষ্ট্রের কাছ থেকেই প্রাপ্ত।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র ধারণাটির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। কোন রাষ্ট্রের কথা বলতে তার ভৌগোলিক রূপটি আমাদের চোখের সামনে এসে পড়ে। সরকারের ধারণার সঙ্গে কোন ভূ-খণ্ডের ধারণা জড়িয়ে নেই।

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র সকল অধিকারের উৎস এবং সে-অর্থে রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকারকে রক্ষা করে। তাই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের কোন অধিকার নাই, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকের বহুবিধ অধিকার আছে। সরকারের বিলোপসাধন চলে কিন্তু রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন চলে না। রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে নাগরিকের অধিকার, তথা স্বাধীনতাই বিপন্ন হবে।

উপসংহারে বলা চলে, উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সকল রাষ্ট্রই অভিন্ন ; প্রত্যেক রাষ্ট্রই জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌমত্ব সম্পন্ন।

কিন্তু শাসনব্যবস্থার দিক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন রকমের শাসন ব্যবস্থা বা সরকার থাকা সম্ভব। যেমন—রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র প্রভৃতি। এই পার্থক্যের দিক থেকে দেখলেও রাষ্ট্র অভিন্ন কিন্তু সরকারে প্রকারভেদ আছে।

৪। রাষ্ট্র ও সংঘ (State and Association):

আধুনিক সমাজব্যবস্থায় মানুষ তার বিভিন্নমুখী প্রয়োজনগুলি পরিতৃপ্ত করার জন্য সংঘ বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। আজকের দিনে রাষ্ট্রর মধ্যে আমরা শিক্ষামূলক, বৃত্তিমূলক, ধর্ম ও সংস্কৃতিমূলক নানা প্রকার সংঘের অস্তিত্ব দেখতে পাই। এইরূপ নানা সংঘ নিয়ে সমাজ গঠিত। রাষ্ট্র সমাজের মধ্যে এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, যদিও সংঘ হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব সমাজের অন্য যে কোন সংঘ অপেক্ষা অনেক বেশী।

সমাজের মধ্যে আমরা যে বিভিন্ন ধরণের সংঘ দেখতে পাই তারা কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্ট হয়। যেমন, ধর্মের জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা রামকৃষ্ণ মিশনের মত ধর্মীয় সংঘ, বৃত্তির জন্য শ্রমিক সংঘ, শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষানৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এদের মত সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অতএব রাষ্ট্রের উদেশ্য ও কার্যাবলীর ক্ষেত্র সংঘগুলির অপেক্ষা ব্যাপক।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র সংঘের উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্রের চাইতে ব্যাপক

রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সকল নাগরিককে রাষ্ট্রের আইন-কানুন মানতে বাধ্য করতে পারে। কোন লোক আইন ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র তাকে তার বিহিত আইন অনুসারে শাস্তি দিতে পারে। এই দণ্ড অনেক সময় জেল, জরিমানা বা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে। কোন সংঘের সদস্য তার নিয়ম-কানুন ভঙ্গ করলে সংঘ নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে বা তাকে সদস্যপদ থেকে অপসারিত করতে পারে মাত্র। কোন সংঘ তার সদস্যকে দৈহিক শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে না।

রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সংঘের নাই

কোন সংঘের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের সভ্যপদ বাধ্যতামূলক। কোন ব্যক্তি সাবালক হলে অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। কিন্তু কোন না কোন রাষ্ট্রের নাগরিক তাকে হতেই হবে।

সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়

রাষ্ট্রের ক্ষমতা কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বিশেষ প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ড অতিক্রম করে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে তার কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করতে পারে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ বা রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে তাদের আদর্শ প্রচার করে। যে কোন রাষ্ট্রের সদস্য এই সংঘগুলির আদর্শ গ্রহণ করতে পারে এবং তাদের নাগরিকত্ব বজায় রেখে এদের সদস্য হতে পারে। কোন লোক একই সময়ে একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি এক সঙ্গে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদস্য এবং কোন ধর্মীয় সংগঠনের সদস্য হতে পারে। একই সময়ে কোন ব্যক্তি একাধিক সংঘের সদস্য হতে পারলেও একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হতে পারে না।

সংঘ কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে গঠিত হতে পারে

একাধিক সংঘের সদস্য হওয়া যায়, কিন্তু একাধিক রাষ্ট্রের নয়

৫। রাষ্ট্রের বস্তুগত এবং ভাবগত রূপ (Idea Vs Concept of State):

প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের একটি বাস্তব অস্তিত্ব আছে। এই দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জনসংখ্যা, ইত্যাদি উপাদানগুলি সমন্বিত একটি বাস্তব প্রতিষ্ঠান। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আবার রাষ্ট্রকে একটি বস্তু-নিরপেক্ষ ধারণা হিসেবেও কল্পনা করেছেন।

আদর্শবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত হেগেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্র একটি বস্তু-নিরপেক্ষ ভাব। বাস্তবে রূপ পরিগ্রহ করার আগে রাষ্ট্রের একটি কাল্পনিক আদর্শময় অস্তিত্ব থাকে যেটি পরে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 'রক্তমাংস সমন্বিত' জৈব প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করে।

হেগেলের মতে রাষ্ট্র বস্তুনিরপেক্ষ ভাব

অনেকে আবার রাষ্ট্রের ভাব বলতে ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন আদর্শ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বোঝেন যা এখনও বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু সেই আদর্শ রূপ পরিগ্রহের জন্য এগিয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে ব্লানসলির বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "রাষ্ট্রের বস্তুগত রূপ রাষ্ট্রের প্রাকৃতিক এবং প্রয়োজনীয় বহিরঙ্গ উপাদানগুলির সঙ্গে জড়িত। রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ কল্পনার রাজ্যে এক সুন্দর এবং সুসম্পূর্ণ ছবির উদ্রেক করে, যেটি নাকি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু তা কামনা করতে হবে।"

রাষ্ট্রের ভাব বলতে একটি বিচ্যুতিহীন আদর্শ রাষ্ট্রকে বোঝায়

ব্লানসলির মত

বার্জেশ বলেছেন, "রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ এবং ত্রুটিবিচ্যুতিহীন রূপ। রাষ্ট্রের বস্তুগত রূপ হল সেই রাষ্ট্র, যা চলমান এবং পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে।"

বার্জেশের মত

আবার অনেকে এক কল্পিত বিশ্ব-রাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শ রাষ্ট্রকে দেখতে চেয়েছেন।

আদর্শ রাষ্ট্র, বিশ্বরাষ্ট্র

কোন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাষ্ট্রই বাস্তব রাষ্ট্র। ঐ রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। এই দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক কালে জাতীয়তার ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রগুলি অসম্পূর্ণ রাষ্ট্র। অপরপক্ষে মানবিকতার ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সারা পৃথিবীজোড়া একটিমাত্র রাষ্ট্র, আদর্শ রাষ্ট্র।

৬। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র (State as a concept of International Law):

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র বলতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন জনসমষ্টিকে বোঝায়। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে কোন দেশকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেতে হলে আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে।

অধ্যাপক গার্ণারের মতে কোন রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র পদবাচ্য হতে হলে তাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে যাতে নাকি সে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক কর্তব্যগুলি পালন করার তার ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকতে হবে। এই যোগ্যতাগুলি থাকলে সে অন্য রাষ্ট্রগুলির সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক সমাজের সভ্য হিসাবে গৃহীত হবে।

অন্য কোন রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না এবং তার এই আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাগুলি পালন করার যোগ্যতাও থাকে না। এই ক্ষমতাগুলির অভাব হলে অন্য রাষ্ট্র তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে অস্বীকৃত হয়। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেতে হলে অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতির প্রয়োজন। বর্তমানে কম্যুনিষ্ট চীন আমেরিকা কর্তৃক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হয়নি এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য পদও সে পায়নি। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিদ্রোহের পর সোভিয়েট রাশিয়াও অনেক দিন পর্যন্ত রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পায়নি।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে কোন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবার জন্য নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ করতে পারি :

* **রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হতে হবে।**
* **অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবার আইনগত যোগ্যতা থাকতে হবে।**
* **আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি ইত্যাদি পালন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে। এবং**
* **অন্যান্য রাষ্ট্র কর্তৃক রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হতে হবে।**

৭। পশ্চিমবঙ্গ কি রাষ্ট্র ? (Is West Bengal a State ?) :

ভারতবর্ষের সংবিধানে ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' বলা হয়েছে। সংবিধান রচনার সময় গণপরিষদে অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' বলা উচিত কিনা—এই নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়। গণপরিষদের অনেক সদস্য এবং ভারতের অনেক চিন্তাশীল রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' বলে আখ্যা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন।

তাঁদের এই বিরোধিতার কারণ—রাষ্ট্র বলে অভিহিত করলে তারা সার্বভৌমত্ব দাবি করে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থান করার দাবি করতে পারে—যেমন হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে। এই সমস্যা নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে এক গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ঐক্য এবং কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবে যুগে যুগে ভারতে বিদেশী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়েছে। অতীতের ইতিহাস থেকে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে সেটি হচ্ছে—কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তা। সুতরাং সংবিধানের মধ্যে এমন কোন শব্দ বা সম্ভাবনা থাকা উচিত নয়—যা নাকি ভারতের কোন অংশকে তার বিচ্ছিন্নমুখী শক্তিগুলিকে প্রেরণা জাগিয়ে জাতীয় ঐক্যের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। অতএব—তাদের 'রাষ্ট্র' বলে নামকরণ না করাই যুক্তিযুক্ত। এই মতবাদীদের যুক্তির সারবত্তা আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

শ্রীনেহেরু অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' হিসেবে নামকরণের পক্ষপাতী ছিলেন। বলা বাহুল্য—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণেই আমরা অঙ্গরাজ্যগুলির 'রাষ্ট্র' নামকরণ করেছি।

বর্তমান সংবিধানে অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' বললেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিক থেকে এদের কোন মতেই রাষ্ট্র বলা চলে না। এদের নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জন-সংখ্যা, সরকার ইত্যাদি থাকলেও সার্বভৌম ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে ভারতীয় রাষ্ট্রের। পৃথক পৃথক ভাবে অঙ্গরাজ্যগুলির এই ক্ষমতা নেই। তা ছাড়া, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোতে প্রাদেশিক সরকারের স্বায়ত্ত শাসন বহুলাংশে সংকুচিত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করা হয়েছে। এই দিক থেকে আলোচনা করলেও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্বের অধিকার টেকে না এবং সেজন্য তাদের রাষ্ট্রও বলা চলে না। কাজেই পশ্চিমবঙ্গকেও এই দিক দিয়ে রাষ্ট্র বলা যায় না।

৮। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি রাষ্ট্র? (Is the U. N. O. a State?):

রাষ্ট্র বলতে আমরা এমন এক প্রতিষ্ঠানকে বুঝি যার নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জন-সংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রের যেমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জেরও তেমনি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, সাধারণ রাষ্ট্রের আইনসভার মত একটি সাধারণ সভা (General Assembly), শাসন বিভাগের মত একটি স্বস্তি পরিষদ (Security Council) এবং বিচার বিভাগের মত একটি বিচার বিভাগ (International Court of Justice) আছে। আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লীগ অব নেশনের অপেক্ষা অধিকতর কার্যকরীশক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলেও মনে হতে পারে। অন্যান্য রাষ্ট্রের মত এর একটি সেক্রেটারিয়ট আছে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি এখানে প্রতিনিধি প্রেরণ করে থাকে।

এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলা যেতে পারে না। এই প্রতিষ্ঠানের কোন নিজস্ব ভূ-খণ্ড নেই। অপরাপর রাষ্ট্রের মত একটি শাসনযন্ত্র থাকলেও এই শাসনযন্ত্রের সাধারণ শাসনযন্ত্রের মত কার্যকরী শক্তি নেই। রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব শাসন বিভাগের এবং এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্রেই শাসন কর্তৃপক্ষ কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি পরিষদের উপর আন্তর্জাতিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ব্যাহত হলে এই পরিষদ কোন কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। ক্ষমতার দিক থেকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ লীগ অব নেশনের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী

প্রতিষ্ঠান। লীগের কোন নিজস্ব সেনাবাহিনী ছিল না—অর্থনৈতিক বয়কট ছিল তার একমাত্র অস্ত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী এবং একটি মিলিটারী ষ্টাফ কমিটি (Military Staff Committee) আছে যার সাহায্যে শান্তিভংগকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে ইউ. এন চার্টারের বিধান অনুসারে স্থায়ী সদস্য বৃহৎ পঞ্চশক্তির একমত হওয়ার প্রয়োজন। বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে কোন শক্তি নেতিবাচক (veto) ভোট দিলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে দুটি বৃহৎ প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠী সৃষ্টি হওয়ায় বৃহৎ পঞ্চশক্তির পক্ষে শান্তিরক্ষার গুরুত্বপূর্ণক্ষেত্রে একমত হওয়া সম্ভব হয় না। ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের স্বস্তি-পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী সিদ্ধান্তই গ্রহণ করতে পারে না। কোন রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে এরূপ কার্যকরী সিদ্ধান্তের অভাব কল্পনাও করা যায় না।

তাছাড়া, কোন সদস্য রাষ্ট্রকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনীতে কোন নির্দিষ্ট সমরোপকরণ বা নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতে বাধ্য করার মত কোন বিধান ইউ এন চার্টারে নেই।

এইসব দিক হতে বিচার করলে ইউ এন ও-কে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতা স্বীকার করে নিয়েছে। কোন রাষ্ট্র আক্রান্ত হলে ইউ এন চার্টার তার আত্মরক্ষার অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া, ইউ. এন ও-র সদস্যেরা স্বাতন্ত্র্য ও সমত্বের ভিত্তিতে এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ যখন কতকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মতিতে গঠিত একটি সংগঠন, তখন এই সংগঠনটি রাষ্ট্র পদবাচ্য হতে পারে না।

সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতাসূচক এই ক্ষমতাগুলি বিদ্যমান থাকলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

৯। নিউইয়র্ক কি রাষ্ট্র ? (Is Newyork a State ?) ঃ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে রাষ্ট্র বলা হয়। তাদের রাষ্ট্র বলার কারণ যে, বর্তমান সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংযুক্ত হবার আগে অঙ্গরাজ্যগুলি প্রত্যেকেই সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি যথার্থই রাষ্ট্র কিনা সে বিষয়ে সেখানকার রাজনৈতিক নেতা ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা যথেষ্ট তর্কের অবতারণা করেছেন। ক্যাল্‌হন (*Calhoun*) প্রভৃতি এক শ্রেণীর লেখকগণ অঙ্গরাজ্যগুলিকে সম্পূর্ণ সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলে ধরে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তাছাড়া, নিজেদের সার্বভৌমক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্র বলে মনে করে আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি এক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেছিল। এই যুদ্ধের ফলে অঙ্গ-রাজ্যগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার অস্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এদের স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করা কিংবা অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা নেই। অঙ্গরাজ্যগুলি এখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতা কয়েকটি অনিবার্য কারণে কমে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে গিয়েছে। এই সমস্ত কারণে অঙ্গ-রাজ্যগুলিকে আজকের দিনে কোনমতেই রাষ্ট্র বলা চলে না। নিউইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। তার জনসংখ্যা, ভূ-খণ্ড, সরকার ইত্যাদি থাকলেও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির মত তার সার্বভৌমিকতা নেই। সুতরাং কোন ক্রমেই তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উপাদান ঃ

উড্রো উইলসন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—State is a people organised for law within a definite territory রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখক তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে গার্ণারের সংজ্ঞাই সর্বোৎকৃষ্ট রাষ্ট্রের সবকটি উপাদানই তাঁর সংজ্ঞার মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। এই উপাদানগুলি হচ্ছে ১) জনসংখ্যা (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (৩) সরকার এবং (৪) সার্বভৌমিকতা।

কোন রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসংখ্যাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) নাগরিক (খ) প্রজা ও (গ) বিদেশী। জনসংখ্যার কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। জনসংখ্যা বেশী অথবা কম হতে পারে। জনসংখ্যার সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হওয়া রাষ্ট্র গঠনের প্রথম প্রয়োজন। ভৌগোলিক সীমারেখারও কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ভৌগোলিক সীমা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র হতে পারে। ট্রিটস্কে রাষ্ট্রের ক্ষুদ্রত্বকে ঘৃণা করতেন। তিনি যুদ্ধের দ্বারা রাষ্ট্রকে বড় করার কথা প্রচার করেছেন। বৃহৎ ভৌগোলিক সীমার সুবিধা হচ্ছে—(১) অধিক পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া সুবিধাজনক। উহার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে, তাছাড়া (২) প্রতিরক্ষা সংগঠনকেও দৃঢ়তর করা সম্ভব হয়।

কিন্তু ভৌগোলিক সীমারেখার উপর রাষ্ট্রের মহত্ত্ব নির্ভর করে না।

রাষ্ট্রের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার একটি যন্ত্র মাত্র। রাষ্ট্র অপেক্ষা সরকারের সঙ্গে কমসংখ্যক লোক জড়িত।

সার্বভৌম ক্ষমতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সার্বভৌমত্ব বলতে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতা একক, অবিভাজ্য, হস্তান্তর যোগ্য নয় এবং চিরস্থায়ী।

রাষ্ট্র ও সরকার :

রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের মধ্যে সরকার একটি উপাদান। রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বৃহৎ, সরকারের সঙ্গে কমসংখ্যক লোক জড়িত। রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান, সরকার অস্থায়ী। রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা আছে, সরকারের নেই। রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের ধারণা জড়িত কিন্তু সরকার বলতে কোন ভূ-খণ্ডকে বোঝায় না।

সমাজ ও রাষ্ট্র :

সমাজের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য অপেক্ষা ব্যাপক। সমাজ, মানুষের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্নমুখী অভাবকে পরিতৃপ্ত করে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করলে সামাজিক কর্তব্য পালন করা হয় না। সমাজ সৃষ্টি হয়েছে রাষ্ট্রের আগে। রাষ্ট্র চালিত হয় শক্তির দ্বারা কিন্তু সহযোগিতাই সমাজের ভিত্তি। সমাজের সরকার নেই। সমাজের কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড নেই, কিন্তু নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড ব্যতিরেকে রাষ্ট্র হতে পারে না। সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্বন্ধ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

রাষ্ট্র ও সংঘ :

মানুষ তার বিভিন্নমুখী প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সংঘ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র এই বিভিন্ন সংঘকে নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বহুমুখী, সংঘ সাধারণতঃ এক বা একজাতীয় উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সংঘের নেই। সংঘের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক, মানুষকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্য হতেই হয়।

সংঘ রাষ্ট্রের সীমা অতিক্রম করে গঠিত হতে পারে। একাধিক সংঘের সদস্য হওয়া যেতে পারে, একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হওয়া যায় না।

রাষ্ট্রের বস্তুগত ও ভাবগত রূপ :

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের বস্তুগত ও ভাবগত রূপের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন।

রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ তার বস্তুনিরপেক্ষ ধারণা, বস্তুগত রূপ তার উপাদানগুলিকে নিয়ে। রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। হেগেলের মতে রাষ্ট্র একটি বস্তুনিরপেক্ষ ভাব, বাস্তব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তা রূপ-পরিগ্রহ করে। রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ বলতে ত্রুটি বিচ্যুতিহীন আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বোঝায়। অনেকের মতে মানবিকতার ভিত্তিতে কল্পিত বিশ্বরাষ্ট্রই রাষ্ট্রের ভাবগত রূপ।

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র :

আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে কোন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র পদবাচ্য হতে হলে ( ) সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে হবে, (২) অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হবার আইনগত যোগ্যতা থাকতে হবে (৩) আন্তর্জাতিক, চুক্তি সন্ধি ইত্যাদি পালন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে এবং (৪) অন্য রাষ্ট্রের দ্বারা রাষ্ট্র বলে স্বীকৃত হতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ও নিউইয়র্ক কি রাষ্ট্র ?

পশ্চিমবঙ্গ, নিউইয়র্ক প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্য। তাদের জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার থাকলেও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাদের রাষ্ট্র বলা যেতে পারে না।

Exercise

1. Define a State. What are its essential elements ?

2. Distinguish between (*a*) State and Society, (*b*) State and Government, (*c*) State and other associations.

3 Discuss the significance and meaning of territory as a constituent element of state What are the exceptions to the principle of exclusive jurisdiction of a state over its own territory ? (*C. U. 1960*)

4 How do you define a State ? Do the following come under the definition of your State

(*a*) Hyderabad, (*b*) New York, (*c*) League of Nations ? Give reasons for your answer.

5. Differentiate between the idea of the state and the concept of the State In which category would you place the following

(*a*) City-State
(*b*) World State
(*c*) Dynastic State and
(*d*) United Nations. [*C. U.* (*Hon.*) *1951*]

6. Is the U. N O a State ? Give reasons

7 How do you distinguish the State from other kinds of Associations ? (*C U 1955*)

ভুল সংশোধন

[illegible] নং পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছত্র এইভাবে পড়তে হবে —

"সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি মিলিটারী স্টাফ কমিটি (Military Staff Committee) আছে যার সাহায্যে শান্তি ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।"

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories of the origin of the State)

১। ভূমিকা (Introduction) :

রাষ্ট্রের উৎপত্তি কেমনভাবে হয়েছে, এটি স্বভাবতঃই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন চিন্তানায়কেরা তাঁদের পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করেছেন। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রকে বিধাতার সৃষ্টি বলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দিতে চেয়েছেন, অনেকে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের ফল বলে বর্ণনা করেন, আবার অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে একটি চুক্তির ফলে। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই সব লেখকেরা তদানীন্তন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে প্রভাবিত হয়ে অথবা মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষ ধারণার বশবর্তী হয়ে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদগুলি প্রচার করেন তা স্পষ্টতঃই একদেশদর্শী। নিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। আধুনিক কালের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে উপাদান সংগ্রহ করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ দাঁড করিয়েছেন। এই মতবাদ ঐতিহাসিক মতবাদ বা বিবর্তনমূলক মতবাদ।

শেষোক্ত মতবাদটি ছাড়া, বাকিগুলিকে আমরা এক বিশেষ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করতে পারি। এগুলি মুখ্যতঃ ধারণাকেন্দ্রিক। অবশ্য আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বলপ্রয়োগের মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত আছে বলে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও স্বীকার করে নিয়েছেন। শেষোক্ত মতবাদটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করতে পারি এই কারণে যে, এইটিই একমাত্র মতবাদ যেটি নিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রথমোক্ত মতবাদগুলির গুরুত্বকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কেননা, এই মতবাদগুলি আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রের এক বিশেষ সময়ে রাজনৈতিক পটভূমিকাকে জানতে সাহায্য করে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ধারণা গ্রহণ করতে গেলেও এই মতবাদগুলি জানা দরকার।

২। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ (Theory of Divine origin):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে যতগুলি মতবাদ আছে—তার মধ্যে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ প্রাচীনতম। এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি, এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের একমাত্র অধিকারী রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি মাত্র। রাষ্ট্র যে শক্তির অধিকারী তা ঈশ্বরের অনুমোদিত—সুতরাং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অর্থ ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের মূলকথা

রাজা যেহেতু ভগবানের প্রতিনিধি সেইহেতু তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য একমাত্র ভগবানের কাছে দায়ী। জনসাধারণ বা জনপ্রতিনিধিমূলক কোন সংস্থার কাছে তিনি তাঁর কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য নন।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমান কালে বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা প্রমাণ করেছে যে, প্রাচীন জনসমাজে সামাজিক কর্তৃত্বের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। প্রাচীন ঈজিপ্টে রাজা ছিলেন সূর্যদেবতার (*Sun God Ra*) প্রাচীন পুরোহিত। গ্রীস ও রোমের প্রাচীন নগর-রাষ্ট্রগুলি দেবদেবীর মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তদ্দেশীয় লোকেরা বিশ্বাস করত যে, মানুষ তার সামাজিক বৃত্তির ফলেই রাষ্ট্রীয় সংগঠনে মিলিত হয়েছে। সামাজিক প্রবৃত্তির বশে উদ্ভূত রাষ্ট্রীয় সংগঠন ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট।

প্রাচীন ঈজিপ্ট, গ্রীস, ও রোমে রাষ্ট্রের উপর ধর্মের প্রভাব

বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে (*Old Testament*) ঈশ্বরকেই রাজার ক্ষমতার উৎস বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ঈশ্বর রাজাকে নিয়োগ করেন এবং ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার উপর রাজার রাজত্ব নির্ভর করে। ঈশ্বর কোন রাজার উপর অসন্তুষ্ট হলে তাকে হত্যা করেন।

খ্রীষ্টধর্মেও রাষ্ট্রের ক্ষমতা যে ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত এই মতের স্বীকৃতি লক্ষিত হয়। সেন্টপল্ (*St Paul*) বলেছেন—প্রত্যেক আত্মাই উচ্চতর শক্তির অধীন, কারণ ঈশ্বর ছাড়া অন্য শক্তিই নেই, যে ক্ষমতা পার্থিব তা ভগবান প্রদত্ত। যে সে ক্ষমতা অমান্য করে সে ভগবানকেই অমান্য করে, এবং যারা তা অমান্য করে তাদের পতন হবে (রোমান্স ১০ ; ১ এবং ২)

খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বরকে রাজার ক্ষমতার উৎস বলে ধরা হয়েছে।

মহাভারতের শান্তিপর্বে উল্লেখ আছে যে, লোকে অরাজকতায় উৎপীড়িত হয়ে তার থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে যে, তিনি যেন এমন একজনকে ক্ষমতা দেন যিনি তাদের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবেন এবং অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা করবেন। ঈশ্বর তখন বিরজসকে রাজা নিযুক্ত করলেন।

মহাভারতে ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতার উল্লেখ

মধ্য যুগে পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহারা নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং সমগ্র খ্রীষ্টরাজ্যে একছত্র অধিপতি বলে মনে করতেন।

পোপের নৈতিক অধঃপতন এবং ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে রাজার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পোপের ক্ষমতার অবসান ঘটেছিল, এ-কারণে রাজারা হয়ে উঠেছিলেন সর্বশক্তিমান। ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজবংশের রাজা প্রথম জেমস্ ঘোষণা করেন যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি—সুতরাং একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন জনসাধারণ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে তিনি তাঁর কার্যাবলীর জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নন।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের চূড়ান্ত-রূপ ইংলণ্ডের ষ্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে

বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক হবস্ (*Hobbes*) যদিও চূড়ান্ত রাজশক্তিকে সমর্থন করেন তবুও এই উদ্দেশ্যে তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করায় রবার্ট ফিল্মার (*Robert Filmer*) তাঁকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। ফিলমারের মতে—প্রাকৃতিক রাজ্যে সমত্ব বলে কিছু থাকতে পারে না, ভগবান আদামকে (*Adam*) ঈভ (*Eve*) ও তার সন্তান-সন্ততিদের উপর রাজা করে পাঠিয়েছেন। বর্তমান কালে রাজারা সবাই তাঁর উত্তরাধিকারী।

হবসের চুক্তিবাদের বিরূপ সমালোচনা

ইংলণ্ডে ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টে সার্বভৌম ক্ষমতার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে রাজার ঐশ্বরিক শক্তির অধিকারের অসারত্ব চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিপ্লবের সমর্থক বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক লক্ (*Locke*), রবার্ট ফিল্মারের রাজার ঐশ্বরিক শক্তির মতবাদকে তীব্র শ্লেষের সঙ্গে সমালোচনা করেন। ইউরোপে নবজাগরণ, ধর্মসংস্কারের আন্দোলন, সামাজিক-চুক্তি মতবাদের প্রচার প্রভৃতির ফলে ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের প্রভাব ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। আধুনিক কালের রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে ভগবানের সৃষ্টি এবং রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করেন না। আজকের দিনে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। আধুনিক

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের প্রভাব হ্রাস পাওয়ার কারণ

কালে পাকিস্তান এবং নি-উইনের অভ্যুত্থানের পূর্বে স্বল্পকালের জন্য ব্রহ্মদেশ ধর্মীয় রাষ্ট্রের (Theocratic State) নিদর্শন।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের ফলেই রাজাকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচারতন্ত্রের উদ্ভব হয়। রাষ্ট্র একটি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় সকলের সমান সুযোগ থাকা উচিত। ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের প্রতি তার একমাত্র দায়িত্ব—এই যুক্তি প্রচার করে সাধারণ মানুষের দেশের কাজে অংশ গ্রহণের অধিকারকে অস্বীকার করেছে। এই মত অনুসারে রাজা ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার হরণ করলেও তাঁর কাছ থেকে কেউ কৈফিয়ত দাবি করতে পারবে না—কারণ তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এবং সব কিছুর উর্ধ্বে। স্পষ্টতঃ, নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারতন্ত্রের অন্ধ সমর্থন এই মতবাদের উদ্দেশ্য।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি

এই মতবাদ রাজার স্বৈরাচারকে সমর্থন করে

ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হন তবে সকলের উপর অত্যাচার হোক এটা কখনই তাঁর বিধান হতে পারে না। ইতিহাসে দেখা যায়, উৎপীড়নকারী এবং স্বৈরাচারী রাজারাই ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্বের দোহাই দিয়ে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চালিয়ে গেছেন। ঈশ্বর মহান—অত্যাচার অন্যায়। মহানের প্রতিনিধি অন্যায়ের বাহক হয় কি প্রকারে? এ দিক থেকে বিচার করলে এই মতবাদ অযৌক্তিকও বটে।

অযৌক্তিক

ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে বিচার করলে ঐশ্বরিক মতবাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ধর্ম মানুষকে বশ্যতা শিখিয়ে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পথকে সুপ্রশস্ত করেছে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব অবশ্যই স্বীকার্য। আনুগত্যের অভাবে সুষ্ঠু সমাজ-জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব। ধর্ম মানুষকে নানাভাবে আনুগত্যের শিক্ষা দিয়ে সমাজ জীবনের আদিস্তরে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহের কাজে সাহায্য করে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পথকে সহজতর করেছে।

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদের মূল্য

৩। বলপ্রয়োগ মতবাদ (Theory of Force):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বলপ্রয়োগ মতবাদ অন্যতম। এই মতবাদে বিশ্বাসী লেখকদের মতে বলবানের দ্বারা দুর্বলের উপর শক্তি প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা আরও বিশ্বাস করেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি হচ্ছে শক্তি। শক্তি ব্যতিরেকে রাষ্ট্রের

উৎপত্তি এবং অস্তিত্ব সম্ভব নয়। ডেভিড হিউম্ (*David Hume*), জেংক্স্ (*Jenks*), ডা: লিকক্ (*Dr Leacock*), ওপেনহাইমার (*Oppenheimer*) প্রভৃতি লেখকগণ এই মতবাদে বিশ্বাসী।

শারীরিক শক্তি অথবা বুদ্ধিবলে বলীয়ান মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে পরাজিত করে তার উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। শুধু মাত্র ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এ কথা প্রযোজ্য নয়—সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তরে জনগোষ্ঠী এবং উপজাতির ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। সমাজের আদি অবস্থায় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই মানুষকে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হত। খাদ্যবস্তুর সংস্থান অথবা গৃহ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমাণ গোষ্ঠী অথবা উপজাতিকে প্রায়ই অনুরূপ শ্রেণীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হত।

বিবরণ

এইভাবে বিজিতকে শ্রেষ্ঠতর সংগঠন ও শক্তির অধিকারী অথবা উপজাতির কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিতে হত। যে নেতার শ্রেষ্ঠতর সাহস, শারীরিক শক্তি অথবা বুদ্ধির প্রভাবে এই সংঘর্ষ পরিচালিত হত, তার নেতৃত্ব স্বভাবতই সার্বজনীন স্বীকৃতি পেত। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বদাঁর (*Jean Bodin*) মতে, যে লেখকেরা মনে করতেন যে রাজা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত, তাঁদের ধারণা ভুল। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে তাঁরা ছিলেন যুদ্ধের সেনাপতি যারা নাকি শক্তির দ্বারা অপরের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বদাঁ (*Jean Bodin*) তাঁর *De Republica* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির জন্য মানবসমাজের সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে বলপ্রয়োগের ফলে।

ইংরেজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জেংক্স (*Jenks*) তাঁর *History of Politics* নামক

জেংক্সের মত

গ্রন্থে কিভাবে বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে তা সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। তার যুক্তির সারাংশটুকু মোটামুটি এরূপ:

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যখন জীবনধারণের উপযোগী প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ পড়তে শুরু করল তখন যুদ্ধপ্রণালীর কলাকৌশলেরও উন্নতি সাধিত হল। যুদ্ধ তখন কয়েকটি বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে উঠল। কোন এক যুদ্ধের নেতা যখন অন্যান্য সৈনিকদের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত এক বৃহৎ ভূ-খণ্ডের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় তখনই সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের। দুটি উপায়ে

এটি সংঘটিত হতে পারে। একটি হচ্ছে—কোন এক নেতার অধীনে বিভিন্ন উপজাতির একীকরণের দ্বারা এবং অপরটি হচ্ছে—কোন শক্তিশালী উপজাতির দেশত্যাগ করে স্থানান্তরে অধিকার বিস্তৃতির দ্বারা। কোন নেতা নিজ উপজাতির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পর তাদের সাহায্যে প্রতিবেশী উপজাতির উপর যখন তার কর্তৃত্ব বিস্তারে সক্ষম হয় তখন সে হয় এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিপতি। ইংলণ্ডে নবম শতাব্দীতে ওয়েসেক্সের (*Wessex*) রাজা এগ্‌বার্টের (*Egbert*) নেতৃত্বে এইভাবে সপ্তরাজ্যমণ্ডলী একীকরণের দ্বারা এক বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল; অপরটির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নর্মানজাতির বিজয় অভিযানের দ্বারা নবম শতাব্দীতে রাশিয়ায়, দশম শতাব্দীতে নর্মাণ্ডিতে, একাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

এইভাবে জেংকস বলেছেন, "ইতিহাসের দিক থেকে অতি সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে যে যুদ্ধজয়ের সাফল্য থেকেই আধুনিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে।"*

অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মতে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মূলেও রয়েছে শক্তি। ওপেন হাইমারের (*Oppenheimer*) মতে উৎপত্তির পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে এবং অস্তিত্বের পর্যায়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র বিজিতের উপর বিজেতাদের বলপ্রয়োগের পরিণতি।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর লেখকেরা বলপ্রয়োগ মতবাদ তাদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে সপ্রমাণ করবার জন্য কাজে লাগিয়েছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এবং সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত পোষণ করলেও, রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি যে শক্তি এ বিষয়ে তাঁরা একমত।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ডারউইনের বিবর্তনবাদকে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। তাঁদের মতে শারীরিক বা বুদ্ধির বলে যারা বলীয়ান তাদেরই সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। প্রকৃতির রাজ্যে আমরা দেখতে পাই দুর্বলকে পরাভূত করে সবল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। রাষ্ট্র যদি দুর্বলকে সাহায্য করে বলবানকে তার স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে তবে প্রকৃতির

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত

* "Historically speaking, there is not the slightest difficulty in proving that all political communities of the modern types owe their existence to successful warfare."—Jenks A History of Politics

এই অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধে সে কাজ করবে। তাই দুর্বলকে প্রশ্রয় না দিয়ে বলবানকে উৎসাহ দেওয়াই রাষ্ট্রের উচিত কাজ। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে তার স্বাধীন এবং সাবলীল অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অর্থ ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া। নাগরিক জীবনের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে বলেই রাষ্ট্র একটি অকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান।

মার্কসবাদীদের মত

সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান চিন্তানায়ক কার্ল মার্কসের (*Karl Marx*) মতে সমাজের এক সুবিধাভোগী শ্রেণী যুগে যুগে সাধারণ মানুষকে তাঁদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে স্বীয় স্বার্থে রাষ্ট্রকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করে এসেছে। এই বঞ্চনার যেদিন অবসান হবে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট ব্যবধানও সেদিন কেটে যাবে—রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও তখন লুপ্ত হয়ে যাবে।

মধ্যযুগে পোপ ও রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে যখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তখন এক শ্রেণীর ধর্মযাজক পার্থিব শক্তির উপর চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য এই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদেব মতে চাচ একটি ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু রাষ্ট্র পাশবিক শক্তির পরিণতি।

জার্মান লেখকদের মত

জাতির গৌরব এবং প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অনেক জার্মান দার্শনিক রাষ্ট্রকে শক্তির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ট্রিটস্কের (*Treitschke*) মতে বলবানের দ্বারা দুর্বলের প্রতি শক্তি প্রয়োগের ফলেই যাবতীয় উন্নতি সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেছেন, "ইতিহাসের শেষ না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্রের প্রতি আবেদন সম্পূর্ণ ন্যায় সংগত" ("Appeal to arms will be valid until the end of history"—*Treitschke*)। সেনাপতি বার্নহার্ডির (*Von Bernhardi*) মতে শক্তি থেকেই অধিকার জন্মায় এবং ন্যায়-অন্যায়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় যুদ্ধের সাহায্যে।

নৈরাজ্যবাদীদের মত

নৈরাজ্যবাদী (*Anarchist*) বাকুনিন্ (*Bakunin*) রাষ্ট্রের পশুশক্তির জন্যই রাষ্ট্রকে অবলুপ্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সম্পত্তিশালীদের দ্বারা শ্রমিক শ্রেণীর শোষণের পথকে প্রশস্ত করার জন্যই রাষ্ট্রের অবস্থিতি। তাছাড়া, রাষ্ট্র মানুষের নীতিবোধ এবং বুদ্ধি-বৃত্তিকে বিকৃত করে তোলে, কারণ রাষ্ট্রের সমস্ত ক্রিয়াকলাপই বাধ্যতামূলক। ব্যক্তি তার নিজস্ব ন্যায়-অন্যায় বোধ থেকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যে কাজ করে সেইটেই নীতিসম্মত। কিন্তু রাষ্ট্রের নির্দেশে বাধ্যতামূলক

ভাবে কোন কাজ যখন মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন তার যথার্থ এবং নৈতিক মূল্য হয় বিকৃত এবং অধঃপতিত।

সুতরাং বাকুনিন্ প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীদের মতে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য কর্তৃত্বময় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিলোপসাধন একান্ত প্রয়োজন।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা শক্তিই রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ এবং ভিত্তি বলে বিশ্বাস করেন না। বিভিন্ন গোষ্ঠী, উপজাতি প্রভৃতিকে একত্রিত করে শক্তি যে রাষ্ট্রের বিবর্তনকে সাহায্য করেছে একথা অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একেবারে অস্বীকারও করেন না। তবে রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য যে শক্তিই একমাত্র উপাদান এই কথা সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা চলে না। রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা, রাজনৈতিক চেতনা প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান মানব সমাজকে সংহত করে রাষ্ট্র সংগঠনে সহায়তা করেছে। ইংরেজ দার্শনিক টি. এইচ. গ্রীন (*T. H. Green*) বলেছেন, "বল নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" (Will and not force is the basis of the state)। গ্রীন অবশ্য স্বীকার করেছেন যে মানুষের সাধারণ ইচ্ছাগুলিকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে বল প্রয়োগের জন্যই রাষ্ট্র টিকে আছে এই ধারণা ঠিক নয়। পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা এবং বিশ্বাসের অভাব থাকলে কোন সমাজ-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে না। মানুষ শুধু মাত্র স্বার্থপর জীব নয়—অপরের অধিকার ও সুবিধা সম্বন্ধেও সে সজাগ।

রাষ্ট্রের ভিত্তি ইচ্ছা-শক্তি নয়

সাধারণের কল্যাণ (Consciousness of common good) সম্বন্ধে এই চেতনাবোধ থাকার জন্য মানুষ আইন মেনে চলে এবং সমাজজীবন সম্ভব হয়। কেবল মাত্র শাস্তির ভয়ে মানুষ আইন মানলে তারা হত সেই সমস্ত বিপজ্জনক জীবের সমপর্যায়ভুক্ত যাদের মধ্যে সমাজ-জীবন বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। গ্রীনের মতে, কেবল মাত্র চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়ে রাষ্ট্র চলে না, চূড়ান্ত ক্ষমতা আইন মাফিক সাধারণের অধিকার রক্ষার জন্য বিশেষভাবে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

৩। সামাজিক চুক্তিবাদ (Theory of Social Contract):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ আছে তার মধ্যে সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এই মতবাদ শুধু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করে না, রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোকপাত করাও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই মতবাদ অতি প্রাচীন। রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদের অনুরূপ ধারণার উল্লেখ মহাভারতের শান্তিপর্বেও পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, অরাজকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানুষ রাজাকে কর দেবে আর রাজা তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করবেন।

প্রাচীন লেখায় এই মতবাদের উল্লেখ

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটলের লেখায়ও এই মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁরা এই মতবাদের সমর্থন করেন নাই। তবে গ্রীসে সোফিষ্ট নামে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের কেউ কেউ এই মতবাদের সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে অ্যালথুসিয়াস (*Johannes Althusius*), হিউগো গ্রোটিয়াস (*Hugo Grotius*) এবং পুফেনডর্ফের (*Pufendorf*) লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

ষোড়শ শতাব্দী হতে পরবর্তীকালে ইংরাজ দার্শনিক হবস্ (*Hobbes*), ও লক (*Locke*) এবং ফরাসী দার্শনিক রুশোর (*Rousseau*) লেখার মাধ্যমে অবশ্য এই মতবাদ সমধিক প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই মতবাদের মূলে রয়েছে এক রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থার কল্পনা। এক প্রাক্-রাষ্ট্রীয় অবস্থা থেকে মানুষ চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। হবস, লক ও রুশো এই রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থাকে প্রাকৃতিক রাজ্য (State of nature) বলে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য এই কল্পিত প্রাকৃতিক রাজ্যের অবস্থা এবং চুক্তির অন্তর্গত পক্ষ ও শর্তসমূহ নিয়ে হবস, লক ও রুশোর মতের পার্থক্য রয়েছে।

এই মতবাদকে আধুনিক রূপ দেন হবস, লক এবং রুশো

হবসের মতবাদ: হবস ছিলেন ইংলণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহ শিক্ষক। রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং ক্রমওয়েলের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থা ইংলণ্ডের জনসাধারণের জীবনে যে বিপর্যয় ডেকে এনেছিল হবসের মতে শক্তিশালী রাজশক্তির অভাবই তার একমাত্র কারণ। তাই তাঁর বিখ্যাত 'লেভিয়েথান' (Leviathan, 1651) নামক গ্রন্থে তিনি এমন এক রাজশক্তির কথা কল্পনা করলেন যিনি সর্বশক্তিমান। জাতির জীবনে শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এক শক্তিমান রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা তিনি অপরিহার্য বলে মনে করেছিলেন।

হবস তাঁর সামাজিক চুক্তির মধ্যে যে প্রাকৃতিক রাজ্যের কথা কল্পনা করেছেন তা তাঁর মানব প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণার অনিবার্য পরিণতি মাত্র। মানুষ চায় সুখী হ'তে। হবসের মতে আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার মধ্যেই

মানুষের সুখ। এই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পেয়ে সুখী হবার জন্য মানুষের চাই শক্তি। এই শক্তি যে সব সময় শারীরিক শক্তি হবে এমন কোন কথা নেই। এই ক্ষমতা মানসিক ক্ষমতাও হ'তে পারে। শরীর এবং মনের যে উচ্চতর গুণাবলীর প্রভাবে মানুষ তার আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যকে হস্তগত করে সুখী হয় সেইটি হচ্ছে তার ক্ষমতা। ধন সম্পদ, সুনাম, বন্ধুত্ব—এমন কি সৌভাগ্যকেও হব্‌স ক্ষমতার অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন। মানুষের সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের পিছনে রয়েছে এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য এক বিরামহীন আকাঙ্ক্ষা ("A perpetual and restless desire for power after power, that ceaseth only in death")। এমত অবস্থায় রাষ্ট্র-পূর্বকালে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের জীবনযাত্রার কাহিনী এক ছেদহীন সংগ্রামের কাহিনী ছাড়া আর কি হ'তে পারে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি হ'চ্ছে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অবিশ্বাস। কলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি জীবনের উচ্চতর ক্ষেত্র মানুষের কাছে অজ্ঞাত ছিল। হব্‌সের ভাষায় মানুষের জীবন ছিল 'একাকী, দরিদ্র, জঘন্য, পাশবিক এবং স্বল্পস্থায়ী" (Solitary, poor, nasty, brutish and short)। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হব্‌স এক জায়গায় লিখেছেন, "বেড়াতে যাবার সময় সে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং বিশ্বাসী বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে যেত। ঘুমাতে যাবার সময় তার দরজা ভাল করে তালা দিয়ে যেত, এমন কি ঘরের মধ্যে থাকার সময় সে তার বুক বর্ম দিয়ে সুরক্ষিত করে রাখত।" এমত অবস্থায় বন্ধু বান্ধব, পুত্র কলত্র, দাস-দাসী এবং অন্যান্য অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতি মানুষের ধারণা কেমন ছিল হব্‌স তা ভেবে দেখতে অনুরোধ করেছেন।[1]

হব্‌স বর্ণিত মানব প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক রাজ্য

এ হেন প্রাকৃতিক রাজ্যে ভাল-মন্দ বলে কিছু থাকতে পারে না। কারণ, মানুষ পরিচালিত হ'ত কতকগুলি প্রবৃত্তির তাড়নায় এবং কোন এক নিয়মের মাপকাঠির অভাবে সব প্রবৃত্তিই মূলতঃ এক।

প্রাকৃতিক রাজ্যের স্বরূপ

1. "When taking a journey, he arms himself and seeks to go well accompanied, when going to sleep he locks his doors, when even in house he locks his chests; (consider) what opinion he has of his fellow subjects, when he rides armed, of his fellow citizens, when he locks his doors, and of his children and servants, when he locks his chests"

—*Hobbes* Leviathan, Chapter XII

এমতাবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে বিচার অবিচার বলেও কিছু থাকতে পারে না। বিচার-অবিচারের ধারণা সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি। সামাজিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে মানুষ তার বিচারবোধকে আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যখন একক, সমাজ বলে যখন কিছু ছিল না তখন বিচার-অবিচারের ধারণাও ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তাই হব্‌সের মতে আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই মানুষকে রাষ্ট্র-সৃষ্টি করতে হয়েছে। কালক্রমে সে বুঝতে শিখল যে, সকলকে নিরস্ত ও রক্ষা করার মত এক সাধারণ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হলেই প্রাকৃতিক রাজ্যের এই অবিরাম সংঘর্ষের হাত থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবে।

এই উদ্দেশ্যে মানুষ এক চুক্তি করল। চুক্তিটি যেন প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের। চুক্তির সময় প্রত্যেক মানুষ যেন প্রত্যেকের সাথে এই রকম এক শর্তে আবদ্ধ হয়েছিল, "আমি এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির কাছে নিজেকে পরিচালিত করার অধিকার পরিত্যাগ করছি এবং তাকে সব কিছু করার অধিকার দিচ্ছি এই শর্তে যে, তুমিও তার কাছে নিজেকে পরিচালিত করার অধিকার ত্যাগ করবে এবং সমভাবে সব কিছু করার অধিকার তাকে দেবে।"[1]

চুক্তির পক্ষ এবং শর্ত

এইভাবে যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের কাছে মানুষ তার স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করেছিল এবং যাকে সবকিছু করার অধিকার দিয়েছিল তিনি হলেন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, এই সার্বভৌম ক্ষমতা চুক্তির অন্তর্গত কোন পক্ষ নন। চুক্তি করেছিল মানুষ নিজেদের মধ্যে। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতাকে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। যে কোন কারণই হোক না কেন, সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাধ্যতার অসম্মতিসূচক কোন কাজ সম্পূর্ণ অবৈধ। যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতাকে মানুষ সবকিছু করার অধিকার দিয়েছে এবং যেহেতু তার ইচ্ছার মধ্যে সকলের ইচ্ছার সমন্বয় ঘটেছে সেইহেতু তিনি যা-কিছু করবেন সেইটিই বৈধ। তাছাড়া, মানুষ যে চুক্তি নিজেদের মধ্যে

সার্বভৌম ক্ষমতার স্বরূপ

চুক্তির পরিণতি

1 "I authorize, and give up my right of governing myself to, this man or to this assembly of men, on this condition, that thou give up thy right to him and authorise all his actions in like manner"
—*Hobbes* Leviathan, Chapter XVII

করেছিল, সেটিকে তারা কোন ক্রমেই ভঙ্গ করতে পারে না। এমত অবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যা নির্দেশ দেবেন সেইটিই বৈধ। কারণ তাঁর নির্দেশই হ'ল আইন।

স্বাধীনতা

এখন প্রশ্ন হল, সার্বভৌম ক্ষমতার যে কোন নির্দেশকেই যদি আইন বলে মনে করা হয়, তাহলে নাগরিকদের স্বাধীনতা বলতে আমরা কোন্ বিষয়টিকে বুঝবো? হবস্ সার্বভৌম ক্ষমতার এবং আইনের যে স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন তাতে তিনি নাগরিকদের যে অধিকার উপভোগ করতে অনুমতি দিয়েছেন সেইটিই তাদের স্বাধীনতা। তাছাড়া, প্রাকৃতিক রাজ্যের নিয়ম অনুসারে যে অধিকারকে ত্যাগ করা যেতে পারে না, সেটিও তাদের স্বাধীনতা। হব্সের মতে এই অধিকার আত্মরক্ষার (Self-preservation) অধিকার। সুতরাং সার্বভৌম ক্ষমতা 'প্রজাদের' কেবলমাত্র আত্মহত্যা অথবা ঐ জাতীয় কোন কাজ করতে নির্দেশ দিতে পারেন না।

সমালোচনা

হব্স তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদে এমন এক চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানিয়েছেন যেখানে সত্যিকারের ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা নাগরিক অধিকার বলে কিছু থাকতে পারে না। ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনের এক অশুভ মুহূর্তে আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার সাময়িক প্রয়োজনীয়তায় হব্স তাঁর মতবাদকে প্রচার করেন। স্থায়ী রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে হব্সের মতবাদকে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে অক্ষম হওয়া হব্সের অন্যতম প্রধান ত্রুটি। তিনি সরকারকে সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, কিন্তু সরকার রাষ্ট্র নয়। সরকার পরিবর্তনশীল আর রাষ্ট্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।

হব্সের এই ত্রুটি সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে তিনি রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে প্রধান চিন্তানায়কদের মধ্যে একজন।

স্টুয়ার্ট রাজাদের আমলে ইংলণ্ডে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলায় ব্যথিত হয়ে তিনি এই মতবাদকে দাঁড় করান। হব্স স্বৈরাচারতন্ত্রের সমর্থন করলেও জনসাধারণই যে সমস্ত শক্তির উৎস এই কথা তিনি স্বীকার করেছেন। তার মতবাদের ভিত্তি ভয় হলেও, তাঁর চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের স্বাধীন চুক্তি এবং সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

লকের মতবাদঃ জন লক (*John Locke*) সপ্তদশ শতকের আর একজন ইংরেজ দার্শনিক। তিনি ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Two Treatises of

Government নামক গ্রন্থে সামাজিক চুক্তি সম্বন্ধে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লব ইংলণ্ডের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসনচ্যুত হ'ন এবং তখনকার দিনের Convention Parliament হল্যাণ্ডের রাজা উইলিয়ম ও তাঁর স্ত্রী মেরীকে সার্বভৌম ক্ষমতায় অভিষিক্ত করে। লকের উদ্দেশ্য ছিল এই গৌরবময় বিপ্লবের ফলে নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন জানানো।

হব্‌সের মত লক্‌ও প্রাকৃতিক রাজ্য নিয়ে তাঁর আলোচনা শুরু করেন।

লক বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্য

তবে তাঁর মতে এই প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ সংঘর্ষময় দুঃসহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো না। তাঁর মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে সাম্য এবং স্বাধীনতা বিরাজ করতো। পাশবিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে শান্তি ও ন্যায়বোধ প্রাকৃতিক রাজ্যে বিরাজমান ছিল। এই প্রাকৃতিক রাজ্যকে সমাজ-পূর্ব অবস্থা না বলে রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থা বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

লকের মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ কতকগুলি প্রাকৃতিক আইন মেনে চলতো এবং কতকগুলি প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করতো। জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকারকে লক্ প্রাকৃতিক অধিকার বলে আখ্যা দিয়েছেন।

এই প্রাকৃতিক অধিকারগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা এবং সেগুলিকে মেনে

লকের মতে প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যক্ত হবার কারণ

চলাই প্রাকৃতিক রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, প্রকৃতির এই শান্তিময় পরিবেশ পরিত্যাগ করে মানুষ রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল কেন? এর উত্তরে লক্ প্রাকৃতিক অবস্থার তিনটি অসুবিধার উল্লেখ করেছেন:

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক নিয়মগুলি সম্বন্ধে মতবিরোধ উপস্থিত হলে তা মীমাংসা করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাব ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক নিয়মভঙ্গ করলে নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তি দেবার জন্য কোন নিরপেক্ষ বিচারক ছিলেন না। অর্থাৎ প্রাকৃতিক আইন ব্যাখ্যার কোন ব্যবস্থা ছিল না।

তৃতীয়তঃ, বিচার ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অভাব ছিল।

মানুষ তার জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে একটি চুক্তি করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল। এই চুক্তির শর্ত অনুসারে প্রত্যেকে

(১) তার নিজস্ব উপায়ে প্রাকৃতিক আইনগুলিকে প্রয়োগ করার এবং (২) আইন ভঙ্গকারীকে দণ্ড দেবার স্বাভাবিক অধিকারকে ত্যাগ করল। লক্ বলেছেন, এই চুক্তির দ্বারা প্রত্যেকে তার সমস্ত প্রাকৃতিক অধিকারকে ত্যাগ করে নি। এই অধিকারটিকে অর্থাৎ নিজস্ব উপায়ে প্রাকৃতিক আইনকে প্রয়োগ করা এবং প্রাকৃতিক আইনভঙ্গকারীকে দণ্ড দেওয়ার স্বাভাবিক অধিকার মাত্র ত্যাগ করেছিল।

সামাজিক চুক্তি

এই চুক্তির ফলে (১) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মত অনুসারে চালিত হতে স্বীকার করে এবং (২) রাষ্ট্রকে তার সিদ্ধান্ত চালু করার ব্যাপারে ব্যক্তির শক্তিকে নিয়োগ করার ক্ষমতা দেয়।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই চুক্তি অনুসারে মানুষ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করে নি। এইগুলিকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক আইন প্রয়োগ করার স্বাভাবিক অধিকার সে রাষ্ট্রের হাতে অর্পণ করেছিল।

মানুষ যে-উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিল, তাকে কার্যকরী করার জন্য তারা আরও একটি চুক্তি করেছিল। এটি হচ্ছে দ্বিতীয় চুক্তি এবং এই চুক্তির দ্বারাই সরকার গঠিত হয়। প্রথম চুক্তিটি হয়েছিল প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হল রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ, দ্বিতীয় চুক্তিটি হয়েছিল সমাজ এবং সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারের মধ্যে। লকের রচনায় চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রগঠন ছাড়া, সরকার গঠনের ধারণাও পাওয়া যায়। লক অবশ্য কোথাও স্পষ্টভাবে এই দ্বিতীয় চুক্তির কথা উল্লেখ করেন নি, চুক্তিটির ইংগিত দিয়েছেন মাত্র।

সামাজিক চুক্তি ছাড়া লক একটি সরকারী চুক্তিরও কল্পনা করেন

এই চুক্তির ফলে সরকারকে চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয় নি। সরকারের কাজ একটি ট্রাস্টের মত অর্থাৎ সরকারের কোন নিজস্ব ক্ষমতা নেই। তার ক্ষমতা শর্তসাপেক্ষ। যতদিন সরকার শর্তগুলি পালন করতে পারবে ততদিন সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে। অর্থাৎ সরকারের কাজ যদি জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় তাহলে জনসাধারণ সেই সরকারকে পরিবর্তন করতে পারবে। এর ফলে সরকার পরিবর্তিত হলেও রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটে না। এখানে জনসাধারণকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। যতদিন সরকার তার যথা-নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে যায় ততদিন এই চূড়ান্ত ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সরকার তার কর্তব্য যথাবিধি পালন করলে জনসাধারণ তাদের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে না। কিন্তু যখনই সরকার বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং তার উপর

চুক্তির শর্ত

ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে অপারগ হয়, তখনই জনসাধারণ এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তার চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, সরকার এই দ্বিতীয় চুক্তির অন্তর্গত একটি পক্ষ। সুতরাং তার কর্তব্য যদি সে পালন না করে, তাহলে অপর পক্ষও তার শর্ত অর্থাৎ সরকারের প্রতি আনুগত্য পালন না করতেও পারে।

লক্ চেয়েছিলেন ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে সমর্থন করতে। সমাজকে ধ্বংস না করে সরকারের পরিবর্তন হতে পারে এই কথা প্রচার করে লক ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন। লক্ সার্বভৌম ক্ষমতার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিলেও জনসাধারণকে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করেছেন। জনসাধারণের অভিমত ও প্রভাব সমূহকে আমরা রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলতে পারি। কিন্তু এই রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌমিকতার আইন-সংগত প্রকাশ না থাকলে কোন শাসনব্যবস্থাই চলতে পারে না। লকের লেখার মধ্যেও আইনগত সার্বভৌমিকতার স্থান নেই।

সমালোচনা

লক্ প্রয়োজন বোধে সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়েছেন। সরকার যদি তার উপর ন্যস্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে কাজ করে তাহলে জনসাধারণের পক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অধিকার ন্যায়সংগত বলে তিনি প্রচার করেছেন। কিন্তু সরকারের কার্যাবলীর যাথার্থ নির্ণয় করার কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ তাঁর লেখার মধ্যে নেই। রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করা লকের প্রধান কৃতিত্ব। কিন্তু হব্‌স এই পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হন নি। উপসংহারে বলা যেতে পারে, লক সরকারের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করে গণতন্ত্রের পথকে সুপ্রশস্ত করেছেন। এইজন্য তাঁকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পুরোধা হিসেবে গণ্য করা হয়।

রুশোর মতবাদঃ অষ্টাদশ শতকের ফরাসী দার্শনিক রুশো তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এক রাষ্ট্র-পূর্ব প্রাকৃতিক রাজ্যের কল্পনা করেছেন।

রুশো তাঁর *Discourse on Inequality* এবং *Emile* নামক গ্রন্থে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে (The Social Contract) তিনি সামাজিক চুক্তি মতবাদের সম্যক ব্যাখ্যা করেন।

রুশোর বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্য

রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হয়ে প্রবৃত্তির দ্বারাই পরিচালিত হ'ত। মানুষের এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি পাশবিক প্রবৃত্তি নয়। প্রকৃতির রাজ্যে আদিম বন্য মানুষ তার সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো। নিজস্ব স্বার্থবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হলেও প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও ছিল না—বিতৃষ্ণাও ছিল না। তারা প্রত্যেকে ছিল স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কারণ তাদের অভাব ছিল অল্প এবং তা অতি সহজেই পরিতৃপ্ত হ'ত।

মানুষ যখন নিজের বস্তুগত অভাব মেটাবার জন্য প্রকৃতির কোলে একাকী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতো তখন সবাই ছিল সমান। রাজা, প্রজা বা ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি সকল প্রকার অসাম্য বিবর্জিত প্রকৃতির রাজ্যকে রুশো মর্ত্যের স্বর্গ বলে কল্পনা করেছেন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলির উপর চাপ পড়ার ফলে ক্রমে মানুষের মধ্যে সম্পত্তিবোধ জাগ্রত হ'তে শুরু করলো। কৃষি ও খনিজ দ্রব্যের আবিষ্কার হওয়ায় তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষকে পরস্পরের সাহায্য নিতে হ'ল। সহযোগিতার প্রশ্ন যখনই উঠলো, বুদ্ধির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্যও তখন স্পষ্ট হ'তে আরম্ভ হ'ল। মানুষে মানুষে পার্থক্যের এই অশুভ সূচনা কালক্রমে ভূসম্পত্তি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক জঘন্য রূপ ধারণ করলো। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈরীভাব প্রকট হয়ে উঠলো। হিংসা, দ্বেষ, যুদ্ধ প্রভৃতি ভয়াবহ পরিণাম একের পর এক এগিয়ে আসতে লাগলো। এই জঘন্য অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই মানুষকে শেষ পর্যন্ত সৃষ্টি করতে হলো সমাজবদ্ধ জীবন বা রাষ্ট্র। রুশো বলেছেন, "যে প্রথম লোকটি এক খণ্ড জমিকে বেড়া দিয়ে ঘিরে নিজে চিন্তা করল, 'এইটিই আমার' এবং দেখল, লোকে সরলভাবে তাকে বিশ্বাস করছে, সেই হ'ল সমাজের 'আসল স্রষ্টা'।[1]

রুশোর প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগের কারণ

সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টিতে মানব হ'ল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব। প্রাকৃতিক রাজ্যে সে পরিচালিত হ'ত তার স্বভাব সুলভ প্রবৃত্তির দ্বারা এবং সেইখানেই তার শান্তি এবং সত্যিকারের স্বাধীনতা। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, হিউগো গোটিয়াস পুফেনডরফ, হব্‌স, লক্ প্রভৃতি রুশোর পূর্ববর্তী লেখকেরা সমাজ-

1 "The first man who, after enclosing a piece of ground be thought himself to say 'this is mine' and found people simple enough to believe him, was the real founder of Civil Society "—*Rousseau* Discouse on Inequality

পূর্ব বা রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় মানুষকে দেখেছেন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জীব হিসেবে। কিন্তু রুশো এই ধারণা পরিত্যাগ করে মানুষের বিচারবুদ্ধিকে তার পতনের মূল কারণ হিসেবে প্রতীয়মান করলেন। তাই রুশো তাঁর *Emile* নামক গ্রন্থে বললেন, মানুষ যদি সত্যিকারের সুখী হ'তে চায় তবে তাকে ফিরে যেতে হবে প্রকৃতির মধ্যে। 'প্রকৃতির মধ্যে ফিরে যাও' ("Back to nature") বলতে রুশো সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস করে সমাজ-পূর্ব আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেন নি। এই কথা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যে, মানুষকে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সুখী হ'তে হ'লে প্রকৃতির নিয়ম মত চলতে হ'বে।

সম্পত্তিবোধ জাগ্রত হওয়ায় প্রাকৃতিক রাজ্যে শেষের দিকে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে একটি রাষ্ট্র তৈরী করলো। এই চুক্তি তারা বাইরের কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের সাথে করে নি। এই চুক্তি তারা করেছিলো নিজেদের মধ্যে। এই চুক্তি অনুসারে মানুষ স্বাধীন ভাবে তার ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রয়োগ না করে তাদের দেহ ও সমস্ত ক্ষমতা সমষ্টিগত ভাবে 'সাধারণ ইচ্ছার' (General will) চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে স্থাপন করল। রুশোর মতে এই সাধারণ ইচ্ছাই (General will) হ'ল সার্বভৌমিক ক্ষমতার অধিকারী। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষ এই ক্ষমতার দাবী করতে পারে না। মানুষ যেহেতু নিজেকে সমষ্টির কাছে দান করেছিল, সেই জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষের কাছে তাকে দেয় নি ("Each man by giving himself to all gave himself to none.")। সুতরাং এই চুক্তির ফলে মানুষের ক্ষতি কিছু হয় নি বরং লাভই হয়েছিল। তবে এই সাধারণ ইচ্ছার (General will) অধীনে নিজেকে স্থাপিত করে মানুষ যেমন একদিকে প্রকৃতির সবকিছুর উপর তার অবাধ অধিকার এবং স্বাভাবিক স্বাধীনতা হারিয়েছিল তেমনি তার পরিবর্তে লাভ হয়েছিল রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা এবং তার সব কিছুর সামাজিক স্বীকৃতি। তাই মানুষ সাধারণ ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেও নিজে রয়ে গেল স্বাধীন।

রুশোর মতে চুক্তির পক্ষ ও শর্ত

রুশোর সৃষ্ট রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ ইচ্ছাই (General will) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এখন আমাদের বোঝা দরকার সাধারণ ইচ্ছা (General will) বলতে রুশো কোন্ ধারণা বা আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা

রুশোর মতে, সাধারণ ইচ্ছা (General will) জনসাধারণের কল্যাণকামী ইচ্ছা। এই ইচ্ছা সকলের ইচ্ছার যোগফল নয়। সেই দিক থেকে বিচার করলে কোন এক শ্রেণী সর্বসম্মতিক্রমে কোন এক প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেইটাই যে তার সাধারণ ইচ্ছা (General will) হ'বে তার কোন কথা নেই। সকলেরই ইচ্ছা (Will of all) সাধারণ ইচ্ছা (General will) নয়। সকলের ইচ্ছা বলতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার সমষ্টি মাত্রকে বোঝায়। কিন্তু সাধারণ ইচ্ছা (General will) বলতে এমন ইচ্ছার সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি নাকি সকলের কল্যাণের সঙ্গে জড়িত। রুশো বলেছেন, প্রত্যেক ব্যক্তি সুবিধা চায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি-স্বার্থ অপরের স্বার্থের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ক্ষেত্র আছে যেখানে সকলের ইচ্ছা এক। সকলের এই সমস্বার্থের প্রকাশ সাধারণ ইচ্ছায় (General will)। যদি কোন ক্ষেত্রেই ব্যক্তি ও সমষ্টির ইচ্ছা এক না হয় তা হলে সাধারণ ইচ্ছা চিন্তা করা যায় না এবং সমাজ ব্যবস্থাও সেখানে সম্ভব নয়।

চুক্তির দ্বারা মানুষ যখন সমাজ ব্যবস্থার সৃষ্টি করলো তখন সমস্ত ব্যক্তি-ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছায় মিশে একীভূত হ'ল এবং সাধারণ ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত একক এবং চূড়ান্ত ইচ্ছায় পরিণত হ'ল। * রুশোর মতে, সমাজবদ্ধ মানুষের একটি পৃথক সমষ্টিগত নৈতিক সত্তা আছে যা অন্যান্যদের ব্যক্তি-সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। সকলের কল্যাণকারী এই সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছা, সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। রুশো বলেছেন, "প্রকৃতি যেমন প্রত্যেক লোককে তার সমস্ত সদস্যদের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে, সামাজিক চুক্তি তেমনি রাষ্ট্রকে তার সমস্ত সদস্যদের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়েছে"।† রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছা (General will) অভ্রান্ত, সুতরাং সকলের সর্বাবস্থায় এই ইচ্ছাকে মেনে চলা উচিত। কেউ যদি মনে করেন সাধারণ ইচ্ছার নির্দেশ তাঁর ব্যক্তি-স্বার্থের পরিপন্থী তাহলে রুশোর মতে তাঁর যথার্থ স্বার্থ কি তা তিনি জানেন না। এ ক্ষেত্রে আপাততঃ যে ব্যক্তি-স্বার্থকে তিনি যথার্থ স্বার্থ বলে মনে করেছেন, সেটি হচ্ছে তাঁর অপ্রকৃত ইচ্ছা (unreal will)। সাধারণ ইচ্ছা সকলের প্রকৃত ইচ্ছার (real will) সমন্বয় মাত্র। অতএব

* "It is 'an association' not an 'aggregation', a moral and collective personality"—*Sabine on Rousseau's General will.*

† "As nature gives to every man an absolute power over all his members, the social pact gives to the body politic absolute power over all its members"—*Rousseau* Contract Social.

ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে এই ইচ্ছার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তার অনুবর্তী হলে মানুষ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়। সুতরাং ব্যক্তি স্বার্থের সঙ্গে সাধারণ ইচ্ছার সংঘর্ষ বাঁধলে ব্যক্তিবিশেষ তখন তার প্রকৃত ইচ্ছাকে (real will) বিসর্জন দেয়। সেইজন্য রাষ্ট্রের তখন উচিত ব্যক্তিবিশেষকে তার প্রকৃত ইচ্ছার (real will) দ্বারা পরিচালিত করে তাকে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হতে বাধ্যকরা। রাষ্ট্রের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাদের জোর করে সংখ্যা গরিষ্ঠের মত গ্রহণ করতে বাধ্য করতে হবে। রুশো বলেছেন, সংখ্যা লঘিষ্ঠকে জোর করে স্বাধীন করতে হবে (Minority should be forced to be free)। এখানে স্বাধীন বলতে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠের স্বার্থের সঙ্গে এক হয়ে সাধারণ ইচ্ছার (General will) অঙ্গীভূত হওয়াকেই বোঝাচ্ছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, রুশো ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যের কথা বলে *Discourse on Inequality* ও *Emile*তে তার রাজনৈতিক আলোচনা শুরু করেন আবার তিনিই তাঁর *Social Contract* গ্রন্থে রাষ্ট্র কর্তৃক সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর বল প্রয়োগের কথা বলছেন। বস্তুতঃ, এখানে হব্‌সের Leviathan-এর প্রতিপাদ্য বিষয়ের সঙ্গে রুশোর প্রতিপাদ্যের কোন তফাৎ নেই। এখানে রুশো এবং হব্‌স উভয়েই রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতাকে সমর্থন করেছেন।

সমালোচনা

রুশোর পরস্পর বিরুদ্ধ অভিমত এখানে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। রুশো প্রাকৃতিক মানুষের স্বভাব সুলভ প্রবৃত্তির জয়গান করতে গিয়ে তার বিচার বুদ্ধির (reason) বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন।[1] আবার স্থান বিশেষে তিনি বলেছেন, মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে তার পারিপার্শ্বিকতা বিচার করতো তার বিচার বুদ্ধি দিয়ে। আবার এক জায়গায় তিনি বলেছেন, প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ তার বিচারবুদ্ধি (reason) ছাড়া কোন সরকারের অধীন নয়।

রুশো তাঁর Social contract এ 'Man is born free but is every where in chains' বলে মানুষের সাম্য ও স্বাধীনতার জয়গান করে তার সমাজ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আবার একমাত্র সমাজের মধ্যেই তারা সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারে—এমন মতও প্রকাশ করেছেন।

1 "The man who reflects is a corrupt creature"—*Rousseau*, Discouse on Inequality.

ব্যক্তি-স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ ধ্বজাধারী শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-বিশেষের উপর জোর ক'রে রাষ্ট্রের সীমাহীন কর্তৃত্বকে চাপিয়ে দেওয়াকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেন! তাঁর এই বিপরীতমুখী ধারণাগুলি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলেই বোধ হয় একবার তিনি বলেছিলেন—"আমার অসঙ্গতির জন্যে আমি মার্জনাপ্রার্থী, তবু কুসংস্কারগ্রস্ত অপেক্ষা অসঙ্গতিপূর্ণ মানুষ হওয়াই আমার অধিক কাম্য।"[1]

রুশো হব্‌স ও লকের মতবাদের সমন্বয় করার চেষ্টা করেন

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে রুশোর সামাজিক চুক্তি মতবাদে আমরা হব্‌স ও লকের মতবাদের প্রভাব দেখতে পাই। রুশো হব্‌সের মত প্রচার করেছেন যে, রাষ্ট্র সৃষ্টির আগে মানুষ এক রাষ্ট্র-পূর্ব প্রাকৃতিক রাজ্যে বাস করতো এবং তারা নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল। সার্বভৌম ক্ষমতা কোন চুক্তির অন্তর্গত পক্ষ নন। অতএব তাঁকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করা চলে না। মানুষ তার সমস্ত ক্ষমতা সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে ত্যাগ করেছিল বলে তাঁর বিরুদ্ধে বশ্যতা অভাবসূচক কোন কাজ অন্যায়। এইভাবে হব্‌স ও রুশো সার্বভৌম ক্ষমতার অপ্রতিহত অধিকারকে সমর্থন করেছেন। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে তফাৎ এই যে, হব্‌সের মতে এই ক্ষমতা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ আর রুশোর মতে সমাজের সাধারণ ইচ্ছা (General will) এই ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষমতার সর্বময়তা সম্বন্ধে উভয়েই চূড়ান্ত অভিমত পোষণ করতেন।*

সার্বভৌম ক্ষমতার চূড়ান্ত শক্তি সমন্ধে রুশো হব্‌সের মতের অনুগামী হলেও এই ক্ষমতার আকার বা গঠন সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। এখানে হব্‌সের পরিবর্তে লকের দ্বারাই তিনি বেশী প্রভাবিত হয়েছেন। রুশো যে সার্বভৌম ক্ষমতা কল্পনা করেছেন তা কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ নয়, সমষ্টিগতভাবে সমাজই এই ক্ষমতার অধিকারী। এখানেই লকের মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে রুশোর মতে এই সার্বভৌম ক্ষমতা অর্থাৎ 'সাধারণ ইচ্ছা' সকল সময়েই কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু লক বলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী জনসাধারণ, সরকার তার যথা নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে গেলে জনসাধারণ নিজের ক্ষমতাকে প্রকাশ করে না। অর্থাৎ সরকার তার ক্ষমতা

---

1 "Forgive me my paradoxes," I like better to be a man of Paradoxes than to be a man of Prejudices"—Rousseau, *Emile.*

* ৬৩ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

পালন করলে এই ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সরকার তার যথাকর্তব্য পালন না করলে জনসাধারণ তার এই ক্ষমতাকে প্রয়োগ করবে এবং সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। সুতরাং জনগণকে চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন লক এবং রুশো উভয়েই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, হব্‌স ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে সার্বভৌম ক্ষমতার চূড়ান্ত অপ্রতিহত ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর লক ছিলেন ব্যক্তিস্বাধীনতার সমর্থক। সার্বভৌম শব্দটিকে তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি। আসলে এই আদর্শ দু'টি বিপরীতমুখী এবং তাদের সমন্বয় সাধন করতে গিয়ে রুশো কথার মারপ্যাচ এবং অনেক যুক্তিতর্কের অবতারণা করলেও শেষ পর্যন্ত এই প্রশ্নের সামঞ্জস্য সাধনের কোন সুষ্ঠু সমাধান করতে পারেন নি।

৪। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা ও মূল্য নির্ধারণ (Criticism and Evaluation of Social Contract Theory):

সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে এই মতবাদ ইতিহাস বিরুদ্ধ। ইতিহাসে এমন কোন নজির পাওয়া যায় না যেখানে রাষ্ট্র চুক্তির দ্বারা গঠিত হয়েছিল। অনেকে ১৬২০ সালের মে ফ্লাওয়ার চুক্তিকে (May Flower Compact) সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি ঐতিহাসিক নজির বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই নজির গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ঐ জাহাজের যাত্রীদল ইংলণ্ডের অধিবাসী। অতএব উত্তর আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপনের আগে রাষ্ট্র সম্বন্ধে ধারণা তাদের ছিল। তারা তথাকথিত প্রাকৃতিক রাজ্যেরও অধিবাসী ছিল না। সুতরাং এই মতবাদ অনৈতিহাসিক (unhistorical)।

ইতিহাস বিরুদ্ধ

এই মতবাদ যুক্তিবিরুদ্ধও বটে। প্রাকৃতিক রাজ্যে বাসকারী মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্র তৈরী করার জন্য তারা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে কি প্রকারে? চুক্তির সাহায্যে মানুষ যে কাজ করতে যায় সে সম্বন্ধে তার একটি ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের রাষ্ট্র সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। সুতরাং রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য কোন চুক্তিতে তারা আবদ্ধ হতে পারে না। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে যে স্বাধীনতার কথা কল্পনা করা হয়েছে, তা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র।

এই মতবাদ যুক্তি বিরুদ্ধ

সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকগণ যে চুক্তির কথা কল্পনা করেছেন তাকে কার্যকরী করতে হলে এক নিরপেক্ষ শক্তির অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন। রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ না থাকায় মানুষের পক্ষে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই মানুষের পক্ষে চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া সম্ভব। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-বিহীন অনগ্রসর সমাজ ব্যবস্থায় চুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাছাড়া, চুক্তিতে যাঁরা আবদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরাই তার শর্ত মানতে বাধ্য। রাষ্ট্র সৃষ্টির বহু পরে যে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করেছেন তাঁরা যেহেতু চুক্তিতে আবদ্ধ হয়নি সেহেতু তাঁরা চুক্তি মানতে বাধ্য নন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি বড় ত্রুটি এই যে, এই মতবাদ বিপজ্জনক। রাষ্ট্র চুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে ধরে নিলে তার স্থায়িত্ব নির্ভর করে চুক্তির শর্ত পালনের উপর। চুক্তির অন্তর্গত একটি পক্ষ যদি তার শর্ত পালন না করে তবে অপর পক্ষও চুক্তির শর্ত পালন করতে অস্বীকার করতে পারে। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অন্তর্গত নাগরিক সম্প্রদায় রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কোন ত্রুটি দেখলে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে।

এই মতবাদ বিপজ্জনক

সামাজিক চুক্তি মতবাদ চুক্তিকে রাষ্ট্রের উদ্ভবের কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই ধারণার বিরুদ্ধে স্যার হেনরী মেইন প্রাচীন আইন ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সমাজের অগ্রগতির নীতি পদমর্যাদা থেকে চুক্তি (from status to contract)। পদমর্যাদা স্থির হত জন্মের ভিত্তিতে—চুক্তির ধারণা আসে পরে। সুতরাং চুক্তিকে রাষ্ট্র সৃষ্টির কারণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না।

সামাজিক চুক্তি মতবাদকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক বিজ্ঞানসম্মত মতবাদ বলে আজকের দিনের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মেনে না নিলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এই মতবাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র কোন ঐশ্বরিক প্রতিষ্ঠান নয়—এটি মানুষেরই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। এই কথা প্রচার করে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ঐশ্বরিক মতবাদে সমর্থিত স্বৈরাচারতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে। এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্রব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে জনমতের সম্মতির উপর। রাজা বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী যদি চুক্তি অনুসারে কর্তব্য পালন করতে না পারে তাহলে জনসমাজও তাদের কর্তব্য অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার নাও করতে পারে। কাজেই এই অর্থে রাষ্ট্রের ভিত্তি হচ্ছে জনসাধারণের

সম্মতি। শাসন কর্তৃপক্ষকে তাদের করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে দায়িত্ব সম্পন্ন হতে হবে যেহেতু তাদের কর্তব্য শর্তসাপেক্ষ।

বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সামাজিক চুক্তি মতবাদের কাছে প্রভূত পরিমাণে ঋণী। স্বাধীনতা, সাম্য, জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty), অধিকার প্রভৃতি যে সমস্ত ধারণা গণতন্ত্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সামাজিক চুক্তি মতবাদই তাদের প্রাণবন্ত করে তোলে। হব্‌স্ স্বৈরাচার তন্ত্রের সমর্থন করলেও চুক্তিকেই তিনি রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ বলে উল্লেখ করেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছার মধ্যে ব্যক্তিগত মতান্তরের অবকাশ না থাকলেও তিনি ছিলেন সাম্য ও স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক। ফরাসী বিপ্লব গণমুক্তির প্রেরণাকে খুঁজে পেয়েছিল রুশোর সাম্যবাদের মধ্যেই। আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেই একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং এই মতবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনায় যথেষ্ট যুক্তির অস্তিত্ব থাকলেও এই মতবাদ চিরকাল রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পাতায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকবে।

গণতন্ত্রের প্রেরণা সামাজিক চুক্তি মতবাদ থেকে

৫। হব্‌স, লক ও রুশোর মতবাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য (Points of agreement and difference among Hobbs, Locke & Rousseau):

সাদৃশ্য (Agreement):

১। হব্‌স, লক ও রুশো—এই তিনজন লেখকই রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্বে এক প্রাকৃতিক রাজ্যের কল্পনা করেছেন।

২। প্রাকৃতিক রাজ্যের অসুবিধার জন্যই শেষ পর্যন্ত মানুষকে প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন করতে হয়েছে।

৩। এই তিন জনেই স্বীকার করেন যে, মানুষ চুক্তির দ্বারা এই প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের পত্তন করে।

৪। প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করার সময় মানুষ নিজেদের মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তি করেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। অবশ্য লকের লেখার মধ্যে দু'টি চুক্তির উল্লেখ দেখা যায়—একটি সামাজিক চুক্তি ও অপরটি সরকারী চুক্তি।

বৈসাদৃশ্য (Difference):

১। হব্‌স, লক এবং রুশো প্রাকৃতিক রাজ্যের কথা কল্পনা করলেও তিনজন লেখকই প্রাকৃতিক রাজ্যের যে চিত্র অংকন করেছেন তা পৃথক।

হবসের মতে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, পাশবিক এবং ঘৃণ্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করতো। প্রত্যেকে অপরকে অবিশ্বাস করতো এবং ভয় করতো। নিজের শক্তি ব্যতীত নিজেকে রক্ষা করার কোন উপায় ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে রাষ্ট্রের পত্তন করে।

লকের প্রাকৃতিক পরিবেশ হবসের মত ভয়াবহ নয়। তাঁর মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ সুখশান্তিতে বাস করতো এবং যুক্তি ও বিবেকবোধের অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হ'ত।

রুশো প্রাকৃতিক রাজ্যকে মর্তের স্বর্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ সরল অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা নির্বাহ করতো। অবাধ স্বাধীনতা, সাম্য প্রাকৃতিক রাজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে হিংসা, দ্বেষ ছিল না। মানুষ নিজের স্বার্থের দ্বারা যেমন চালিত হ'ত অপরের দুঃখ-কষ্টকেও তেমনি অনুভব করতো। কিন্তু পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পত্তিবোধ ও চিন্তাশক্তির উন্মেষের জন্য এই প্রাকৃতিক অবস্থা জঘন্য এবং ভয়াবহ হয়ে উঠলো।

২। হবসের মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানব যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করতো তা জঘন্য পাশবিক প্রবৃত্তির জন্য স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মাত্র ছিল। এটিকে সমাজ-পূর্ব অবস্থা বলা যেতে পারে। কিন্তু লকের মতে প্রাকৃতিক অবস্থা রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থা মাত্র। এখানে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে চালিত হ'ত। রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু এই স্বাধীনতা মানুষকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলে নি। কারণ মানুষ ছিল শান্ত, নিরীহ ও পরের দুঃখ কষ্টের প্রতি অনুভূতিশীল। সুতরাং প্রাকৃতিক রাজ্যেই মানুষ ছিল সত্যিকারের স্বাধীন ও সাম্যের অধিকারী।

৩। হবসের মতে প্রাকৃতিক রাজ্যের জঘন্য ও ভয়াবহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি। লকের মতে প্রাকৃতিক রাজ্যের কয়েকটি অনিশ্চয়তা যেমন, প্রাকৃতিক নিয়মের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার কর্তৃপক্ষের অভাবের জন্য মানুষকে প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন জনসংখ্যা, সম্পত্তিবোধ ইত্যাদির জন্য মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো তখন তারা প্রাকৃতিক রাজ্য পরিত্যাগ করে রাষ্ট্র সৃষ্টি করল।

৪। হবস এবং রুশো একটিমাত্র চুক্তির কথা কল্পনা করেছেন কিন্তু লক দু'টি চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন— একটি সামাজিক চুক্তি (Social Compact)

এবং অপরটি সরকারী চুক্তি (Governmental Compact)। লক এই দ্বিতীয় চুক্তি অর্থাৎ সরকারী চুক্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে ইংগিত দিয়েছেন মাত্র।

৫। হব্‌স রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন নি। কিন্তু লক ও রুশো রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন।

৬। হব্‌সের মতে সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজা চুক্তির অন্তর্গত কোন পক্ষ নন। কিন্তু লকের মতে সরকার চুক্তির অন্তর্গত একটি পক্ষ। তিনি 'সার্বভৌম' এই শব্দটি কোথাও স্পষ্টভাবে ব্যবহার করেন নি। রুশোর মতে মানুষ প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র পত্তন করে।

৭। হব্‌সের মতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সরকার বা রাজা চুক্তির অন্তর্গত কোন পক্ষ না হওয়ায় তাঁকে চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। মানুষ নিঃশেষে সব কিছু সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে সমর্পণ করে। সুতরাং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কখনও আইনসঙ্গত হতে পারে না। লকের মতে সরকার চুক্তির অন্তর্গত একটি পক্ষ হওয়ায় তাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। অতএব প্রয়োজন হলে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যেতে পারে। রুশোর মতে সরকার চুক্তির অন্তর্গত কোন পক্ষ নয়—চুক্তি হয়েছিল জনসাধারণ এবং সমষ্টিগত সমাজের মধ্যে। সুতরাং জনসাধারণ ইচ্ছা করলে সরকারের পরিবর্তন করতে পারে।

৮। হব্‌সের মতে চুক্তির শর্ত হিসেবে মানুষ সব কিছু নিঃশেষে সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে সমর্পণ করেছিল। লকের মতে মানুষ সবকিছু সমর্পণ করে নি। জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগ করার জন্য একটিমাত্র অধিকার সমর্পণ করেছিল। সেটি হচ্ছে প্রাকৃতিক আইন ব্যাখ্যা করা ও তাকে প্রয়োগ করার অধিকার। রুশোর মতে প্রত্যেকে তার দেহ এবং সমস্ত ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ ইচ্ছার (General will) চূড়ান্ত নির্দেশের অধীনে অর্পণ করে।

হবস সার্বভৌম ক্ষমতার হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে এবং তাকে দায়িত্বহীন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী করে স্বৈরাচারতন্ত্রের সমর্থন করেছেন। লক কখনও স্বৈরাচারতন্ত্রের সমর্থন করতে পারেন নি। সরকার চুক্তির পক্ষ এবং তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং প্রয়োজন বোধে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাও ন্যায়সংগত। রুশোও সার্বভৌম সাধারণ ইচ্ছার হাতে সব কিছু তুলে দিয়ে

তাকে অভ্রান্ত নৈতিক সত্তায় পর্যবসিত করে কার্যতঃ স্বৈরাচারতন্ত্রেরই সমর্থন করেছেন, যদিও এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্য রক্ষিত হবে, বাক্‌চাতুরীর দ্বারা তিনি এই সিদ্ধান্তই করতে চেয়েছেন।

৬। পরিবার-সম্প্রসারণের মতবাদ: পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal and Matriarchal Theories of State):

এই মতবাদীদের মতে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্রের আকার ধারণ করে। পরিবারের গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অবশ্য এই মতবাদীরা একই মত পোষণ করেন না। স্যার হেনরী মেন (*Sir Henry Maine*), দুগুই (*Duguit*) প্রভৃতি লেখকেরা মনে করেন যে, আদি পরিবারে পিতার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বেশী ছিল। এই মতবাদকে আমরা পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory of State) বলে আখ্যা দিতে পারি। অপরপক্ষে মর্গান (*Morgan*), জেংকস্ (*Jenks*), ম্যাকলেনান (*McLennan*) প্রভৃতি লেখকের মতে মাতাকে কেন্দ্র করেই আদিম পরিবারগুলি গড়ে উঠেছিল। এই মতবাদকে আমরা মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory of State) বলে আখ্যা দিতে পারি। এই দুটি মতবাদ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন:

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory): গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে জৈব প্রেরণায় স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে বাস করার ফলেই পরিবারের সৃষ্টি। কতকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে একটি গ্রামে এবং কতকগুলি গ্রাম নিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

এই মতবাদের আধুনিক রূপ দান করেন স্যার হেনরী মেইন (*Sir Henry Maine*) তাঁর Ancient Law (1861) এবং Early History of Institution (1875) নামক গ্রন্থে। তাঁর মতে আদি সমাজ ব্যবস্থার প্রাথমিক সংগঠন হচ্ছে পরিবার। পরিবারের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল জ্যেষ্ঠতম পুরুষ সদস্যের এবং বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ধারিত হতো সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্যের মাধ্যমে। ক্রমে একটি পরিবার বিভক্ত হয়ে সৃষ্টি হল কতকগুলি পরিবারের এবং প্রথম পরিবারের গৃহস্বামীর কর্তৃত্বে সমষ্টিবদ্ধ পরিবার-সমবায় হচ্ছে উপজাতি (Tribe)। কতকগুলি উপজাতি সৃষ্টি করে রাষ্ট্র। স্যার হেনরী মেইনের ভাষায় বলা যায়, "জ্যেষ্ঠতম পুরুষ পদাধিকারীর অধীনে সাধারণভাবে সংযুক্ত প্রাথমিক সংগঠন হচ্ছে পরিবার। কতকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে

স্যার হেনরি মেইনের বিশ্লেষণ ও মতবাদ

সৃষ্টি করে জেন্‌স বা হাউস্ (*Gens or House*)। কতকগুলি জেন্‌স্ বা হাউস্ সমষ্টিবদ্ধভাবে সৃষ্টি করে উপজাতি বা ট্রাইব (Tribe)। কতকগুলি উপজাতি বা ট্রাইব সমষ্টিবদ্ধভাবে সৃষ্টি করে রাষ্ট্র।"

প্রাচীন ভারতবর্ষ, গ্রীস ও রোমের প্রথা এবং ওল্ড টেস্টামেণ্টের (Old Testament) নজির দেখিয়ে মেইন তাঁর প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদের স্বপক্ষে নজির

এই মতবাদের সমালোচকগণ বলেন, আদি সমাজ ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক নয়—মাতৃতান্ত্রিক। পিতার কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে উদ্ভূত পরিবার ব্যবস্থার আগে মায়ের কর্তৃত্বের উপর ভিত্তি করে পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

এই মতবাদের সমালোচনা

অনেক সমালোচকের মতে সব সময় হেনরী মেইন নির্দিষ্ট পথে—অর্থাৎ পরিবার থেকে জেন্‌স্, জেন্‌স থেকে উপজাতি এবং উপজাতি থেকে রাষ্ট্র—সৃষ্টি হয় নি। আদি সমাজে মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করতো। সুতরাং আদিতম সমাজব্যবস্থা পরিবার-ভিত্তিক নয়—দলভিত্তিক।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory of State)। ম্যাকলীনান (*McLennan*), মরগ্যান্ (*Margan*), জেংকস্ (*Jenks*) প্রভৃতি লেখকেরা মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের প্রচারক।

এই মতবাদীদের মতে মাতার কর্তৃত্বকে ভিত্তি করেই আদি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। মাতার মাধ্যমেই বংশ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি নির্ণীত হতো।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের মূলকথা

মাতার কর্তৃত্বে গড়ে-উঠা পরিবার প্রথার যুক্তির স্বপক্ষে বলা হয় যে, অতীতে যখন সুগঠিত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি তখন স্ত্রীলোকের মাধ্যমেই রক্তের সম্পর্ক নির্ণীত হোত। অতীতে স্ত্রীলোক যখন বহুপতি গ্রহণ করতে পারতো তখন স্বভাবতঃই পিতৃত্ব নির্ণয় ছিল অনুমান সাপেক্ষ, কিন্তু মাতৃত্ব নির্ণয় করতে অনুমানের উপরে নির্ভর করতে হয় নি। এমতাবস্থায় স্ত্রীলোকের কর্তৃত্বের প্রাধান্য এবং স্ত্রীলোকের মাধ্যমে রক্তের সম্পর্ক, উত্তরাধিকার ইত্যাদি নির্ণীত হওয়াই স্বাভাবিক।

এই মতবাদের বিশ্লেষণ

জেংক্‌সের মতে পরিবার আদিতম সামাজিক সংগঠন হতে পারে না। আদিতম সামাজিক সংগঠন হচ্ছে জাতি। কারণ দলবদ্ধ অবস্থায় বাস করাই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ট্রাইব (Tribe) থেকে ক্রমে গোষ্ঠী এবং পারিবারের সৃষ্টি হয়। জেংকস্

জেংকসের মতবাদ

অষ্ট্রেলিয়া, মালয় প্রভৃতি দেশের আদি সমাজ ব্যবস্থা থেকে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি প্রতিষ্ঠিত করেন। মর্গান আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান ও অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদকে প্রচার করেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের নাম Ancient society or Researches in the Lines of Human progress from Savagery, through Barbarism to Civilisation এবং জেংকসের পুস্তকের নাম A History of Politics। ভারতবর্ষের অন্তর্গত আসাম রাজ্যে অনেক পার্বত্য উপজাতির সমাজ-ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের নিদর্শন। হিন্দু সমাজের তান্ত্রিক উপাসনা পদ্ধতির মধ্যেও মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সূত্র লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত

এই মতবাদের সমালোচনায় বলা হয় যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাই যে সর্বত্র প্রচলিত ছিল, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন আদি সমাজব্যবস্থায় উভয় প্রকার সংগঠনই বোধ হয় বিদ্যমান ছিল।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সমালোচনা

পুরুষ অপেক্ষা নারী স্বভাবতঃই দুর্বল, সুতরাং আদি সমাজ-ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকই যে সকল সময় অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের উপর কর্তৃত্ব করতো এই ধারণা যুক্তিবিরুদ্ধ বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

৭। রাষ্ট্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical or Evolutionary Theory) :

আদি সামাজিক গঠন থেকে শুরু ক'রে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে এক বিচিত্র জটিল পথে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে। অধ্যাপক গার্ণার যথার্থই বলেছেন, "রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি নয়, প্রবলতর পশু-শক্তির ফল নয়, প্রস্তাব বা চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট নয়, এমন কি শুধু পরিবারের সম্প্রসারণ বলে রাষ্ট্রকে গ্রহণ করা যায় না।"[1]

গার্ণারের মত

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিভিন্ন মতবাদগুলির ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলির প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর একদেশদর্শী। রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে

1 The state is neither the handiwork of God, nor the result of superior physical force, nor the creation of resolution or convention, nor a mere expansion of the family" —*Garner.*

ধরে নিলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন আলোচনার প্রয়োজন হয় না। আবার, রাষ্ট্র সবলের দ্বারা দুর্বলের প্রতি বল প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত হয়েছে বলে ধরে নিলে রাষ্ট্রীয় সংগঠনে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলিকে অস্বীকার করে শক্তিকেই একমাত্র উপাদান বলে ধরে নিতে হয়। শুধু বল প্রয়োগের কথা উল্লেখ করলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

রাষ্ট্র রাতারাতি চুক্তির ফলেও সৃষ্ট হতে পারে না। ইতিহাসে তার নজির মেলেনা, যুক্তির দিক থেকেও তা সমর্থন করা যায় না। আসলে রাষ্ট্র হচ্ছে—ইতিহাসের অগ্রগতির অনিবার্য পরিণতি। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ফলে নানা উপাদানের প্রভাব এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে রাষ্ট্র তার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রাচীন মানব সমাজের ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় রক্তের সম্বন্ধ সমাজ সংগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। পরিবার আদিতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। স্বাভাবিক জৈব প্রবৃত্তি এবং স্ত্রী ও শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের প্রাথমিক প্রয়োজন থেকে সমাজের এই আদিতম প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হলেও আত্মীয়তা বন্ধন এই পারিবারিক সংগঠনকে এক সামাজিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকে থাকতে সাহায্য করেছিল।

রক্তের সম্বন্ধ (Kinship)

পরিবারের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পরিবারের সৃষ্টি হয়। এই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে একতাবন্ধনের মূলসূত্র রক্তের সম্বন্ধ। পরিবারের মধ্যে গৃহকর্তার কর্তৃত্ব এবং তার প্রতি আনুগত্য পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতো। কিন্তু একটি পরিবার থেকে বিবাহ ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন পরিবার সৃষ্টি হলে গৃহকর্তার কর্তৃত্বের গুরুত্ব কমে যায়। তখন এই বিভিন্ন পরিবারের মানুষ, একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এই ধারণায় ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ থাকে। পূর্বপুরুষকে পূজা করা (ancestor worship) অনেক প্রাচীন সমাজের রীতি আজও দেখা যায়। ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ বিভিন্ন পরিবারকে সামগ্রিকভাবে গোষ্ঠী বলা হয়। গোষ্ঠীর একত্ববন্ধনের প্রধান উপাদান আত্মীয়তাবোধ বা রক্তের সম্বন্ধ।

সমাজের সংগঠনে ধর্মের প্রভাব অনস্বীকার্য। কিভাবে ধর্মের প্রভাব সমাজ সংগঠনে সাহায্য করেছে স্যার ফ্রেজার (*Sir J. G Frazer*) তাঁর বিখ্যাত *The Golden Bough* নামক গ্রন্থে সুন্দরভাবে তা আলোচনা করেছেন।

সমাজ বিবর্তনের আদিঅবস্থায় মানুষ ঝড়, বৃষ্টি, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে ভয় করত। এই সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বিজ্ঞান-সম্মত কারণ তারা জানতো না এবং এই জাতীয় প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোন দেবদেবীর অস্তিত্ব কল্পনা করে নিতে। সমাজের অপেক্ষাকৃত চতুর ব্যক্তিরা মানুষের এই অজ্ঞতা এবং অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সমাজের মধ্যে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতো। তারা প্রচার করতো যে এই জাতীয় নৈসর্গিক ঘটনা বিশেষ দেবদেবীর ক্রোধের প্রকাশমাত্র এবং এদের বশীভূত করার মন্ত্রতন্ত্র ও কলাকৌশল তাদের জানা আছে। সুতরাং সাধারণ মানুষ কল্পিত দেবদেবীর ক্রোধমত্ত তাণ্ডবে ভীত হয়ে নিজেদের রক্ষার জন্য স্বভাবতই এই চতুর ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হতো—তাদের প্রতি আনুগত্য এবং বশ্যতা স্বীকার করতো। মানুষের কুসংস্কারের সুযোগ নিয়ে যে চতুর ব্যক্তিরা সমাজে নিজেদের নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করতো, নৃতত্ত্বের ভাষায় তাদের ঐন্দ্রজালিক (*magician*) বলা হয়। কালক্রমে মানুষ যখন এই প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শিখলো তখন ঐন্দ্রজালিকের প্রয়োজন হ'ল তার ক্ষমতার এক সুস্থতর ভিত্তি অন্বেষণের। ঐন্দ্রজালিক ঝাড়ফুকের সাহায্য ত্যাগ ক'রে পূজা অর্চনার আশ্রয় গ্রহণ করলো। ঐন্দ্রজালিকের স্থান অধিকার করলো পুরোহিত। প্রাচীন মানব সমাজে পুরোহিতের কর্তৃত্বের সর্বজনীন স্বীকৃতি ছিল। সকলে তাকে ভয় করতো, শ্রদ্ধা করতো এবং দ্বিধাহীন আনুগত্য জানাতো। তাই প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় পুরোহিত সম্প্রদায় পার্থিব ক্ষমতার শ্রেষ্ঠতম অধিকারী বলে বিবেচিত হতো। প্রাচীন ঈজিপ্টের রাজা সূর্যদেবতার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীসের স্পার্টার রাজাকে পুরোহিত ও রাজা—এই দু'য়েরই কর্তব্য পালন করতে হতো। আধুনিক কালে ইংলণ্ডের রাজা প্রধানতঃ চার্চের প্রধান কর্তা (Head of the Established Church) এবং ধর্মবিশ্বাসের রক্ষক (Defender of the Faith)। বর্তমানে জাপানের রাজাও সূর্যদেবতার প্রধান পুরোহিত। প্রাচীন সমাজে পূর্বপুরুষকে পূজা করা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল। এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভবের ধারণা এবং তাকে পূজা করা অনিবার্য ভাবে সমাজ বন্ধন সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। প্রাচীন সমাজের আইন ব্যবস্থাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা সামাজিক সংগঠনে ধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারি। অতীতের আইন ব্যবস্থা ছিল কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসনের সমষ্টি মাত্র।

ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও ধর্মের প্রভাব

ধর্মীয় অনুশাসনের নির্দেশে মানুষ আইনানুগ হয়ে বাস করায় সমাজে শৃঙ্খলা আনয়ন সহজসাধ্য হয়েছিল।

রাষ্ট্র সংগঠনে শক্তি একটি বড় উপাদান। জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন উপজাতি যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতো তখন তাদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। জীবিকার্জনের উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই সংঘর্ষ প্রায়ই ঘটে থাকতো। ভ্রাম্যমান অবস্থা পরিত্যাগ করে এক জায়গায় বসবাস করার ক্ষেত্রেও এই বল প্রয়োগকারী শক্তির কম প্রয়োজন ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বোধ জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা থেকে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন থেকেই উদ্ভূত হয় বলপ্রয়োগকারী শক্তির। অতীতে কোন উপজাতি যখন অপর কোনো উপজাতির দ্বারা আক্রান্ত হতো তখন তারা অনিবার্যভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হতো এবং নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো। আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা এবং যুদ্ধ জয়ের প্রয়োজনীয়তা থেকে উদ্ভূত যুদ্ধনেতা কালক্রমে হলো রাজা।

শক্তি

সামাজিক বিবর্তনের আদি অবস্থা থেকে গোষ্ঠীস্তর পর্যন্ত সামাজিক সংগঠনের মূল বন্ধন ছিল রক্তের সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে উপজাতির উপর রক্তের সম্বন্ধের প্রভাব নষ্ট হয়ে গিয়ে সামরিক সংগঠনের প্রভাব সামাজিক সংগঠনকে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে।

রাষ্ট্রের বিবর্তনে অর্থনৈতিক কারণগুলিও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সমাজব্যবস্থার আদি স্তরে মানুষ যখন শিকার অথবা পশুপালনের দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করতো তখন তাদের অনিবার্য কারণে পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হতে হয়েছিল। কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্পত্তির অর্জন, ভোগ ও বিনিময় ইত্যাদি সম্বন্ধে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মের প্রয়োজনীয়তা সমাজ-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হতে শুরু করলো।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন

রাষ্ট্রীয় বিবর্তনের প্রতি স্তরেই মানুষ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আসছে। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বলতে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের মাধ্যমে কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনকে বোঝায়। এই চেতনা সমাজ সৃষ্টির প্রাথমিক স্তরে সুপ্ত বা অর্ধসুপ্ত অবস্থায়

কার্যকরী ছিল। কিন্তু কালক্রমে, ধীরে ধীরে মানুষ এই প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে সচেতন হতে শুরু করে। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য, সামাজিক সম্পর্ককে সুসংবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট করার জন্য, দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য এবং সর্বোপরি তার সামাজিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার আবশ্যকতাকে একান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিল। এই প্রয়োজন বোধ থেকে উদ্ভূত হ'ল আইন। প্রাচীনকালে আইন বলতে ধর্মীয় অনুশাসনকে বোঝাতো। কালক্রমে, ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলেও মানুষ তার যুক্তি ও বিচার দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজজীবনে আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে শিখলো এবং স্বভাবতঃ আইনের অনুগত হয়ে উঠলো।

রাজনৈতিক চেতনা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আদিতম সমাজ বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবের ফলে ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম ক'রে আজকের পরিপূর্ণ রাষ্ট্র-অবস্থায় রূপ পরিগ্রহ করেছে। অবশ্য কোন্ স্তরে কোন্ উপাদান কতটা কার্যকরী হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ বিচার আজকের দিনে সম্ভব না হলেও, রাষ্ট্র যে এক স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ইতিহাসের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ পরিবর্তন করতে করতে আজকের দিনে পূর্ণতর সমাজ-ব্যবস্থায় এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে, আধুনিক কালের সমস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তা স্বীকার করেন। অধ্যাপক বার্জেসের ভাষায় আমরা বলতে পারি—"সম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত সূচনা থেকে সুরু করে রাষ্ট্র অসম্পূর্ণ কিন্তু প্রগতিশীল প্রকাশের মাধ্যমে সর্বদোষমুক্ত এক বিশ্বজনীন সংগঠনের পথে মানব সমাজের অবিশ্রান্ত অগ্রগতি।" ("The state is a continuous development of human society out of a grossly imperfect begining through crude but improving forms of manifestation towards a perfect and universal organisation of mankind."—*Burgess.*)

সংক্ষিপ্তসার

ঐশ্বরিক উৎপত্তি মতবাদ:

এই মতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীনতম মতবাদ। এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে, রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং রাজা ভগবানের প্রতিনিধি মাত্র। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে, খৃষ্ট ধর্মে এবং মহাভারতে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। এই মতবাদ স্বৈরাচারকে সমর্থন

করে। ইউরোপের নবজাগরণ, ধর্মসংস্কার আন্দোলন, সামাজিক চুক্তি মতবাদের উদ্ভব ইত্যাদি কারণে এই মতবাদের প্রভাব কমে যায়।

বলপ্রয়োগের মতবাদ :

এই মতবাদের মূলকথা হচ্ছে দুর্বলের উপর সবলের বলপ্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূল ভিত্তি শক্তি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী লেখকেরা, যথা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, সমাজতন্ত্রবাদী নৈরাজ্যবাদী প্রভৃতি লেখকেরা তাঁদের প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে এই মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ :

সামাজিক চুক্তিমতবাদ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ। মহাভারত ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং গ্রীসের বিশিষ্ট দার্শনিকদের লেখায় এই মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়। হব্‌স, লক ও রুশোর লেখার মাধ্যমেই এই মতবাদ সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এঁরা সকলেই এক রাষ্ট্র-পূর্ব প্রাকৃতিক রাজ্যের কথা কল্পনা করেছেন। হব্‌স প্রাকৃতিক রাজ্যের এক ভয়াবহ চিত্র অংকন করেছেন। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল 'একাকী, দরিদ্র, জঘন্য এবং পাশবিক'। এই প্রাকৃতিক রাজ্যে ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ বলে কিছু থাকতে পারে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মানুষ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকে চুক্তি করল যার ফলে এক সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে বিনা শর্তে তাদের প্রাকৃতিক অধিকার ত্যাগ করল। এই সার্বভৌম ক্ষমতা চুক্তির অন্তর্গত পক্ষ নন। অতএব তাঁকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ এবং অন্যায়। লক বর্ণিত প্রাকৃতিক রাজ্যে শান্তি ও ন্যায়বোধ বিরাজ করলেও সেখানে প্রাকৃতিক রাজ্যের নিয়মগুলিকে ব্যাখ্যা করার এবং এই নিয়মভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়ার কেউ ছিল না। এই অভাবের জন্য তারা একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হল। এই চুক্তির দ্বারা মানুষ তার নিজস্ব উপায়ে প্রাকৃতিক আইনগুলিকে প্রয়োগ করার ও আইনভঙ্গকারীকে দণ্ড দেবার স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করল। মানুষ তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার ত্যাগ করেনি। এইগুলিকে রক্ষা করার জন্যই প্রাকৃতিক আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত স্বাভাবিক অধিকার ত্যাগ করেছিল—অপর একটি চুক্তির ফলে স্বষ্ট সরকারকে অপ্রতিহত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা হয়নি। সরকার চুক্তির অন্তর্গত একটি পক্ষ। অতএব তাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অবৈধ হতে পারে না। এই মতবাদের দ্বারা তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করতে চেয়েছেন।

রুশো প্রাকৃতিক রাজ্যকে একটি স্বর্গের নন্দন কানন বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে মানুষ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতো। ক্রমে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও সম্পত্তিবোধ জাগ্রত হওয়ার ফলে প্রাকৃতিক রাজ্য মানুষকে ত্যাগ করতে হয়। এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে তাদের সমস্ত অধিকারকে সমাজের কাছে ত্যাগ করল। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ নয়—সামগ্রিকভাবে সমাজের 'সাধারণ ইচ্ছাই' (General Will) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

এই মতবাদ স্বৈরাচারতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করার পথ প্রশস্ত করেছে। এই মতবাদ—(ক) ইতিহাস বিরুদ্ধ, (খ) যুক্তি বিরুদ্ধ ও (গ) বিপজ্জনক।

পরিবার সম্প্রসারণের মতবাদ :

এই মতবাদ অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠা, উপজাতি ইত্যাদি সৃষ্টি করে রাষ্ট্রের পত্তন করে। এই মতবাদের অন্তর্গত পিতৃতান্ত্রিক মতবাদীদের মতে পরিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুরুষ সদস্য বা পিতার কর্তৃত্বই প্রধান এবং পিতার মাধ্যমে উত্তরাধিকার ও বংশ গণনা করা হয়। মাতৃতান্ত্রিক মতবাদীদের মতে মাতার কর্তৃত্বকে ভিত্তি করে আদি পরিবার-ব্যবস্থা

গড়ে উঠেছিল এবং মাতার মাধ্যমেই বংশ ও উত্তরাধিকার নির্ণীত হত। যদিও সমাজের আদিমতম রূপের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই, তবু রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদ এই মতবাদের সত্যতা অনেকটা স্বীকার করে নিয়েছে।

ঐতিহাসিক মতবাদ ঃ

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্ট, শুধুমাত্র বলপ্রয়োগের ফল অথবা পরিবার সম্প্রসারণের পরিণতি বলে বিবেচিত হতে পারে না। (ক) রক্তের সম্বন্ধ (খ) ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও ধর্মের প্রভাব (গ) শারীরিক শক্তি (ঘ) অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা (ঙ) রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবের ফলে রাষ্ট্র এক আদি এবং অসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বিবর্তনের মাধ্যমে আজকের পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থায় এসে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

Exercise

1. Critically discuss the Theory of Divine Origin of the State.

2 "Government rests on force." "Government rests on public opinion. Discuss these statements carefully. (*C. U '44*)

3. Comment on the statement, "will, not force is the basis of the state." (*C. U. 1956*)

4. Discuss the Social Contract Theory of the origin of the state. [*C. U, 1947, 49*]

5. Discuss the points of agreement and difference between Hobbes and Rousseau as expounders of the Social Contract Theory. (*C. U. 1959*)

6. Rousseau tries to combine "The theories of Hobbes and Locke".—Elucidate (*C. U 1951*)

7. Discuss the practical importance of Social Contract Theory in actual political development (*C. U 1949*)

8. "The accepted theory of the origin of the state in modern Political Science is the Historical or Evolutionary Theory."—Discuss (*C. U. 1962*)

চতুর্থ অধ্যায়

সার্বভৌমিকতা

(Sovereignty)

১। সার্বভৌমিকতার অর্থ (Meaning of Sovereignty) :

আমরা আগেই দেখেছি সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র তার অন্তর্গত সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনুগত্য লাভ করে অর্থাৎ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা সকল ব্যক্তি বা সংস্থার উপর প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা কোন শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয় অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাইরে কোন শক্তিই এই রাষ্ট্রকে পরিচালিত করতে পারে না বা কৈফিয়ত দাবি করতে পারে না।

সার্বভৌমিকতার অর্থ ও সংজ্ঞা

ফরাসী দার্শনিক বদাঁ (*Bodin*) সার্বভৌম ক্ষমতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "আইনের দ্বারা অপ্রতিহত, নাগরিক এবং প্রজাদের উপর রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা।"[1]

জেলিনেক (*Jellinek*) এইভাবে সার্বভৌমের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন : সার্বভৌম ক্ষমতা "রাষ্ট্রের সেই বৈশিষ্ট্য যার বলে একমাত্র তার নিজের ইচ্ছা ব্যতীত আইনসংগতভাবে তাকে বাধ্য করা যেতে পারে না অথবা নিজের ক্ষমতা ব্যতীত অন্য কোন ক্ষমতা দ্বারা তাকে সীমিত করা যেতে পারে না।"[2]

বার্জেস (*Burgess*) সার্বভৌম ক্ষমতাকে "অধস্তন ব্যক্তি এবং অধস্তন সংস্থাগুলির উপর মৌলিক চূড়ান্ত এবং সীমাহীন ক্ষমতা"—বলে আখ্যা দিয়েছেন।[3]

তিনি আরো বলেছেন, এটি "আদেশ দেবার এবং আনুগত্য আদায় করার মৌলিক এবং স্বাধীন ক্ষমতা।"[4]

---

1 "Supreme power of the State over citizens and subjects, unrestrained by law"—*Bodin*

2 "that characteristic of the State in virtue of which it cannot be legally bound except by its own will, or limited by any other power than itself."—*Jellinek*

3 "Original, absolute and unlimited power over the individual subject and over all associations of subjects"—*Burgess.*

4. "The underived and independent power to command and compeel obedience."—*Ibid.*

২। **সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sovereignty) :**

সার্বভৌম ক্ষমতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার চূড়ান্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা বাইরে কোন উচ্চতর ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্র তার এই ক্ষমতাবলে নাগরিক বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি করতে পারে। রাষ্ট্রের বাইরে কোন শক্তিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নির্দেশ দিতে পারে না। তাছাড়া, রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা মৌলিক। রাষ্ট্র ব্যবস্থার সঙ্গেই এই ক্ষমতা ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, কোন শক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা নয়।

আভ্যন্তরীণ ও বহিঃ শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত চূড়ান্ত ক্ষমতা

দ্বিতীয়তঃ, এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী (permanent)। রাষ্ট্রের রাষ্ট্রত্ব থাকলে সার্বভৌমিকতা থাকবে। রাষ্ট্রের মধ্যে সরকার পরিবর্তিত হতে পারে। সরকার পরিবর্তিত হলে সার্বভৌম ক্ষমতার পরিবর্তন সাধন হয় না। সরকার পরিবর্তনের অর্থ রাষ্ট্রের পরিবর্তন নয়।

এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী

তৃতীয়তঃ, এই ক্ষমতা অবিভাজ্য (indivisible)। একটি বর্গক্ষেত্রকে তার বর্গক্ষেত্র বজায় রেখে যেমন ভাগ করা যায় না তেমনি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে ভাগ করা যায় না। একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা কর্তৃক এই ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। সমাজ-ব্যবস্থার ঐক্য এবং সংহতি অব্যাহত রাখার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার অবিভাজ্যতা অপরিহার্য। সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত হলে সমাজে অরাজকতার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে।

এই ক্ষমতা অবিভাজ্য

চতুর্থতঃ, এই ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয় (inalienable)। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হয়। গাছ যেমন তার অংকুরোদ্গম হওয়ার অধিকারকে এবং মানুষ যেমন তার জীবন ও ব্যক্তিত্বকে নিজেকে ধ্বংস না করে হস্তান্তর করতে পারে না তেমনি রাষ্ট্র তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে তার রাষ্ট্রত্ব বজায় রেখে হস্তান্তর করতে পারে না। সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তরযোগ্য নয় বলতে এই কথা বোঝায় না যে, রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডের একাংশ হস্তান্তর করতে পারে না। ভূ-খণ্ডের একাংশ হস্তান্তরকরণের অর্থ সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তরকরণ নয়। ভারত সরকার পাকিস্তানের হাতে বেরুবাড়ী হস্তান্তর

এই ক্ষমতা হস্তান্তর যোগ্য নয়

করেছেন বলে ভারতবর্ষ তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। সরকার পরিবর্তন হওয়াকেও সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তরকরণ বোঝায় না।

পঞ্চমতঃ, এই ক্ষমতা সার্বজনীন (universal)। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপরে তার ক্ষমতা অপ্রতিহত, অর্থাৎ এই ক্ষমতা বলেই রাষ্ট্র তার সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে। রাষ্ট্রের মধ্যে যে সব বৈদেশিক প্রতিনিধি এবং দপ্তরখানা থাকে তার উপর সেই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা অবশ্য থাকে না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই সমস্ত বৈদেশিক প্রতিনিধি এবং দপ্তরখানা যে রাষ্ট্রের এরা তাদেরই সার্বভৌম ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণাধীন। এর ফলে যে রাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিনিধি বা দপ্তরখানা থাকে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার সার্বজনীনতা হ্রাস পায় না। আন্তর্জাতিক নিয়ম, পারস্পরিক সুবিধা এবং সৌজন্যের খাতিরে রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় এই সমস্ত বৈদেশিক ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির উপরে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে না।

এই ক্ষমতা সার্বজনীন

৩। সার্বভৌমিকতার ইতিহাস (History of Severeignty):

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সার্বভৌমিকতার ধারণাটি খারিজ করে দিতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব স্থায়ী কল্যাণ করা হবে। তিনি বলেছেন, সার্বভৌমিক ক্ষমতার উদ্ভব হয় ষোড়শ শতাব্দীর কতকগুলি ঘটনার আকস্মিক পরিণতির ফলে। মধ্যযুগে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা একটি মাত্র কেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল—সেটি হচ্ছে সমগ্র খ্রীষ্ট জগতের ধর্মগুরু পোপ। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম আন্দোলনের ফলে এবং পোপের নৈতিক অধঃপতনের জন্য তার কর্তৃত্বেব বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইউরোপের বিভিন্ন অংশের রাজারা এই প্রতিক্রিয়ার সুযোগ গ্রহণ করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

সার্বভৌমিকতাব উদ্ভব ষোড়শ শতাব্দীতে

ইউরোপে কেন্দ্রীভূত রাজক্ষমতার আর একটি প্রতিবন্ধক ছিল সামন্ত প্রথা। সামন্ত প্রথায় আনুগত্য ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। মুখ্য ভূম্যধিকারীরা রাজাকে আনুগত্য দেখাত। কিন্তু তাঁদের অধস্তন ভূম্যধিকারীদের রাজার প্রতি কোন কর্তব্য ছিল না। ফলে রাজাকে সম্পূর্ণভাবে মুখ্য ভূম্যধিকারীদের বিশ্বস্ততার উপর নির্ভব করতে হত। ইংলণ্ডে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের ফলে এবং ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের

ফলে মুখ্য ভূম্যধিকারী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়ায় রাজ-ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ইউরোপের রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে তাদেরও অপসারিত হতে হয়।

এইভাবে রাজার ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলি ক্রমে ক্রমে অপসারিত হওয়ায় রাজাকে কেন্দ্র করে সার্বভৌম ক্ষমতা তথা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ষোড়শ শতাব্দী থেকেই গড়ে উঠতে শুরু করে। সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণাটি ফরাসী দার্শনিক বদাঁই (*Jean Bodin*) সর্বপ্রথম তাঁর '*Six Books on the Republic*' নামক গ্রন্থে বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করেন। বদাঁ সার্বভৌমিকতার নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন :

বদাঁর ব্যাখ্যা

"নাগরিক এবং প্রজাদের উপর আইনের দ্বারা রাষ্ট্রের অপ্রতিহত চূড়ান্ত ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা" ("supreme power of the state over citizens and subjects, unrestrained by law")। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বদাঁ এবং তাঁর পূর্ববর্তী লেখকেরা রাজার ক্ষমতাকেই সার্বভৌম ক্ষমতা বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের পক্ষে অবশ্য এই ভুল করাই স্বাভাবিক। কারণ, সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণার উদ্ভবের পেছনে যে সংগ্রামময় ইতিহাস রয়েছে তাতে রাজারাই তার পুরোভাগে থেকে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। এই সংগ্রামে যেহেতু রাজারাই শেষ পর্যন্ত কৃতকার্যতা অর্জন করেছিলেন, তজ্জন্য তাঁদেরকেই সার্বভৌম ক্ষমতা বলে ধরে নেওয়া হত।

পরবর্তীকালে হব্‌স, লক ও রুশো সার্বভৌমিকতার ধারণাটির পরিবর্তিত রূপ দান করেন। হব্‌স তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদে দেখিয়েছেন যে, সার্বভৌম ক্ষমতা এমন একটি শক্তি যাঁর কাছে মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে তাদের সমস্ত স্বাভাবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা বিনা শর্তে ত্যাগ করে।

হব্‌সের ব্যাখ্যা

যেহেতু বিনা শর্তে মানুষ তার সমস্ত অধিকার ত্যাগ করেছিল এবং সার্বভৌম ক্ষমতা যেহেতু চুক্তির অন্তর্গত কোন পক্ষ নন, তজ্জন্য তাঁর ক্ষমতা চূড়ান্ত। এই ক্ষমতাকে কোন ক্রমেই চুক্তিভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। সুতরাং জনসাধারণের উপর তিনি অপ্রতিহত এবং সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী। হব্‌স সার্বভৌম ক্ষমতার আইনগত দিকটিই লক্ষ্য করেছেন। কেননা, তাঁর লেখার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার কোন স্বীকৃতি নেই।

লক্ 'সার্বভৌম' শব্দটি কোথাও ব্যবহার করেননি। বাস্তবিকপক্ষে লক্ হব্‌সের মত অসীম এবং অপ্রতিহত ক্ষমতার কল্পনা কোথাও করেননি। তিনি জনসাধারণকে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী বলেছেন। কিন্তু এই ক্ষমতা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। যতদিন সরকার তার কর্তব্য পালন করে যায় ততদিন এই ক্ষমতাকে কার্যকরী হতে দেখা যায় না। কিন্তু সরকার তার চুক্তির শর্তমত যথাকর্তব্য পালন করতে না পারলে, জনসাধারণ সরকারকে ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে নিজেদের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে প্রকাশ করতে পারে। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যায় যে, লক্ সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাছাড়া, তাঁর লেখায় আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্যের ইংগিতও দেখা যায়।

লকের ব্যাখ্যা

রুশো যে সার্বভৌম শক্তির কথা কল্পনা করেছেন তা হব্‌সের সার্বভৌম শক্তির মত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নয়। রুশো দেখিয়েছেন, প্রত্যেকে তার স্বাভাবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা সামগ্রিকভাবে সমাজের কাছে পরিত্যাগ করেছে। এই সমাজের সাধারণের ইচ্ছাই (General will) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই সাধারণ ইচ্ছা (General will) সকলের ইচ্ছার সমষ্টি, বা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র নয়। যে ইচ্ছা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ কামনা করে সেইটিই সাধারণ ইচ্ছা (General will)। এই সাধারণ ইচ্ছার (General will) বিরুদ্ধে কারও কোন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কোন ব্যক্তির স্বার্থ সাধারণ ইচ্ছার বিরোধী বলে মনে হলে সে নিজের যথার্থ স্বার্থ কি তাই বুঝতে ভুল করেছে। এইরূপ ক্ষেত্রে জোর করে তার ইচ্ছা সাধারণ ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত করার কথা রুশো প্রচার করেছেন। সুতরাং রুশোর সার্বভৌম ক্ষমতা হব্‌সের মত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ না হলেও ক্ষমতার দিক থেকে উভয়ের মতেই সার্বভৌম ক্ষমতা চরম ও অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী।

রুশোর ব্যাখ্যা

রুশোই সার্বভৌম ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তার অবিভাজ্যতা ও হস্তান্তর যোগ্যতার অভাবের কথা প্রতিপন্ন করেন। সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে রুশোর আদর্শই আধুনিক সার্বভৌমিকতার ধারণার মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে।

রুশোর পরে ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম ও আইনবিদ্ অষ্টিন সার্বভৌমিকতার ধারণাকে নূতন ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান

বলে ধরে নিয়ে সার্বভৌম ক্ষমতাকে অসীম এবং অপ্রতিহত বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তাছাড়া, তাঁরা রাষ্ট্রের আইনগত সার্বভৌমিকতার দিকটির উপর জোর দিয়েছেন। ইংরেজ দার্শনিক গ্রীন এবং বোসাঙ্কেট্ রাষ্ট্রকে মানুষের সামাজিক বৃত্তির প্রকাশ বলে ধরে নিয়ে মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তায় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সমর্থন করেন।

আদর্শবাদী ইংরেজ দার্শনিকদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা

বর্তমান যুগে বহুত্ববাদীরা রাষ্ট্রের একক সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে বৃত্তি ও জীবিকার ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাগুলিই আধুনিক সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। এদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত হলে বা কোন প্রকার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রের দ্বারা সেই সামঞ্জস্য সাধন হবে, তবে তার জন্য রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতার মত চরম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার প্রয়োজন নেই। রাষ্ট্রের ক্ষমতায় যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁরাও ভুলত্রুটি সমন্বিত মানুষ। সুতরাং মানুষের নাগালের বাইরে কোন চরম অপ্রতিহত ক্ষমতায় তাঁদের অধিষ্ঠিত করার কোন ন্যায়সংগত যুক্তি থাকতে পারে না।

বহুত্ববাদীদের দৃষ্টিতে সার্বভৌমিকতা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান লেখকগণ সার্বভৌমিকতাকে একক অবিভাজ্য এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা বলে প্রতিষ্ঠিত করলেও এই ধারণাটির স্বরূপ, অবস্থিতি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ফলে সার্বভৌমিকতা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সার্বভৌমিকতা সম্বন্ধে ধারণার এই বিভিন্ন দিকগুলি আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন।

৪। নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব (Titular and actual Sovereignty):

ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এমন এক সময় ছিল যখন রাজাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করা হত। ক্রমে রাজার ক্ষমতা কমে যায় এবং আসল ক্ষমতা জন-প্রতিনিধিমূলক আইনসভার হাতে ন্যস্ত হয়। রাষ্ট্রের মধ্যে যে শক্তি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার অধিকারী এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্ষম তাকে প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলা যেতে পারে। আর যিনি নামে মাত্র রাজা কিন্তু যাঁর নামে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তিনি নামসর্বস্ব সার্বভৌমিকতার অধিকারী (titular sovereignty)। যেমন,

ইংলণ্ডে রাজা নামেমাত্র সার্বভৌম কিন্তু আসল ক্ষমতা পরিচালনা করে মন্ত্রীসভা। এখানে রাজা নামসর্বস্ব সার্বভৌম আর মন্ত্রীসভা সমন্বিত পার্লামেণ্ট প্রকৃত সার্বভৌমিকতার (actual sovereignty) অধিকারী।

৫। আইনসংগত সার্বভৌমিকতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা (Legal and Political Sovereignty) :

প্রত্যেক রাষ্ট্রে এমন এক শক্তি থাকে যা চূড়ান্তভাবে আইন প্রণয়নের অধিকারী। এই ক্ষমতাটিকে আইনসংগত সার্বভৌমিকতা বলা হয়। যেমন, ব্রিটেনে রাজাসহ পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের অধিকারী। এই আইন অমান্য করার অধিকার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নেই। সেখানকার কোন বিচারালয় এই আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না। তর্কের খাতিরে বলা যায় যে, রাজাসহ পার্লামেণ্টের কোন আইনের বলে যদি ইংলণ্ডের সমস্ত নীল চোখসম্পন্ন ছেলেদের হত্যা করতে হয় তাহলে সেই অদ্ভুত আইনটিও অন্ততঃ আইনের দিক দিয়ে সিদ্ধ। পার্লামেণ্টের ক্ষমতার এই চূড়ান্ত দিকটি দেখাতে গিয়ে ব্রিটেনের কোন সংবিধান ব্যাখ্যাকারী বলেছেন যে, শুধু পুরুষকে স্ত্রীলোকে এবং স্ত্রীলোককে পুরুষে পরিণত করা ছাড়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সব কিছুই করতে পারে।

আইনসংগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার স্বরূপ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আইনের চোখে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সব কিছু করবার ক্ষমতা থাকলেও বাস্তবে তা করতে পারে কি? উত্তরে বলা যায়, তা সম্ভব নয়। কেননা, পার্লামেণ্টের কাজকে আসলে নিয়ন্ত্রিত করছে সেখানকার জনমত। জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্ট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না। গণ-মানসকে সঙ্গে নিয়ে পার্লামেণ্টকে চলতে হয়। আইনের চোখে সে অনেক কিছুই হয়ত করতে পারে কিন্তু বাস্তবে তাকে চিন্তা করতে হয় জনসাধারণ তার ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কিরূপ মনোভাব পোষণ করছে। অন্যথায় গণবিপ্লব অথবা নির্বাচনের ফলে এই পার্লামেণ্টের সদস্যদের গদিচ্যুত হতে হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পার্লামেণ্ট আইনের সবকিছু করার অধিকারী হয়েও বাস্তবে সে তা করতে পারে না। যে শক্তি বাস্তব ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করছে সেটিকে সেখানকার রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলা যেতে পারে। অতএব, আইনগত সার্বভৌমিকতাকে যে শক্তি বা প্রভাব নিয়ন্ত্রিত করছে সেইটি হচ্ছে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। সভা, সমিতি, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত সব সময়

সরকারের কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। জনমতের এই প্রভাবকে অস্বীকার করা বা এড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রের সরকারের থাকে না।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আইনসংগত সার্বভৌমিকতা এবং রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি।

আইনগত এবং রাজনৈতিক সার্বভৌম ক্ষমতার সংজ্ঞা

আইনসংগত সার্বভৌমিকতা বলতে সেই চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিসমষ্টি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষকে বুঝি যার চূড়ান্তভাবে আইন তৈরী করার ক্ষমতা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। আইনজীবি একমাত্র এই ক্ষমতাকেই স্বীকার করে নেয়। রাষ্ট্রের যে সমষ্টিগত প্রভাব আইনসংগত সার্বভৌমিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইটি হল রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। অধ্যাপক গিলক্রিস্ট বলেছেন, "রাষ্ট্রের যে সমষ্টিগত প্রভাব আইনের পিছনে অবস্থান করছে সেইগুলি একত্রযোগে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা।"[1]

রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা আইনগত সার্বভৌমিকতার অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী

বাহ্যতঃ আইনসংগত সার্বভৌমিকতা আইন প্রণয়নের আইনসংগত অধিকারী এবং জনসাধারণের কাছ থেকে অনুগত্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত একে রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার কাছে মাথা নত করতে হয়। অধ্যাপক ডাইসীর (*Dicey*) ভাষায় বলা যায়, "যে সার্বভৌমিকতাকে আইনজীবি স্বীকার করেন তার পিছনে আর একজন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রয়েছে যার কাছে আইনসংগত সার্বভৌমিকতা মাথা নত করবে।"[2]

রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা আইনসংগত সার্বভৌমিকতার চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হলেও আইনের চোখে কিন্তু তার স্বীকৃতি নেই। জনগণের ইচ্ছা

আইনগত সার্বভৌমিকতা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা অসংবদ্ধ ও অনির্দিষ্ট

আইন সভার মাধ্যমে বিধি নির্দিষ্ট উপায়ে প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত বিচারালয় তাকে স্বীকার করে নেবে না। সভা, সমিতি, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে জনমত নিয়তই প্রকাশিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক প্রভাবে কোন বিশেষ মত কখনও বা প্রবল আকার ধারণ করে। এই মত যতই সুদৃঢ় এবং তীব্র হোক না কেন—আইন সভা যতক্ষণ পর্যন্ত

---

1 "The political sovereign is sumtotal of the influences in a State which lie behind law."—*Gilchrist*

2 "Behind the sovereign which the lawyer recognises, there is another sovereign to whom the legal sovereign must bow."—*Dicey*

না সেই মতকে তার বিশেষ ছাঁচে ফেলে আইনের আকারে রূপ না দিচ্ছে ততক্ষণ তার কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। জনমত অনুসারে কাজ না করার জন্য সরকারকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না। কিন্তু আইন সভা সেই জনমতকে যখন স্বীকার করে নিয়ে আইনের আকারে রূপ দেয়—তখন তাকে অস্বীকার করার অধিকার কারোর নেই। সরকার বা যে কোন ব্যক্তি আইনসভা প্রণীত এই আইনকে ভঙ্গ করলে সে আইন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী। আইনভঙ্গকারীকে বিচারালয়ে অভিযুক্ত করলে বিচারালয় তার বিচার করতে বাধ্য। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা অধিক ক্ষমতাশালী হলেও সে অসংবদ্ধ ও অনির্দিষ্ট। কিন্তু আইনসংগত সার্বভৌমিকতা সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সুসংবদ্ধ।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার সাথে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। এই শাসনব্যবস্থায় শাসন কার্যের কর্ণধারেরা জনসাধারণের ইচ্ছাকে বেশীদিন উপেক্ষা করতে পারেন না। গণতন্ত্রে জনসাধারণ সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র, ডেপুটেশন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের অভিমতকে ব্যক্ত করার সুযোগ পায়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা এই অভিমতকে উপেক্ষা করলে তাদের ক্ষমতাচ্যুতির সম্ভাবনা। কাজেই জনসাধারণের ইচ্ছার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে এই ক্ষমতার কার্যাবলী বাস্তবে রূপায়িত করার উপরই গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করছে। সুতরাং রাজনৈতিক ও আইনসংগত সার্বভৌমিকতার মধ্যে সুষ্ঠু এবং সহজ সম্পর্ক স্থাপনই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান সমস্যা।

আইনগত সার্বভৌমিকতার রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সংগতি বজায় রাখার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে

প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, রাজনৈতিক এবং আইনসংগত সার্বভৌমিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের সমস্যা বর্তমান যুগের প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা। অতীতে গ্রীক এবং রোম নগর-রাষ্ট্রগুলিতে যেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল সেখানে এই সমস্যার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনি। কারণ, জনসাধারণ সেখানে সরাসরিভাবে শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করে তাদের ইচ্ছাকে কার্যকরী করার সুযোগ পেত। কিন্তু বর্তমান সময় গণতন্ত্রে এই সুযোগ না থাকায় আইনসভার প্রতিনিধিদের জনসাধারণের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সংগতি রেখে সরকারী নীতি নির্ধারণ করার উপর তাদের কার্যকারিতার যাথার্থ নির্ভর করে।

৬। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা এবং বাস্তব-সার্বভৌমিকতা (De Jure and De facto Sovereignty):

অনেক সময় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা হয়। রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা আইনের দ্বারা সার্বভৌম ক্ষমতা বলে স্বীকৃত হয়—সেইটি হচ্ছে আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা। আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা যে আইন তৈরী করে আইনসংগত ভাবে সেইটি সিদ্ধ আইন। জনসাধারণের কাছ থেকে এই ক্ষমতা বৈধ আনুগত্যের অধিকারী এবং জনসাধারণকে আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আইনের দ্বারা স্বীকৃত।

আইনানুমোদিত সার্বভৌম ক্ষমতা আইনের দ্বারা স্বীকৃত

অনেক সময় দেখা যায়, রাষ্ট্রের যে ক্ষমতা সার্বভৌমিকতার অধিকারী তার পিছনে আর একটি ক্ষমতা তার কর্তৃত্বকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়। আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকৃত না হলেও আসলে ক্ষমতা তার হাতেই। লর্ড ব্রাইস্ বাস্তব সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি আইনসংগত ভাবে অথবা আইনের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছাকে বলবৎ করতে পারে"[1] —সেইটি হচ্ছে বাস্তব সার্বভৌমিকতা।

ব্রাইসের বাস্তব সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা

পাকিস্থান, ব্রহ্মদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি রাষ্ট্র সেনাধ্যক্ষদের দ্বারা বিদ্রোহের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করণের মধ্যে আইনানুমোদিত এবং বাস্তব সার্বভৌমিকতার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞার পর দীর্ঘ পার্লামেণ্টকে (Long Parliament) বাতিল করে অলিভার ক্রমওয়েল বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী হয়েছিলেন। বাস্তব সার্বভৌমিকতার ক্ষমতা শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইনের দ্বারা স্বীকৃত না হলেও এই শক্তির নির্দেশ জনসাধারণকে মানতে বাধ্য হতে হয়।

বাস্তব সার্বভৌমিকার উদাহরণ

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় অথবা দেশ বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে আইনানুমোদিত এবং বাস্তব সার্বভৌমিতার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে ধরা

1. "The person or body of persons who can make his or their will prevail whether with the law or against the law"—*Bryce*

পড়ে। ফরাসী বিপ্লবের সময় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় বিপ্লবের পর Convention Parliament রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। আইনসংগত ভাবে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে তাঁদের ক্ষমতা স্বীকৃত হবার আগে তাঁরা ছিলেন বাস্তব সার্বভৌমিকতার অধিকারী।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য ধরা পড়ে

রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন সুসংগঠিত শাসনব্যবস্থায় আইনসংগত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য থাকে না। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে আনুষ্ঠানিক সার্বভৌমিকতাই বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা। রাজাসহ পার্লামেণ্ট গ্রেট ব্রিটেনে আইনসংগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। যবনিকার অন্তরালে কোন অদৃশ্য নিয়ন্তা সেখানকার পার্লামেণ্টের কাযাবলী নিয়ন্ত্রিত করছে—একথা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্রে আইনসংগত সার্বভৌমিকতার পিছনে আরেকটি শক্তিকে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করতে দেখা যায়। যথা, রুশ দেশে জার দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে রাষ্ট্রের সর্বেসর্বা ছিলেন রাসপুটিন। তাঁরই নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের সবকিছু চলত—যদিও আইনের দৃষ্টিতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন জার স্বয়ং।

আইনানুমোদিত ও বাস্তব সার্বভৌমিকতার মধ্যে পার্থক্য অনুন্নত রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

আনুষ্ঠানিক ও বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য অবশ্য সাময়িক। বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কিছুদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার পর আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতায় পর্যবসিত হন। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের ফলে বলশেভিক পার্টির ক্ষমতায় অধিষ্ঠান, চীনের কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণ প্রভৃতি এই পরিণতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাস্তব সার্বভৌম ক্ষমতা যে কোন প্রকারে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করুক না কেন, অধিক দিন ধরে সে তার ক্ষমতাকে কাযকরী করতে সক্ষম হলে কালক্রমে তার ক্ষমতা আইনের স্বীকৃতি লাভ করে, এটিই স্বাভাবিক।

বাস্তব সার্বভৌমিকতা ক্রমে আইনগত সার্বভৌমিকতায় পর্যবসিত হয়

৭। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা (Popular Sovereignty):

ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ক্ষমতা

বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা উদ্ভূত হয়। পেড্রুয়ার মার্সিগলিও, অকহামের উইলিয়ম প্রভৃতি ধর্মযাজকেরা জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা প্রচার করতে শুরু করেন। ফরাসী বিপ্লবের আগে ফরাসী দার্শনিক রুশো 'জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার মালিক'—একথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রচার করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণায় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার উল্লেখ দেখা যায়।

জনগণের সার্ব-ভৌমিকতার ধারণা

'জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক'—এই ধারণাটি গণতন্ত্রের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। অধ্যাপক ব্রাইস এই ধারণাটিকে গণতন্ত্রের ভিত্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধারণা একটি মহান আদর্শ বলে পরিগণিত হলেও অধ্যাপক গিলক্রিস্ট যথার্থই বলেছেন—"জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা শব্দটি কোন বিজ্ঞানসম্মত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।"[1]

জনগণের সার্ব-ভৌমিকতার ধারণার অস্পষ্টতা

জনগণের ক্ষমতা অর্থে সার্বভৌম ক্ষমতা বোঝাতে পারে না। কারণ, রাষ্ট্রের সমস্ত জনসাধারণের পক্ষে এই ক্ষমতার ব্যবহার সম্ভব নয়। এই ক্ষমতাকে পরিচালিত করতে হলে একটি সুসংগঠিত জনসাধারণ প্রয়োজন। রাষ্ট্রের সমস্ত লোক সুসংগঠিত নয়, অতএব তাদের দ্বারা এই ক্ষমতার প্রয়োগও সম্ভব নয়। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা অনেক সময় জনগণের ইচ্ছাই আইন—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, জনসাধারণের কোন অভিমত যতক্ষণ পর্যন্ত আইন সভার মাধ্যমে বিধিনির্দিষ্ট উপায়ে অনুমোদিত না হচ্ছে ততক্ষণ তা আইন বলে পরিগণিত হবে না। জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা অনেক সময় জনগণের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অর্থে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারকে বোঝায়। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকার অর্থে 'জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা' শব্দটি ব্যবহৃত হলে তার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবে কোন সংহত ক্ষমতার অর্থে ব্যবহার করলে এই ধারণাটির যথার্থ অর্থ আবিষ্কার করা দুরূহ। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের অনেক সময় পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। তাছাড়া, একতাবদ্ধ হয়ে এই শক্তির ব্যবহারও তাদের দ্বারা সম্ভব নয়। অধ্যাপক রীচির (*Ritchie*) মতে, জনগণ তাদের নির্বাচনী

[1] "The phrase 'Popular Sovereignty has not been used in any real Scientific sense…" —*Gilchrist*

শক্তি ও নানা প্রকার প্রভাবের দ্বারা শেষ পর্যন্ত সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং জনগণই প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু আমরা জানি যে, ক্ষেত্রবিশেষে একটি ছোট সৈন্যদলও অসংখ্য জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। অতএব জনগণই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এই ধারণা ভুল।

বাঁচির মত

আসলে সার্বভৌমিকতার ধারণাটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। অসংবদ্ধ এবং অসংগঠিত জনতা কখনও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। জনসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ এবং সংগঠিত হলেই তারা সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে। রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে সংগঠিত জনসাধারণই রাষ্ট্র। সুতরাং সার্বভৌম ধারণাটি জনগণের সঙ্গে সংযুক্ত না করে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম এবং গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

৮। জাতীয় সার্বভৌমিকতা (National Sovereignty) :

জাতীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাটি ফরাসী বিপ্লবের পর প্রচারিত হতে শুরু করে। এই ধারণা অনুসারে সমগ্র জাতি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু এই ধারণা স্বৈরাচারতন্ত্র এবং উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। ফলে রাজার অপ্রতিহত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিই সার্বভৌমত্বের অধিকারী —এই ধারণা প্রসার লাভ করতে শুরু করে। তাছাড়া, মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে কতকগুলি অধিকার নিয়ে জন্মায় এবং সর্বাবস্থায় সেগুলি অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ থাকে—এই ধারণাটিকেও জাতীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা অস্বীকার করে।

জাতীয় সার্বভৌমিকতার ধারণা এবং জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণাটি অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হওয়ায় তাকে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়ায় অসুবিধা দেখা দেয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে জাতি সার্বভৌমত্বের অধিকারী —এই ধারণা আইনসংগত ভাবে স্বীকৃত হতে কোন বাধা নেই। তবে তত্ত্বের দিক থেকে জাতীয় সার্বভৌমিকতা প্রচার লাভ করলেও এ ধারণা একটি কাল্পনিক আদর্শমাত্র। সামগ্রিক ভাবে জাতি তার চূড়ান্ত ইচ্ছাকে কার্যকরী করতে পারে না।

৯। অস্টিনের মতে সার্বভৌমিকতা (Austin's Concept of Sovereignty):

সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে অস্টিন বলেছেন, 'কোন নির্দিষ্ট মানবীয় কর্তৃপক্ষ (কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী) যদি অন্য কোন অনুরূপ কর্তৃপক্ষের বশ্যতা স্বীকারে অভ্যস্ত না হয়, অথচ নিজেই সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির আনুগত্য লাভ করে তবে সেই সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ ঐ সমাজের সার্বভৌম শক্তি হবেন এবং ঐ কর্তৃপক্ষসমেত ঐ সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে গঠিত ও স্বাধীন সমাজ' (If a determinate human superior, not in the habit of obedience to a like superior, receive habitual obedience from the bulk of a given society, that determinate superior is sovereign in that society, and the society (including the superior) is a society political and independent.—*Austin*)। অস্টিনের এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির অবস্থিতি দেখতে পাই:

অস্টিনের সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত

(১) সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে বিশেষভাবে এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝব।

(২) যেহেতু এই ক্ষমতা নির্দিষ্ট, এর অবস্থিতির জন্য রাষ্ট্রের মধ্যে কোন এক স্থান নির্দিষ্ট থাকবে।

(৩) এর ক্ষমতা চূড়ান্ত এবং

(৪) এর আদেশই আইন।

বহুত্ববাদ এবং ঐতিহাসিক মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তানায়কেরা অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতার সংজ্ঞাটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন: কোন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কখনও চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেনি। যখন এমন কোন ক্ষমতা প্রয়োগের প্রবণতা দেখা দিয়েছে তখন তাঁর উপর নানা রকমের বাধা নিষেধ আরোপ করে তাকে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। ল্যাস্কি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌম ক্ষমতার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—"এমন কি তুর্কীর সুলতান যখন তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তখন কতকগুলি প্রথাগত

বিধিনিষেধের দ্বারা তাঁর ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ এবং বস্তুতঃ এগুলি ছিল যেন তাঁর পক্ষে বাধ্যতামূলক।"[1]

ঐতিহাসিক মতবাদের চিন্তানায়ক স্যার হেনরী মেন (*Sir Henry Maine*) দেখিয়েছেন, প্রাচ্য দেশীয় অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিতে প্রথাগত বিধিনিষেধের ক্ষমতা খুবই প্রবল। এই মতবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, পাঞ্জাবের স্বৈরাচারী শাসনকর্তা মহারাজা রঞ্জিত সিং তাঁর সারা জীবনেও প্রথাগত বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে স্বীয় অভিমতকে বলবৎ করতে সাহস করেননি।

ঐতিহাসিক মতবাদ স্যার হেনরী মেনের সমালোচনা

সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ নিরপেক্ষ প্রথাগত আইনের অবস্থিতি বলে অস্টিন অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে, প্রথাগত আইনগুলিকে চলতে দেওয়ার মধ্যে তাঁর প্রচ্ছন্ন আদেশ ব্যক্ত হয়েছে। বিচারালয় যখন কোন প্রথাগত আইনকে স্বীকার করে, তার অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা তাকে আইন বলে অনুমোদন করেছে। এই অনুমোদনই হল তাঁর আদেশ। অস্টিন বলেছেন, "What the sovereign permits, he Commands"। অবশ্য অস্টিনের এই উক্তির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, রণজিৎ সিং কি কখনও এই প্রথাগত আইনগুলিকে পরিবর্তন করার কল্পনাও করেননি? যদি করে থাকতেন, তা হলে বাস্তবিক কি এইগুলিকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এইগুলিকে অনুমোদন করা ছাড়া তাঁর গত্যন্তর ছিল না।

প্রথাগত আইন সম্বন্ধে অস্টিনের বক্তব্য

ডাইসে (*Diecy*) তার *Law of the Constitution* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনগত সার্বভৌমিকতাকে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার কাছে মাথা নত করতে হয়। আইনগত সার্বভৌমিকতার পিছনে যে প্রভাবসমষ্টি কাজ করে যায় সেইটিই রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা। এই ক্ষমতা অনির্দিষ্ট হলেও, একে অস্বীকার করার ক্ষমতা আইনগত সার্বভৌমিকতার নেই।

1 "Even the Sultan of Turkey in the highest of his power was himself bound down to a Code of traditional observance obedience to which was practically compulsory upon him" —*Laski, Grammar of Politics.*

অস্টিনের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা ঈশ্বরের অভিপ্রায় অথবা জনমনের ইচ্ছা বা ঐ জাতীয় কোন নৈর্ব্যক্তিক জিনিস নয়। তাঁর মতে, বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টিই সার্বভৌমক্ষমতার অধিকারী। তা যদি হয় তা হলে এর অবস্থিতির কোন বিশেষ এক ক্ষেত্র থাকবে যাতে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি, এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী অথবা এই বিশেষ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর আবাসস্থল।

সার্বভৌম ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট—এই মতের বিরুদ্ধ যুক্তি

অস্টিনের মতে, রাজাসহ পার্লামেন্ট ব্রিটেনে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনের দিক দিয়ে হয়তো তাই। রাজাসহ পার্লামেন্ট ব্রিটেনে যে কোন আইন তৈরী করতে পারে এবং সেই আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার গ্রেট ব্রিটেনে কোন বিচার সভার নেই। তত্ত্বের দিক হতে বিচার করলে, ব্রিটিশ পালমেণ্ট এমন আইন তৈরী করতে পারে যার ফলে কোন নাগরিকদের ভোটাধিকার থাকবে না বা শ্রমিক সংঘগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই রকম কোন অদ্ভুত আইন তৈরী করার ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নেই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কার্যাবলীর পিছনে রয়েছে সেখানকার জনমত ও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাব। সেখানকার সদাজাগ্রত জনমত ও নির্বাচকমণ্ডলীর প্রভাবকে অস্বীকার করার ক্ষমতা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে দেওয়া হয়নি।

ব্রিটেন ও এককেন্দ্রীক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্র আলোচনার পরে আমরা যদি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার দিকে তাকাই তা হলে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে খুঁজে বের করা আরও দুরূহ হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে দেয় সংবিধান। সংবিধানের দেয় ক্ষমতার বাইরে বা বিরুদ্ধে কোন বিষয়বস্তুর উপরে কোন আইন সভা আইন প্রণয়ন করলে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারালয় তাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করবে। তা হলে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা অঙ্গরাজ্যগুলির কেউই তাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবী করতে পারেন না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি

এমতাবস্থায় সংবিধানকে হয়তো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যই কি তাই? সংবিধান পরিবর্তনশীল। আমেরিকা

যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান চারটি উপায়ে পরিবর্তন করা যায়। সংবিধান পরিবর্তনের এই বিভিন্ন ধারাগুলিকে আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা বললে ভুল করা হবে। কারণ অস্টিনের মতে তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা একক এবং স্থির—সতত দোদুল্যমান ও পরিবর্তনশীল নয়।

সংবিধান পরিবর্তনশীল

অস্টিনের সার্বভৌম ক্ষমতার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আইন সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র। এই সিদ্ধান্তকে সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করলে আইনের গতিশীলতার দিকটি অস্বীকার করা হয়। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্তন হয়। প্রগতিশীল রাষ্ট্রের আইনও প্রগতিশীল হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ, কোন রাষ্ট্রের বিবিধ আইনের মধ্যে সেখানকার সমাজ ব্যবস্থার রূপ অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়। কোন সার্বভৌম ক্ষমতা তার খেয়ালখুশী অনুসারে আইন প্রণয়ন করতে পারে না। সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আইনও বিবর্তিত হতে থাকে।

আইন সার্বভৌমিক ক্ষমতার আদেশমাত্র হতে পারে না

ঐতিহাসিক মতবাদে বিশ্বাসী চিন্তানায়কেরা ছাড়া দুগুই (*Leon Duguit*), হিউগো ক্রাবে (*Hugo Krabbe*) প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীরা আইনকে সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র বলে স্বীকার করতে রাজী নন। এঁদের মতে, সমাজের প্রয়োজনেই আইনের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের উৎপত্তির পূর্বে সমাজব্যবস্থা কয়েকটি বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত। কোন প্রকার নিয়ম ব্যতিরেকে সমাজব্যবস্থা চলতে পারে না। তাই রাষ্ট্রীয় অনুমোদনই আইনের উৎস বললে আইনের প্রকৃত স্বরূপ আমরা বুঝতে ভুল করব। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ন্যায় অন্যায় সম্বন্ধে সমাজের ধারণাই আইনের উৎস। মানুষ তার ন্যায়-অন্যায় বোধ দিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নির্দেশ করে, তার সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মান নির্ণয় করে। তাই কতকগুলি কাজের পিছনে তার থাকে সমর্থন আর কতকগুলি হয় নিন্দিত। সামাজিক মূল্য নির্ণয়ে যা সমাজবিরুদ্ধ বলে বিবেচিত হয়, আইনের দিক থেকে সেইটিই অবৈধ বা অসিদ্ধ।

দুগুই, ক্রবে প্রভৃতি সমাজবিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা

ল্যাস্কি প্রমুখ বহুত্ববাদীদের মতে মানুষ তার সামাজিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নানা প্রকার সংঘ বা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে। বর্তমান সভ্য সমাজে

এই সংঘগুলির প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। রাষ্ট্রও এরূপ প্রতিষ্ঠানদের মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। তাই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলির সার্বভৌম ক্ষমতা বলে যদি কিছু না থাকে তাহলে রাষ্ট্রের এমন একটি বিশেষ ক্ষমতা থাকবে কেন? ল্যাস্কি বলেছেন, "সার্বভৌম ক্ষমতার ধারণাটিকে সমূলে খারিজ করে দিতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভূত কল্যাণ করা হবে।"[1]

ল্যাস্কি প্রভৃতি বহুত্ববাদীদের বিরুদ্ধ যুক্তি

অধ্যাপক বার্কার বলেছেন, "আজকাল আমরা মানুষ বনাম রাষ্ট্র—এই কথা লিখি না। সংঘ বনাম রাষ্ট্র এই কথাই লিখে থাকি।"[২]

কিন্তু বর্তমানে মানুষের প্রয়োজনে সংঘগুলি রাষ্ট্রের সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত হতে চলেছে। তাই এই সংঘগুলির উপরে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করার কোন নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক অধিকার ও মানবিকতার প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা বেড়ে চলেছে। এই কারণেও আজ রাষ্ট্র মানুষের উপর চূড়ান্ত ও একচ্ছত্র আধিপত্য দাবী করতে পারে না। আন্তর্জাতিক আইনের পরিধি ও গুরুত্বকেও অস্বীকার করার উপায় নেই। এই আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার খাতিরেও আজ রাষ্ট্রের একক অবিভাজ্য সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা যায় না।

আধুনিককালের রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর মধ্যে অস্টিনের সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে যে সমালোচনা করা হয় তার কারণ অস্টিনের বক্তব্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সমালোচকদের ভুল ধারণা। অধিকাংশ সমালোচক মনে করেন যে, অস্টিনের সার্বভৌম ক্ষমতা বোধ হয় পাশবিক শক্তির প্রতীক। এই ধারণা ঠিক নয়। নৈতিক আইনের শক্তিতে অস্টিনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্টিনের লেখা থেকে উদ্ধৃতির সাহায্যে দেখিয়েছেন, মানুষ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি যে আনুগত্য জানায় তা ইচ্ছা করেই জানায়।[৪] এই সম্মতি তারা দেয়

অস্টিনের সার্বভৌমিকতার ভুল ব্যাখ্যা

1. "It would be lasting benefit to Political Science of the whole concept of sovereignty were surrendered"—*Laski*

2 "No longer we write man Vs state, we write group Vs. state"—*Barker*

3 "All obedience, therefore, according to Austin 'is volantary and free' and "every party who obeys consents to obey".—*D. N. Banerjee, Calcutta Review, August 1942*

কারণ বুদ্ধিজীবী মানুষ তার বিচারশক্তি দিয়ে বুঝতে পারে যে, সমাজজীবন যাপন করতে হলে এক সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন অপরিহার্য, অন্যথায় সমাজ জীবন অসম্ভব হয়ে পড়বে।

১০। বহুত্ববাদ (Pluralism) :

রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ও অবিভাজ্য সার্বভৌম ক্ষমতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক বিশেষ মতবাদ অস্বীকার করেছে, একে বলা হয় বহুত্ববাদ। উনবিংশ শতকের শেষের দিকে এই মতবাদ প্রাধান্য লাভ করে। জার্মান আইনবিদ্ গিয়ার্কে (*Otto V. Gierke*), ক্র্যাবে (*H. Krabbe*), ফরাসী লেখক লিঁয়ো ডুগুই (*Leon Duguit*), ইংরেজ চিন্তানায়ক হ্যারল্ড ল্যাস্কি (*Harold Laski*), আর্নেস্ট বার্কার (*Ernest Barker*), এ ডি. লিণ্ডসে (*A D Lindsay*) এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এম পি ফলেৎ (*M P Follett*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই মতবাদ প্রচার করেন।

বহুত্ববাদের প্রধান লেখক

অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সার্বভৌমিকতার ধারণাটি একেবারে খারিজ করে দিতে পারলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রভূত কল্যাণ করা হবে। এ. ডি লিণ্ডসে (*A. D Lindsay*) বলেছেন, "সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা স্পষ্টতই ভেঙ্গে পড়ছে ("It is clear enough that the theory of sovereign state has broken down.")।

মানুষ তার ধর্মীয়, সামাজিক এবং জীবিকাগত বিভিন্ন প্রকার স্বার্থকে বাস্তবরূপ দেবার জন্য বিভিন্ন প্রকার সংঘ বা প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। মানুষের পক্ষে আজ একক ও ব্যক্তি নিরপেক্ষ জীবন অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আজ আমরা শ্রমিক সংঘ, সংস্কৃতিমূলক সংঘ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সংঘের অস্তিত্ব দেখতে পাই। আজকের দিনে রাষ্ট্র তাই কতকগুলি সংঘের সমষ্টি মাত্র। অধ্যাপক ল্যাস্কির (*Laski*) মতে সমাজ একটি যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মত ('Society is federal in nature')। ফিজিস (*Figgis*) রাষ্ট্রকে '*Society of societies*" বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে বর্তমানে আমরা মানুষ বনাম রাষ্ট্রের কথা না বলে সংঘ বনাম রাষ্ট্রের কথাই বেশি করে বলে থাকি।

বহুত্ববাদের মূল কথা

প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি দিককে বিকশিত হতে সাহায্য করে সংশ্লিষ্ট সংঘ। বহুত্ববাদীদের মতে কোন প্রতিষ্ঠান মানুষের ব্যক্তিত্ব

বিকাশে কতটা সাহায্য করেছে তার উপর সেই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।

সমাজের বিভিন্ন সংঘের মতই রাষ্ট্র একটি সংঘ মাত্র। তাই এক বিশেষ সার্বভৌম ক্ষমতায় অভিষিক্ত হবার নৈতিক অধিকার রাষ্ট্রের নেই। প্রত্যেক সংঘই তার নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম। জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যেমন স্বীকৃত, সংঘের তেমনি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। অবশ্য বিভিন্ন সংঘের মধ্যে মতানৈক্য বা সংঘর্ষ উপস্থিত হলে রাষ্ট্রের এক বিশেষ কর্তব্য রয়েছে—একথা প্রায় সকল বহুত্ববাদী স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে তার জন্য রাষ্ট্রের কোন অন্তর্নিহিত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকার অন্ততঃ নীতির দিক থেকে তাঁরা স্বীকার করতে রাজী নন।

সমাজের বিভিন্ন সংঘের মত রাষ্ট্র একটি সংঘ মাত্র

বহুত্ববাদীদের মধ্যে বিভিন্ন লেখক তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংঘ-জীবনের বৈশিষ্ট্য, তাদের ক্ষমতার সীমা ও কর্তব্যের পরিধি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

গিয়ার্কে (*Gierke*) এবং মেটল্যাণ্ড (*Maitland*)-এর মতে স্থায়ী সংঘগুলি স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। প্রতিটি সংঘের পৃথক সত্তা, চেতনা ও ইচ্ছাশক্তি আছে। প্রত্যেক সংঘের একটি স্বকীয় স্বতন্ত্র ইচ্ছা আছে যেটি তার সদস্যদের ইচ্ছার সমষ্টি মাত্র নয়—সেটি তার নিজস্ব চেতনাময় সত্তার ইচ্ছা। ব্যক্তিমাত্রেরই যেমন কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে, সংঘমাত্রেরই তেমনি কতকগুলি অধিকার ও কর্তব্য আছে। এই অধিকার ও কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা যথাযথ স্বীকৃতি পাওয়া উচিত।

গিয়ার্কে ও মেটল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা

পল বংকুর (*J. Paul Boncour*) বৃত্তিমূলক এবং অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই এই সংস্থাগুলির উৎপত্তি হয়েছে। নিজেদের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যে নিয়মকানুন তারা তৈরি করে সেগুলিই পরে রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়। এইভাবে প্রতিটি বৃত্তিমূলক বা অর্থনৈতিক সংঘ সার্বভৌম সংস্থায় পরিণত হয়।

পল বংকুরের ব্যাখ্যা

এমিলে ডার্কহিমের (*Emile Durkheim*) মতে জাতির অর্থনৈতিক জীবন রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাই এই কাজ সম্ভব। তাই ভৌগোলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রথা রহিত করে জীবিকা বা বৃত্তির ভিত্তিতে তিনি আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের পক্ষপাতী।

ডার্কহিমের ব্যাখ্যা

ফিজিস (*Figgis*) তাঁর '*Churches in the Modern State*' গ্রন্থে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে চার্চের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে রাষ্ট্রের অন্তর্গত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতার ও স্বতন্ত্র সত্তার কথা উল্লেখ করেছেন। ফিজিসের মতে, ধর্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিজস্ব সত্তা আছে এবং নিজেদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন তারা নিজেরাই তৈরী করে নেবে।

ফিজিসের ব্যাখ্যা

অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বা সংঘের মত রাষ্ট্রও একটি সংঘ মাত্র। সুতরাং মানুষের কাছ থেকে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যতটুকু আনুগত্য পায় রাষ্ট্র তার চাইতে বেশি আনুগত্য দাবি করতে পারে না। একক ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবন যাপন করতে গিয়ে আজকের দিনের সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। তাই সমস্বার্থসম্পন্ন মানুষের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে সে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সমাজজীবনে এমন অনেক কাজ আছে যা রাষ্ট্রের দ্বারা সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব। সেজন্য নাগরিকের আনুগত্যের সবটুকুই রাষ্ট্র দাবি করতে পারে না। ল্যাস্কি বলেছেন—'মানুষের আনুগত্য বহুমুখী'। যে সংঘগুলি বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করছে সেই সংঘগুলির প্রত্যেকের কাছেই মানুষের আনুগত্য।

অধ্যাপক ল্যাস্কির ব্যাখ্যা

অধ্যাপক ল্যাস্কি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের সর্বাত্মক সার্বভৌম ক্ষমতাকে আক্রমণ করেছেন। কোন রাষ্ট্রই আজ স্বয়ং-সম্পূর্ণ হতে পারে না। এক রাষ্ট্র অনিবার্য কারণে অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক আইনগুলি সার্বভৌম রাষ্ট্রের এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গড়ে-ওঠা সংঘগুলির কার্যাবলীও রাষ্ট্রের সীমারেখা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে

বিভিন্ন সংঘের কার্যাবলী কোন এক বিশেষ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া আজ অসম্ভব এবং নীতিবিরুদ্ধ।

ফরাসী লেখক ডুগুই (*Duguit*) এক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণাকে খণ্ডন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলী থেকেই আইনের উৎপত্তি। মানুষকে সমাজ জীবন যাপন করতে হলে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য কতকগুলি নিয়ম-কানুন মেনে চলা অপরিহার্য। এই নিয়মগুলি সমাজ জীবনের অনিবার্য পরিণতি। এই আইনগুলি সকলকে যেমন মেনে চলতে হয়—রাষ্ট্রকেও তেমনি এই আইন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং রাষ্ট্রকে যেহেতু আইনানুগ হতে হয় সেহেতু রাষ্ট্র এক অপ্রতিহত সর্বময় ক্ষমতা দাবি করতে পারে না।

ডুগুইয়ের ব্যাখ্যা

প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে গিয়ে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত সার্বভৌম ক্ষমতাকে অস্বীকার করলেও সংঘমূলক সমাজ জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ—এ কথা এই মতবাদের প্রায় সকল লেখকই স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ, সিণ্ডিক্যালিজমের (Syndicalism) সঙ্গে বহুত্ববাদের (Pluralism) এইখানেই ইগুরুতর পার্থক্য। কেননা সিণ্ডিক্যালিষ্টরা সম্পূর্ণ স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণকারী অর্থ নৈতিক সংঘগুলির কথা কল্পনা করেছেন।

বহুত্ববাদী ফিজিস বলেছেন, বিভিন্ন সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং তারা যাতে ন্যায় ও আইনের সীমা লঙ্ঘন না করে তার ব্যবস্থা করার জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। আর্নেস্ট বার্কার এই নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্যতার জন্য রাষ্ট্রের বিশেষ গুরুত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কিও রাষ্ট্রের চরম সংরক্ষিত ক্ষমতাকে ('Ultimate reserve power of state') স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, নাগরিক হিসেবে মানুষের স্বার্থকে রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাছাড়া, সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে রাষ্ট্র অন্যান্য সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে—এ কথা ল্যাস্কি সুস্পষ্টভাবে মেনে নিয়েছেন।

বহুত্ববাদীরা সংঘজীবনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতাকে অস্বীকার করেছেন। আজকের সমাজজীবন মূলতঃ সংঘকেন্দ্রিক হলেও রাষ্ট্রের হাতে এক বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না।

বিভিন্ন প্রকার সংঘের সংখ্যাধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তাও অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। তাছাড়া, সংঘগুলির ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে তাদের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন।

বহুত্ববাদের ত্রুটি

সংঘের সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এবং বিভিন্ন সংঘের মধ্যে সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্যই রাষ্ট্রের হাতে এক বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। মালিক সংঘ এবং শ্রমিক সংঘের স্বার্থ বিপরীতমুখী। সমাজজীবনে বিপরীত স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন সংস্থাগুলির সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত না হলে সমাজজীবনে বিশৃঙ্খলা উপাস্থিত হবে। এই বিশৃঙ্খলার হাত থেকে সমাজ জীবনকে রক্ষা করার জন্যই রাষ্ট্র।

বহুত্ববাদীরা অবশ্য নৈরাজ্যবাদীদের মত রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করেন না। তাঁদের আপত্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বিরুদ্ধে। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সার্বভৌম ক্ষমতাই রাষ্ট্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। সার্বভৌম ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের হাত থেকে কেড়ে নেওয়ার ফলে সমাজজীবনে যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেব নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকে না। এরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রের অস্তিত্বেরই কোন যুক্তিসংগত অর্থ থাকে না।

অধ্যাপক ল্যাস্কি *Grammar of Politics* নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ভুলত্রুটি সমন্বিত একদল মানুষের দ্বারা গঠিত সরকার রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে। তাই রাষ্ট্রের তথাকথিত সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে প্রশ্নহীন আনুগত্য তিনি দিতে রাজী নন। তাই তিনি ঘোষণা করেছেন, বিবেকের অনুশাসনের কাছেই তাঁর প্রথম আনুগত্য। এই বাস্তববাদী ল্যাস্কিকেও সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তা হিসেবে রাষ্ট্রের বিশেষ ক্ষমতাকে শেষ পর্যন্ত তাঁর *Foundations of Sovereignty* নামক গ্রন্থে মেনে নিতে হয়েছিল।

বহুত্ববাদীদের এই যুক্তির দুর্বলতা সত্ত্বেও আমাদের একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই মতবাদ সমাজজীবনে এক বিশেষ প্রবণতার দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে সমাজবিজ্ঞানের বিশেষ কল্যাণসাধন করেছে। বিরাট

বহুত্ববাদের গুরুত্ব

ভৌগোলিক সীমা ও বিশাল জনসংখ্যা সমন্বিত রাষ্ট্রে মানুষ এককভাবে নিজেকে নিঃসহায় মনে করে, বহুর মাঝে সে নিজেকে ছড়িয়ে ফেলে। তাই সমস্বার্থসম্পন্ন অন্যের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে সরকারের দরবারে নিজের বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার কাছ থেকে

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আদায় করে নেয়। সংঘমূলক জীবন তাই আজকের দিনে অপরিহার্য।

বহুত্ববাদীরা সংঘজীবনের গুরুত্বের কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সরকারের আইনপ্রণয়ন ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সংঘগুলির সাথে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যেক সরকারের পক্ষে এটি আজ অবশ্য করণীয় কর্তব্য। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিধি বিস্তৃত হওয়ার ফলে আইন সভায় প্রণীত আইনের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। নাগরিক জীবনের প্রায় প্রতিটি দিকই আজ কোন না কোন আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে এবং এর ফলও সুদূরপ্রসারী। তাই, এই আইনগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রণীত হওয়ার পূর্বে সরকারের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং উপদেশ নেওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

১১। সার্বভৌম ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা (Theory of limited sovereignty):

আমরা আগেই দেখেছি যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক, চরম এবং সীমাহীন। আভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক কোন শক্তি দ্বারা সীমিত হলে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা তথা রাষ্ট্রত্ব লোপ পায়।

সার্বভৌম ক্ষমতা তিনটি বিশেষক্ষেত্রে সীমিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে। যথা, (১) **নীতি, ধর্ম ও জনমত,** (২) **সংবিধানিক আইন** এবং (৩) **আন্তর্জাতিক আইন।**

সকল রাষ্ট্রই সাধারণতঃ নীতি ও ধর্মের অনুশাসন মেনে চলে। রাষ্ট্রনীতি ও ধর্মের অনুশাসন ভঙ্গ করলে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিক্ষোভ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করতে পারে। ব্লান্‌সলির মতে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিজের প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। লর্ড ব্রাইস '*American Commonwelth*' নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলেছেন যে, সরকার সকল সময়েই স্বতঃপ্রণোদিত না হলেও জনসাধারণের ভয়, শ্রদ্ধা এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুমোদন দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই, যিনি 'আমিই রাষ্ট্র' বলে দম্ভ প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরও ক্ষমতা ছিল না যে ফ্রান্সের জনসাধরণের উপর প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম চাপিয়ে দেন। তুরস্কের সুলতান, এমনকি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টও জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করতে কদাচ সাহস

সার্বভৌম ক্ষমতা কোন্ দিক থেকে সীমাবদ্ধ

করবে না। জার্মান লেখক শুল্‌জ (*Schulze*) বলেছেন, সার্বভৌম ক্ষমতার উপরেও একটি শাশ্বত নৈতিক আইন আছে।

প্রশ্ন হচ্ছে—নীতি, ধর্ম বা জনমত সত্যই কি সার্বভৌম ক্ষমতাকে সীমিত করে? অধ্যাপক গার্ণার (*Garner*) বলেছেন, "এই সংকোচকারী শক্তিগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, আইনগত ভাবে তারা সার্বভৌম ক্ষমতার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে না।"[1] বস্তুতঃ, আইনের দিক থেকে এগুলির কোন স্বীকৃতি নেই। রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় তাদের মেনে নেয় এবং এই জাতীয় বাধ্যবাধকতা স্বেচ্ছায় স্বীকৃত বাধ্যবাধকতা মাত্র।

সার্বভৌম ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দিক থেকে সীমাবদ্ধ

সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সংকুচিত করে বলে অনেকে মনে করেন। সংবিধান রাষ্ট্রের কাঠামো ঠিক করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ কি ভাবে কাজ করবে তার নির্দেশ বা ছক তৈরী করে দেয়। সংবিধানের সেই ছক অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের কাজ পরিচালিত করতে বাধ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকার কোন সংবিধান বিরোধী কাজ করলে দেশের চূড়ান্ত বিচারালয় সেটিকে সংবিধান বহির্ভূত বলে নাকচ করে দিতে পারেন। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় সাংবিধানিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে সংকুচিত করে। কিন্তু একটু ভেবে বিচার করলে আমরা সেগুলিকে সার্বভৌম ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ বলে গণ্য করতে পারি না। কারণ সাংবিধানিক আইনগুলি রাষ্ট্রেরই সৃষ্টি। তাই এই আইনগুলি যদি তার সার্বভৌম ক্ষমতাকে সংকুচিত করে তবে আমরা তাকে স্বেচ্ছায় আরোপিত বাধানিষেধ বলে অভিহিত করব। অধ্যাপক ডাইসে বলেছেন যে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধ (Self-imposed restrictions)। সুতরাং সাংবিধানিক আইনগুলিকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্বকারী কোন শক্তি বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না।

সাংবিধানিক আইন সার্বভৌমিক ক্ষমতাকে সংকুচিত করে না

আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে খর্ব করে বলে মনে হতে পারে। আন্তর্জাতিক আইন যুদ্ধ ও শান্তির সময় রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ণয় করে। সকল রাষ্ট্রই সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে মেনে নেয়। কোন রাষ্ট্র

1 "An examination of these limitations, however, will show that legally they are not restrictions on sovereignty at all"—*Garner*

আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করলেও সে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করেছে একথা নগ্নভাবে প্রকাশ করে না।

আন্তর্জাতিক আইনের ভুল ব্যাখ্যার কথা বলে সে নিজের কাজকে আন্তর্জাতিক আইনসম্মত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। আন্তর্জাতিক আইনের এই সাধারণ স্বীকৃতির জন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়—এই সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করতে পারি না। কারণ, প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজ নিজ সুবিধার জন্যই আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে মেনে নেয়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তায় কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ একক এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণ অবস্থিতি বজায় রাখা একেবারেই অসম্ভব।

আন্তর্জাতিক আইনকে সমর্থন করার জন্যে রাষ্ট্রের শক্তির মত কোন শক্তি আর নেই। বর্তমানে সম্মিলিত জাতিসংঘের সৈন্যবাহিনী থাকলেও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন রাষ্ট্রকে সে জোর করে তার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া, সম্মিলিত জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রদের সমান সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের পিছনে কোন কার্যকারী শক্তি না থাকার জন্য অনেকে এই আইনকে আইন বলে গণ্য করতে রাজী নন। ওপেনহাম বলেছেন, "আন্তর্জাতিক আইন যে আইনের সীমান্তের খুব কাছাকাছি রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।"[1]

আন্তর্জাতিক আইন সার্বভৌমিক ক্ষমতার পরিপন্থী নয়

যাই হোক, আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলে গণ্য না করলেও এই আইন সকল রাষ্ট্রই স্বেচ্ছায় মেনে নেয়। আন্তর্জাতিক আইনকে প্রয়োগ করার শক্তির অভাবই তার দুর্বলতা। আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠনের দুর্বলতাই বর্তমান পৃথিবীব্যাপী সংকটের অন্যতম কারণ। এই আইন যদি সত্যই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে খর্ব করলে মানবতার দিক থেকে কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে না।

১২। সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি (Location of Sovereignty):

সার্বভৌমিকতার নির্ধারিত ধারণা অনুসারে এর চূড়ান্ত ক্ষমতা নির্দিষ্ট এবং অবিভাজ্য। তাই যদি হয় তবে রাষ্ট্রের মধ্যে কোন এক বিশেষ কেন্দ্রে এই ক্ষমতার অবস্থিতির প্রশ্ন এসে পড়ে। পার্লামেণ্ট পরিচালিত এবং

1. "that they lie on the extreme frontier of law is not to be denied"—*Oppenheim*

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় পার্লামেণ্ট সমগ্র শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। পার্লামেণ্টের তৈরী আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার কোন বিচারালয়ের থাকে না। ইংলণ্ডে রাজাসহ পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। কারণ পার্লামেণ্ট যে আইন তৈরী করে তা চূড়ান্ত এবং তাকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার ইংলণ্ডের কোন বিচার সভার নেই। পার্লামেণ্টের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করার মতো কোন লিখিত সংবিধানও সেখানে নেই। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করলে সাধারণ উপায়ে যে কোন সাংবিধানিক আইন পরিবর্তন করতে পারে। এই সব দিক দিয়ে চিন্তা করে অনেকে রাজাসহ পার্লামেণ্টকে ইংলণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে থাকেন। অবশ্য রাজাসহ পার্লামেণ্টকে ইংলণ্ডের সত্যিকারের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে অনেক তর্কের অবকাশ আছে। অনেকে বলেন ইংলণ্ডের রাজাসহ পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করলেই সবকিছু করতে পারে না। কেননা তাকে জনমতকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হয়। জনমত-বিরোধী কাজ করলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হবে। অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজাসহ পার্লামেণ্টকে আইনগত সার্বভৌমিকতা বলে ধরে নিলেও তার পিছনে একটি রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার অবস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা আবার কোন একটি নির্দিষ্ট জিনিস নয়। জনমত নিয়তই নানা প্রভাবের দ্বারা পরিবর্তিত হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতা, সংবাদ-পত্র, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদি জনমতকে প্রভাবিত করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে এই প্রভাবের দ্বারা জনমত কখনও স্থির থাকে না। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে সার্বভৌমিকতার প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে নির্দিষ্ট এবং অবিভাজ্য বলা যেতে পারে না। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থিতি সম্বন্ধে এইজাতীয় তর্কের মধ্যে লিপ্ত না হয়ে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যে, এই শাসনব্যবস্থায় জাতীয় আইনসভাই আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী।

এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার সার্বভৌমিক ক্ষমতার অবস্থিতির প্রশ্ন

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর সরকার থাকে—একটি কেন্দ্রীয় সরকার এবং কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার। এই দুই শ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের জন্য একটি লিখিত সংবিধান থাকে। এই সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে থাকে। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক সরকার নিজ নিজ ক্ষেত্রে

স্বাধীন। কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না বা আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকার সংবিধান বহির্ভূত কিছু করলে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচালয় তাকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। এইজন্য অনেক সময় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারালয়কে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচারালয়ই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যায় না এই জন্য যে, সংবিধান পরিবর্তনশীল। প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান পরিবর্তনের কতকগুলি বিধান সংবিধানে নির্দিষ্ট থাকে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিচারালয় সংবিধানের ব্যাখ্যা করে শাসনযন্ত্র পরিচালনা সম্বন্ধে শেষ কথা বলার সুযোগ পায় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সার্বভৌমিকতার অবস্থিতির প্রশ্ন

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত হবার আগে অঙ্গরাজ্যগুলি এক প্রকার সন্ধিসমবায় বা Confederation-এ যুক্ত ছিল। এই সন্ধিসমবায়ে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রেখেছিল। কিন্তু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে এই সমস্যা সম্বন্ধে এক বিতর্কের অবকাশ থেকে যায়। ম্যাডিসন (*Madison*), হামিলটন (*Hamilton*) প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, ডি টকভিলে (*De Tocqueville*), হুইটন (*Wheaton*) প্রভৃতি লেখকেরা এবং কুলী (*Cooly*), ষ্টোরী (*Stary*) প্রভৃতি আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার কিছু অংশ আছে জাতীয় সরকারের হাতে এবং কিছু অংশ আছে রাজ্য সরকারগুলির হাতে। সুতরাং সংবিধান যে যে ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দিয়েছে সে সমস্ত ব্যাপারে জাতীয় সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আর যে যে ক্ষমতাগুলি আঞ্চলিক সরকারের উপর ন্যস্ত রয়েছে সেই সমস্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলি সার্বভৌম। অপর পক্ষে কালহন (*Calhon*) প্রভৃতি লেখকেরা এই দ্বৈত সার্বভৌমিকতার ধারণার তীব্র সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণভাবে তার অধিকারী। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার অবস্থিতি সম্বন্ধে দুই বিরুদ্ধবাদীর মত

সদস্য রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমত্বের অধিকারে চরম আঘাত পেয়েছিল ১৮৬১-৬৫ সনের গৃহযুদ্ধে। এই যুদ্ধের ফল স্থির করে দেয় যে, আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যগুলি কেন্দ্র থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বতন্ত্র দাবী করতে পারে না।

দ্বৈত সার্বভৌমিকতার ধারাটির সমর্থকের অভাব নেই। ইংরেজ ঐতিহাসিক ফ্রিম্যান (*Freeman*), ডি. টকভিলে (*De Tocqueville*), ডুগুই (*Duguit*) প্রভৃতি ফরাসী লেখকেরা এবং ব্লানস্‌লি (*Bluntchli*), স্থুল্‌জ (*Schulze*) প্রভৃতি জার্মান লেখকেরা বিভক্ত সার্বভৌমিকতার পক্ষপাতী।

অনেক লেখকের মতে সার্বভৌম ক্ষমতা সম্বন্ধে ভুল ধারণা থেকেই সার্বভৌম ক্ষমতা বিভক্ত—এই ধারণা উদ্ভূত হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা একক এবং অবিভাজ্য। রুশো বলেছেন, ক্ষমতার বিভক্তীকরণ সম্ভব কিন্তু সার্বভৌমিকতার বিভক্তিকরণ আদৌ সম্ভব নয়। সার্বভৌমিকতা সরকারের বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় মাত্র। সরকারের ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশ করা হয় বলে তারা সার্বভৌমিকতার অধিকারী হয় না।

অধ্যাপক উইলোবী (*Willoughby*) তাঁর *The Nature of the State* নামক গ্রন্থে বলেছেন, সার্বভৌমিকতা অবিভাজ্য, সুতরাং, হয় কেন্দ্রীয় সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলি এই ক্ষমতার অধিকারী নয়, অথবা সদস্য রাষ্ট্রগুলি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা নেই। গার্ণারের মতে, এই ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও সদস্য রাষ্ট্রগুলির ঊর্ধ্বে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার সীমা নির্দিষ্ট করে এবং কর্তব্যের পরিধি নির্ণয় করার ক্ষমতা যে শক্তির আছে তাকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলা যেতে পারে। এই দিক থেকে বিচার করলে যে ক্ষমতা সংবিধানকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারে তাকেই সার্বভৌম ক্ষমতা বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এই ক্ষমতার অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়তো সম্ভব নয় কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম ক্ষমতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।[1]

উইলোবীর মত

---

1 "That power and that power alone is sovereign in a federal union which can in the last analysis determine the competence of Central Government and those of the component States, and which can redistribute these powers between them in such a way as to enlarge or curtail the sphere of either That power is not in the Central Government nor in the States, it is over and above both, and wherever it is, there is sovereign"—*Garner*

সংক্ষিপ্তসার

সার্বভৌমিকতা :

সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতা চিরস্থায়ী, অবিভাজ্য, হস্তান্তর যোগ্যতার অভাবসম্পন্ন এবং সার্বজনীন।

সার্বভৌমিকতা বিভিন্ন দিক থেকে আলোচিত হয়েছে, যথা—(১) নামসর্বস্ব ও প্রকৃত সার্বভৌমিকতা (২) আইনসংগত সার্বভৌমিকতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা, (৩) আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা এবং বাস্তব সার্বভৌমিকতা।

আইনসংগত সার্বভৌমিকতা বলতে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন সেই ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়—যার চূড়ান্তভাবে আইন তৈয়ারী করার ক্ষমতা আইনগতভাবে স্বীকৃত। রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা বলতে আইনগত সার্বভৌমিকতার পিছনে শক্তিসমষ্টিকে বুঝায়। আইনগত সার্বভৌমিকতা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট, রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। আইনগত সার্বভৌমিকতা রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

আইনানুমোদিত সার্বভৌমিকতা আইনের দ্বারা স্বীকৃত এবং জনসাধারণের কাছ থেকে বৈধ আনুগত্যের অধিকারী, বাস্তব সার্বভৌমিকতা বৈধ আনুগত্যের অধিকারী না হলেও, আসলে তার ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে সমর্থ হয়। বাস্তব সার্বভৌমিকতা কালক্রমে আইনগত সার্বভৌমিকতায় পর্যবসিত হয়।

জনগণের সার্বভৌমিকতা :

রুশো জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণার প্রচারক। এই মতবাদ অনুসারে জনসাধারণই সার্বভৌমিকতার অধিকারী। এই ধারণার বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে, অসংবদ্ধ জনসাধারণ সার্বভৌমিক ক্ষমতা পরিচালিত করতে সক্ষম নয়। জনসাধারণের ইচ্ছা বিধিনির্দিষ্ট উপায়ে রূপ পরিগ্রহ না করলে বিচারালয় তাকে স্বীকার করে না। জনগণের সার্বভৌমিকতার ধারণা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

অস্টিনের মতে সার্বভৌমিকতা :

অস্টিন সার্বভৌমিকতাকে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এক নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে বুঝিয়েছেন। এই ক্ষমতার আদেশই হল আইন। অস্টিন রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতাকে উপেক্ষা করে আইনগত সার্বভৌমিকতাকে বেশী জোর দিয়েছেন। ঐতিহাসিক মতবাদীদের মতে অস্টিন প্রথাগত আইনকে উপেক্ষা করেছেন। আইন হল সামাজিক বিবর্তনের পরিণতি।

বহুত্ববাদ :

এই মতবাদ অনুসারে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনকে পরিতৃপ্ত করার জন্য মানুষ নানাপ্রকার সংঘ বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। এই সংঘগুলি সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। রাষ্ট্র সমাজ-জীবনের প্রধান নিয়ন্ত্রণকারী হলেও তাকে এই চূড়ান্ত ক্ষমতায় অভিসিক্ত করা যেতে পারে না। সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করার নৈতিক অধিকার নেই। আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বহুত্ববাদীরা অস্টিনের সার্বভৌমিকতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করেছেন।

সার্বভৌমিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা :

সাংবিধানিক আইন ও আন্তর্জাতিক আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে সংকুচিত করে। সাংবিধানিক আইন যেহেতু রাষ্ট্রেরই সৃষ্ট, তজ্জন্য তাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা সংকোচনকারী বলা

যেতে পারে না। নিজের ক্ষমতাকে নিজে সংকুচিত করলে তাকে প্রকৃতপক্ষে বিধিনিষেধ বলা চলে না।

আন্তর্জাতিক আইন দুর্বল আইন। তাকে সম্পূর্ণ আইন বলতে অনেকে অস্বীকার করেছেন। আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্র নিজের সুবিধার জন্য মান্য করে।

Exercise

1. What are the characteristic of Sovereignty? When speak of 'limited sovereignty', do we understand physical or legal limitation? *(C. U. Hon. 1928)*

2. Differentiate between (i) Legal and Political Sovereignty, (ii) De Facto and De Jure Sovereignty *(C. U 1951)*

3. How is Legal Sovereignty usually distinguished from Political Sovereignty? Illustrate your answer *(C. U 1958)*

4. Explain clearly the doctrine of Popular Sovereignty. What are its limitations? *(C. U. 1949)*

5. What do you understand by Sovereignty? Discuss the Pluralistic criticism of the classical theory of Sovereignty. *(C. U 1954)*

6. State and examine the Austinian Theory of Sovereignty. *(C. U. 1945)*

7. "The State is limited within, it is also limited without". —Examine the statement. Discuss in this connection the the essential attributes of sovereignty *(C. U. 1957)*

পঞ্চম অধ্যায়

রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ

(Theories of the Nature of the State)

আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদগুলি আলোচনা করেছি। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদগুলির সম্পর্কেও আমাদের কিছু জানা দরকার।

এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাষ্ট্রের একটি সামগ্রিক সত্তা আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সামগ্রিক সত্তার স্বরূপটি কিরূপ? আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করেছেন। অপর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, মার্কসবাদ প্রভৃতি মতবাদগুলি রাষ্ট্রকে মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করতে পারে নি। এই বিরুদ্ধ মতবাদীদের যুক্তিতর্কের মধ্যে যতই আমরা প্রবেশ করতে চেষ্টা করি, রাষ্ট্র ততই আমাদের কাছে এক রহস্যময় প্রতিষ্ঠান বলে প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই বিভিন্ন মতবাদীদের মতাদর্শের আলোচনার সাহায্যে আমরা তার প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা পোষণ করতে চেষ্টা করব। এবারে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি মতবাদের আলোচনা করা যাক :-

১। জৈব মতবাদ (Organic or Organismic Theory):

রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে। এই তুলনা স্পষ্টতঃই উদ্দেশ্যমূলক। জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে এই মতবাদীরা রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁদের বিশেষ ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে চান। রাষ্ট্রকে একটি প্রাণহীন জড় পদার্থ বা কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান বলে ধরে নিলে রাষ্ট্রকে মানুষের প্রয়োজনে যন্ত্রবৎ ব্যবহারের প্রশ্ন ওঠে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকেরা রাষ্ট্রকে চুক্তির ফল বলে বর্ণনা করেছেন। এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করার অর্থ যে, রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্ট—অতএব মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রকে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু অন্য জীবদেহের মত রাষ্ট্রকে একটি সজীব প্রাণী বলে মনে করলে জৈব সত্তা হিসেবে তার স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে স্বীকার করে নিতে হয়। এই মতবাদীরা রাষ্ট্রকে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি হিসেবে দেখতে রাজী নন। রাষ্ট্রের জনসাধারণের পৃথক সত্তা

জৈব মতবাদ উদ্দেশ্যমূলক

রাষ্ট্রের সঙ্গে বিলীন হয়ে যায় এবং এক স্বতন্ত্র সামগ্রিক সত্তার সৃষ্টি হয়। মানুষ এই সামগ্রিক সত্তার অংশমাত্র। রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে তার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকতে পারে না। স্পষ্টতঃই এই মতবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী।

এই মতবাদের আর একটি উদ্দেশ্য মানুষের উপর মানুষের এবং রাষ্ট্রের উপর মানুষের নির্ভরশীলতাকে প্রতিপন্ন করা। তুলনার সাহায্যে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, জীবদেহের কোষগুলির যেমন অন্য কোষকে বা জীবদেহকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তেমনি মানুষের পক্ষে অপর মানুষকে বাদ দিয়ে বা রাষ্ট্রকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব। রাষ্ট্রের উপর পূর্ণ নির্ভরশীলতার কথা উল্লেখ করে এই মতবাদ রাষ্ট্রের আদর্শবাদকে (Idealistic concept of State) একদিকে যেমন সমর্থন করেছে, মানুষের সঙ্গে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে এই মতবাদ তেমনি সমাজতন্ত্রবাদকেও সমর্থন জানিয়েছে। জৈব মতবাদের এই উদ্দেশ্যগুলি আলোচনার পর আমাদের জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের তুলনামূলক দিকটি আলোচনা করা দরকার।

জৈব মতবাদের লেখকেরা জীবদেহের সাথে সমাজদেহের তুলনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত সাদৃশ্যগুলির উল্লেখ করে থাকেন।

জীবদেহ ও সমাজদেহের তুলনা

জীবদেহ এবং সমাজদেহের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। উনবিংশ শতকের বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার দেখিয়েছেন যে, জীবদেহ ও সমাজদেহ উভয়েরই জন্ম অবস্থায় অত্যন্ত সরল, কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা জটিল আকার ধারণ করতে শুরু করে।

জীবদেহে যেমন কতকগুলি কোষ থাকে এবং প্রত্যেক কোষগুলি যেমন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিরাও তেমন পরস্পরের উপর এবং সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। জীবদেহের মধ্যে তিনটি ব্যবস্থা থাকে, যথা—(১) **সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা** (Sustaining System), (২) **সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থা** (Distributory System) এবং (৩) **নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা** (Regulatory System)। সমাজদেহের মধ্যেও অনুরূপ তিনটি ব্যবস্থা আছে। খাদ্যনালী, পাকস্থলী প্রভৃতি জীবদেহের সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা, আর রাষ্ট্রের সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা হচ্ছে তার কৃষি ও শিল্পজ সম্পদ। শিরা, উপশিরা প্রভৃতি জীবদেহের সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থা

আর রেলপথ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি রাষ্ট্রের সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থা। মস্তিষ্ক (brain) জীবদেহের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা, আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা সরকার। বিষয়টি ভালভাবে বুঝবার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ছকের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে :

অঙ্গসমষ্টি (The parts)	জীবদেহ (Animal organism)	সমাজদেহ (Social organism)
সংরক্ষণকারী ব্যবস্থা (Sustaining system)	খাদ্য নালী (মুখ, পাকস্থলী ইত্যাদি)	কৃষি ও শিল্পজ সম্পদ
সংযোগসাধনকারী ব্যবস্থা (Distributory system)	হৃদতন্ত্র, শিরা, উপশিরা প্রভৃতি রক্ত চলাচলকারী অঙ্গ	রেলপথ, ক্যানেল, ডাক, তার প্রভৃতি পরিবহন পদ্ধতি
নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা (Regulatory system)	মস্তিষ্ক, স্নায়ু ইত্যাদি	সরকার

জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের এই তুলনাকে এক চূড়ান্ত এবং অদ্ভুত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন জার্মান দার্শনিক ব্লানস্‌লি (*Bluntchli*)। তিনি তুলনার সাহায্যে রাষ্ট্রকে জীবদেহের মত বলে প্রতিপন্ন না করে রাষ্ট্রকে স্বয়ং একটি জীবন্ত প্রাণী বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রকে পুরুষ প্রকৃতি এবং চার্চকে নারী প্রকৃতি বলে প্রতিপন্ন করেন।

ব্লানস্‌লির তুলনা

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, জৈব মতবাদ রাষ্ট্রের আদর্শবাদ এবং সমাজতন্ত্রবাদের পরোক্ষ সমর্থক। এই প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হার্বার্ট স্পেনসার (*Harbert Spencer*), যিনি জৈব মতবাদের একজন প্রধান প্রচারক—তিনি আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। বস্তুতঃ, হার্বার্ট স্পেনসারের জৈব মতবাদ এবং তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ পরস্পর বিপরীতমুখী আদর্শ—একটির সঙ্গে অপরটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই জন্য অধ্যাপক আর্নেষ্ট বার্কার (*Ernest Barker*) হার্বার্ট স্পেনসারের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "যে প্রধান ভুল তিনি কখনো অতিক্রম করতে পারেননি সেটি হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্বন্ধে কতকগুলি পূর্ব ধারণা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে

হার্বার্ট স্পেনসারের জৈব মতবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বিপরীতমুখী

তিনি যে জৈব মতবাদ বা বিবর্তনবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তার সাথে কোন মতে খাপ খায় না বা খাপ খেতে পারে না।"[1]

হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর এই দুই মতবাদের বৈপরীত্য সম্বন্ধে সজাগ হওয়ার জন্যই বোধ হয় জীবদেহ ও সমাজদেহের মধ্যে কয়েকটি বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেই যথার্থ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেছেন যে, জীবদেহের কোষগুলি জীবদেহের মধ্যে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত (concrete), কিন্তু রাষ্ট্রের কোষগুলি ছড়িয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত (discrete) নয়। তাছাড়া, রাষ্ট্রের চেতনা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। প্রতিটি মানুষের চেতনাই রাষ্ট্রের চেতনা। এইভাবে হার্বার্ট স্পেনসার রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের নির্ভরশীলতার পরিবর্তে ব্যক্তির পৃথক সত্তা ও স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেন।

হার্বার্ট স্পেনসার জীবদেহ ও সমাজদেহের বৈশাদৃশ্যের উল্লেখ করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্রব্যবস্থা সমর্থন করেন

জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের এই বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করে হার্বার্ট স্পেনসার তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করলেও জৈব মতবাদের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মৌলিক পার্থক্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। অধ্যাপক বার্কার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "হার্বার্ট স্পেনসারের দর্শন স্বাভাবিক অধিকার এবং জৈবিক তুলনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা।"[2]

জৈবিক মতবাদের মধ্যে জীবদেহ ও সমাজদেহের যে তুলনা করা হয়েছে তা উদ্দেশ্য প্রসূত হলেও, সে উদ্দেশ্যের যথার্থ স্বরূপটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত। ব্লানস্‌লি রাষ্ট্রকে একটি জীবন্ত সত্তা বলে অভিহিত করেছেন। এই ধারণা থেকে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত এবং অপ্রতিহত কর্তৃত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। সেদিক থেকে বিচার করলে জৈব মতবাদ ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণকারী এক বিপজ্জনক মতবাদে পরিণত হওয়াই

জৈব মতবাদের পরিণতি

1. "The fundamental confusion which he never surmounts is due to the fact that the *a priori* conceptions of individual rights with which he starts do not and can not accord with the organic and evolutionary conception of the State which he attains through the use of natural science."
—*Barker*

2. "His philosophy consequently begins and ends as 'an incongruos mixture of Natural Rights and physiological metaphor' "—*Barker.*

স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 'রুশো এবং হেগেল প্রভৃতি আদর্শবাদী চিন্তানায়কেরাও তাঁদের আদর্শবাদী রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে কখনও কখনও রাষ্ট্রের এই জৈব সত্তার দিকটি উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের উপর জৈব সত্তা পরিপূর্ণভাবে আরোপ করলে তার পরিণতি রাষ্ট্রের আদর্শবাদে। তাছাড়া, বর্তমানযুগের নাজীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাসী নিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিকে আবিষ্কার করা যাবে জৈব মতবাদের মধ্যে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে ইটালীর স্বেচ্ছাচারী শাসক মুসোলিনী প্রায়ই রাষ্ট্র হিসেবে ইটালীর উপর একটি জৈবিক সত্তা আরোপ করতেন।

জৈব মতবাদ জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের তুলনা করে ব্যক্তির উপর ব্যক্তির এবং সমাজের উপর ব্যক্তির নির্ভরশীলতার দিকটি প্রতিষ্ঠিত করে সামাজিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছে। এইদিক থেকে বিচার করলে জৈব মতবাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে না।

জৈব মতবাদের গুরুত্ব

একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ মাত্রেই অনিবার্যভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল। শুধুমাত্র নিজের স্বাধীনতা এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে চাইলে মানুষের পক্ষে সমাজ জীবন নির্বাহ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রচেষ্টা মানুষের বৃহত্তর নৈতিকজীবনের পরিপন্থী তো বটেই।

অধ্যাপক গার্ণার যথার্থ বলেছেন--"যদি জৈব মতবাদ এই প্রতিপন্ন করতে চায় যে, রাষ্ট্র কতকগুলি যোগসূত্রবিহীন মানুষের কৃত্রিম সমষ্টিমাত্র নয়, অর্থাৎ এটি এমন একটি সমাজ যার মধ্যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে এক বিশেষ অর্থে সমাজের উপর নির্ভরশীল, তাহলে এর বিরুদ্ধে কোন জোড়ালো যুক্তি টিঁকে থাকতে পারে না।"[1]

গার্ণারের অভিমত

1. "If the Organismic Theory meant simply that the State is something more than an aggregation of individuals crowded or massed together without unifying bond, in otherwords, that it is a society in which the members individually are in a peculiar sense dependent upon the whole and the whole in turn is conditioned upon the parts,—no well grounded objection to it could be raised."—*Garner.*

২। আইনমূলক মতবাদ (Juristic or Juridical Theory):

আমরা আগেই দেখেছি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃত উদ্দেশ্য বিচার করবার জন্য দার্শনিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানমূলক, আইনমূলক ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ঐ পদ্ধতিগুলি এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের জন্ম, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রের পরিধি, লক্ষ্য ইত্যাদি আলোচনা করে।

আইনমূলক মতবাদের প্রধান চিন্তানায়কগণ

ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*), জেলিনেক (*Jellinek*), গিয়ার্কে (*Gierke*) প্রভৃতি জার্মান আইনবিদেরা এবং ফরাসী লেখক দুগুই (*Duguit*), ইংরেজ আইনবিদ্ অস্টিন, (*Austin*), মেটল্যাণ্ড (*Maitlaad*) প্রভৃতি আইনবিদেরা এই মতবাদ প্রচার করেন। অবশ্য আইনমূলক মতবাদের বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এঁরা সকলে একমতাবলম্বী নন।

আইনমূলক মতবাদের মূল কথা

আইনমূলক মতবাদীদের মতে রাষ্ট্র আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কাজ আইন সৃষ্টি করা এবং সেগুলিকে চালু করা। সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অন্যান্য দিকগুলি অস্বীকার করে তাঁরা রাষ্ট্রকে একটি আইনমূলক প্রতিষ্ঠান বলে মনে করেন। অধ্যাপক জেলিনেকের মতে, এই মতবাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক আইনের নীতিগুলি নির্দেশ করে সেখান থেকে তার স্বাভাবিক সিদ্ধান্তগুলি প্রতিপন্ন করা।

ঐতিহাসিক মতবাদী ও বিশ্লেষণপন্থী লেখকদের দৃষ্টিতে আইন

আইনমূলক মতবাদের লেখকেরা এই মতবাদের বিচার ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে একমতাবলম্বী নন। অস্টিন (*Austin*) প্রমুখ বিশ্লেষণপন্থী চিন্তানায়কেরা (Analytical school of jursists) আইনকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ বলে বর্ণনা করেছেন। ঐতিহাসিক মতবাদীরা আইনকে ইতিহাসের বিবর্তনের পরিণতি বলে মনে করেন। কোন এক রাষ্ট্রের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন হয় আইনে। সুতরাং আইনকে রাষ্ট্রের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত কতকগুলি নিয়মের সমষ্টি বললে আইনের যথার্থ স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয় না। রাষ্ট্রের মধ্যে প্রথাগত আইনগুলি কোন রাষ্ট্রীয় শক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার না করলেও সেগুলি আইন বলে সকল রষ্ট্রেই স্বীকৃত হয়। এই মতবাদের অনেক লেখক রাষ্ট্রের উপর আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেমন কতকগুলি আইনসংগত

অধিকার ও কর্তব্যের অধিকারী, রাষ্ট্রও তেমনি কতকগুলি আইনসংগত অধিকার ও কর্তব্যের অধিকারী। মধ্যযুগের লেখকেরা চার্চ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির উপর কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। কিন্তু রাষ্ট্রের উপর কোন ব্যক্তিত্ব তাঁরা আরোপ করেননি। অর্থাৎ তাঁদের মতে আইনগত ব্যক্তিত্ব শাসনতান্ত্রিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু নয়। উনবিংশ শতকের ট্রিটস্‌কে (*Treitschke*), ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*), জেলিনেক (*Jellinek*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনগত ব্যক্তিত্ব শাসনতান্ত্রিক আইনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু হিসেবে আলোচনা করেছেন এবং রাষ্ট্রের উপরও এই ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন।

ব্লানস্‌লির মত

ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*) রাষ্ট্রকে একটি যথার্থ ব্যক্তি (State per excellence) হিসেবে কল্পনা করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের নিজস্ব একটি ইচ্ছা আছে যা রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তিদের ইচ্ছার সমষ্টি মাত্র নয়। এই ইচ্ছাকে সে কথা এবং কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে পারে। রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র একটি কাল্পনিক আইনগত সত্তা নয়, এটি এক আসল প্রাণময় সত্তা।

দুগুই ও লে ফার মত

দুগুই (*Duguit*), লে ফার (*Le Fur*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। দুগুই রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্বের ধারণা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত এবং মূল্যহীন বলে ঘোষণা করেছেন। দুগুই আইনকে রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের আগে আইনের অস্তিত্ব ছিল। আইন রাষ্ট্রের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই আইনের নির্দেশকে অমান্য করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই।

আইনমূলক মতবাদের

রাষ্ট্রের উপর ব্যক্তিত্বের আরোপ সম্বন্ধে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাষ্ট্রের উপর এক কাল্পনিক ব্যক্তিত্ব আরোপ করার মধ্যে আপত্তিজনক কিছু থাকা উচিত নয়, কিন্তু রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসাধারণের ব্যক্তিত্বের ঊর্ধ্বে রাষ্ট্রের একটি স্বতন্ত্র আসল ব্যক্তিত্ব আছে বলে কল্পনা করলে তার থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী অনেক বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হতে পারে।

৩। রাষ্ট্র সম্বন্ধে আদর্শবাদীদের মতবাদ (Idealistic concept of State):

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও আরিস্টটলের রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় মতবাদ আদর্শবাদের মূল ভিত্তি। গ্রীক দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতেন। তাঁদের

মতে মানুষ তার ব্যক্তি-জীবনের চরম আদর্শকে স্বার্থক করে তুলতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যেই। প্লেটো তাঁর *Republic*-এ বলেছেন, ন্যায়পরায়ণতা (justice) বলতে মানুষের যথানির্দিষ্ট স্থানে কর্তব্য পালন করাকেই বোঝায়। justice সম্বন্ধে তাঁর এই ধারণা বর্তমান আদর্শবাদের সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

রাষ্ট্রের আদর্শবাদ জার্মান দার্শনিকদের লেখায় এক নূতন রূপ ধারণ করে। তাঁরা রাষ্ট্রকে মানুষের নাগালের বাইরে এক চরম গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে রাষ্ট্রের ব্যক্তিসমষ্টির সত্তা থেকে পৃথক একটি নিজস্ব নৈতিক সত্তা আছে। তিনি রাষ্ট্রকে "আত্মসচেতন নৈতিক বস্তু এবং নিজের সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন এবং নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ব্যক্তি বলে আখ্যা দিয়েছেন" ("a self-conscious ethical substance and a self-knowing and self-actualising individual")।

হেগেলের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

হেগেলের মতে রাষ্ট্র কখনই চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট একটি কৃত্রিম প্রতিষ্ঠান হতে পারে না। তাঁর মতে রাষ্ট্রের একটি জৈব সত্তা আছে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তির সত্তা ছাড়াও রাষ্ট্রের একটি পৃথক ইচ্ছা আছে যাকে সাধারণ ইচ্ছা (General will) বলা যেতে পারে। এই সাধারণ ইচ্ছা রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র নয়। সকল ইচ্ছার উর্ধ্বে এক পৃথক ইচ্ছা এই সাধারণ ইচ্ছা। রাষ্ট্রের কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে এই ইচ্ছার প্রকাশ হয়। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রকে কোন লক্ষ্যে পৌঁছাবার যন্ত্র বলে মনে করা যেতে পারে না। রাষ্ট্র স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিজেই নিজের চরম লক্ষ্য। ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য ও স্বার্থকতার চরম পরিণতি রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের জন্যই মানুষ, মানুষের রাষ্ট্রের বাইরে কোন অস্তিত্ব নেই। সুতরাং এই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না।

মানুষ যখন মনে করে যে রাষ্ট্রের নির্দেশ তার ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরুদ্ধে, তখন সে তার যথার্থ বিচার শক্তিকে হারিয়ে ফেলে। বাহ্যত সে যাকে তার ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে মনে করছে সেটি তার যথার্থ স্বাধীনতা নয়। মানুষ তার যথার্থ স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করে রাষ্ট্রের মধ্যে। রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের যথার্থ বিচারশক্তি রূপ পরিগ্রহ করে। হেগেল রাষ্ট্রকে 'সর্বদোষমুক্ত বুদ্ধিময়তা' ('Perfected rationality') এবং 'চেতনার বস্তুগত রূপ বা নৈতিক শক্তি' ('objective reason or spirit') বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি

বলেছেন, রাষ্ট্রের মধ্যে মানুষ তার বাহ্যিক সত্তাকে তার আত্মিক সত্তার পর্যায়ে উন্নীত করে থাকে। মানুষের বৃহত্তর স্বাধীনতার উপলব্ধি এবং তার বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করা রাষ্ট্রের মধ্যেই সম্ভব। এক কথায়, রাষ্ট্রই মানুষের সম্পূর্ণ এবং পরিণত সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা (General will) থেকে অনুসৃত এবং যেহেতু সাধারণ ইচ্ছা মানুষের শ্রেষ্ঠতম যথার্থ ইচ্ছার সমন্বয় সেহেতু রাষ্ট্র কখনও ভুল করতে পারে না। সুতরাং মানুষের উচিত সর্বাবস্থায় আইন-কানুন এবং নির্দেশগুলিকে মেনে চলা। রাষ্ট্রের অধিকার এবং ব্যক্তির তথাকথিত অধিকারগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে, ব্যক্তির এই তথাকথিত অধিকারকে অগ্রাহ্য করে রাষ্ট্র তার নিজস্ব অধিকারকে বলবৎ করতে পারে।

হেগেল রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক সত্তাসম্পন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান বলেই ক্ষান্ত হননি, তিনি রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন ('State is the march of God on earth')। তিনি রাষ্ট্রকে স্বীয় মহিমায় মহিমান্বিত এবং চরম গৌরবোজ্জ্বল সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা এবং অধিকারকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন।

নিটসে, ট্রিটসকে ও বার্ন হার্ডির দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

হেগেলের স্বয়ংসম্পূর্ণ, ভ্রান্তিমুক্ত (infallible), ভগবান রাষ্ট্রের (God-state) পরিণতি পরবর্তীকালে নিট্‌সে (*Nietzche*), ট্রিটস্‌কে (*Treitschke*) এবং বার্ন হার্ডি (*Bernhardi*) প্রভৃতি লেখকদের যুদ্ধবাদে দেখা যায়। ট্রিটস্‌কে (*Treitschke*) হেগেলকে 'জার্মান রাষ্ট্রনৈতিক দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম যথার্থ রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তবীর" বলে আখ্যা দিয়েছেন। ট্রিটস্‌কের মতে রাষ্ট্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে শক্তিশালী করা। ট্রিট্‌স্‌কে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে তীব্রভাবে ঘৃণা করিতেন এবং সভ্যতার অগ্রগতির জন্য উচ্চতর সভ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলির যুদ্ধের দ্বারা নিম্নতর সভ্যতাসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলি জয় করার কথা প্রচার করেন।

রুশোর অভিমত

ফরাসী দার্শনিক রুশোর নাম সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শের সাথে অধিকতর জড়িত থাকলেও তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ কার্যতঃ আদর্শবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁর সাধারণ ইচ্ছার (General will) ধারণা রাষ্ট্রকে এক চরম কর্তৃত্বসম্পন্ন নৈতিক সত্তায় পর্যবসিত করেছে।

ইংলণ্ডের আদর্শবাদীদের মধ্যে ব্রাডলে (*Bradley*), গ্রীন (*T. H Green*), বোসাঙ্কেটের (*Bosanquet*) নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রাডলে *Ethical Studies* নামক পুস্তকে যে রাষ্ট্রনৈতিক ধারণা প্রকাশ করেছেন তো প্লেটোর *Republic*-এর বিচারবোধ ('justic') এবং হেগেলের সামাজিক ন্যায়বোধের ('Social Righteousness') সমন্বয় মাত্র।

গ্রীন, ব্রাডলে ও বোসাঙ্কেটের মত

ব্রাডলে রাষ্ট্রকে একটি নৈতিক জীবনসত্তা হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, সমাজের জন্যই মানুষের ব্যক্তিগত সার্থকতা এবং আমরা যাকে সমাজ বলি তা নামসর্বস্ব একটি ধারণামাত্র নয়—তার একটি আসল সত্তা আছে। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই তার যাথার্থ নির্ধারিত হয়। জন্মের সময় থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি স্তর সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়। সামাজিক সম্পর্কই মানুষের যথার্থ স্থান নির্ণয় করে দেয়। মানুষ তার যথাকর্তব্য পালন করে তার নৈতিক সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

গ্রীন (*T H Green*) আদর্শবাদী হলেও হেগেলের মত ব্যক্তি সত্তাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে রাজী নন। বস্তুতঃ, গ্রীন তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাখ্যায় হেগেল অপেক্ষা কাণ্টের অধিক অনুগামী। তিনি ব্যক্তির মৌলিক অধিকারগুলির উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে সীমাবদ্ধ। গ্রীন ব্যক্তি-অধিকারের স্বীকৃতির প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন।

ব্যক্তিকে নিয়েই জাতির জীবন, সুতরাং ব্যক্তি-জীবনকে বাদ দিয়ে জাতির জীবনের কোন আসল অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ব্যক্তি অধিকারের উৎস এবং স্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্ব এবং নৈতিক মূল্যকে স্বীকার করেই তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আদর্শবাদী ও হেগেলপন্থী।

বোসাঙ্কেট রাষ্ট্রের স্বরূপ বিশ্লেষণে হেগেল অপেক্ষা রুশোর অধিকতর অনুগামী। তিনি তাঁর *Philosophical Theory of the State* নামক গ্রন্থে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা এবং রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছার (General will) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে রাষ্ট্রের আদর্শবাদকেই সমর্থন জানিয়েছেন। তবে রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি হেগেলের মত ব্যক্তির স্বাধীনতাকে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিতে চাননি। দায়িত্বসম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তিসত্তার উপর তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায়গুলি দূরীভূত করে তার বিকাশের জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের কাজ।

রাষ্ট্রের দার্শনিক মতবাদ রাষ্ট্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বাস্তববাদীদের (Realistic School) দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। এই মতবাদীদের মধ্যে ডুগুইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাষ্ট্রের উপর একটি পৃথক ব্যক্তিসত্তা আরোপ করে তাকে চরম দৈব শক্তিতে অভিষিক্ত করার প্রচেষ্টাকে তাঁরা তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন। রাষ্ট্রকে এইভাবে চরম ও অপ্রতিহত ক্ষমতায় অভিষিক্ত করলে সাম্য, স্বাধীনতা, অধিকার এবং স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ মূল্যহীন হয়ে পড়ে।

আদর্শবাদ সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী

আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে প্রকৃত ইচ্ছার সমন্বয় বলে প্রচার করেছেন। ব্যক্তি-ইচ্ছা এই প্রকৃত ইচ্ছার বিরোধী হলে মানুষ তার অপ্রকৃত ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় বলে আদর্শবাদীরা প্রতিপন্ন করেন। এর অর্থ, রাষ্ট্রের নির্দেশ অর্থাৎ আইন সকল সময়েই নির্ভুল এবং এই নির্ভুল সিদ্ধান্তের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে একীভূত করার মধ্যেই প্রকৃত স্বাধীনতা। কেননা, আদর্শবাদীরা আইন ও স্বাধীনতাকে অভিন্ন জ্ঞান করতেন।

আদর্শবাদীরা আইন ও স্বাধীনতাকে অভিন্ন জ্ঞান করতেন

অধ্যাপক ল্যাস্কি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করে আমাদেরই মত ভুলত্রুটি সমন্বিত সাধারণ মানুষ। সুতরাং সর্বাবস্থায় সেগুলি অবনত মস্তকে গ্রহণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত হতে পারে না।

আদর্শবাদীরা রাষ্ট্র ও সমাজকে অভিন্ন বলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই ধারণা ভুল। রাষ্ট্র ও সমাজ এক নয়। সমাজের মধ্যে রাষ্ট্র একটি সংগঠন মাত্র। সামাজিক জীবন বলতে কেবলমাত্র মানুষের রাষ্ট্র-নৈতিক জীবনকে বোঝায় না। সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপক। পরিবার, ধর্মীয় সংগঠন, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি নিয়ে মানুষের সমাজিক জীবন। এই জীবন মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক জীবন অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত। আজকের দিনে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সমাজনৈতিক ইত্যাদি বহুমুখী প্রয়োজনের তাডনায় মানুষ সংঘ বা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে। মানুষের সমাজ জীবনে এই সংঘগুলির গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে।

আদর্শবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে অভিন্ন জ্ঞান করতেন

মানুষের এই বিভিন্নমুখী সংগঠনগুলির প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করলে মানুষের কর্তব্যের পরিধি শেষ হয় না।

আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের কর্তব্য চরম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে প্রচার করে শুধুমাত্র বাস্তব জীবনের এই বিশেষ দিকটিকেই অস্বীকার করেন নি, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার কথাও অস্বীকার করেছেন।

৪। মার্কসবাদ (Marxist Theory) :

কার্ল মার্কস (Karl Marx—1818-83) এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের স্বরূপ, প্রকৃতি ও পরিণতি আলোচনা করেছেন। রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর এই মতবাদ এক বিচ্ছিন্ন ধারণা মাত্র নয়। মার্কস রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিবর্তনের ধারা, বর্তমান স্বরূপ, সমাজের বর্তমান আদর্শ-ধ্যান-ধারণা এবং সর্বোপরি তার অনিবার্য পরিণতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে তাকে সুসংবদ্ধ 'বৈজ্ঞানিক' মতবাদে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

[মার্কস্ জার্মানীর সন্তান এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীকালে জার্মানীর সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। ধারণাসর্বস্ব রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ দিয়ে সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যাধির নিরসণ হয় না—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সমাজের বর্তমান অবস্থার বস্তুগত রূপটিকে বিশ্লেষণ করে তার ভিত্তিতে তিনি সামাজিক ব্যাধির কেবল কারণ নির্ণয় করেই ক্ষান্ত হননি। কোন নির্ধারিত পন্থা অবলম্বনে এই দুরাবস্থার নিরসন হতে পারে সে সম্বন্ধেও তিনি সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন। ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি তদানীন্তন বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারী-নীতির তীব্র সমালোচনা করার জন্য সেই সব রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত হয়ে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবনের অবশিষ্ট চৌত্রিশ বৎসর কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে লণ্ডন শহরে নীরবে অধ্যয়ন ও গবেষণায় রত থেকে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের বুনিয়াদ রচনা করেন।

মার্কসের সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের পরিস্ফুটন ও প্রচারের ক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন তাঁর বন্ধু ফ্রেডারিক এংগেলস্ (Frederick Engels—1820-1865)। মার্কস্ এবং এংগেলস্ একত্রযোগে ১৮৪৮ সালে বিখ্যাত কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো (*Communist Manifesto*) প্রকাশ করেন। এই বিখ্যাত পুস্তকের বিষয়বস্তুগুলি আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয় মার্কস লিখিত তাঁর বিখ্যাত পুস্তক *Das Capital* গ্রন্থে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মার্কসের জীবদ্দশায় এই পুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়।]

মার্কসের রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদকে জানতে হলে তাঁর মতবাদের কয়েকটি মূল সূত্র প্রথমে আলোচনা করা দরকার, যথা—

মার্কসবাদের চারটি মূলতত্ত্ব

(ক) **ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা** (Materialistic interpretation of history), (খ) **শ্রেণী সংগ্রাম** (Class struggle), (গ) **বর্ধিত মূল্যের মতবাদ** (Theory of surplus value) এবং (ঘ) **সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব** (Dictatorship of the proletariat)।

(ক) **ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (Materialistic interpretation of history):** মার্কসের মতে বাস্তব জীবনের ধনোৎপাদনের রীতিই সমাজ ব্যবস্থার নিয়ামক। কোন এক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত আদর্শ, ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি সবকিছুই নির্ভর করে সেই সমাজের ধন উৎপাদনের রীতির উপর। অর্থাৎ সমাজের রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক জীবনের প্রতিটি দিক সেখানকার অর্থনৈতিক আবস্থার প্রতিচ্ছবি মাত্র। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তনের কারণ। ইতিহাসে দাস যুগ থেকে ভূমিদান যুগ এবং ভূমিদান যুগ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার দিকে যে পরিবর্তন হয়েছে তার কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন রীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য তার ধ্বংসকে ডেকে এনে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে।

ধনোৎপাদনের রীতিই সমাজব্যবস্থায় নিয়ামক

(খ) **শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle):** মার্কস ও এংগেলসের মতে উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য থেকে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়। কোন এক উৎপাদন ব্যবস্থায় যে মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় উৎপাদন পদ্ধতিগুলি করায়ত্ত করে, তারা হল সুবিধাবাদী সম্প্রদায়। আর যাদের বঞ্চিত করে এই মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় উৎপাদিত সম্পদগুলি ভোগ করে, তারা হল নিঃস্ব বা শোষিত সম্প্রদায়। উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যেক স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—শোষক ও শোষিতের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান। মার্কসের মতে রাষ্ট্র শোষক সম্প্রদায়ের শ্রেণী-স্বার্থ বজায় রাখার একটি যন্ত্র মাত্র। রাষ্ট্রের সাহায্যে শোষিতকে দমন করে শোষক সম্প্রদায় তার শ্রেণী স্বার্থকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। সুতরাং সমাজের বিবর্তনের যে বিশেষ স্তরে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণী বৈষম্যর উদ্ভব হয়েছে রাষ্ট্রের প্রাথমিক সূত্রপাত তখন থেকেই। মার্কস ও এংগেলসের মতে, এমন একদিন ছিল যখন পাথরের যন্ত্রপাতি, তীরধনুক প্রভৃতি জীবিকা অর্জনের পদ্ধতিগুলি এবং অর্জনলব্ধ ভোগ্যবস্তু মানুষ সমান ভাবে ভোগ করত। মার্কস, এংগেলস্ এই যুগকে আদিসাম্যবাদের (Primitive communism) যুগ বলে আখ্যা দিয়েছেন। সেই যুগে 'আমার—তোমার' বলে কিছু ছিল না, সুতরাং রাষ্ট্রেরও উদ্ভব তখন হয়নি। সমাজের বিবর্তনের এক বিশেষ পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণী বৈষম্য সুস্পষ্টরূপ ধারণ করে। এই সমাজকে দাস সমাজের (Slave-

শ্রেণী সংগ্রামের কারণ

আদি সাম্যবাদের যুগ

society) যুগ বলা যেতে পারে। দাস সমাজে যারা উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, পশুচারণ ক্ষেত্রে—এমনকি উৎপাদনকারী সম্প্রদায় পর্যন্ত কুক্ষিগত করত তারা হল দাস মালিক ও অভিজাত সম্প্রদায়। আর ভোগ্যবস্তু উপকরণ সৃষ্টির কাজে যাদের জোর করে খাটান হত তারা হল ক্রীতদাস সম্প্রদায়। দাস সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আদি সমাজের উৎপাদনের উপকরণ ও ভোগ্যবস্তুর উপর সাধারণ অধিকারের বিলুপ্তি সাধন এবং তৎপরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বের প্রবর্তন। প্রথম রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় এই সমাজেই। দাস মালিকেরা রাষ্ট্ররূপ যন্ত্রটির সাহায্যে দাস সম্প্রদায়কে দমন করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

দাস সমাজ

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে দাসসমাজের রূপ পরিবর্তিত হয় এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। ভূম্যাধিকারী অভিজাত সম্প্রদায় এবং ভূমিদাসের মধ্যে বৈষম্য এই সমাজ ব্যবস্থার আসল রূপ। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ

সামন্ততান্ত্রিক যুগের পর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে শিল্পবিপ্লব শুরু হয় তার ফলে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ উদ্ভূত হল ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক যুগের শ্রেণী বৈষম্য এক নূতন রূপ ধারণ করে। ভূম্যধিকারী অভিজাত সম্প্রদায়ের স্থান দখল করে শিল্পপতি সম্প্রদায়, আর শোষিত ভূমিদাস সম্প্রদায়ের পরিবর্তে উদ্ভব হল মজুর শ্রেণীর। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ এবং তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে প্রচুর পরিমাণে অত্যন্ত সস্তা দরে ভোগ্যবস্তু সৃষ্টি হওয়ার ফলে ক্ষুদ্র ও মধ্যম শ্রেণীর পুঁজিবাদীরা এই প্রতিযোগিতায় টিঁকে থাকতে পারল না। কালক্রমে তারাও সর্বহারা শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং পুঁজিবাদী বৃহৎ শিল্পপতিরা সংখ্যায় কমতে থাকে এবং সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। এইভাবে, ধন উৎপাদনের মূল উৎসগুলি স্বল্পসংখ্যক লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হওয়ায় পুঁজিবাদী এবং সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী সংগ্রাম ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রকটরূপ ধারণ করে।

ধনতান্ত্রিক সমাজ

আধুনিক কালের ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাতেও রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির একটি যন্ত্রমাত্র। পুঁজিবাদী সমাজের তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম শোষক

সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে। শিল্পপতি সম্প্রদায় রাষ্ট্রের সাহায্যে সর্বহারা শ্রেণীকে দমন করে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। লেলিন (*Lenin*) মার্কসবাদে রাষ্ট্রের ধারণাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, "রাষ্ট্র শ্রেণী বিদ্বেষের সামঞ্জস্যহীনতার পরিণতি" ("State is the product of the irreconcilability of class antagonism.")। সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্রবাদ শ্রেণীবিদ্বেষের অপরিহার্যতা বিশ্বাস করে না। রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রেণী স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান করে সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করা সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু মার্কসবাদীরা রাষ্ট্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের ভিত্তিতে দুটি বিরুদ্ধ শ্রেণীর স্বার্থের কোনমতে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব নয় বলে শোষক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের সাহায্যে শোষিত সম্প্রদায়কে দমন করে তার শ্রেণীস্বার্থকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করে। সুতরাং পুঁজিবাদীর হাতে রাষ্ট্র একটি বলপ্রয়োগকারী শক্তিমাত্র যার দ্বারা তারা শ্রমিক শ্রেণীকে চিরকালের জন্য দমন করে শ্রেণীস্বার্থকে স্থায়িত্ব দেবার চেষ্টা করে।

মার্কসের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র

(গ) **বর্ধিত মূল্যের মতবাদ (Theory of Surplus Value):** ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য তার যন্ত্রপাতি, কাঁচা মাল-মশলা এবং শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ যে ব্যয় হয় তার অধিক। এই অধিক মূল্য সৃষ্টি করে শ্রমিক, আর তাকে ভোগ করে মালিক শ্রেণী। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত মূল্য ন্যায়ত ভোগ করা উচিত শ্রমিক শ্রেণীর। কিন্তু মালিক সম্প্রদায় উৎপাদনের উৎসগুলির উপর তার কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে নিজেরাই এই উদ্বৃত্ত মূল্য হস্তগত করে এবং তা ভোগ করে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ধনিক শ্রেণী শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত করে উদ্বৃত্ত মূল্য নিজেরাই ভোগ করে বলে শ্রেণী সংগ্রাম অত্যন্ত প্রকট আকার ধারণ করে। পুঁজিবাদী সমাজে মালিক শ্রেণী রাষ্ট্রের সাহায্যে এই উদ্বৃত্ত মূল্য স্থায়ীভাবে ভোগ করে। রাষ্ট্রের আইনকানুন রচিত হয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায়। রাষ্ট্রের পুলিস, সৈন্যবাহিনী এমনকি বিচার বিভাগ পর্যন্ত মালিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে চালিত হয়।

উদ্বৃত্ত মূল্যের অর্থ

সুতরাং দেখা গেল, কার্ল মার্কস নৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেছেন।

শ্রেণীসংগ্রামের দিকটি তার রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং উদ্বৃত্ত মূল্যের দিকটি তার অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ।[1]

(ঘ) **সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব** (**Dictatorship of the Proletariat**)**:** উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কে পরিবর্তন হওয়ার মধ্যে সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের ধ্বংসের বীজ নিহিত থাকে।

কি ভাবে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়

ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অধিক উৎপাদনের ফলে মালিক শ্রেণীর সংখ্যা যখন কমতে থাকবে এবং সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যা বাড়তে থাকবে তখন সর্বহারা শ্রেণী পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাহায্যে বিলোপ সাধন করে এবং শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করে। এই সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদনের উৎসগুলির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক সত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করে অধিক সংখ্যক সর্বহারা শ্রেণীর দ্বারা শাসন ক্ষমতা হস্তগত করণের ফলে কোন নতুন শোষক শ্রেণীর উদ্ভব হয় না। মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদী শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিরাট সর্বহারা শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই তখন রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা।

সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা

সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব ক্রমে সকল প্রকার শোষণের অবসান ঘটিয়ে শ্রেণী বৈষম্যের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটাবে। শ্রেণীহীন সমাজে রাষ্ট্রেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধীরে ধীরে অবসান ঘটবে। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদী সমাজ—যে সমাজে প্রত্যেকে তার সাধ্যমত সমাজকে দিয়ে যাবে এবং প্রয়োজন মত সমাজের কাছ থেকে ভোগ্যবস্তু লাভ করবে ('From each according to his capacity and to each according to his need')।

1 In technical terms then, the communist regard the state from two points of view As an economic organisation, he sees it as a society of capitalists for the extraction of surplus value from the workers, as a political oraganisation, it is for him a society to protect the process of extraction from rebellion by the workers who suffer from that process" —*Laski*, *Communism*.

৫। রাষ্ট্র সম্বন্ধে মার্কসীয় মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the Marxian Concept of State):

মার্কস কেবলমাত্র অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন

(ক) মার্কস সমাজের বিবর্তনকে যে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন তা সব সময়ে ঠিক নয়। সমাজের বিবর্তনে ধর্ম, নীতি, কলাবিজ্ঞান, কৃষ্টি ও সাহিত্যের প্রভাবকে অস্বীকার করা চলে না।

বর্তমানে অনেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা উন্নত হতে দেখা যায়

(খ) মার্কসের মতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় দারিদ্র্যের তীব্রতা ক্রমে বাড়তে শুরু করবে। এই তীব্রতার শেষ পরিণতি শোষক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিন্তু বর্তমান কালের অনেক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা অবনত হওয়ার পরিবর্তে উন্নত হতে দেখা যায়।

মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি

(গ) মার্কসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে শিল্পের দিক থেকে অগ্রসর ইংলণ্ড ও জার্মানী এই দুটি রাষ্ট্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শুরু হবে। কিন্তু কার্যতঃ এই রাষ্ট্র দুটির পরিবর্তে রাশিয়ার মত অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রাষ্ট্রেই এই বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। ইতিহাস ও সমাজের গতি বস্তুগত এবং ভাবগত নানা প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কোন এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তার গতিপথ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা তাই ভ্রমাত্মক হতে পারে।

হিংসাত্মক পন্থায় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থায় পৌছানো যায় না

হিংসা-দ্বেষ বর্জিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রে পৌছানোর জন্য মার্কস সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। অনেক চিন্তাশীল মনীষীর মতে হিংসাত্মক পন্থা অবলম্বন করে মানুষ শান্তিময় আদর্শ রাষ্ট্রে পৌছাতে পারে না। উদ্দেশ্য ও উপায়ের সংগতির অভাব মার্কসবাদের প্রধান ত্রুটি বলে অনেকে মতে প্রকাশ করেছেন। বস্তুতঃ, মার্কস যে সাম্যবাদের কথা কল্পনা করেছেন সেখানে মানুষ সৎ, হিংসা বিদ্বেষ বিবর্জিত। শ্রেণীর বৈষম্য না থাকার জন্য সেখানে রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তাই থাকবে না।

মার্কস কল্পনা করেছেন, সাম্যবাদ-পূর্ব সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। শ্রেণীগত স্বার্থের কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধান এখানে সম্ভব নয়। তাই সর্বহারা শ্রেণীর বিদ্রোহের পথ অনুসরণ করা ভিন্ন তাদের শোষণের হাত থেকে মুক্তির আর পথ নেই। যদি তাই হয় তবে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মানুষ হিংসা-

শোষণ বর্জিত শান্ত সুন্দর জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে—একথা তিনি কল্পনা করতে পারেন কেমন করে? মার্কস বলেছেন, বস্তু থেকেই আদর্শের উৎপত্তি। ধর্ম, আদর্শ, রীতিনীতি সব কিছুই বস্তু থেকে সৃষ্টি। এই বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের জন্য মার্কসকে অনেক বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই বিরুদ্ধবাদী যুক্তির সারবত্তা হয়তো আছে, তবে আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে, তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত মতবাদের মূল লক্ষ্য—সমগ্র মানব জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি। তাই মার্কসের মতবাদের এই সার্বজনীন মানবিকতার দিকটি সহজেই অন্তর স্পর্শ করে। শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন মানুষ যার লক্ষ্য তার মতবাদকে আদর্শভ্রষ্ট বস্তুবাদ বলা চলে না।

মার্কসবাদের অসংগতি

মার্কসবাদের মূল্য নিরূপণ

সংক্ষিপ্তসার

জৈব মতবাদ ঃ

জৈব মতবাদ উদ্দেশ্যমূলক। এই মতবাদ জীবদেহের সঙ্গে রাষ্ট্রের তুলনা করে। জীবদেহের মত রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীন ইচ্ছা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং রাষ্ট্রের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা প্রতিপন্ন করা এই মতবাদের অপর একটি উদ্দেশ্য। এই মতবাদ অনুসারে জীবদেহের মত সমাজদেহের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে এবং জীবদেহ ও সমাজদেহে (১) সংরক্ষণকারী, (২) সংযোগসাধনকারী এবং (৩) নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থা আছে। ব্লানস্‌লি রাষ্ট্রকে পুরুষ প্রকৃতি ও চার্চকে নারী প্রকৃতি বলে বর্ণনা করেছেন। হার্বার্ট স্পেন্সার জীবদেহের সঙ্গে সমাজদেহের বৈসাদৃশ্য উল্লেখ করে তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদকে সমর্থন করেন। জৈব মতবাদের পরিণতি আদর্শবাদে এবং বিশ্বযুদ্ধ পূর্ব নাজীবাদ ও ফ্যাসিবাদে। মানুষের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রতিপন্ন করার মধ্যেই জৈববাদের গুরুত্ব।

আইনমূলক মতবাদ ঃ

ব্লানস্‌লি, গিয়ার্কে, ডুগুই, মেটল্যাণ্ড প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদের সমর্থক। রাষ্ট্র আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন সৃষ্টি করা ও তাকে চালু করা রাষ্ট্রের কাজ। বিশ্লেষণপন্থী লেখকেরা আইনকে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ বলেছেন। ঐতিহাসিক মতবাদীরা আবার প্রথাগত আইনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ট্রিট্‌স্‌কে, ব্লানস্‌লি, জেলিনেক প্রভৃতি লেখকেরা রাষ্ট্রের প্রতি আইনগত ব্যক্তিত্ব আরোপ করেছেন। ডুগুইয়ের মতে আইনের স্থান রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বে, তাই রাষ্ট্র নিজে আইন মানতে বাধ্য।

আদর্শবাদ ঃ

গ্রীক দার্শনিকদের রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় আলোচনা আদর্শবাদের মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে হেগেল এই মতবাদকে পরিপূর্ণ রূপ দেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের একটি পৃথক সত্তা ও পৃথক ইচ্ছা আছে। এই সত্তা ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যক্তি নিজস্ব স্বাধীনতা দাবী করতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব। হেগেলের মতবাদের পরিণতি ট্রিট্‌সকে, নিট্‌সে ও বার্নহার্ডির যুদ্ধবাদে দেখা যায়। রুশো সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের একটি 'সাধারণ ইচ্ছার' কল্পনা করে

রাষ্ট্রকে চরম ক্ষমতাশালী করেছেন। আদর্শবাদে বিশ্বাসী ইংরেজ দার্শনিকদের মধ্যে ব্রাডলে, বোসাঙ্কেট ও গ্রীনের নাম উল্লেখযোগ্য। বোসাঙ্কেট ও গ্রীন আদর্শবাদী হবেও রাষ্ট্রের যুপকাষ্ঠে ব্যক্তিস্বাধীনতাকে বলি দিতে চাননি। গ্রীন ব্যক্তি-অধিকারের প্রয়োজনে স্বাধীনতার কর্তৃত্ব সীমিত করার পক্ষপাতী। আদর্শবাদ সাম্য ও স্বাধীনতার বিরোধী। এই মতবাদ আইন ও স্বাধীনতাকে অভিন্ন জ্ঞান করে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রকে এক বলে গণ্য করে থাকে।

মার্কসবাদ ঃ

মার্কসবাদে রাষ্ট্রের ধারণা আলোচনা করতে হলে—(১) ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা (২) শ্রেণী সংগ্রাম (৩) বর্ধিত মূল্যের মতবাদ এবং (৪) সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব আলোচনা করা দরকার। মার্কসের মতে কোন এক সময়ের প্রচলিত আদর্শ, ধর্ম, কলা, বিজ্ঞান সবকিছু নির্ভর করে ধনোৎপাদন নীতির উপর। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সামাজিক বিবর্তনের কারণ। ক্রীতদাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ এবং ধনতান্ত্রিক সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল অর্থনৈতিক ভিত্তিতে শ্রেণীগত বৈষম্য। মার্কসের মতে রাষ্ট্র শোষকশ্রেণীর হাতে শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখার একটি যন্ত্রমাত্র। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিজের ধ্বংসের বীজ লুক্কায়িত থাকে। কালক্রমে সর্বহারাশ্রেণীর বিদ্রোহের দ্বারা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার লোপ হব এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

মার্কসবাদ সমাজ ব্যবস্থার অন্যান্য উপাদানের প্রভাবকে বাদ দিয়ে অর্থনৈতিক প্রভাবের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অনেক পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকশ্রেণীর উন্নতি হতে দেখা যায়। মার্কস তাঁর মতবাদে ইংলণ্ড ও জার্মানীতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে বলে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মার্কসবাদে মত ও পথের সামঞ্জস্য নেই।

সমাজ বিবর্তনের প্রতি স্তরে মানুষকে স্বার্থপর ও বিদ্বেষপরায়ণ বলে কল্পনা করলে সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তাঁরা ভাল হয়ে যাবে একথা কল্পনা করা যেতে পারে না।

Exercise

1. What is meant by the Organismic Theory of the State? How far is this theory a satisfactory explanation of the nature of the State?

2. "The Organismic Theory is neither a satisfactory explanation of the nature of the state nor a trustworthy guide to state activity"—Elucidate

3. Explain the Idealistic Theory of the State (*B. U. 1963*)

4. Discuss the Marxist Theory of the State.

5. Give a critical account of the organic theory of the state. (*B. U 1963)*

6 "State is the product of the irreconcilability of class antagonism."—Discuss.

ষষ্ঠ অধ্যায়

আইন (Law)

১। আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of law):

আইন শব্দটি ব্যাপক ও বহুবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আইন শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি শাস্ত্র কতকগুলি নিয়ম বা বিধির উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর কার্যকারণের পিছনেও কতকগুলি নিয়ম আছে। যেমন, চন্দ্র, সূর্য এদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসের রাসায়নিক মিলনে জল উৎপন্ন হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কার্যকারণের এই আবিষ্কৃত ও অনাবিষ্কৃত নিয়মগুলিকে আমরা বৈজ্ঞানিক আইন বা Scientific Law বলতে পারি।

নীতিশাস্ত্রেরও কতকগুলি নিয়ম বা আইন আছে। সামাজিক মানুষের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় বোধের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ মানসিক আচরণগুলিকে আমরা নৈতিক আইন বা Moral Law বলে অভিহিত করতে পারি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচ্য এই বিধিগুলি সাধারণ নিয়ম মেনে চলে বলেই তাদের বলা হয় আইন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও আইন বলতে এই রকম কতকগুলি সাধারণ নিয়মের কথা বুঝব।

মানুষ সামাজিক জীব। প্রত্যেক মানুষ তার খেয়াল-খুশি অনুসারে কাজ করলে সমাজ জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই, সমাজ জীবনকে সম্ভব করে তোলার জন্য মানুষের কার্যাবলী ও গতিবিধিকে কতকগুলি সাধারণ বিধি-নিষেধের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করা অপরিহায।

রাষ্ট্রীয় আইনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে কতকগুলি সাধারণ বিধি-নিষেধ দিয়ে মানুষের কার্যাবলী ও গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করে সমাজ জীবনকে সম্ভব ও উন্নত করে তোলা। তবে রাষ্ট্রীয় আইনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, মানুষের আভ্যন্তরীণ বা নৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে না। কারণ, তা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মানুষের বাহ্যিক কার্যাবলীকেই কেবল আইন নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

এই আইনের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কতকগুলি নিয়ম দিয়ে রাষ্ট্র মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার শক্তি দিয়ে সকলকে সেগুলি মানতে বাধ্য করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদীরা তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আইনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন ও তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। বিশ্লেষণপন্থী (Analytical School of jurists) অস্টিনের মতে আইন হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ মাত্র। এই মতবাদের আর একজন লেখক হল্যাণ্ড আইনের নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন: "মানুষের বাহ্যিক আচরণের যে সাধারণ নিয়ম রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃক বলবৎ হয় তাই আইন" (A general rule of external human action enforceed by a sovereign political authority)।

অস্টিন ও হল্যাণ্ড প্রদত্ত আইনের সংজ্ঞা

বিশ্লেষণপন্থী অস্টিনের আইনের সংজ্ঞার সমালোচনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক-পন্থীরা (Historical school of jurists) বলেছেন যে, আইনকে সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র বলে গ্রহণ করলে আইনের গতিশীলতার দিকটি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়। সমাজ পরিবর্তনশীল এবং এই পরিবর্তিত সামাজিক ধ্যান-ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আইনও পরিবর্তিত হচ্ছে। তাছাড়া, আইনকে কেবলমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র বলে ধরে নিলে প্রত্যেক রাষ্ট্রের মধ্যে যে সমস্ত প্রথাগত আইনকানুন আছে সেগুলিকেও অস্বীকার করা হয়। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, প্রথাগত আইন-কানুন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির ফলেই আইনে পরিণত হয়। তাই, অধ্যাপক উড্রো উইলসন তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আইনের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন— ।

"মানুষের সুপ্রতিষ্ঠিত চিন্তা ও অভ্যাসের যে অংশ সরকারের ক্ষমতা কর্তৃক বলবৎ হয়ে সর্বজনীন নিয়মের আকারে সুস্পষ্ট ও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে, তা হল আইন।"[1]

উড্রো উইলসনের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন ও সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে, (ক) **বিশ্লেষণমূলক মতবাদ** (Analitical School), (খ) **ঐতিহাসিক মতবাদ** (Historical School)

---

1 "Law is that portion of established thought and habit which has gained distinct and formal recognition in the shape of uniform rules backed by the authority and power of government."—*Wilson*

এবং (গ) **সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদের** (Sociological School) নাম করা যেতে পারে।

আইন বিষয়ক এই বিভিন্ন মতবাদের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে নিম্নে একে একে আলোচনা করা হচ্ছে :

(ক) বিশ্লেষণমূলক মতবাদ (Analytical Concept of Law) : বঁদা, হব্‌স, অস্টিন, হল্যাণ্ড প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদের সমর্থক। এই সকল লেখকদের মতে আইন সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ মাত্র। বিশ্লেষণমূলক মতবাদের সমধিক প্রসিদ্ধ চিন্তানায়ক জন অস্টিন ১৮৩২ সালে প্রকাশিত তাঁর '*Lectures on Jurisprudence*' নামক গ্রন্থে আইন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে আইন হচ্ছে "নিম্নতনের প্রতি ঊর্ধ্বতনের আদেশ মাত্র" ("Command given by a superior to an inferior")।

এই মতবাদের মূল ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এতে আইনের বিবর্তনের দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থেকেছে। বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনও পরিবর্তিত হচ্ছে। আইন সমাজের মতই গতিশীল।

ঐতিহাসিক মতবাদীদের এই সমালোচনার উত্তরে অস্টিন বলেছেন, ইতিহাসের বিবর্তনের ফলে সামাজিক নিয়মকানুন যতই পরিবর্তিত হোক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত সেই নিয়মকানুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্বীকৃতি না পাচ্ছে ততক্ষণ তা আইন বলে গণ্য হতে পারে না।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদীরা সমালোচনা করলেও, রাষ্ট্রের শক্তির সাহায্যেই যে আইন কার্যকরী করা সম্ভব হয় এই যুক্তি অনস্বীকার্য।

(খ) ঐতিহাসিক মতবাদ (**Historical Concept of Law**): জার্মানীর বিখ্যাত আইনবিদ্‌ স্যাভিনী (Savigany) এই মতবাদের একজন শ্রেষ্ঠ নায়ক। স্যার হেনরী মেইন, ক্লার্ক, সিজউইক্‌ প্রভৃতি চিন্তানায়কগণের নামও এই মতবাদের সহিত জড়িত। এঁদের মতে বিশ্লেষণীদের প্রধান ত্রুটি এই যে, তাঁদের মতবাদে আইনকে স্থিতিশীল বলে মনে করা হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মাধ্যমে অনগ্রসর সমাজ প্রগতিশীল সমাজে রূপান্তরিত হয়। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে। কোন আইন প্রণেতার ইচ্ছা অনুসারে একদিনে আইন

প্রণীত হয়েছে, এই ধারণা ভুল। আজকের আইনকে সম্যকভাবে বুঝতে হলে অতীতের রাজনীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার কি ভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে তাও অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্যার হেনরী মেইন তাঁর *Early History of Institutions* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, অতীতের রাজনীতি ও সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পন্ন কোন রাজারও ছিল না।

অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে অষ্টিনপন্থীরা বলেন—"What the sovereign permits, he commands" অর্থাৎ, সার্বভৌম ক্ষমতার এই অতীত সামাজিক প্রথাগুলিকে চলতে দিয়ে পরোক্ষভাবে তার আদেশ বলবৎ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক মতবাদীরা বলবেন তথাকথিত সার্বভৌম ক্ষমতাশালী রাজার এই ভাবে পরোক্ষ আদেশ বলবৎ করা ভিন্ন গত্যন্তর কোথায়?

ঐতিহাসিক মতবাদীদের যুক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আমাদের দেশে এমন একদিন ছিল যখন অতি অল্প বয়সে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা যাকে কুপ্রথা বলে থাকি এমন অনেক সামাজিক রীতিনীতি সেকালে আইনসিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। কিন্তু বর্তমানে এগুলি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আজ অস্পৃশ্যতাও আইনের চোখে দণ্ডনীয় (Untouchability is an offence punishable by law)। উনবিংশ শতকের ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও কৃষ্টির প্রভাব প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবের ফলেই যে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে, একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

(গ) সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদ (Sociological Concept of Law): আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমাজবিজ্ঞানমূলক মতবাদকে আধুনিকতম মতবাদ বলে অভিহিত করা চলে। এই মতবাদের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে গুমপ্লোভিচ (*Gumplowicz*), ডুগুই (*Duguit*), ক্র্যাবে (*Krabbe*), পাউণ্ড (*Pound*) প্রভৃতি আইনবিদ্‌দের নাম উল্লেখযোগ্য।

সমাজবিজ্ঞানপন্থী আইনজ্ঞরা প্রধানতঃ মনোবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও প্রয়োগবাদী দর্শন থেকে তাঁদের তথ্য আহরণ করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বিভিন্ন সামাজিক কারণ ও প্রভাবের ফলে আইনের সৃষ্টি হয়েছে এবং আইনের উদ্দেশ্য হল সামাজিক প্রয়োজন ও কল্যাণ বিধানে সহায়তা করা। সমাজ-বিজ্ঞানবাদীরা আইনের উদ্ভব ও প্রয়োগ পদ্ধতি উভয়েরই বিচার করেন এবং

তাঁদের মতে আইনের সার্থকতা অবাস্তব তত্ত্বালোচনায় নয়—বাস্তব উপযোগিতায়। সমাজ কল্যাণের কি আদর্শ আইনে রূপায়িত হওয়া বিধেয়, তাই তাঁদের প্রধান বিচার্য। আইন সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ বলেই যে তাকে মেনে চলতে হবে, বিশ্লেষণধর্মী আইনজ্ঞদের এ ধারণাকে তাঁরা ভ্রান্ত মনে করেন। প্রতিষ্ঠিত আচার ব্যবহার ও প্রচলিত প্রথা আইনে স্বীকৃতি লাভ করে বলে যে আইন মেনে চলা হয়, এ-কথাও তাঁরা সব সময়ে মানতে রাজী নন। তাঁদের মতে আইন সমাজের কল্যাণ বিধান করে বলেই মানুষ আইন মেনে চলে। এই অর্থে আইন সর্বোচ্চ শক্তি, রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অপেক্ষা আইনের বৈধতাই প্রধান এবং আইন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উর্ধ্বে।

আইনের স্বরূপ ও উৎস সম্পর্কে বিভিন্ন মতাদর্শের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য মতাদর্শের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। আপাতদৃষ্টিতে এই বিভিন্ন আদর্শ বা ধারণার মধ্যে বিরোধ দেখা গেলেও, উল্লিখিত প্রতি মতবাদই আইনের স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন দিককে আলোকিত করে এবং তার উৎসের বৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের নিঃসন্দেহ করে। সেদিক থেকে এই বিভিন্ন মতাদর্শ পরস্পরের পরিপূরক এবং এই বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয় বিধানের মধ্য দিয়েই আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা সম্যক ধারণা করতে সক্ষম হব। অর্থাৎ সার্বভৌমের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন যেমন রাষ্ট্রীয় বিধির ক্ষেত্রে অপরিহার্য তেমন এ-কথাও অনস্বীকার্য যে, আইন একদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাধারা ও অন্যদিকে সামাজিক ন্যায়বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই রূপ পরিগ্রহ করে।

২। আইনের উৎস (Sources of Law):

অধ্যাপক হল্যাণ্ড আইনের ছয়টি উৎসের উল্লেখ করেছেন, যথা—(ক) **প্রথা** (খ) **ধর্ম** (গ) **বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা** (ঘ) **বিচারকের রায়** (ঙ) **ন্যায়নীতি** এবং (চ) **আইন প্রণয়ন**। নিম্নে এই উৎসগুলির বিস্তৃত আলোচনা একে একে করা হচ্ছে।

(ক) প্রথা (Custom): দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা আচার-ব্যবহারগুলিই প্রথা। প্রাচীনকালে প্রথাগুলিই ছিল আইনের একমাত্র উৎস। সমাজে বহুজন যখন কোন বিশেষ কার্যপ্রণালী বা ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরে অনুসরণ করে তখন প্রথার উদ্ভব হয়। কোন বিশেষ সময়ে বিশেষ রীতি একজনের দ্বারা আবিষ্কৃত হতে পারে কিন্তু পরবর্তীকালে অনেকে যখন এই একই কার্যপ্রণালী অনুসরণ করে যায় তখন তা প্রথার রূপ গ্রহণ করে। অধ্যাপক

হল্যাণ্ড বলেছেন, একটি সবুজ তৃণক্ষেত্রের উপর দিয়ে যেমনভাবে একটি পায়ে চলা রাস্তা তৈরী হয় তেমনি করে উৎপত্তি হয় প্রথার।

প্রয়োজনীয়তা থেকেও প্রথার উৎপত্তি হয়। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন পরিবার এবং জ্ঞাতি—গোষ্ঠীর মধ্যে কতকগুলি আচার-ব্যবহার গড়ে ওঠে। প্রাচীনকালে পরিবার বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হলে, পরিবারের কর্তা অথবা গোষ্ঠীপতি চিরাচরিত প্রথার সাহায্যেই বিবাদের নিষ্পত্তি করতেন এবং সাধারণভাবে সেগুলি মেনে চলাই ছিল রীতি। কালক্রমে সেই আচার-ব্যবহারগুলি ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করে দৃঢ়তর হয় এবং আইনের মর্যাদা লাভ করে। মনুসংহিতায় প্রথার গুরুত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। মনু বলেছেন, "রাজা ঐশ্বরিক আইন সম্বন্ধে অবহিত হয়ে বিশেষ পরিবারের নিয়মকানুনগুলিকেও জানবেন এবং সেই ক্ষেত্রে সে বিশেষ প্রথাগুলিকে প্রয়োগ করবেন।"

ব্রিটেনে কোন সুপ্রাচীন প্রথা পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বিরোধী অথবা ন্যায়বোধ বহির্ভূত বলে বিবেচিত না হলে আইনের মর্যাদা লাভ করে। বস্তুতঃ, ইংলণ্ডের Common Law মুখ্যতঃ প্রথার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে।

অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে মানুষ যেমন তার নিজের দেহকে পরিবর্তন করতে পারে না তেমনি রাষ্ট্র দেশের সমগ্র আইন ব্যবস্থাকেও নতুন করে তৈরী করতে পারে না। রাষ্ট্র মাঝে মাঝে দু-একটি আইন পরিবর্তন করে অথবা নতুন আইন যোগ করে মাত্র।

(খ) ধর্ম (Religion): প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় ধর্মের সঙ্গে আইনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতার ধর্মপর অনুশাসন এবং আইনের সমষ্টিমাত্র। মনুসংহিতায় হিন্দু ধর্মের চারটি উৎসের কথার উল্লেখ আছে। শ্লোকটি এইরূপ:

> শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
> এতৎ চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্মস্য লক্ষণম্।
>
> —মনুসংহিতা [প্রথম অধ্যায় ১২ শ্লোক।

শ্লোকটি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ধর্মকেই হিন্দুরা আইন বলে মনে করতেন। শ্লোকটির অর্থ করলে এই দাঁড়ায়—বেদ, উপনিষদ, সৎ আচার এবং নিজস্ব ন্যায়বোধ—এই চারটি ধর্মের, অর্থাৎ আইনের লক্ষণ।

মুসলমান ধর্মগ্রন্থ কোরান মুসলমান আইনের একটি বড় উৎস। অতীতের মুসলমান সমাজ রাষ্ট্রের দ্বারা সৃষ্ট আইনের প্রতি বিশেষ আস্থাবান ছিল না। তাঁদের দৃষ্টিতে ধর্ম ও আইন অভিন্ন এবং অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইহুদী সমাজে ধর্মীয় অনুশাসন সমগ্র আইন ব্যবস্থার এক বড অংশ জুড়ে আছে। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেষ্টামেণ্ট (*Old Testament*) অনুসারে মানুষের কার্যাবলীর সঙ্গে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে এবং তিনিই সরাসরিভাবে মানবসমাজকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

ধর্মের সঙ্গে প্রথার সম্পর্ক নিবিড। প্রাচীন প্রথা ধর্মের সমর্থনে শক্তিশালী ও দৃঢ হত। হিন্দু ধর্মে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আইনের ব্যাখ্যা-কর্তা। প্রাচীন রোমের আইনগুলি কতকগুলি প্রাচীন রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের সমষ্টি মাত্র।

(গ) বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (**Scientific commentaries**): আইন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মনীষীদের আইন বিষয়ক আলোচনা, অভিমত ও গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অন্যতম প্রধান উৎস। ইংলণ্ডের কোক (*Coke*) ও ব্ল্যাকস্টোন (*Blackstone*), আমেরিকার স্টোরী (*Story*) ও কেণ্ট (*Kent*) প্রভৃতি আইনবিদ্‌দের অভিমতকে আইনের মর্যাদা দেওয়া হয়।

আইন সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অভিমত এমনিতেই আইন বলে গণ্য হয় না; রাষ্ট্রের বিচারালয়ের স্বীকৃতিই সেগুলিকে আইনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

(ঘ) বিচারকের রায় (**Adjudication**): প্রত্যেক দেশেই বিচারপতিরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন করে থাকেন। মুখ্যতঃ তাঁদের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা। কিন্তু আইনকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁরা আইনকে নতুন ছাঁচে ঢেলে নতুন রূপ দেন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচারপতিরা যখন রায় দেন তখন তাঁরা যে নজীর সৃষ্টি করেন সেগুলিকে পরবর্তীকালের বিচারকেরা অনুরূপ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কালক্রমে এগুলি নতুন আইনের আকারে পর্যবসিত হয়।

(ঙ) ন্যায়-নীতি (**Equity**): বিচারকার্য পরিচালনার কালে অনেক সময় দেখা যায় যে, বিচার্য বিষয় সম্পর্কে প্রচলিত আইনে কোন নির্দেশ নেই। তখন বিচারপতি স্বভাবতই তাঁদের ন্যায় ও বিবেকবোধ অনুসারে সেই বিচার্য বিষয়ের মীমাংসা করেন। বর্তমান আইনের অভাবে সাধারণ ন্যায়, ধর্ম এবং বিবেকবোধ অনুসারে বিচার করার নামই ন্যায়-নীতি।

ইংলণ্ডের প্রচলিত 'কমন ল' (Common Law) অনুসারে যখন কোন বিবাদের মীমাংসা করা সম্ভব হত না তখন রাজার বিবেকবোধের রক্ষক (Keeper of king's conscience) হিসেবে লর্ড হাইচ্যান্সেলারের কোর্টে (Lord Highchancellar) আবেদন করা হ'ত। লর্ড হাইচ্যান্সেলারের কোর্টকে কোর্ট অব্ চ্যান্সারী (Court of Chancery) বলা হত। এই কোর্ট সাধারণ ন্যায়বোধ এবং বিবেকবোধ অনুসারে অন্যায়ের প্রতিবিধান করত।

(চ) **আইন প্রণয়ন (Legislation):** আজকের দিনে আইন সভাই হচ্ছে আইনের প্রধান এবং বৃহত্তম উৎস। আইন-সভার সদস্যরা জনমতের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে আনুষ্ঠানিকভাবে আইন-প্রণয়ন করে থাকেন। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেই আইন সভার আইন প্রণয়নের সংখ্যা যত বেড়ে যাচ্ছে, বিচারালয়ের রায়, ন্যায়বোধ—এমনকি বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা দিয়ে বিচার নিষ্পত্তির অবকাশ ততই কমে আসছে। অবশ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচারালয় বা অনুরূপ সংগঠনের আইন বিষয়ক অভিমত এবং অভিজ্ঞ আইনবিদ্দের সিদ্ধান্তের প্রভাব আইনের ক্ষেত্রে বড কম নয়। তাছাডা, আইন প্রণয়নের কাজে আজকের দিনেও এই সমস্ত বিভিন্ন প্রভাবের গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য।

৩। আইন ও নীতিজ্ঞান (Law and Morality):

আইন ও নীতিজ্ঞান পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। উভয় জ্ঞানই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করে। এই নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে এক আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গডে তোলাই উভয়ের লক্ষ্য।

আইন ও নীতিজ্ঞানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। আইন মুখ্যতঃ মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু নীতিজ্ঞান মানুষের চিন্তার ক্ষেত্র ও বাহ্যিক জীবন উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আইনের সঙ্গে মানুষের চিন্তার জগতের কোন সম্পর্ক নেই—এ কথা বললে ভুল বলা হবে। পরিকল্পিত অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেওয়া আইনের বিধান আছে। বস্তুতঃ, আইন ভঙ্গ করলে বিচারককে অপরাধীর মানসিক অবস্থাটিকেও বিচার করতে হয়। যাই হোক্, সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, নীতিজ্ঞান মানুষের চিন্তা, কাজ ও কাজের উদ্দেশ্যে সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। আর আইন মুখ্যতঃ মানুষের বাহ্যিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুতঃ, চিন্তার ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করা রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাইরে। মানুষ যখন অপরের অনিষ্ট

আইনমূলতঃ মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়া-কলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে

চিন্তা করে তখন রাষ্ট্রের কিছু করার নেই কিন্তু যখন সে সেই চিন্তাকে কাজে পরিণত করে, রাষ্ট্রের আইন তখন তাকে দণ্ড দেবে। নীতিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা ও তাকে কার্যকরী করা উভয়ই অন্যায়। কিন্তু অনিষ্ট চিন্তার নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্র প্রায় নীরব।

অধ্যাপক সিজউইক (*Sidgwick*) নীতিজ্ঞানকে সামাজিক এবং ব্যক্তি কেন্দ্রিক—এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। ব্যক্তিবিশেষের শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ইত্যাদির উপর অনেক সময় নীতিজ্ঞান নির্ভরশীল। এরূপ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নীতিবোধের সঙ্গে আইনের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক নীতিবোধ ছাড়া সাধারণভাবে সমাজ কর্তৃক সমর্থিত এক প্রকার নীতিবোধ আছে। সমাজ সমর্থিত নীতিজ্ঞান এবং আইনের একটি সার্বজনীন রূপ আছে। সুতরাং আইনের সঙ্গে এই নীতিজ্ঞানের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। আইন ও সামাজিক নীতিজ্ঞান এক হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে।

সিজউইকের দৃষ্টিতে নীতিজ্ঞান

প্রথমতঃ, সামাজিক নীতিবোধকে লঙ্ঘন করলে অপরাধী সমাজের চোখে নিন্দনীয়, আর রাষ্ট্রের আইন ভঙ্গ করলে অপরাধীকে রাষ্ট্রের আইন অনুসারে শাস্তিভোগ করতে হয়। সমাজ সমর্থিত নীতিবোধগুলিকে মানুষ মেনে চলে বিবেকের দংশনে অথবা লোকনিন্দার ভয়ে, রাষ্ট্রের আইন মানুষকে মানতে হয় রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।

আইন ও নীতিজ্ঞানের পার্থক্য

দ্বিতীয়তঃ, আইন সামাজিক নীতিবোধ অপেক্ষা অনেক বেশী স্পষ্ট এবং সুসংবদ্ধ। রাষ্ট্রের আইনগুলি আইন-সভা কর্তৃক সৃষ্ট হয়ে অথবা বিচারালয় কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়ে সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করে। কিন্তু নীতিবোধের যথার্থ স্বরূপ কি তা ধারণা করা শক্ত। নীতিবোধের স্পষ্টতা এবং সুনির্দিষ্টতার অভাব আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাল্যবিবাহ এখন আইনবিরুদ্ধ কিন্তু কিছুদিন আগে যখন এই সম্বন্ধে কোন আইন ছিল না তখন এই প্রথাটি ন্যায় কি অন্যায় এই নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল।

এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি নীতিবিরুদ্ধ না হলেও আইনবিরুদ্ধ। জননিরাপত্তার খাতিরে এমন আইন থাকতে পারে যার ফলে জনবহুল শহরে রাস্তার বাঁদিক ধরে হেঁটে যাওয়াই আইন সংগত। কেউ এই নিয়ম ভঙ্গ করলে আইনবিরুদ্ধ কাজ করবে, কিন্তু এই কাজটিকে নীতিবিরুদ্ধ বলা যায় না।

নীতিবিরুদ্ধ না হলেও আইনবিরুদ্ধ কাজ

অনেকের মতে রাষ্ট্র তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য নীতিজ্ঞান বিরোধী আইনও প্রণয়ন করতে পারে ("The safety of the State is its first law and to realise this end it must be above morality.")। শর্ত নিরপেক্ষ ভাবে আমরা এই অভিমতকে গ্রহণ করতে পারি না। অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য বিপদগ্রস্থ হয় এবং সেই দিক থেকে বিচার করলে বিপৎকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রকে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। এই ক্ষমতা সাময়িকভাবে নীতিজ্ঞান বিরোধী হলেও রাষ্ট্রকে তার নিরাপত্তার জন্য এই আইনকে বলবৎ করতে হয়। ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থায় প্রেসিডেন্টের হাতে এমন কতকগুলি ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে যার বলে সংবিধানে উল্লেখিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারকে তিনি খর্ব করতে পারেন। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে এই ক্ষমতা অবশ্যই সমর্থনযোগ্য। কারণ, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছু থাকবে না। তবে সাধারণ অবস্থায় রাষ্ট্রের নীতিজ্ঞান বর্জিত আইন প্রণয়নের অধিকারকে কখনই স্বীকার কর' যেতে পারে না।

রাষ্ট্র কি নীতিজ্ঞান বর্জিত আইন-প্রণয়ন করতে পারে ?

আইন ও নীতিজ্ঞানের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি সত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের নীতিজ্ঞান রাষ্ট্রের আইনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বস্তুতঃ, রাষ্ট্রের কোন এক সময়ের আইনের মধ্যেই সেই দেশের নৈতিক মানের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। যে দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত নয়, সেখানকার আইন ব্যবস্থাও অনুন্নত। পক্ষান্তরে, যে দেশের নৈতিক মূল্যবোধ উন্নত, তারা এক উন্নত পর্যায়ের আইন ব্যবস্থা গড়ে তুলবে সন্দেহ নেই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আইন সামাজিক নীতিবোধের স্বপক্ষে থাকলে সরকারের পক্ষে সেই আইন সহজে চালু করা সম্ভব হয়। পক্ষান্তরে, কোন আইন সমাজের নীতিবোধের বিরোধী হলে সরকারের পক্ষে তাকে কার্যকরী করা কঠিন হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধে অস্পৃশ্যতা দোষনীয় বলে বিবেচিত হলেই এই নিয়মকে কার্যকরী করা সম্ভব হবে।

৪। প্রাকৃতিক আইন (Law of Nature):

প্রাকৃতিক আইনের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। রাষ্ট্রের আইন, নাগরিকদের অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচিত হয়েছে। তাই প্রাকৃতিক আইন বলতে কি বোঝায় আমাদের তা জানা দরকার।

প্রাকৃতিক আইনের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তার বিভিন্ন স্তরে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধীয় আলোচনার প্রথম শুরু হয় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের আমলে। প্রকৃতির প্রকাশভেদ ও বৈষম্যের মধ্যে গ্রীক দার্শনিকেরা এক শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করেছিলেন। প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে তাঁরা রাষ্ট্রীয় আইনের স্বরূপ ও যাথার্থ বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। প্লেটোর লেখায় বস্তুনিরপেক্ষ ন্যায়বোধ এবং মানুষের সৃষ্ট আইনের মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ দেখা যায়। আরিস্টটল তাঁর *Ethics* গ্রন্থে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম নিয়মের মধ্যে তারতম্য নির্দেশ করেছেন।

গ্রীক দার্শনিকদের দৃষ্টিতে প্রাকৃতিক আইন

সোফিস্ট (*Sophist*) দার্শনিকেরা মনে করতেন মানুষ তাদের নিজেদের ধারণা মত আইন সৃষ্টি করে। তাঁদের মতে মানুষের তৈরী আইন কৃত্রিম এবং পরিবর্তনশীল, আর প্রাকৃতিক আইন শাশ্বত এবং অপরিবর্তণীয়।

সিনিক (*Cynic*) দার্শনিকেরা মানুষের সৃষ্ট সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই কৃত্রিম বলে অবজ্ঞা করতেন। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানুষের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত।

স্টোয়িক (*Stoic*) দার্শনিকেরা প্রাকৃতিক আইনকে এক শাশ্বত ন্যায়বোধ বলে অভিহিত করেছেন। মানুষের ন্যায়বোধের মাধ্যমেই প্রাকৃতিক আইনের প্রকাশ হয়। তাঁদের মতে মানুষ তার ন্যায়বোধ দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার করতে পারে এবং এই বিচারবোধ দিয়েই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

স্টোয়িক দার্শনিকদের ব্যাখ্যা।

প্রাকৃতিক আইনের ধারণা রোমের আইন ব্যবস্থাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। রোমের নাগরিকদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হত তাদের আভ্যন্তরীণ আইন ব্যবস্থার দ্বারা। এই আইন-ব্যবস্থাকে *Jus civile* বলা হ'ত। শিল্প বাণিজ্যের জন্য আগত বিদেশীদের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হত না। বস্তুতঃ, গ্রীক নাগরিকেরা এবং সাম্রাজ্য-বিস্তৃতির আগে রোমের নাগরিকেরা তাদের পৃথক আইন ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াকে এক বিশেষ অধিকার বলে মনে করত। বিদেশীদের ক্ষেত্রে তা কখনও প্রযোজ্য হত না। স্টোয়িক

রোমের আইন ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক আইনের প্রভাব

দার্শনিকদের প্রভাবে এবং পরিবর্তিত রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় অধিক সংখ্যক বিদেশী আসার ফলে এক নূতন আইন ব্যবস্থা গড়ে উঠতে শুরু করে। এই আইন ব্যবস্থাকে *Jus gentium* বলা হয়।

Jus gentium বলতে সাধারণ ন্যায়বোধ এবং বিচার বুদ্ধির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এমন এক আইন সমষ্টিকে বোঝায় যা দেশ কালের গণ্ডী অতিক্রম করে সকল দেশে সমভাবে গ্রহণযোগ্য। রোমের শাসকবর্গের দ্বারা এই আইন প্রথমে বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হলেও পরবর্তী কালে তাদের শ্রেষ্ঠতর যুক্তি এবং মানবিক আবেদনের ফলে *Jus gentium*, *Jus Civile* অপেক্ষা উন্নততর আইন ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হত। মানুষের সাধারণ ন্যায়বোধ ও বিচারশক্তি *Jus gentium*-এর মূল নীতি হওয়ায় পরবর্তীকালে স্বভাবতই তাকে প্রাকৃতিক আইন বা *Jus Naturale* বলে গণ্য করা হত। বর্তমান যুগে এই আইনকেই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি বলে ধরে নেওয়া হয়।

মধ্যযুগের অনেক লেখক প্রাকৃতিক আইনকে ঐশ্বরিক আইন বলে প্রচার করেছেন এবং এই আইন অনুসারে রাজার শাসকার্য পরিচালনা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন।

সামাজিক চুক্তি মতবাদে প্রাকৃতিক আইন

সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকেরা রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় প্রাকৃতির রাজ্যে মানুষ যে নিয়ম মেনে চলত তাকে প্রাকৃতিক আইন বলে বর্ণনা করেছেন। এই প্রাকৃতিক আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অবশ্য সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকগণের মতের পার্থক্য আছে। বিখ্যাত ওলন্দাজ লেখক হিউগো গ্রোটিয়াস (*Hugo Grotius*) প্রাকৃতিক আইনকে 'যথার্থ বিচার বোধের নির্দেশ' (dictate of right reason) বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে এই আইনই আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তি। স্যার হেনরী মেইনের মতে প্রাকৃতিক আইনের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি আন্তর্জাতিক আইনের সৃষ্টি।

হিউগো গ্রোটিয়াসের ব্যাখ্যা

প্রাকৃতিক আইনের সমালোচনা

প্রাকৃতিক আইন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বহু আলোচিত বিষয়বস্তু হলেও এই ধারণা কোন নির্দিষ্ট অর্থে কোন দিনই ব্যবহৃত হয়নি। তাই গ্রীক দার্শনিকদের আমল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এই ধারণা কোন বিশেষ আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি।

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় চিন্তার ইতিহাসে এই ধারণা মানুষের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য একটি নৈতিক মান নির্ণয়ের চেষ্টা করলেও

এই ধারণা অনুসারে বাস্তবে মানুষ কোনদিন নিয়ন্ত্রিত হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক আইনের কোন ঐতিহাসিক নজির নেই।

তৃতীয়তঃ, প্রাকৃতিক আইন রাষ্ট্রীয় আইনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ, প্রাকৃতিক আইন আদর্শ আইনের একটি মান নির্ণয় করে মাত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে প্রাকৃতিক আইন বলতে কতকগুলি নীতিসূত্রের সমষ্টি মাত্রকে বোঝায়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নৈতিক নিয়মগুলিকে প্রয়োগ করা অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

প্রাকৃতিক আইনের এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও এই ধারণা আইনশাস্ত্র এবং-নাগরিকদের অধিকার, কর্তব্য ইত্যাদি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-বস্তুকে সমৃদ্ধতর করেছে সন্দেহ নেই। বিচার ক্ষেত্রে বিচারকদের অনেকে সময় নিজস্ব বিবেক ও ন্যায়বোধ দ্বারা পরিচালিত হওয়া, আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব, জুরীর সাহায্যে বিচার কার্য পরিচালনা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আইনের সার্বজনীন আবেদনের পরোক্ষ স্বীকৃতি।

৫। আইনকে কি পরিমাণে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে গণ্য করা যেতে পারে (How far law is the expression of the General will of the Community):

ফরাসী দার্শনিক রুশো সমাজের সাধারণ ইচ্ছাকে (General will) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণ ইচ্ছা সকলের ইচ্ছার সমষ্টিমাত্র নয়; আবার সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকেও সাধারণ ইচ্ছা বলা যেতে পারে না। রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণকামী ইচ্ছাই সাধারণ ইচ্ছা। প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে এই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের সমস্ত জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে সাধারণের কল্যাণের জন্য যে ইচ্ছা প্রকাশ করে সেইটিই সাধারণ ইচ্ছা। এই সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হয় আইনের মাধ্যমে, অর্থাৎ আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ মাত্র। যেহেতু আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ, কোন ব্যক্তির উচিত নয় সেই সাধারণ ইচ্ছাকে অমান্য করা। কোন ব্যক্তি আইনকে তার স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করলে, সে তার প্রকৃত ইচ্ছাকে বুঝতে ভুল করে। তার ক্ষুদ্র স্বার্থ আপততঃ তার পক্ষে মঙ্গলজনক মনে হলেও এটি তার যথার্থ স্বার্থ নয়। সাধারণ ইচ্ছার সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ একীভূত হলেই সে সত্যিকারের স্বাধীন। সুতরাং সকলকে সর্বাবস্থায় আইন মেনে চলা উচিত।

রুশোর মতে আইন সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ

রুশো সাধারণ ইচ্ছাকে সকলের কল্যাণকামী এক ইচ্ছা বলে বর্ণনা করলেও বাস্তবে এই ইচ্ছাকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র। এখানে আইন সভার প্রতিনিধিবর্গ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধি। এই প্রতিনিধিমূলক আইন সভার দ্বারা রুশোর তথাকথিত আদর্শসর্বস্ব সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়। আইন যদি শ্রেণীস্বার্থের প্রকাশ হয় তবে তাকে সর্বাবস্থায় মেনে চলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে সকলের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করা সম্ভব হলেও সকলের পক্ষে এক মতাবলম্বী হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই সাধারণ ইচ্ছা কিভাবে ব্যক্ত হতে পারে সে বিষয়ে রুশো নিজেই কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেন নাই।

রুশোর সাধারণ ইচ্ছা ধারণার অসংগতি

অধ্যাপক ল্যাস্কি (*Laski*) বলেছেন, বর্তমানে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সরকারের দ্বারা যারা সাধারণ লোকের মতই ভুল ত্রুটি সম্পন্ন হতে পারে। সুতরাং তাদের সিদ্ধান্তকে সর্বাবস্থায় মেনে চলার কোন নৈতিক যুক্তিই থাকতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রীনের মত আদর্শবাদীও প্রয়োজন বোধে সরকারের সিদ্ধান্তকে বাধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং রুশো আদর্শকে সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে প্রত্যেকের দ্বারা আইন মেনে চলার নৈতিক যুক্তি দেখিয়ে পরোক্ষভাবে হবসের মত স্বৈরাচারতন্ত্রকেই সমর্থন করেছেন।

মার্কস্‌বাদীরা রাষ্ট্রের সাহায্যে আইনের মধ্যে শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষিত হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। মার্কসবাদীদের এই ধারণার মধ্যে তর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা আইনকে সর্বাবস্থায় সমাজের কল্যাণকারী তথাকথিত সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ বলে মনে করতে পারি না। বর্তমান যুগে সরকারের গঠন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অস্তিত্ব—এই সবদিক চিন্তা করে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা উচিত।

মার্কশবাদীদের দৃষ্টিতে আইন

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে আইনের যথার্থ বিচারের প্রয়োজনীয়তা

৬। লোকে আইন মানবে কেন? (Why people obey Law?):

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদীরা তাঁদের পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা

আইন মানার কয়েকটি কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। আদর্শবাদীরা মানুষের সাধারণ সৎ প্রবৃত্তিকেই আইন মানার কারণ বলে অভিহিত করেছেন। গ্রীন বলেছেন, মানুষ শুধু নিজের অধিকার সম্পর্কেই সজাগ নয়, সে অপরের অধিকার সম্বন্ধেও সজাগ। পারস্পরিক অধিকার সম্বন্ধে সকলের অনুভূতি ও সজাগ থাকার জন্যই লোকে আইন মেনে চলে। কারণ তারা জানে, আইনের মধ্যে সাধারণের অধিকার সংরক্ষিত হয়। গ্রীন বলেছেন, "শক্তি নয়, ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি" (Will, not force is the basis of the State)। অস্টিন, হব্‌স, বেন্থাম প্রভৃতি লেখকদের মতে লোকের আইন মানার কারণ, আইন রাষ্ট্রের শক্তি দ্বারা সমর্থিত হয় বলে। রাষ্ট্রের শক্তির ভয়েই লোকে আইন মানে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অস্টিনের উদ্ধৃতি থেকে দেখিয়েছেন—পাশবিক শক্তিকে আইনের মূলকথা বলে প্রতিপন্ন করা অস্টিনের উদ্দেশ্য ছিল না। মানুষ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন জীব বলে আইনের উপযোগীতা সম্বন্ধে সজাগ হয়ে আইন মানে ('veason bottomed on the principle of utility')। তাছাড়া, তারা আইন মানতে সম্মত হয় বলেই আইন মানে।

আদর্শবাদীদের মতে আইন মান্য করার কারণ

বিশ্লেষণ পন্থীদের মতে আইন মান্য করার কারণ

কৌটিল্য তাঁর দণ্ডনীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—মানুষ শাস্তির ভয়েই আইন মানে।

লর্ড ব্রাইস (*Bryce*) আইন মানার পাঁচটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে : (১) **আলস্য** (Indolence) (২) **শ্রদ্ধা** (Deference) (৩) **সহানুভূতি** (Sympathy), (৪) **শাস্তির ভয়** (Fear) এবং (৫) **বিচারবুদ্ধি** (Reason)।

ব্রাইসের উল্লিখিত পাঁচটি আইন মান্যের কারণ

৭। বিভিন্ন প্রকার আইন (Different Kinds of law):
অধ্যাপক হল্যাণ্ড আইনকে দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(ক) সরকারী আইন (**Public Law**) **এবং (খ) ব্যক্তিগত আইন** (**Private Law**)।

সরকারী আইনকে তিনি আবার কয়েকটি উপভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

(i) সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)।

(ii) শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law)।

(iii) অপরাধ সম্পর্কীয় আইন (Criminal Law)।

(iv) দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় আইন (Criminal Procedure)।

(v) রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্ব আরোপ সম্পর্কীয় আইন (The law of the State considered in its quasi-passive personality) এবং

(vi) উক্ত অর্থে বিবেচিত রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধি (Procedure relating to the state so considered)।

উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগের পরিপ্রেক্ষিত আমাদের আইনের উল্লেখযোগ্য শ্রেণীগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনার প্রয়োজন।

(i) সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law): অধ্যাপক গিলক্রিস্টের (*Gilchrist*) মতে যে নীতিগুলির ভিত্তিতে সরকার দাঁড়িয়ে থাকে সেইগুলিই সাংবিধানিক আইন। সরকারের গঠন প্রণালীর এবং তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদির নির্দেশ সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পাওয়া যায়। অধ্যাপক উইলোবীর (*Willoughby*) মতে যে আইন কোন এক প্রচলিত সরকারেব সংগঠন, তার বণ্টিত ক্ষমতা সমূহ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও কাযপরিচালকদের ক্ষমতার প্রয়োগ ও সীমরেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকেই সংবিধানিক আইন বলা যেতে পারে।

(ii) শাসন সংক্রান্ত আইন (Administrative Law): সরকারের বিভিন্ন শাসন বিভাগের গঠন প্রণালী ও কর্তব্যসমূহ নিয়ে শাসন সংক্রান্ত আইন গঠিত। জনসাধারণের সঙ্গে শাসন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক নির্ণয় করাও এই আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। অধ্যাপক ডাইসের মতে (D.cey) শাসন সংক্রান্ত আইন বলতে ব্যক্তি ও শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্বন্ধ নির্ণয়কারী আইন সমষ্টিকেই বুঝায়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার সম্পর্কীত আইনকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডে এই জাতীয় কোন আইন-সমষ্টি নেই। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে একজন সাধারণ নাগরিক—সকলেই, সাধারণ আইনের আওতায় পড়েন। সরকারী কর্মচারীদের জন্য সেখানে কোন পৃথক আইন ব্যবস্থা বা বিচারালয় নেই। সাধারণ নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারী সকলেই একই আইনের দ্বারা পরিচালিত। এই জন্য আইনের অনুশাসন (Rule of law)—অর্থাৎ উচ্চতম সরকারী কর্মচারী এবং

সাধারণ নাগরিক, একই আইনী ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়।

আইনকে আবার রাষ্ট্রীয় আইন (Municipal Law) এবং আন্তর্জাতিক আইন (International Law)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় আইন (Municipal Law) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলির উপর প্রযোজ্য। আন্তর্জাতিক আইন এমন কতকগুলি নিয়মসমষ্টি যার দ্বারা সকল সভ্যরাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দিষ্ট হয়।

৮। আন্তর্জাতিক আইন (International Law):

রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য আইন থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য কতকগুলি আইন থাকে, সেগুলিকে বলা হয় আন্তর্জাতিক আইন (International Law)। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক প্রগতি, অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী নব নব ধারণার উন্মেষ ইত্যাদির জন্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রও বিস্তৃত হতে চলেছে। কোন সভ্য রাষ্ট্রের পক্ষেও আজ স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব নির্বাহ করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করার প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অন্যতম প্রশ্ন হচ্ছে, **'আন্তর্জাতিক আইনকে কি আইন বলা চলে?'**

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, অস্টিন প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা আইনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যেতে পারে না। কারণ অস্টিন আইনকে এক সার্বভৌম ক্ষমতার নির্দেশ বলে মনে করেছেন। যেহেতু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নেই সেজন্য রাষ্ট্র সমূহের সম্পর্ক নির্ধারণকারী নিয়ম সমূহকে আইন বলা যেতে পারে না।

অস্টিনের মতে আন্তর্জাতিক আইন

অন্যভাবে বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক আইনকে কার্যকরী করার জন্য যেহেতু কোন শক্তি নেই সেজন্য আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ আইন বলে বিবেচিত হতে পারে না। অস্টিনের মতে আন্তর্জাতিক আইন কতকগুলি নৈতিক নিয়মের সমষ্টিমাত্র। এইজন্য অধ্যাপক হল্যাণ্ড (*Holland*) বলেছেন, "আন্তর্জাতিক আইন, আইন-শাস্ত্রের

হল্যাণ্ডের মতে আন্তর্জাতিক আইন

তিরোধান বিন্দু" "(Internat onal Law is the vanishing point of jurisprudence)।"

কিন্তু ঐতিহাসিক মতবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে যদি আইনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যেতে পারে। তাঁদের মতে আইন সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র নয়। সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির ভিত্তিতে আইন গড়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক আইনও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবে উদ্ভূত কতকগুলি প্রথা ও রীতিনীতি থেকে গড়ে উঠেছে। সাধারণের সম্মতিই এই আইনের ভিত্তি। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইনগুলিকে আইন বলে গণ্য করতে বাধা নেই।

ঐতিহাসিক মতবাদীদের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক আইন

আন্তর্জাতিক আইন কোন শক্তি দ্বারা বলবৎ না হলেও তার পিছনে জনমতের সমর্থন আছে। নৈতিক সমর্থন আইনের বড় শক্তি। শুধুমাত্র শক্তির দ্বারা বলবৎ হওয়াই আইনের বৈশিষ্ট্য নয়; নিজস্ব যুক্তি, জনমতের সমর্থন ইত্যাদি গুণও আইনের থাকা প্রয়োজন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক আইনেরও আছে। সুতরাং তাকে আইন বলে গণ্য করা যেতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনস্ (Leage of Nations) প্রতিষ্ঠিত স্থায়ি আন্তর্জাতিক বিচারালয় (Permanent court of International Justice) এবং বর্তমান কালের সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত (International court of Justice) আন্তর্জাতিক আইনকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক আদালতে আবেদন এবং তার রায়কে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অধুনা বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্ অধ্যাপক ওপেনহাম (*Oppenheim*) বলেছেন—আন্তর্জাতিক আইন দুর্বল আইন তব আইনের সীমারেখার খুব কাছাকাছি জায়গায় যে এ আইন সমূহের অবস্থিতি সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ("...that they lie on the extreme frontier of law is not to be denied ")। বস্তুতঃ, কোন রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করলে সে রাষ্ট্র বলে না যে, আইন ভঙ্গ করার ক্ষমতা তার আছে বলেই সে আইনভঙ্গ করছে। আইনভঙ্গকারী রাষ্ট্র তখন আন্তর্জাতিক আইনের বিকৃত ব্যাখ্যা করে স্বীয় কর্মকে সমর্থন করার চেষ্টা করে। আইন

আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলে গণ্য করার স্বপক্ষে আরও কয়েকটি যুক্তি

ওপেনহামের মতে আন্তর্জাতিক আইন দুর্বল আইন হলেও আইন

হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনের অবস্থিতির এ একটি বড় প্রমাণ। বিশ্বজনমত যত বেশী শক্তিশালী হবে আন্তর্জাতিক আইন তত বেশী আইনের মর্যাদা লাভ করবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মত প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের উপরেও আন্তর্জাতিক আইনের কার্যকারিতা ও ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে।

সংক্ষিপ্তসার

আইনের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ঃ

কতকগুলি বিধিনিষেধ দিয়ে মানুষের বাহ্যিক কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করে সমাজ জীবনকে সম্ভব করে তোলাই আইনের উদ্দেশ্য। বিশ্লেষণ পন্থীদের মতে আইন সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশমাত্র। ঐতিহাসিক মতবাদীরা আইনকে সামাজিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন। তাঁদের মতে সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন হয় আইনে এবং সমাজের অবস্থা পরিবর্তিত হলে আইনেরও পরিবর্তন হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা সমাজের কোন্ আদর্শ আইনে রূপায়িত হওয়া উচিত সেইটিই তাঁদের প্রধান বিচার্য। সমাজের কল্যাণ বিধান করে বলেই মানুষ আইন মানে—সার্বভৌম ক্ষমতার আদেশ বলে নয়। আইন রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের চাইতে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের ভিত্তিই হল আইন। আইনের প্রকৃতি সম্বন্ধে এই তিনটি মতাদর্শকে বিপরীত মুখী মনে না করে তাদেরকে পরস্পরের পরিপূরক বলে মনে করলেই আইনের যথার্থ স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা সম্যক ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আইনের উৎস ঃ

অধ্যাপক হল্যাণ্ড আইনের ছয়টি উৎসের উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল (১) প্রথা, (২) ধর্ম (৩) বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা (৪) বিচারকদের রায় (৫) ন্যায় বোধ এবং (৬) আইন সভা।

আইন ও নীতিজ্ঞান ঃ

আইন মুখ্যতঃ মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে। নীতিজ্ঞান মানুষের বাহ্যিক ক্রিয়া, চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আইনভঙ্গ করলে রাষ্ট্রের শাস্তি পেতে হয়, নীতিবহির্ভূত কাজ করলে সমাজে নিন্দার্হ হতে হয়। আইন সুস্পষ্ট, নীতিজ্ঞান অস্পষ্ট। এমন অনেক কাজ আছে যেগুলি নীতি বিরুদ্ধে না হলেও আইন বিরুদ্ধ। সমাজের নীতিবোধের স্বপক্ষে থাকলে আইনকে সহজে কার্যকরী করা যায়, বিপক্ষে হলে তা কার্যকরী করা শক্ত।

প্রাকৃতিক আইন ঃ

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকেরা তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে প্রাকৃতিক আইনের ব্যাখ্যা করেছেন। প্লেটো বস্তুনিরপেক্ষ ন্যায়বোধ এবং মানুষের সৃষ্ট আইনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন। সিনিক দার্শনিকেরা মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলে অবজ্ঞা করতেন। স্টোইক দার্শনিকেরা মানুষের শাশ্বত ন্যায়বোধকে প্রাকৃতিক আইন বলে গণ্য করেছেন। রোমের আইন ব্যবস্থায় জাসজেনসিয়াম (Jus gentium) বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও মানুষের বিবেক ও ন্যায়বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ক্রমে জাসজেনসিয়াম প্রাকৃতিক আইন বা জাসন্যাচারাল (Jus Naturale) বলে গণ্য হয়। মধ্য যুগের লেখকেরা ভগবানের নির্দেশকে প্রাকৃতিক আইন বলে প্রচার করতেন। সামাজিক চুক্তির লেখকেরা রাষ্ট্র-পূর্ব প্রাকৃতিক রাজ্যে যে নিয়ম প্রচলিত ছিল তাকেই আইন বলে ব্যাখ্যা করতেন। সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রাকৃতিক আইনের ধারণা কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মানুষের কাজের একটি নৈতিক মান নির্ণয়ের চেষ্টা করলেও তা কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক আইন কতকগুলি নীতির সমষ্টিমাত্র।

লোকে আইন মানবে কেন ?

আদর্শবাদীদের মতে মানুষ তার নীতিজ্ঞানের জন্য আইন মানে। বিশ্লেষণ পন্থীদের মতে লোকে আইন মানে রাষ্ট্রের শক্তির জন্য। ব্রাইস আইন মানার পাঁচটি শর্তের উল্লেখ করেছেন—সেগুলি হচ্ছে (১) আলস্য, (২) শ্রদ্ধা, (৩) সহানুভূতি, (৪) ভয় ও (৫) বিচার বুদ্ধি।

বিভিন্ন প্রকারের আইন :

অধ্যাপক হল্যাণ্ড আইনকে (১) সরকারী এবং (২) ব্যক্তিগত—এই দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেন। সরকারী আইনকে আবার কতকগুলি উপভাগে ভাগ করেছেন, যথা—(১) সাংবিধানিক আইন (২) শাসন সংক্রান্ত আইন, (৩) অপরাধ সম্পর্কীয়-আইন, (৪) দণ্ডবিধি সম্পর্কীয় আইন, (৫) রাষ্ট্রের ব্যক্তিত্ব আরোপ সম্পর্কীয় আইন এবং (৬) উক্ত অর্থে বিবেচিত রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রযোজ্য বিধি।

সাংবিধানিক আইন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী ও সম্পর্ক নির্ণয় করে, শাসন সংক্রান্ত আইন এবং আইনের অনুশাসনগুলি ইংলণ্ডের ও ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থায় পার্থক্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইংলণ্ডে আইনের অনুশাসন অনুসারে উচ্চতম শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে সরকারী কর্তৃপক্ষের বিচারের জন্য শাসন সংক্রান্ত আইন এক পৃথক আইনব্যবস্থা।

আন্তর্জাতিক আইন :

আন্তর্জাতিক আইনের গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ (১) বৈজ্ঞানিক প্রগতি, (২) অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং (৩) চিন্তারক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী ধারণার উন্মেষ।

অস্টিনের নির্দেশিত সংজ্ঞায় আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায় না। কারণ তাকে কার্যকরী করার জন্য কোন সার্বভৌম শক্তি নেই। হল্যাণ্ড আন্তর্জাতিক আইনকে আইন-শাস্ত্রের তিরোধান বিন্দু বলেছেন। ওপেনহাম আন্তর্জাতিক আইনকে দুর্বল আইন এবং আইনের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বলেছেন। জনমত ও নৈতিক সমর্থনের দিক থেকে বিচার করলে আন্তর্জাতিক আইনকে আইন বলা যায়।

Exercise

1. Discuss the nature and sanction of Law. How far is it correct to use such expression as the Natural Laws, Laws of Morality and International Laws? *(C. U. 1950, '58)*

2. Distinguish between the Spheres of Law and Morality and show the relation that exists between them. *(C. U. 1957)*

3 "A law is a command which obliges a person or persons to a course of conduct" Comment on the definition considering particularly the cases of (*a*) Customary Law (*b*) Equity and (*c*) International Law. *(C U. 1960)*

4. "Law is the expression of the general will of the Community"—Discuss the Statement.

5. Discuss the nature and sanction of International Law. Can Intenat onal Law be regarded as Law in the strict sense of the term? Give reasons for your answer. *(C. U. 1958)*

6. Discuss the nature of Law with special reference to its relation to morality.

7. Define law. What are its important sources?

সপ্তম অধ্যায়

রাষ্ট্র ও জাতীয়তাবাদ
(State and Nationalism)

১। ভূমিকা (Introduction):

ইংরাজী 'নেশন' (Nation), 'ন্যাশনালিটি' (Nationality) প্রভৃতি শব্দ *Natio* বা *Natus* নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে উদ্ভূত। 'জন্ম' বা 'জাতি' অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় এবং নেশন বা ন্যাশনালিটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল—'একই পূর্বপুরুষ থেকে জাত জনসমষ্টি।' নেশন, ন্যাশনালিটি প্রভৃতি শব্দগুলি যে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয় বাংলায় তার যথার্থ অনুবাদ করা দুরূহ। যে বিশেষ ধারণার সঙ্গে এই শব্দগুলি জড়িত, ভারতীয় ভাবধারার সঙ্গে তার যোগসূত্র নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি'* গ্রন্থে 'নেশন কী' প্রবন্ধে বলেন—"স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। ··নেশন ও ন্যাশন্যাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।" আজকাল অবশ্য বাংলায় ন্যাশনালিটি অর্থে জাতীয় জনসমাজ এবং নেশন অর্থে জাতি এই শব্দগুলির প্রয়োগ দেখা যায়।

নেশন, ন্যাশন্যালিটি সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা সৃষ্টির পথে আর একটি অন্তরায় এই যে, এই কথা দুটি অনেক সময়ে একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যেও এই শব্দগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে মতবিরোধ দেখা যায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাধারণতঃ যে অর্থে ন্যাশন্যালিটি শব্দটি ব্যবহৃত হয়, অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী 'নেশন' সেই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন এবং 'নেশন' শব্দটি সাধারণতঃ যে ধারণা বহন করে তার জন্য তাঁরা 'নেশন-স্টেট' (Nation State) শব্দটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী। এই মতবিরোধ ও অসুবিধা সত্ত্বেও জনসাধারণ (People), 'ন্যাশন্যালিটি' (Nationality), 'নেশন' (Nation)—এই শব্দগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ ধারণার বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সেই বিশেষ অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মোটামুটি একটা মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। সেই মতৈক্যের ভিত্তিতে শব্দগুলির সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন।

*রবীন্দ্র রচনাবলী ৩য় খণ্ড পৃ. ৫১৫

জনসমাজ (People) : জনসমাজ হল একই ভূখণ্ডের অধিবাসী, এক জনসমষ্টি যাদের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় বোধ অভিন্ন। বিভিন্ন ক্ষেত্রের এই অভিন্নতা ও ঐক্য সমাজবন্ধনের সূত্র হিসেবে কোন নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে যেখানে কার্যকরী, সেখানেই জনসমাজের উদ্ভব ঘটে।

জনসমাজ, ন্যাশনালিটি ও নেশন শব্দগুলির অর্থ

ন্যাশনালিটি (Nationality) : ন্যাশনালিটি শব্দটি দুটি প্রধান অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, ন্যাশনালিটি বলতে নির্দিষ্ট জনসমাজের জাতীয় ভাব বা জাতীয় ঐক্যানুভূতি বোঝায়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় চেতনাসম্পন্ন নির্দিষ্ট এক জনসমাজকে ন্যাশনালিটি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ন্যাশনালিটি শব্দটি উক্ত দুই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এবং উক্ত দুই অর্থে ব্যবহৃত হলেও, শেষোক্ত অর্থেই এর গুরুত্ব বেশি। কোন জনসমাজ (People) যখন রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, যখন সেই জনসমাজের মনে নিজস্ব সরকারের মধ্য দিয়ে আপন ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের আগ্রহ জাগ্রত, তখন সেই জনসামাজ এক ন্যাশনালিটিতে পরিণত হয়েছে বলা চলে। তাহলে ন্যাশনালিটি হল সেই বিশেষ অনুভূতি যা নির্দিষ্ট জনসমাজকে যে শুধু ঐক্যবদ্ধ করে তাই নয়, তাকে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাসম্পন্নও করে।

নেশন (Nation) : ন্যাশনালিটির পরিণত প্রকাশ হল নেশন। নিজস্ব রাষ্ট্রের অধিকারী ঐক্যবদ্ধ জনসমাজ হল 'নেশন', নেশন বলতে তা হলে ন্যাশনালিটির অপেক্ষা আরও বেশি বা অতিরিক্ত কিছু বুঝতে হবে। লর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রনৈতিক ভাবে সংগঠিত জনসমাজ যখন বহিঃশাসন থেকে মুক্ত বা মুক্ত হবার চেষ্টা করে তখন তারা হয় নেশন। ন্যাশনালিটি যেখানে সার্বভৌম অর্থাৎ যেখানে তার একটি নিজস্ব রাষ্ট্র থাকে সেখানে সে 'নেশন', সংক্ষেপে বলতে গেলে—ন্যাশনালিটি + রাষ্ট্র = নেশন।

রাষ্ট্র ও নেশন (State and Nation) : রাষ্ট্র বলতে আমরা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, সরকার ও সার্বভৌমিকতাসম্পন্ন ধারণা বা প্রতিষ্ঠানকে বুঝি। যখন রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসমষ্টি এক আদর্শ বা ঐতিহ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন তা হল একটি নেশন বা জাতি। অন্যভাবে বলা যায় যে, এক আদর্শ, ঐতিহ্য বা কৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কোন জনসমষ্টির মধ্যে যখন একটি ঐক্যভাব জাগ্রত হয় তখন তারা একটি নেশন বা জাতিতে পরিণত হয়। কোন এক রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে এই ঐক্যভাব না'ও থাকতে পারে।

এই ঐক্য ভাবের অভাবে সেই রাষ্ট্র যে রাষ্ট্র পদবাচ্য হবে না এমন কথা নয়, এই ঐক্যবোধ না থাকলেও সেই রাষ্ট্র রাষ্ট্র পদবাচ্য হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অস্ট্রীয়াহাঙ্গেরীর নাম উল্লেখ করতে পারি। এই সময় অস্ট্রীয়াহাঙ্গেরী একটি রাষ্ট্র ছিল কিন্তু প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধের অভাবে সেখানকার জনসমষ্টি একটি জাতিতে পরিণত হতে পারেনি।

অবশ্য আমাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন রাষ্ট্রে বহুদিন যাবৎ বসবাস করলে সেখানকার জনসমটির মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঐক্যভাব জাগ্রত হয় এবং কালক্রমে তারা একটি নেশন বা জাতিতে পর্যবসিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডের তিনটি পৃথক ভাষা ভাষী জনসমষ্টি কালক্রমে এক সাধারণ জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হতে সক্ষম হয়েছে। গ্রেটব্রিটেনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদেব স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পরিসমপ্তির পর থেকে আমরা জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র সৃষ্টির একটি প্রবণতা দেখতে পাই। অবশ্য জাতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র একটি সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ কিনা সেবিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'এক-জাতি এক রাষ্ট্র' এই পর্যায়ে করা হল।

২। ন্যাশনালিটির উপাদান (Elements of Nationality):

যে সমস্ত উপাদান কোন এক বিশিষ্ট জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধের সৃষ্টি করে সেগুলিকেই ন্যাশানালিটির উপদান বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ ছয় প্রকার উপাদানের উল্লেখ করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, এই উপাদানগুলির কোন একটি উপাদান ন্যাশন্যালিটি সৃষ্টির পক্ষে বিশেষ অপরিহার্য নয় যদিও এদের মধ্যে কোন একটি উপাদানের অভাব ঘটলে প্রয়োজনীয় ঐক্যবোধ দুর্বল হতে পারে।

ন্যাশনালিটির উপাদান ছটি: (১) **ভৌগোলিক ঐক্য** (২) **কুলগত ঐক্য** (৩) **ভাষাগত ঐক্য** (৪) **ধর্মীয় ঐক্য** (৫) **একই সরকারের অধীনতা বা অভিন্ন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা** এবং (৬) **ঐতিহ্যগত ঐক্য**।

(১) **ভৌগোলিক ঐক্য (Geographical Unity):** কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে বাস করলে এক জনসমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়। কোন এক জনসমাজ যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়

—তাদের মধ্যে ন্যাশনালিটির ভাবধারা জাগ্রত হতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ ন্যাশনালিটি কোন না কোন এক নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বাস করে থাকে। তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে কয়েক বৎসর পূর্বেও ইহুদী জাতির কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্র ছিল না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে তারা ছড়িয়ে বাস করলেও ন্যাশনালিটি হিসেবে তাদের ঐক্যবোধের অভাব ছিলনা। কোন দুর্বল ন্যাশনালিটি অধিক দিন ধরে অন্য রাষ্ট্রে বাস করলে অন্য কোন শক্তিশালী ন্যাশনালিটির সংস্পর্শে আসার ফলে জনসমাজ হিসেবে তাদের পার্থক্য লুপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। চেক, শ্লোভাক, জার্মান—প্রভৃতি বিভিন্ন ন্যাশনালিটি বহুদিন ধরে আমেরিকায় বাস করার ফলে তাদের স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে এবং তারা এক নূতন জাতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। ইহুদীদের ক্ষেত্রে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকার কারণ—ন্যাশনালিটি হিসেবে তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অত্যন্ত সুদৃঢ়।

(২) **কুলগত ঐক্য** (**Racial unity**): একই কুল বা Race-এর অন্তর্গত হলে কোন এক জনসমাজের মধ্যে একাত্মবোধ জাগ্রত হতে পারে। হের হিটলার জার্মান জাতিকে এক মহান কুলগত ঐতিহ্যের ধারক বলে ধরে নিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত করেন।

আধুনিক নৃতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ করেছেন যে, কোন এক জাতির মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা নিছক কল্পনামাত্র। নর্ডিক জাতির রক্তের বিশুদ্ধতার বিশ্বাস নিয়ে হিটলার জার্মান জাতির জীবনে এক বিষম বিপর্যয় ডেকে এনেছিলেন। কুলগত ঐক্যের অন্ধবিশ্বাস হিটলারের রাজনীতির এক প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, আজকের দিনে কুলগত ঐক্য জাতীয় ভাবধারা সৃষ্টির একটা বড় উপাদান বলে গণ্য হয় না। জার্মান, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি জাতির মধ্যে কিছুটা কুলগত ঐক্য থাকলেও ন্যাশনালিটি হিসেবে তারা পৃথক। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন কুলোদ্ভূত জাতি একত্রে বাস করলে, তারা এক পৃথক 'আমেরিকান' জাতিতে পরিণত হয়েছে।

(৩) **ভাষাগত ঐক্য** (**Sameness of Language**): ভাষা মনের ভাবপ্রকাশের বাহন এবং ভাব বিনিময়ের মাধ্যমেই একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। সেইজন্য এক ভাষা-ভাষী হলে এক জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়তার ভাব জাগ্রত হয়। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফিক্‌টের (*Fichte*) মতে ভাষাই হচ্ছে জাতীয় বন্ধন সৃষ্টির একটি বড় উপাদান। ইউরোপে অনেক জাতীয় আন্দোলন

ভাষার সমস্যাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। চেক ভাষাভাষী লোকেদের এক পৃথক রাষ্ট্রের জন্যই বোহেমিয়া দাবি করা হয়েছিল।

বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে কৃষ্টি ও সংস্কৃতির আদান প্রদানের একটি বড় অন্তরায় হল ভাষার পার্থক্য। তবে ভাষার পার্থক্য থাকলে যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠবেনা—এ ধারণা ঠিক নয়।

সুইজারল্যাণ্ডে প্রধানতঃ জার্মান, ইতালী ও ফরাসী—এই তিনটি পৃথক ভাষাভাষী জনসমষ্টি দেখা যায়। এই ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এক পৃথক জাতীয়তাবোধের ভাবধারায় তারা ঐক্যবদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছে। বেলজিয়ামের লোকেরা দুটি পৃথক ভাষায় কথা বলে, তবুও তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের অভাব নেই। আবার আমেরিকা এবং ইংলণ্ডের লোকেরা এক ভাষা-ভাষী হলেও তারা আমেরিকান এবং ব্রিটিশ—এই দুটি পৃথক ন্যাশনালিটির অন্তর্গত।

ভাষাগত পার্থক্য ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্যের পথে একটি বড় অন্তরায়। ভাষার এই ব্যবধান সত্ত্বেও ভারতবর্ষ একদিন জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। বহুদিন ধরে বিদেশী শাসকের অধীনে থাকাই হয়তো এই ঐক্যের কারণ। ১৯৪৭ এর পর স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও দ্বন্দ্ব আজ এত প্রবল আকার ধারণ করেছে যে, ভারতে জাতীয় ঐক্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। "ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে—"[1]

তবে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতে ভাষার বিভিন্নতাকে ভারতে জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রতিবন্ধক বলে মনে করা উচিত নয়। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ভাষকরণ ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরিষদের ২৩তম সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির তরফ থেকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার প্রচেষ্টা যদি দেখা যায় তবে ভাষা তার কারণ হবে না। ভাষার বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ও কৃষ্টিগত পার্থক্যও যদি প্রকট হত—তবেই আমাদের জাতীয় ঐক্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হবার যথেষ্ট কারণ থাকত। ভরসার কথা এই যে, ভারতবাসীরা ভিন্ন ভাষাভাষী হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা একই ধর্ম, কৃষ্টি এবং নৈতিক আদর্শবোধের অনুগামী।

(৪) **ধর্মীয় ঐক্য (Religious unity) :** ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তা-বাদের একটি বড় উপাদান। ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে ছড়িয়ে বাস করা

1 'যে দেশে বহুধর্ম বহু ভাষা'—অন্নদাশঙ্কর রায়, 'দেশ', ১০ই নভেম্বর, ১৯৬২।

সত্ত্বেও ধর্মীয় ঐক্যের প্রভাবেই জাতি হিসেবে তাদের পৃথক অস্তিত্ব সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। অধ্যাপক গিলক্রিস্টের মতে ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য যেখানে প্রবল, সেখানে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় এবং স্থায়ী হতে পারে না।[1] উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন যে, তুর্কী ও ম্যাগইয়াররা এক বংশোদ্ভূত এবং প্রায় এক ভাষাভাষী হয়েও কেবলমাত্র খৃষ্টান এবং মুসলমান এই ধর্মীয় পার্থক্যের জন্যই এক জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। ভারত ও পাকিস্তান—এই দুটি পৃথক্ রাষ্ট্রে ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়া এই উক্তির যাথার্থ প্রমাণ করে।

ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য সত্ত্বেও যে জাতীয়তাবোধ জন্মাবে না এ ধারণা ঠিক নয়। পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রেই ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে এক হয়ে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে সক্ষম হয়েছে।

(৫) **একই সরকারের অধীনতা** (**Common Political union**): এক সরকারের অধীনে দীর্ঘকাল ধরে বাস করলে অনেক সময় জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়। ভারতবর্ষ বহু ভাষাভাষীর দেশ। গুজরাটী, বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, তেলুগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকেরা ভারতবর্ষে দীর্ঘকাল যাবত এক বিদেশী শাসকের অধীনে বাস করায় জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হতে সক্ষম হয়েছিল। বিদেশী শাসকের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের সমস্যা আজ প্রবল আকার ধারণ করেছে।

একই সরকারের অধীন থাকাব ফলে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং ওয়েলস্-এর লোকেরা আজ ব্রিটিশ জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করতে, সক্ষম হয়েছে। বিভিন্ন বংশোদ্ভূত জাতি এবং বহু ভাষাভাষী জনসমষ্টি দীর্ঘকাল ধরে আমেরিকায় বসবাস করার ফলে তাদের পৃথক সত্তা লোপ করে এক নূতন 'আমেরিকান' জাতিতে নিজেদের সুসংবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

(৬) **ঐতিহ্যগত ঐক্য** (**Cultural unity**): দীর্ঘকাল ধরে এক ভূ-খণ্ডে বাস করলে এক সাধারণ ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি অনিবার্যভাবে এক জনসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। বংশ (Race), ভাষা, আচার-ব্যবহার, পোশাক্-পরিচ্ছদ প্রভৃতি ব্যাপারে ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। এই বিভেদের মধ্যেও এক মহান মিলন সম্ভব হয়েছে। ইতিহাস

1 'National union, other things being equal, is not likely to be strong and lasting where there are fundamental differences in faith, as between Christianity and Muhammadanism''—*Gilchrist*

তাদের সমান সুখ-দুঃখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—এক বৃহত্তর সর্বভারতীয় কৃষ্টির তারা ধারক ও বাহক। তাই এই বাহ্যিক বিভেদের মধ্যেও ভারতীয়েরা এক জাতি। অতএব, ভারতীয় মহান ঐক্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ শংকিত হবার কোন কারণ নেই।

বার্নস (*C. D. Burns*) বলেছেন, "রক্তের অভিন্নতা অপেক্ষা এক স্মৃতি এবং এক আদর্শ জাতি গঠনে অধিকতর সাহায্য করে" ("A common memory and a common ideal—these more than common blood make a nation")।

আমরা এযাবত ন্যাশনালিটির বিভিন্ন উপাদানগুলি আলোচনা করলাম এবং দেখলাম এই বিভিন্ন উপাদানগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ন্যাশনালিটি গঠনে সাহায্য করলেও এদের কোনটিই একেবারে অপরিহার্য নয়। ফরাসী লেখক অধ্যাপক রেনাঁরের (*Renen*) মতে ন্যাশনালিটি মূলতঃ একটি ভাগবত ধারণা (Spiritual sentiment)। অধ্যাপক জিমার্ন বলেছেন যে, ন্যাশনালিটি ধর্মের মতই একটি মনোগত ধারণা। বস্তুতঃ, এই ধারণার উৎপত্তি, গতি ও প্রকৃতি রহস্য-জনক। ধর্ম, ভাষা, জাতি (Race) প্রভৃতি কোন এক বিশেষ উপাদানের মধ্যে এর রহস্য আবিষ্কার করা এক দুরূহ ব্যাপার, কেননা এ হল একটি আত্মিক ঐক্যানুভূতি, মনের দিক থেকে ঐক্যবোধ। জাতি, ধর্ম ও ভাষা প্রভৃতি বহিরঙ্গ উপাদানের স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও এই ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। এই ঐক্যবোধে উদ্বুদ্ধ জনসমাজের সকলেই ভাবেন আমরা এক, আমরা অন্য জনসম্প্রদায় থেকে পৃথক। নিজেদের মধ্যে একত্ববোধ এবং অপর জনসম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ—এই দুই আপাতবিরোধী চেতনা ন্যাশনাল ঐক্যবোধের মধ্যে নিহিত আছে।

৩। জাতীয় রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ (Growth of Nation-State):

সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবনযাত্রা নির্বাহ করে আসছে। শক্তিশালী রাজার অধীনে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এক বিরাট জনসংখ্যা বহুদিন যাবৎ বাস করেছে। তবে আধুনিককালে জাতীয়তাবোধ বলতে আমরা যে ধারণাটিকে বুঝি তার উৎপত্তি কিন্তু বেশী দিনের নয়। জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য যে প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিবেশের প্রয়োজন হয় তার অভাবের জন্যই এই ধারণা তখন উদ্ভব হতে পারেনি।

জাতীয় রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলন অনিবার্যভাবে জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পথ সুপ্রশস্ত করে। পোপ যখন সমগ্র ইউরোপের ধর্মগুরু বলে দাবী করতেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন রাজাদের কাছ থেকে আনুগত্য দাবী করতেন তখন স্বভাবতই জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হতে পারে না। পোপের নৈতিক অধঃপতনের ফলে সাধারণ লোকের মনোভাব যখন তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল, ইউরোপের রাজন্যবর্গরা সেই বিরূপ মনোভাবের সুযোগ নিয়ে জনসাধারণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করলেন। রাজার ক্ষমতার আর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সামন্তসম্প্রদায়। রাজার ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ করে এবং নিজেদের মধ্যে অবিরত কলহদ্বন্দ্বে লিপ্ত থেকে তারা যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল, ইউরোপের দেশগুলির সাধারণ মানুষ তার পরিসমাপ্তি কামনা করেছিল। ইউরোপের নবজাগরণের নূতন ভাবধারায় ইউরোপীয় চিন্তার রাজ্যে যে নূতন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সাধারণ মানুষ চেয়েছিল তাকে এক শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে। এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজনে তারা এক কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় স্বভাবতই শক্তিশালী রাজশক্তিকেই সমর্থন জানিয়েছিল। পোপের ও সামন্তসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত রাজশক্তির উত্থানের মধ্যেই জাতীয় রাষ্ট্রের প্রথম সূচনা। এই সময় ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের বণিকসম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বীতা শুরু হয়, জাতীয়তাবাদের আদর্শকে তা দৃঢ়তর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে।

ষোড়শ শতাব্দীর ধর্মীয় আন্দোলন ও নব জাগরণের প্রভাব

রাজশক্তি যখন অতিরিক্ত শক্তিশালী হয়ে সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হতে শুরু করে তখন তার বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নেপোলিয়নের পররাজ্য লিপ্সার প্রতিক্রিয়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করে। ভিয়েনা কংগ্রেসের পর ইউরোপের মেটারনিক ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এই নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধকে অস্বীকার করে ইউরোপের মানচিত্রকে প্রাচীন ভাবধারার ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা করলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে গণবিপ্লব আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৩০ সালে বেলজিয়াম এক নূতন জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ম্যাট্‌সিনি, কাভুর ও গ্যারিবল্ডীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন ইটালী ১৮৭০ সালে

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিক্রিয়া

এক নূতন রাষ্ট্র হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বার্লিন কংগ্রেসের পর রুমানিয়া, মন্টিনিগ্রো প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্র তুরস্কের অধীনতা ছিন্ন করে স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয় রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সনের প্রচেষ্টায় জাতীয়তাবোধের ভিত্তিতে পূর্ব ইউরোপে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। পোল্যাণ্ড চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি নূতন রাষ্ট্র এই সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব

ইউরোপের জাতীয়তাবোধ থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে, বিদেশী শক্তির অধীনতা পাশ ছিন্ন করার জন্য যে জাতীয় আন্দোলন দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তা সাফল্য-লাভ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশ পশ্চিমীশক্তির অধীনতা ছিন্ন করে নূতন জাতীয়রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আফ্রিকায় নবজাগরণ

জাতীয়তাবোধের এই নূতন প্রাণবন্যা আজ আফ্রিকার নিপীড়িত জাতিগুলিকেও স্পর্শ করেছে। পশ্চিমীশক্তির অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে তারাও আজ স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে।

৪। 'এক জাতি এক রাষ্ট্র' (One nation one State) :

ন্যাশনাল ঐক্যে উদ্বুদ্ধ জনসমাজের পক্ষে একটি নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করার বাসনা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক ন্যাশনালিটি বাস করলে গণতন্ত্রের পদ্ধতি অনুসারে স্বভাবতঃই কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ ন্যাশনালিটি সরকার গঠনের সুযোগ পাবে এবং সে ক্ষেত্রে অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ ন্যাশনালিটি নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের সাহায্যে নিজেদের রাষ্ট্রনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার সুযোগ পাবে না। তাই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার জন্য একটি রাষ্ট্রে একটি ন্যাশনালিটি থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। একটি রাষ্ট্রীয় সীমারেখায় একাধিক ন্যাশনালিটি বাস করলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল

মিলের অভিমত

তাঁর *Representative Government* নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্রের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে, সরকারের সীমারেখা এবং ন্যাশনালিটির সীমারেখা সমানুপাতিক হওয়া উচিত। তিনি এই কথা বলতে চেয়েছেন যে, গণতন্ত্রের খাতিরে একটি রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে একটি মাত্র ন্যাশনালিটি থাকা উচিত।[1]

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধি সম্মেলনে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন 'এক জাতি এক রাষ্ট্রের' নীতিটি বলিষ্ঠভাবে প্রচার করেন। তাঁর ধারণা, একটা রাষ্ট্রের মধ্যে বহুজাতি বাস করায় অশান্তি বিদ্বেষের ফলেই মহাযুদ্ধ শুরু হয়। সুতরাং পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত করত হলে 'এক জাতি এক রাষ্ট্রে'র নীতিকে গ্রহণ করতে হবে। প্রেসিডেণ্ট উইলসনের এই বলিষ্ঠ যুক্তির ফলে সন্ধিসম্মেলনে উপস্থিত ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ইউরোপের মানচিত্রকে নূতনভাবে রূপদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ফলে পূর্ব ইউরোপে পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, এস্টোনিয়া, ল্যাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, ড্যানজিগ ও চেকোশ্লোভাকিয়া—এই সাতটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

প্রেসিডেণ্ট উইলসনের সমর্থন ও কয়েকটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি

'এক জাতি এক রাষ্ট্র'-নীতির স্বপক্ষে যুক্তিঃ 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'-নীতির স্বপক্ষে যে কয়েকটি বলিষ্ঠ যুক্তি আছে তা অস্বীকার করা চলে না।

প্রথমতঃ, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মাত্র জাতি বাস করলে তারা নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা সরকার গঠনের সুযোগ পায়। প্রত্যেক জাতির নিজ নিজ পছন্দমত সরকার গঠনের অধিকার গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার অধিকার আছে। একমাত্র নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত সরকারের সাহায্যে জাতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে জীবিত রাখা সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, একটি রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে একাধিক জাতি বাস করলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করে তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে। ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতির মধ্যে পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত করতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে অস্বাস্থ্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক

---

1 "It is in general a necessary condition of free institutions, that the boundaries of governments should coincide in the main with those of nationalities"—*Mill.*

সময় বৈদেশিক উস্কানি ও হস্তক্ষেপের ফলে গৃহযুদ্ধ অথবা জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই আভ্যন্তরীণ শান্তি ও বিশ্বশান্তি সম্ভব করার জন্যও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

চতুর্থতঃ, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকৃত হলে, প্রবল জাতির শাসন ও শোষণে দুর্বল জাতিকে নিপীড়িত হতে হবে। প্রত্যেক জনসম্প্রদায়েরই বিজাতীয় শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত থাকার সংগত অধিকার আছে মেনে নিলে, আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীকে না মেনে উপায় থাকে না।

পঞ্চমতঃ, নিজেদের দ্বারা গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরস্পরের ভিতরে প্রীতির যোগ থাকায় রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্ব ঘটে এবং বিপ্লবের সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত বা দূরীভূত হয়। এই ব্যবস্থায় জনসাধারণ স্বভাবতই সরকারের প্রতি অনুগত থাকে।

উপসংহারে বলা চলে যে, মানব সভ্যতার বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি বিধানের জন্যও আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতির প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারপ্রাপ্ত বিভিন্ন জনসম্প্রদায় সে ক্ষেত্রে নিজ নিজ বিশেষ সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে সক্ষম হবে এবং তার ফলে বিশ্বসংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তার করতে সহায়তা করিতেছে। মনুষ্যত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি সুর যোগ করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোক যে একটি কল্পনাগণ্য মহিমার সৃষ্টি করিতেছে, তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।"*

'এক জাতি এক রাষ্ট্র'-নীতির বিপক্ষে যুক্তিঃ বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটন (*Lord Acton*) 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'-নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর মতে মানুষের সমাজবদ্ধ হওয়ার মত বিভিন্ন জাতির একটি রাষ্ট্র একতাবদ্ধ হওয়া সভ্য জীবনযাপনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। একাধিক জাতি এক রাষ্ট্রে বাস করলে সভ্যতার দিক থেকে দুর্বল এবং অনগ্রসর জাতি উন্নততর সভ্য জাতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের সভ্যতাকে পুনরুজ্জীবিত এবং প্রাণবন্ত করে তুলতে সক্ষম হয়। বিভিন্ন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একত্র সংমিশ্রণে উন্নততর সভ্যতার সৃষ্টি হয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবের আদান-প্রদান বন্ধ হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় বিভিন্ন জাতির একত্র সংমিশ্রণ না ঘটলে সেই একই অবস্থার

লর্ড অ্যাকটনের সমালোচনা

* 'নেশন কি' "আত্মশক্তি"—রবীন্দ্র রচনাবলী ; ৩য় খণ্ড পৃঃ ৫১৯।

সৃষ্টি হয়। তাই লর্ড অ্যাক্টন বলেছেন যে, যেখানে রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যে একটি মাত্র জাতি বাস করে, সমাজ সেখানে অনগ্রসর।

'এক জাতি এক রাষ্ট্র' এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠিত হলে অনেক রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। এই নীতি বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে গ্রেট ব্রিটেনকে ভেঙে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং ওয়েল্‌স—এই তিনটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি করতে হবে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড এবং ওয়েল্‌সের লোকেরা সম্প্রীতির সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বাস করছে। নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টির কথা তারা কল্পনাও করে না। একই কারণে সুইজারল্যাণ্ডকে ভেঙ্গে তিনটি এবং বর্তমান সোভিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ষোলটি পৃথক রাষ্ট্র করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে 'এক জাতি এক রাষ্ট্রের' ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করলে সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা অধিকতর জটিল আকারে ধারণ করবে।

'এক জাতি এক রাষ্ট্র' নীতির বাস্তব প্রয়োগের অসুবিধা ও বিরুদ্ধ যুক্তি

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিটি জাতির জন্য একটি করে পৃথক রাষ্ট্র সৃষ্টি করলে অনেক সময় প্রকৃতির বিধান ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দিকটিও অস্বীকার করতে হবে। প্রকৃতিদত্ত এক ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অনেক সময় একাধিক জাতি পাশাপাশি বাস করে। প্রতিটি জাতির জন্য এক একটি পৃথক রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে অনেক সময় প্রকৃতির বিধানের বিরুদ্ধে যেতে হয়, যার ফলে অনেক জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। পাকিস্তানের অর্থনৈতিক এবং শাসনের সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যার জন্য দায়ী, দুটি বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক অবস্থান। প্রকৃত পক্ষে, প্রাকৃতিক সম্পদ, যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অস্বীকার করে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নীতি কার্যকরী হলে জাতির অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ও প্রতিরক্ষা শক্তি দুর্বল হতে বাধ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া প্রভৃতি বহু জাতির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'এক জাতি এক রাষ্ট্রের' ভিত্তিতে গঠিত বহু রাষ্ট্র অপেক্ষা শক্তিশালী।

১৯১৯ সালের সন্ধিসম্মেলনের পর পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা পুনর্বণ্টনের পরও এই অঞ্চলের শান্তি ফিরে আসে নি। নবগঠিত চেকোশ্লোভাকিয়া এবং পোল্যাণ্ডের মধ্যে অনেক জার্মান জাতির লোক থেকে যায়। দুটি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে জার্মান সংখ্যালঘুদের উস্কানি দিয়ে জার্মানীর তদানীন্তন রাষ্ট্র

নায়ক হের হিটলার অবিশ্রাম প্রচার কার্য চালিয়ে যান। হিটলারকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯৩৮ সালে মিউনিক চুক্তি (Munich Agreement) সম্পাদিত হলেও তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয় নি। অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীয় ন্যাশনালিটির বহুলোক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ছড়িয়ে থাকায় তাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত ছিল না। সুতরাং, 'এক জাতি এক রাষ্ট্রের' ভিত্তিতে রাষ্ট্র পুনর্গঠন করা সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল।

এই নীতি সম্বন্ধে লর্ড কার্জনের মন্তব্য

পরিশেষে আমরা লর্ড কার্জনের উক্তি উল্লেখ করে বলতে পারি যে, আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারনীতি এমন একটি অস্ত্র যার দু দিকে ধার। এই নীতির ভাল ও মন্দ দুটি দিকই আছে। একই রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকদের এ নীতি যেমন ঐক্য-বদ্ধ হবার প্রেরণা দেয়, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ন্যাশনালিটিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের মধ্যে বিরোধ ও বিদ্বেষ-ভাবের সৃষ্টি করে।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি একত্রে হাত মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একত্রিত হবার প্রবণতা যখন দেখা দিয়েছে, যান্ত্রিক উন্নতি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিকামনায় পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র যখন অনিবার্যভাবে ঘনিষ্ঠতর যোগসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এক নতুন বিশ্ববিধানের কল্পনা যখন পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তখন 'এক জাতি এক রাষ্ট্র'র ভিত্তিতে পৃথিবীর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুনর্বণ্টনের চেষ্টা চললে আমরা তাকে ইতিহাসের পশ্চাৎগতির নিদর্শনই বলব।

৫। ন্যাশনালিটির অন্যান্য অধিকার (Other Rights of Nationalities):

যে রাষ্ট্রে একাধিক জাতি বাস করে সেখানে জাতীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রগঠন সম্ভব না হলেও, সংখ্যালঘু জাতিগুলির কয়েকটি প্রয়োজনীয় অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেকারণ রাষ্ট্রের মধ্যে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যাতে তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ধর্ম, ভাষা অথবা সংস্কৃতির ভিত্তিতে যখন ভিন্ন ভিন্ন জনসম্প্রদায় ঐক্যবদ্ধ হয় তখন রাষ্ট্রের তরফ থেকে এমন কোন আইন বলবৎ করা উচিত নয় যাতে তাদের এই সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য নষ্ট হয়।

সংখ্যালঘু জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষিত হওয়া উচিত

কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসম্প্রদায় বাস করলে, রাষ্ট্রের সেই ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে খর্ব করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও সরকারের সাধারণ কার্যাবলী পরিচালনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রধান ভাষাগুলির স্বীকৃতি থাকা উচিত। ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে গঠিত জনসমাজের নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যবহার ও উন্নয়নের পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে প্রত্যেক জাতির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সেখানকার আইনকানুন ষোলটি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং প্রত্যেক ভাষাভাষী সম্প্রদায় নিজ নিজ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায়তনে পঠন পাঠনের সুযোগ পায়। সুইজারল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টের কার্যাবলী জার্মান, ফরাসী এবং ইতালীয়—এই তিনটি পৃথক ভাষায় পরিচালিত হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানেও ভাষা ও কৃষ্টির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতির উদাহরণ

অধ্যাপক গার্ণারের মতে সভ্যতার অগ্রগতির দিক থেকে প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভাষা সরকার কর্তৃক উৎসাহিত হওয়া সংগত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তাঁর মতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, ধর্মীয় প্রার্থনায় অথবা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার চলতে পারে, কিন্তু যে ভাষা সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় এবং যার দ্বারা আন্তর্জাতিক ভাবের আদানে-প্রদান বা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যার ব্যবহার সম্ভব নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের উপযুক্ত অন্যান্য উন্নততর ভাষাগুলির মত তাদের সমান সুযোগ ও স্বীকৃতি দেওয়ার কোন স্বার্থকতা থাকতে পারে না।

অধ্যাপক গার্ণারের মত

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থানীয় আচারব্যবহার ও প্রথা রক্ষা করার অধিকারও অন্যতম অধিকার। তবে এই প্রথাগুলি যাতে সাধারণ নৈতিকতার পরিপন্থী না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রাচীন হিন্দুসমাজের গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপ করা অথবা সতীদাহ-প্রথা কখনই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। নৈতিক প্রয়োজনে এই জাতীয় কু-প্রথা রহিতকরণ সম্পূর্ণ যুক্তি-সংগত। অধ্যাপক গার্ণারের মতে কোন স্থানীয় আইন দেশের সাধারণ আইনের পরিপন্থী হলে, সেই আইনকে রক্ষা করার অধিকার কোন সম্প্রদায়ের থাকা উচিত কিনা তা চিন্তার বিষয়। রোম তার বিজিত জাতিগুলির উপর তার আইন আরোপ করে কোন অন্যায়

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচারব্যবহার এবং স্থানীয় প্রথা বাঁচিয়ে রাখার অধিকার কতদূর যুক্তিসংগত

করেনি। রোমের শ্রেষ্ঠতর আইন ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সকলেই স্বীকার করবে।

৬। জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা (Nationalism and Internationalism):

মানুষ মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব বিকাশের দাবি যেমন রাষ্ট্রব্যবস্থার অবশ্য স্বীকার্য নীতি, প্রত্যেক জাতির নিজের ধর্ম, ভাষা ও কৃষ্টির-উন্নতিসাধনের দ্বারা শ্রেষ্ঠতর জীবনযাত্রা নির্বাহের অধিকারও তেমনি এক অপরিহার্য সত্য। ফরাসী দার্শনিক রেনাঁ (*Renan*) জাতীয়তাবাদকে একটি আধ্যাত্মিক ধারণা (spritual concept) বলে অভিহিত করেছেন। এই অনুভূতি মানুষকে একতাবদ্ধ করে। এর ফলে ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে মানুষ এক রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মধ্যে সমষ্টিগত কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের উর্ধ্বে এই একত্ববোধের চৈতন্য মানুষকে দেশের ও দশের প্রয়োজনে ত্যাগ স্বীকার করার প্রেরণা দিয়ে এসেছে। এই বিশেষ ঐক্যানুভূতি মানুষকে নব নব শিল্প, কলা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধতর করার কাজে সাহায্য করেছে। সমষ্টির প্রয়োজনে ব্যবহৃত জাতীয় সম্পদ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথনির্দেশ করেছে এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক দরবারে তার ন্যায়-সংগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মানুষ তার জাতীয় জীবনকে সুসংবদ্ধ ও সুগঠিত করার চেষ্টা করে এসেছে। জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ইটালীয় দার্শনিক ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) ইটালীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতায় ব্যথিত হয়ে তার জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তাকে উদাত্ত কণ্ঠে প্রচার করেন। প্রত্যেক জাতির এক অন্তর্নিহিত সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। এই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য, এক জাতীয় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়ার জন্য ইটালীর অধিবাসীদের তিনি আহ্বান জানান।

জাতীয়তাবাদের অবদান

জাতীয়তাবাদের আদর্শ যখন ক্ষুদ্র স্বার্থের সীমা ছাড়িয়ে বৃহত্তর প্রয়োজনে মানুষকে ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে এবং এক বিশেষ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে তখন এই আদর্শ এক মহান আদর্শ সন্দেহ নেই। কিন্তু আধুনিক কালে আমরা জাতীয়তাবাদের অন্য এক ভয়াবহ রূপ প্রত্যক্ষ করেছি। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদী শাসন ও সাম্রাজ্যবাদ, জাতীয়তাবাদকে ম্যাট্‌সিনি, রেনাঁ কথিত উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করেছে এবং তাকে বিকৃতির পথে

নিয়ে গেছে। প্রবলের আক্রমণে যেখানে দুর্বলের সংস্কৃতি বিপন্ন, পরশাসনে যেখানে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ, সেখানে জাতীয়তাবাদ স্বদেশ প্রেমের রূপ ধারণ করে। পরশাসনে উৎপীড়িত বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজ তখন স্বাভাবিক কারণেই স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। অন্যদিকে মদমত্ত শক্তিপুঞ্জ তাদের অন্যায় স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য দুর্বল জাতিপুঞ্জের উপর প্রভুত্ব বিস্তারে বদ্ধ-পরিকর হয়। এর ফলে জাতিতে জাতিতে সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ

অধ্যাপক ল্যাস্কি দেখিয়েছেন, বর্তমান শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং আধুনিক যুদ্ধের কলা-কৌশল জাতীয় রাষ্ট্রকে মানবতার বিরুদ্ধে এক সর্বনাশা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যের কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য এবং অতিরিক্ত মুনাফার আশায় সেগুলি বিদেশে বিক্রয়ের প্রয়োজনীয়তায় নূতন নূতন উপনিবেশ সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দেয়। বাণিজ্যের প্রয়োজনে উপনিবেশের সৃষ্টিকে অনিবার্য করে তোলে আধুনিক জাতীয় রাষ্ট্র। 'বণিকের মানদণ্ড' রূপান্তরিত হয় 'রাজদণ্ডে'। জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় উন্মত্ত ইউরোপীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর উনবিংশ শতকের ইতিহাস এসিয়া ও ইউরোপের অনুন্নত জাতিগুলির স্বাধীনতা হরণ করার অর্থ নৈতিক শোষণের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, জাতীয় স্বার্থের নামে বিশেষ বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর স্বার্থে অবাধ বাণিজ্যের সুফল থেকে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা হয়—সংরক্ষণমূলক শুল্ক (Protective tariff), বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির নীতি (most favoured nation clause) ইত্যাদি নানা প্রকার বাধা নিষেধের দ্বারা। স্পষ্টতঃ দেশপ্রেমের নামে সাধারণের সুযোগ সুবিধাকে জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রেণীস্বার্থকে বাঁচিয়ে রাখাই এর আসল উদ্দেশ্য।

ল্যাস্কি ও জাতীয়তাবাদ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই এই সংঘাতের বর্বর আত্মপ্রকাশ পৃথিবীর সর্বত্র চিন্তাশীল ব্যক্তিদের পীড়িত ও ভাবিত করে তোলে। তাই ৬২ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ জাতিপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বরমূর্তি কি স্পষ্ট করেই না তুলে ধরেছেন—

রবীন্দ্রনাথ ও জাতীয়তাবাদ

স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম, প্রলয়মন্থনক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি

জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায় ॥

জাপানের পাশ্চাত্ত্য জাতীয়তাবাদের অন্ধ অনুকরণের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সাবধান বাণী উচ্চারণ করে তাকে আত্মসচেতন হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

উপসংহারে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয়তাবাদের ভয়াবহ বিকৃত রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করলেও সুস্থ জাতীয়তাবাদের অবদানকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। আন্তর্জাতিকতার লক্ষ্য এক মহান লক্ষ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে আমাদের জাতীয়তাবাদের পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। আলফ্রেড জিমার্ন (*Alfred Zimmern*) যথার্থই বলেছেন, "জাতীয়বাদের ভেতর দিয়েই আন্তর্জাতিকার পথ" (The road to Internationalism lies through Nationalism)। ম্যাটসিনির মতে মানবিকতা ও জাতীয়তাদের মধ্যে কোন বিরুদ্ধভাবাপন্ন অসংগতি নেই। রবীন্দ্রনাথ পশ্চিমের মানবতা বিবর্জিত, বিকৃত জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিলেন, কিন্তু ভারতীয়দের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে অস্বীকার করেননি। 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' তাঁর আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবী ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের নগ্ন হিংস্রতা জাতীয়তাবাদকে শুধু বিকৃত করেনি, সংকীর্ণও করেছে, যার ফলে অনেকে জাতীয়তাবাদের ব্যাধি বা বিকৃতিকেই একমাত্র সত্যজ্ঞানে গ্রহণ করেছেন এবং জাতীয়তাবাদকে মানবতা-বিরোধী ও সভ্যতা বিধ্বংসী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু আমরা যদি স্বীকার করি যে ব্যক্তির চরিতার্থতার জন্য তার স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন, তা হলে এ-কথাও না মেনে উপায় থাকে না যে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের বিকাশের জন্যও জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অপরিহায। জাতীয় স্বাতন্ত্র্য যে সবসময় রাষ্ট্রগঠনের দাবিতে আত্মপ্রকাশ করবে তা নয় এবং এই স্বাতন্ত্র্যের বিকাশের জন্য যে পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হতে হবে এমন কোন কথা নেই। যে জাতীয়তা জাতিবৈরের জনক তাকে প্রকৃত জাতীয়তা বলা ভুল, কেননা প্রকৃত দেশপ্রীতি মানবপ্রীতিতেই পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এ-কথাও মনে রাখতে হবে যে, ক্রমবিকাশের নিয়মে ও ইতিহাস-ধর্মের প্রয়োজনে বর্তমান পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছে। "আধুনিক জাতীয়তাবাদ একটি বিশ্বজনীন ঘটনা, যার শক্তি বা প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। জাতীয়তাবাদ স্বভাবতই অহিতকর ও নিন্দার্হ নয়। একদিকে যেমন এর কল্যাণকর প্রয়োজনে মানবসভ্যতার অশেষ শ্রীবৃদ্ধি

ঘটতে পারে, অন্যদিকে উদগ্র, সাম্রাজ্যলিপ্সু ও উদ্ধত জাতীয়তাবাদ সহজেই মানবসভ্যতাকে বিপর্যয় ও ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।"

'পরস্পর নির্ভরতা মানুষের ধর্ম'—এ-সত্য মানব উপলব্ধিতে বহু পূর্বেই ধরা পড়েছিল। কিন্তু অতীত যুগে নানা বাস্তব অসুবিধার জন্য মানুষ প্রায়ই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতি ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবনীয় বিপ্লবের ফলে ভূগোলের সীমা আজ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, পৃথিবী ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়েছে। মানুষ পরস্পরের খুবই কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষের প্রধান প্রধান সমস্যা (যেমন, যুদ্ধ ও শান্তির সমস্যা) আজ সর্বমানবীয় সমস্যা এবং কোন প্রধান সমস্যার সমাধানই আজ সর্বজাতির সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এর বিপরীত পথে যদি আমরা চলতে চাই তবে মানব সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সার্থক করে তোলার কাজে এবং বিশ্বের অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য পরস্পর নির্ভরতা ছাড়া আজ আর গত্যন্তর নেই। বর্তমান পৃথিবীতে কোনরকমেই মানুষ আর পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারবে না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও আজকের পৃথিবী এক ও অবিভাজ্য।

আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপরিহার্যতা

মানুষের শুভবুদ্ধি, বৈজ্ঞানিক প্রগতি ও ইতিহাসের নির্দেশ আজ সার্বজাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনকে প্রকট করে তুলেছে। মানব সভ্যতার যে সংকট আজ তীব্র আকার ধারণ করেছে, তা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের আন্তর্জাতিকতার পথেই চলতে হবে। এখানে অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে প্রকৃত জাতীয়তা আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়। প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মানবমূল্যে আস্থাবান, মানবতারই পূজারী। একথাও মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তিসত্তার উদ্বোধন যেমন রাষ্ট্রকে আশ্রয় করেই সার্থক হতে পারে, তেমন জাতিসত্তার চরিতার্থতা আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই সম্ভব হতে পারে। মানব প্রগতির বর্তমান বিকাশের ক্রমে প্রকৃত জাতীয়তাবোধেই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার অগ্রসূচনা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব। এই অর্থে জাতীয়তাবাদই ব্যক্তি ও বিশ্বমানবের মিলন সম্ভব করে তুলবে। সমর-প্রবণ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ নিঃসন্দেহে আন্তর্জাতিকতার পথকণ্টক। যখন কোন জনসমাজের এক বৃহৎ অংশ মনে করতে থাকে যে, তারা সাহিত্যে,

প্রকৃত জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী নয়

ধর্মে, সভ্যতায় ও সব কিছুতেই অপরাপর মানবগোষ্ঠী থেকে শ্রেষ্ঠ, যখন অন্য সব জাতিকেই তারা হেয় জ্ঞান করতে থাকে, যখন জাতীয়তাবাদ উদগ্র ও উদ্ধত মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তার ঘটে বিকৃতি। সেই মিথ্যা জাতীয়তাবাদকে আন্তর্জাতিকতার পরম শত্রু জ্ঞানেই গ্রহণ করতে হবে। আমি নিজের দেশকে ভালবাসি বলে অন্য দেশকে অবজ্ঞা করব—প্রকৃত জাতীয়তাবাদ কখনো এ-শিক্ষা দেয় না। আমাদের স্বদেশপ্রীতি তখনই সত্যিকার স্বদেশপ্রীতি হয়ে উঠবে যখন অন্য সব দেশকে আমরা ভালবাসতে শিখব। কল্যাণবোধ ও আত্মিক ঐকানুভূতি যে জাতীয়ভাবের প্রাণ, তা কখন আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হতে পারে না।

সংক্ষিপ্তসার

ভূমিকা :

জনসমাজ, ন্যাশনালিটি, নেশন প্রভৃতি শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জনসমাজ বলতে বিভিন্ন কারণে ঐক্যবদ্ধ এক জনসমষ্টিকে বোঝায়। ন্যাশনালিটি বলতে নির্দিষ্ট জন-সমাজের জাতীয়ভাব বা ঐক্যানুভূতিকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় চেতনাসম্পন্ন জনসমাজকেও ন্যাশনালিটি বলা হয়। ন্যাশনালিটির পরিণত প্রকাশ হল নেশন। ন্যাশনালিটির রাষ্ট্রীয় সংগঠন লাভ করার চেষ্টা করলে বা লাভ করলে হয় নেশন।

ন্যাশনালিটির উপাদান :

ভৌগোলিক, কুলগত, ভাষাগত, ধর্মীয়, একই বিদেশী সরকারের অধীনতা বা ঐতিহ্যগত ঐক্য থেকে ন্যাশনালিটির সৃষ্টি হয়। ন্যাশনালিটির সৃষ্টির জন্য উপরোক্ত কোন একটি উপাদান অপরিহার্য নয়। ন্যাশনালিটি আসলে একটি মনোগত ধারণা। কোন এক বিশেষ উপাদানের মধ্যে এই মনোগত ঐক্যবোধ খুঁজে নাও পাওয়া যেতে পারে।

জাতীয় রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশ :

জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মীয় আন্দোলন ও নবজাগরণের ফলে। ভিয়েনার কংগ্রেসের পরে ইউরোপে কয়েকটি নূতন জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর 'এক জাতি এক রাষ্ট্রের' ভিত্তিতে কয়েকটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এশিয়া মহাদেশেও কয়েকটি জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

'এক জাতি এক রাষ্ট্র' :

মিলের মতে একটি জাতির জন্য একটি রাষ্ট্র থাকা প্রয়োজন। ভার্সাই সন্ধিসম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন এই নীতিকে গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানান। এই নীতি গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব সরকারের সাহায্যে তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসা বিদ্বেষজনিত কলহের সম্ভাবনাও লোপ পায়। লর্ড অ্যাক্টন 'এক জাতি এক রাষ্ট্রনীতি'র বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে বিভিন্ন জাতি এক রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করলে এক নূতন উন্নততর সভ্যতার সৃষ্টি হয়। দুর্বল এবং অনগ্রসর জাতি উন্নততর সভ্যজাতির সংস্পর্শে এসে নিজেদের সভ্যতাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে। এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে ইংলণ্ড, রাশিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে নূতন করে 'এক জাতি এক রাষ্ট্রে'র ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করতে হয়। তাতে রাজনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা

বেশী। এই নীতি কার্যকরী করলে অনেকক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে হয়। অর্থনৈতিক ও শাসনসংক্রান্ত সুবিধার দিকটি অস্বীকার করলে রাষ্ট্র দুর্বল হতে বাধ্য। 'এক জাতি এক রাষ্ট্রে'র ভিত্তিতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর পূর্ব ইউরোপের অনেক রাষ্ট্র পুনর্গঠিত হলেও সেখানে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হয়নি। লর্ড কার্জনের মতে এই নীতির ভালমন্দ দুটি দিকই আছে, একে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ন্যাশনালিটির অন্যান্য অধিকার :

'এক জাতি এক রাষ্ট্রে'র ভিত্তিতে সরকার গঠন সম্ভব না হলেও সংখ্যালঘু জাতির কয়েকটি অধিকার প্রত্যেক রাষ্ট্রেই সংরক্ষিত থাকা উচিত। প্রত্যেক জাতির ভাষা এবং সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যও সংরক্ষিত হওয়া উচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার-ব্যবহার ও স্থানীয় প্রথা ও রীতিনীতিও সম্ভবমত সংরক্ষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতা :

জাতীয়তাবাদ এক জনসমষ্টিকে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সমষ্টিগত কল্যাণের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। জাতীয়তাবাদ নূতন শিল্প, কলা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে সভ্যতার ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধতর করেছে। জাতীয়তাবাদের বিকৃতির পরিণাম ভয়াবহ। অধ্যাপক ল্যাস্কি দেখিয়েছেন, (১) বর্তমান শিল্প সংগঠনের পরিণতি এবং (২) আধুনিক যুদ্ধের কলাকৌশল জাতীয় রাষ্ট্রকে মানবতার বিরুদ্ধে এক ভয়াবহ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ, হ্যারোল্ড, ল্যাস্কি প্রভৃতি অনেক চিন্তাশীল মনীষী উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরোধী।

Exercise

1 Define people, nationality and nation Distinguish between State and Nation

2 What are the factors that tend to create a Nationality ? How does a nation come into being out of divers Nationalities
(*C U 1957*)

3. Discuss the factors that create a sense of Unity in a State

4 Discuss what rights of Nationalities should be preserved in a State

5. What do you understand by self-determination as applied to Nationalities ? Discuss the limitations upon which self-determination seems to be possible and desirable
(*C U 1962*)

6. Discuss the value and limitation of the doctrine of self-determination as a political principle.
(*C U. Hons. 1955*)

7 What do you understand by the doctocrine of self determination ? Discuss in this connection the value and limitations of their doctorine (*C. U. 1958, '61*)

8 Discuss the strength and limitations of Nationalism.
(*B U. 1962*)

9. Is Nationalism a menace to civilization ? Give reasons for your answer. (*B U. 1963*)

10. What are the essential factors that tend to constitute a group of people into a Nationality ? (*C. U. 1959*)

অষ্টম অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

১। ভূমিকা (Introduction):

নাগরিক কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'নগরের অধিবাসী বা সভ্য'। এই অর্থে যে ব্যক্তি নগরে বাস করে সে-ই নাগরিক। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং বর্তমানে প্রচলিত অর্থে কেবলমাত্র নগরের অধিবাসীকে নাগরিক বলে না। বর্তমানকালে নাগরিক বলতে রাষ্ট্রের সদস্যদের বোঝায়। অতীতের গ্রীস ও রোমে ছোট ছোট নগর-রাষ্ট্র ছিল। এই নগর-রাষ্ট্রে যে সমস্ত ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেত তাদের বলা হত নাগরিক। ক্রীতদাস, মজুর, স্ত্রীলোক প্রভৃতি যারা পরনির্ভরশীল তাদের রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হত। সুতরাং দেখা যায় সে-সমাজে রাষ্ট্র পরিচালনায় যারাই অংশ গ্রহণের অধিকারী ছিল তারাই ছিল নাগরিক।

নাগরিক শব্দটির অর্থ

আধুনিক কালের রাষ্ট্র প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলির মত ক্ষুদ্র না হলেও রাষ্ট্রের জনসমষ্টির যে অংশ রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা বা অধিকার থেকে বঞ্চিত নয়, তারাই হল নাগরিক। এক কথায় বলা যায়, রাষ্ট্রের সদস্য মাত্রই নাগরিক।

নাগরিকত্বের যথার্থ বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে নাগরিকের সঙ্গে বিদেশী ও অসম্পূর্ণ নাগরিক বা প্রজার পার্থক্যটি আলোচনা করা দরকার।

২। নাগরিক ও বিদেশী (Citizen and alien):

কোন ব্যক্তি তার নিজ রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে কার্যবশতঃ যখন অন্য রাষ্ট্রে বাস করে, তখন সে তার সাময়িক আবাসে বিদেশী (alien) বলে গণ্য হয়। বিদেশী অন্য রাষ্ট্রে বসবাস করলেও স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অবশ্য যে রাষ্ট্রে সে বাস করছে সেই রাষ্ট্রের আইনকানুন তাকে মেনে চলতে হয় ও কর প্রদান করতে হয়। বিদেশী যে দেশে সাময়িকভাবে বাস করে সেখানকার পৌর অধিকারগুলি (Civil Rights) সে ভোগ করার অধিকারী কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights) তাকে দেওয়া হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি কোন এক রাষ্ট্রে নাগরিক তাকে তার নিজ রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ

আনুগত্য জ্ঞাপন করতে হবে। তাছাড়া, নাগরিক পৌর এবং রাজনৈতিক, (Civil and Political Rights) উভয়বিধ অধিকার ভোগ করে।

নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্র যে পরিমাণ কর্তব্য ও আনুগত্য দাবি করতে পারে বিদেশীর কাছ থেকে তা পারে না। বিদেশীকে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা চলে না। কিন্তু নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্র এই অধিকার দাবি করিতে পারে।

সুতরাং দেখা যায় নাগরিক যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে তেমন রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্যের গুরুত্বও অধিক। বিদেশী যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার দাবি করতে পারে না তেমন সাধারণ আইন মানা এবং কর প্রদান ব্যতীত চূড়ান্ত আনুগত্য বা ঐ জাতীয় কোন গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বিদেশীর কাছ থেকে রাষ্ট্র দাবি করতে পারে না।

রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে বহু লোককে অনেক সময় রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। যেমন, প্রত্যেক রাষ্ট্রেই আইন অনুসারে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক মাত্র ভোটাধিকারী। ভারতবর্ষে একুশ বৎসর বয়স্ক স্ত্রী পুরুষকে ভোটধিকার দেওয়া হয়েছে। যাদের বয়স একুশ বৎসরের কম তাদের এই অধিকার দেওয়া হয় নি। দেউলিয়া, উন্মাদ বা কোন জঘন্য অপরাধে দণ্ড-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেক সময় ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। নাবালক, দেউলিয়া, দণ্ডিত ব্যক্তি প্রভৃতি যাদের রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় না তাঁদের অনেক সময় 'প্রজা' (Subject) আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রজা শব্দটির বর্তমানকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি সুষ্ঠু প্রয়োগ বলে বিবেচিত হয় না। এই শব্দটি বিগত দিনের এক বিশেষ ধরনের অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ইংরেজদের আমলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ছিল প্রজা। স্বাধীন দেশের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে এই অর্থে 'প্রজা' বলা যেতে পারে না। তাই অনেক লেখক প্রজা শব্দটির পরিবর্তে এই জাতীয় ব্যক্তিদের অসম্পূর্ণ নাগরিক (National) বলে আখ্যা দেবার পক্ষপাতী। 'প্রজা' শব্দটির পরিবর্তে অসম্পূর্ণ নাগরিক শব্দটির প্রয়োগ অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং গণতন্ত্রসম্মত বলে মনে হয়।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, যে ব্যক্তি রাজনৈতিক অধিকারের অধিকারী, সেই নাগরিক। অধ্যাপক গার্ণার এই ধারণা সমর্থন করেন না। তাঁর মতে ভোট দেবার অধিকার এবং

নাগরিকত্বের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মিলারের (*Miller*) মতে নাগরিকরা রাষ্ট্রনৈতিক সমাজের সদস্য (The Citizens are members of the Political community to which they belong)। তিনি নাগরিকদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে আরও বলেছেন যে, কোন জনসমষ্টি যখন রাষ্ট্র সংগঠন করে, সামাজিকভাবে তারা যখন ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত অধিকার রক্ষার জন্য কোন সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং তার বশ্যতা স্বীকার করে, তখন তারা নাগরিক।

মিলারের দৃষ্টিতে নাগরিক

অধ্যাপক ল্যাস্কি (*Laski*) নাগরিকতার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য নাগরিকদের কর্তব্যবোধের উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য নিজের জ্ঞানসম্পন্ন অভিমতের প্রয়োগই হচ্ছে নাগরিকতা। (Citizenship is "the Contribution of one's instructed judgment to public good)."

ল্যাস্কির দৃষ্টিতে নাগরিক

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অধ্যাপক ল্যাস্কি নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিবিশেষের আদর্শগত কর্তব্যের দিকটিই উল্লেখ করেছেন। বিবেচনা সহকারে জনসাধারণের মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের কার্যাবলীকে পরিচালনা করা নাগরিক মাত্রেরই উচিত সন্দেহ নেই, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিকদের এই আদর্শের দিকটি শুধু আলোচনা করলে চলবে না। সাধারণভাবে নাগরিকের বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ না করলে এই পর্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

৩। নাগরিকত্ব লাভের উপায় (Modes of aquisition of Citizenship) :

নাগরিকত্ব দুটি উপায়ে অর্জন করা যায় : প্রথমটি হচ্ছে (১) জন্মের দ্বারা এবং (২) দ্বিতীয়টি হচ্ছে অনুমোদনের দ্বারা। জন্মের দ্বারা নাগরিকত্ব আবার দু' প্রকারের হতে পারে : (ক) রক্তের সম্বন্ধ অনুসারে এবং (খ) জন্মের স্থান অনুসারে।

(১) জন্মের দ্বারা নাগরিকতা (By birth) : পূর্বেই বলা হয়েছে. যে জন্মের দ্বারা নাগরিতকা দু'রকমের হতে পারে : (ক) রক্তের সম্পর্ক অনুসারে (*Jus Sanguinis*) এবং (খ) জন্মের স্থান রীতি (*Jus Soil*) অনুসারে। রক্তের সম্পর্ক (*Jus Sanguinis*) অনুসারে শিশু যে রাষ্ট্রেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন তার মা-বাবা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত

হবে। যেমন, কোন ইংরেজ মা বাবার সন্তান যদি পশ্চিম জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করে তবে রক্তের সম্বন্ধ (*Jus Sanguinis*) নীতি অনুসারে সে ইংলণ্ডের নাগরিক বলেই বিবেচিত হবে। ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, জার্মানী, সুইডেন প্রভৃতি রাষ্ট্র এই নীতি অনুসরণ করে। জন্মের স্থান (*Jus Soil*) নীতি অনুসারে শিশুর মা বাবা যে রাষ্ট্রের নাগরিক হোন্ না কেন শিশু যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করবে সে হবে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক। ভারতীয় মাবাবার সন্তান যদি যুক্তরাজ্যে (United Kingdom) জন্মগ্রহণ করে তবে জন্মস্থান (*Jus Soil*) নীতি অনুসারে সে হবে যুক্তরাজ্যের নাগরিক। আর্জেন্টিনা এই নীতির অনুসরণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট্ ব্রিটেন পূর্বোক্ত উভয় নীতিই অনুসরণ করে থাকে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ যে, রক্তের সম্পর্ক অনুসারে এবং জন্মের স্থান নীতি অনুসারে নাগরিকতা অর্জনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রয়োগের প্রশ্নটি অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা যদি স্থান নির্বিশেষে ব্যক্তির উপর প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে নাগরিক বিদেশে বাস করলেও তার নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা তার উপর প্রযোজ্য হবে। এই অর্থে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের বিদেশে বসবাস কালে তার যদি সন্তান হয় তাহলে সেই সন্তানদেব উপরও তার মাবাবার রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রযোজ্য হবে। অপরপক্ষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা যদি ব্যক্তিনির্বিশেষে স্থানের উপর প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কোন রাষ্ট্রের বিদেশে বসবাসকারী নাগরিক বা সেখানে জাত তাদের সন্তান-সন্ততিদের উপর তার নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা প্রয়োজ্য হতে পারে না। সুতরাং কোন বিদেশী অন্য রাষ্ট্রে বাস করলে তাদের সন্তানদের জন্মস্থান নীতি অনুসারে সেই রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা তাদের উপর প্রযোজ্য। অবশ্য বিদেশী দূত বা জাহাজের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।

জন্মের দ্বারা নাগরিকত্ব লাভের দুটি নীতি

আবশ্য বর্তমানকালে কোন রাষ্ট্রের বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকদের উপর কর্তৃত্ব স্বীকৃত হয় না।

রোমান আইন (Roman Law) জন্মস্থান নীতি (*Jus Soil*) অনুসারে নাগরিকতার সমর্থক। এই নীতির প্রধান সুবিধা হল এর সরলতা। জন্মস্থান নীতি অনুসারে নাগরিকতা নির্ণয় করা সহজ। কিন্তু নীতিগতভাবে এই নিয়ম কতটা সমর্থনযোগ্য তা চিন্তার বিষয়। কারণ জন্মের স্থান অনেকটা আকস্মিক ঘটনার

জন্মস্থান (Jus Soli) নীতিব সমালোচনা

উপর নির্ভর করে এবং এই কারণে কোন শিশুর উপর জোর করে নাগরিকতা চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

রক্তের সম্বন্ধ নীতির প্রধান অসুবিধা তার অনিশ্চয়তা। অনেক সময় মা বাবার জাতীয়তা প্রমাণ করা শক্ত হয়, যার ফলে তাদের সন্তানদের নাগরিকতা নির্ণয় করাও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, জন্মের দ্বারা নাগরিকতা লাভের দুটি পদ্ধতির মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ অনুসারে নাগরিকতা নির্ণয়ের পদ্ধতিটি অধিকতর যুক্তিসংগত।

রক্তের সম্বন্ধ নীতির সমালোচনা

(২) **অনুমোদিত সূত্রে নাগরিকতা লাভ (By Naturalisation) :** কোন কোন রাষ্ট্রে বিদেশীকেও অনেক সময় নাগরিকতা দেওয়া হয়। কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে বিদেশীর উপর আরোপিত এই কৃত্রিম নাগরিকতাকে অর্জিত নাগরিকতা বলা যেতে পারে।

বিদেশীগণ নিম্নলিখিত উপায়ে অপর রাষ্ট্রের নাগরিকতা পেতে পারে :

(ক) **বিবাহ (Marriage) :** একজন স্ত্রীলোক অন্য রাষ্ট্রের পুরুষ নাগরিককে বিবাহ করলে সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে বিবেচিত হয়।

(খ) **নির্বাচন (Option) :** কোন রাষ্ট্রের বিদেশী মাতাপিতার সন্তান বয়ঃপ্রাপ্তির পর যে দেশে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেখানকার নাগরিকতা লাভ করেতে পারে।

(গ) **সরকারী চাকুরি (Government Service) :** বিদেশী সরকারের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিরা অনেক সময়ে তাঁদের কার্যসূত্রে নূতন নাগরিকত্বের অধিকার অর্জন করেন।

(ঘ) **বসবাস (Domicile) :** অনেক সময় বিদেশে দীর্ঘকাল বসবাসের ফলে বিদেশী নাগরিক অধিকার অর্জন করতে পারে।

(ঙ) **সম্পত্তি ক্রয় (Acquisition of Property) :** জমি বা অনুরূপ স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় বা অর্জনের দ্বারাও কোন কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার অর্জন করা যায়।

(চ) **আবেদন দ্বারা (On Application) :** উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করলে বিদেশী বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করতে পারে। তবে বিদেশীর আবেদন অনুমোদন করা বা না করা বিশেষ রাষ্ট্রের নিয়মসাপেক্ষ। অনেক সময় কোন বিদেশী আবেদন করলে কতকগুলি শর্ত সাপেক্ষে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে

নাগরিকতা দেওয়া হয়। এই দিকে সংকীর্ণ অর্থে অথবা আইনগত উপায়ে নাগরিকতা অর্জন বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ সম্পর্কে বিভিন্ন বিধি রয়েছে। ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যে বিদেশী নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করবে তাকে সচ্চরিত্র হতে হবে। ইংলণ্ডে আবেদনকারী ব্যক্তিকে ইংরেজী ভাষা জানতে হবে। ভারতের ক্ষেত্রেও ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত যে কোন একটি ভাষা তাকে জানতে হবে। জন্মের দ্বারা অথবা অর্জনের দ্বারা প্রাপ্ত নাগরিকদের অধিকার ভেদে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'গৃহীত' নাগরিকদের প্রেসিডেণ্ট অথবা ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদের প্রার্থী হতে দেওয়া হয় না।

৪। নাগরিক অধিকারের বিলুপ্তি (Loss of Citizenship):

কোন এক নাগরিক অন্য এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা লাভ করলে তার পূর্ব-নাগরিকতা লোপ পায়। কোন মহিলা যদি বিদেশী নাগরিককে বিবাহ করেন তবে তাঁর পূর্ব নাগরিকতা লোপ পায় এবং তিনি স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করেন। সৈন্যবাহিনী থেকে পলায়ন করলে অনেক রাষ্ট্রে নাগরিকতা কেড়ে নেওয়া হয়। কোন কোন রাষ্ট্রে গভীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত নাগরিকের নাগরিকতা লোপ পায়। ভিন্ন রাষ্ট্রের জমি খরিদ করে সেখানে দীর্ঘদিন যাবত বাস করলে, অথবা বিদেশী সরকারের অধীনে দীর্ঘকাল যাবত চাকুরিতে বহাল থাকলে অনেকে সময় নাগরিকত্ব লোপ পায়।

গ্রেট্ ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পূর্ব-প্রচলিত নিয়ম অনুসারে কোন নাগরিকের মূল নাগরিকত্ব লোপ হত না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং গ্রেট ব্রিটেনে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নূতন আইন পাস করে তাদের নাগরিকদের বিদেশে নাগরিকতা গ্রহণের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

৫। নাগরিকদের কর্তব্য (Duties of Citizens):

একমাত্র রাষ্ট্রের সদস্য হযেই ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব। রাষ্ট্র ব্যক্তিসমষ্টির অধিকার রক্ষা করে, তাদের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে সাহায্য করে। নাগরিক রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করে বলেই তার পক্ষে স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রের বাইরে তার জীবন, সম্পত্তি, স্বাধীনতা কোন কিছুরই নিরাপত্তা নেই। অথচ এগুলি না থাকলে তার সম্ভাবনার

কোন দিন স্ফুরণ ঘটবে না। রাষ্ট্রই মানবীয় জীবনযাত্রার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার নিরাপত্তার বিধান করে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের কাজে তাকে সাহায্য করে। তার ব্যক্তি জীবনের অস্তিত্বকে সে স্বার্থকতার দিকে প্রসারিত করতে পারে একমাত্র রাষ্ট্রের সভ্য হয়ে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকেরই রাষ্ট্রের প্রতি নিম্নোক্ত কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত।

(ক) **আনুগত্য** (Allegiance) : প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করা। বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সকল সক্ষম ব্যক্তিরই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। আভ্যন্তরিণ বিপ্লব যদি নাগরিক জীবনকে বিপর্যয়ের পথে নিয়ে যায় তবে প্রত্যেকেরই উচিত রাষ্ট্রকে সাধ্যমত সাহায্য করা। এক কথায়, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে প্রত্যেক নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রয়োজনে আত্মনিয়োগ করা উচিত। দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মচারীরা কাজে নিযুক্ত থাকা কালীন তাঁদের প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সাহায্য করা প্রত্যেক নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য।

(খ) **আইনানুগ হওয়া** (Obedience to Laws) : প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। আইনই রাষ্ট্রের ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করে। সুতরাং ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রয়োজনেই প্রত্যেকের আইনানুগ হওয়া উচিত। যদি কোন নাগরিক মনে করেন যে কোন আইন সাধারণের কল্যাণের পরিপন্থী তবে তাঁর উচিত নিয়মসঙ্গত উপায়ে সেই আইনের পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করা।

(গ) **কর দান** (Payment of Tax) : আজকের দিনের জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থের একটা বড় অংশ সংগৃহীত হয় জনসাধারণের কাছ থেকে কর রূপে। সুতরাং নাগরিক মাত্রেরই রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নিয়মিতভাবে কর প্রদান করা উচিত।

এগুলি ছাড়া, প্রত্যেক নাগরিকের উচিত ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করা। নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুসারে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া সকল নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। আইনসভায় প্রতিনিধি হিসেবে বা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কাজে নিযুক্ত হওয়ার জন্যও প্রত্যেকের প্রস্তুত থাকা উচিত এবং প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত।

৬। সুনাগরিক হবার পথে বাধা (Hindrances to good Citizenship) :

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে সুনাগরিকের উপর। সুনাগরিক হবার জন্য নাগরিকদের তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। যে রাষ্ট্রের নাগরিকসম্প্রদায় নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ নয় সেখানে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যর উপর হস্তক্ষেপ হওয়া স্বাভাবিক। 'Eternal vigilance if the price for libertey'—এই উক্তিটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রের মত প্রাচীনকাল থেকে পরিগণিত হয়ে আসছে। নাগরিকদের শুধু অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকলেই চলবে না ; রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধেও তাদের অবহিত থাকতে হবে এবং অপরের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। সুষ্ঠু সমাজ জীবনের পক্ষে পারস্পরিক অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে সহনশীলতা অপরিহার্য।

লর্ড ব্রাইস্ (*Lord Bryce*) সুনাগরিক হওয়ার পথে তিনটি প্রধান অন্তরায়ের উল্লেখ করেছেন : (১) নির্লিপ্ততা (Indolence), (২) ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private self-interest) এবং (৩) দলীয় মনোবৃত্তি (Party Spirit)। এগুলি ছাড়া, (৪) অজ্ঞানতা (Ignorance)-ও সুনাগরিক হওয়ার একটি অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়।

(১) **নির্লিপ্ততা** (Indolence) : নাগরিকদের নির্লিপ্ততার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি প্রায়ই বৃহদায়তন। রাষ্ট্রের আকার বড় হওয়ার জন্য সকল নাগরিকের পক্ষে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তিগত কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত থাকা সম্ভব হয় না। ব্যক্তিবিশেষ মনে করে যে নাগরিক হিসেবে তার যথাকর্তব্য করা বা না করার উপর রাষ্ট্রের শুভাশুভ নির্ভর করে না। 'একে না করলে অপরে করবে'—এই ধারণা সকলকে প্রভাবিত করে। ফলে নাগরিক নির্লিপ্ত হয়ে পড়ে।

তাছাড়া, আধুনিক রাষ্ট্রের শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি জীবনের বিভিন্নদিক নাগরিকদের দৃষ্টি এবং উৎসাহকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। ফলে রাষ্ট্রের ঘটনাবলী তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় না। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধের অভাবের এটিও একটি অন্যতম কারণ।

নির্লিপ্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার আরও একটি কারণ জীবন সংগ্রামের তীব্রতা। শিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে রুচি ও

দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান যান্ত্রিক ও বস্তু-সর্বস্ব সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ আজ অনিবার্যভাবে আত্মকেন্দ্রিক।

(২) **ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা (Private self-interest) :** ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা সুনাগরিক হওয়ার পথে একটি বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অনেক রাষ্ট্রেই আজ ব্যক্তিস্বার্থ দুষ্ট গ্রহের মত কাজ করছে। ব্যক্তিগত সাময়িক স্বার্থের বশে আমরা উৎকোচ গ্রহণ করি অথবা উৎকোচ গ্রহণকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। দেশের গণ নির্বাচন অনেক সময় ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রেও অনেক সময় এই স্বার্থপরতা স্বজন পোষণের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সমষ্টির উন্নয়ন ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত উন্নয়ন সম্ভব নয়—একথা সাময়িক স্বার্থ সিদ্ধির প্রয়োজনে আমরা চিন্তা করি না।

(৩) **দলীয় মনোবৃত্তি (Party spirit) :** গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ফলে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন ব্যক্তিরা দলীয় স্বার্থকেই সমষ্টিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেন।

রাষ্ট্রের ভাল-মন্দের কথা আজকাল কোনক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীসহকারে বিবেচিত হয় না। উগ্র-দলীয় মনোভাব রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিপন্থী। তাই আজ ভারতে অনেক চিন্তাশীল মনীষী রাজনৈতিক দলপ্রথার ব্যতিরেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কথা চিন্তা করছেন।

(৪) **অজ্ঞতা (Ignorance) :** রাষ্ট্রের নাগরিক সম্প্রদায় অনেক সময় অন্ধ বিশ্বাস অথবা অজ্ঞতার জন্য নাগরিক হিসেবে তাদের যথাকর্তব্য পালন করতে পারে না। সুতরাং নাগরিক সম্প্রদায়ের অজ্ঞতা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রের উচিত উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নাগরিকদের অবহিত করার জন্য দেশে নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি সততা সহকারে নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাছাড়া, সরকারের তরফ থেকে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক সমস্যাগুলিকে নাগরিকদের যথাসম্ভব জ্ঞাত করান উচিত। তাহলে, দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত থেকে নাগরিক সম্প্রদায় রাষ্ট্রের প্রতি তাদের যথাকর্তব্য পালন করতে সক্ষম হবে।

৭। সুনাগরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের উপায় (Measures to remove the hindrances to good Citizenship) :

সুনাগরিকতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকগুলি দূর করার জন্য লর্ড ব্রাইস দুটি প্রতিকারের উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান এবং অপরটি হচ্ছে নাগরিকদের নীতিবোধ উন্নত করণ।

শাসনব্যবস্থার মধ্যে এমন কতকগুলি বিধান থাকা উচিত যেগুলি সুনাগরিক হিসেবে প্রত্যেককে তার কর্তব্য পালন করতে বাধ্য করবে। প্রত্যেক নাগরিককে যদি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি নির্বাচনে বাধ্য করা যায়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গণভোট, গণ-উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিকদের শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে যদি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় তবে নাগরিক সম্প্রদায় স্বভাবতই তাদের নির্লিপ্ততা, স্বার্থপরতা এবং দলীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রের প্রতি যথাকর্তব্য পালনের জন্য এগিয়ে আসবে।

শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান

কেবলমাত্র শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের দ্বারা সুনাগরিকতার পথে অন্তরায়গুলি দূরীভূত করা সম্ভব নয়। নাগরিকদের চারিত্রিক মানও উন্নত করতে হবে। সাধারণ মানুষের চরিত্রের মান উন্নত না হলে শাসনতান্ত্রিক সমস্ত প্রকার প্রতিবিধান ব্যর্থ হতে বাধ্য। নাগরিক চরিত্রের মান উন্নত করার জন্য রাষ্ট্রের সচেষ্ট থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে ব্যাপকভাবে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। অশিক্ষিত নাগরিকদের চারিত্রিক মান উন্নত হতে পারে না।

চারিত্রিক মান উন্নয়ন

মানুষ যেখানে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত, সেখানে নাগরিক সম্প্রদায় উন্নত চরিত্রের হতে পারে না। অভাবের তাড়নায় সুস্থ নীতিবোধ স্থায়িত্বলাভ করতে পারে না। তাই, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে উগ্র ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণে এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে।

সংক্ষিপ্তসার

নাগরিক ও বিদেশী :

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নাগরিক বলা হত। বর্তমানকালে রাষ্ট্রের সদস্য মাত্রই নাগরিক। কিন্তু নাগরিক, বিদেশী ও প্রজার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয়। কোন ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্র পরিত্যাগ করে কোন কারণবশতঃ সাময়িকভাবে অন্য রাষ্ট্রে বাস

করলে সেই রাষ্ট্রে সে বিদেশী। বিদেশী পৌর অধিকার ভোগ করিতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পারে না। নাগরিক রাজনৈতিক ও পৌর উভয় অধিকার ভোগ করতে পারে। রাষ্ট্রের যে সমস্ত স্থায়ী অধিবাসীকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদের 'প্রজা' বলা হয়।

নাগরিকত্ব লাভের উপায় ঃ

নাগরিকত্ব লাভের উপায় দুটি: যথা, (১) জন্মের দ্বারা এবং (২) অনুমোদনের দ্বারা। জন্মের দ্বারা নাগরিকত্ব আবার দুটি উপায়ে নির্ধারিত হয়—যথা, (ক) জন্মস্থান এবং (খ) রক্তের সম্পর্ক নীতি অনুসারে। অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা সাধারণত: (১) বিবাহ, (২) নির্বাচন, (৩) বসবাস এবং (৪) আবেদনের দ্বারা লাভ করা যেতে পারে।

নাগরিকতার বিলুপ্তি ঃ

বিবাহ, সৈন্যবাহিনী থেকে পলায়ন, গভীর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, দীর্ঘকাল যাবৎ বিদেশে বাস করলে, জমি খরিদ করলে, অথবা বিদেশী সরকারের অধীনে দীর্ঘকাল ধরে চাকরিতে নিযুক্ত থাকলে নাগরিকত্ব লোপ পায়।

নাগরিকদের কর্তব্য ঃ

নাগরিকদের প্রধান কর্তব্যগুলির মধ্যে—(১) আনুগত্য (২) আইনানুগ হওয়া এবং (৩) কর প্রদান করা উল্লেখযোগ্য।

সুনাগরিক হবার পথে বাধা ঃ

সুনাগরিক হওয়ার পথে বাধা প্রধানত: চারটি, যথা—(১) নির্লিপ্ততা, (২) স্বার্থপরতা, (৩) দলীয় মনোবৃত্তি এবং (৪) অজ্ঞতা।

সুনাগরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের উপায় ঃ

সুনাগরিক হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের উপায় প্রধানত: দুটি, যথা—(১) শাসনতান্ত্রিক উপায় এবং (২) নাগরিকদের চারিত্রিক মান উন্নয়নের ব্যবস্থা।

Exercise

1. Define citizenship Differentiate between citizens, aliens, and subjects.

2. What do you understand by a citizen? In what way is the position of a citizen superior to that of an alien? What important differences concerning the acquisition of citizenship exist in the Laws of various state? (*C. U 1930*)

3. Give an account of the different modes of acquisition of citizenship.

4. What are the hindrances to good citizenship? How can they be removed?

5. Enumerate the duties of a good citizen.

নবম অধ্যায়

স্বাধীনতা, সাম্য ও অধিকার
(Liberty, Equality and Right)

স্বাধীনতা

১। ভূমিকা (Introduction) :

মানুষ দুটি সহজাতবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। একটি তার সামাজিক প্রবৃত্তি (Social Nature) এবং অপরটি তার নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা স্পৃহা। মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তি দুটি পরস্পর বিপরীতমুখী। সমাজজীবনের সুবিধাভোগ করতে হলে মানুষকে তার অবাধ স্বাধীনতা কিছুটা বিসর্জন দিতে হবে—অথবা অবাধ স্বাধীনতা উপভোগ করতে হলে তাকে সমাজজীবন ত্যাগ করে অরণ্যে আশ্রয় নিতে হবে।

মানুষের দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি

এই দুই বিপরীতমুখী বৃত্তির সমন্বয় সাধনের সমস্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান সমস্যা। স্বাধীনতা (Liberty) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু হিসেবে, এই দুই বিপরীতমুখী বৃত্তির সমন্বয় সাধনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার সমস্যা বিপরীতমুখী প্রবৃত্তি সমন্বয় সাধনের সমস্যা

মানুষ চায় তার ইচ্ছানুসারে কাজ করার অবাধ স্বাধীনতা অর্থাৎ, তার ইচ্ছানুসারে কাজ করার উপর কোনরূপ বাধানিষেধ থাকবে না। কিন্তু কোনরূপ বাধানিষেধ-বিহীন স্বাধীনতা উপভোগ করা সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাধানিষেধ বিহীন স্বাধীনতা কেউ উপভোগ করলে অপরের অনুরূপ স্বাধীনতাকে খর্ব করতে হয়। সুতরাং—সমাজজীবনের স্বাভাবিক ধারাকে সহজ ও সুন্দর করে তুলতে গেলে মানুষের অবাধ স্বাধীনতায় কিছুটা বাধানিষেধ আরোপ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অধ্যাপক ল্যাস্কি (*Laski*) বলেছেন, "মানুষের সামাজিক বৃত্তির অনিবার্য পরিণতিরূপে বাধানিষেধগুলি প্রয়োজনীয়।"[1]

সমাজজীবনে রাষ্ট্রের বাধানিষেধের প্রয়োজনীয়তা

1 "Regulations, obviously enough, is the consequence of gregariousness, for we cannot live together without common rules"—*Laski*.

সমাজে সকলের পক্ষে স্বাধীনতা সমানভাবে সম্ভব করে তুলতে হলে ব্যক্তিবিশেষের অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

সমাজজীবন যাপন করে সকলের পক্ষে স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব করে তোলার জন্যই রাষ্ট্র তার আইনকানুনের মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব করে থাকে। অধ্যাপক ল্যাস্কি (*Laski*) বলেছেন, "স্বাধীনতার প্রকৃতির মধ্যেই বাধানিষেধ জড়িয়ে রয়েছে, কারণ—আমি যে পৃথক স্বাধীনতা ভোগ করি তা আমি যাদের সঙ্গে বাস করি তাদের স্বাধীনতা খর্ব করার স্বাধীনতা নয়।"[1]

রাষ্ট্র যদি বাধানিষেধ আরোপ করে তথাকথিত অবাধ স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব না করত, তাহলে সমাজে বলবান এবং ধনী ব্যক্তিরাই স্বাধীনতা উপভোগ করতো ; দুর্বলের স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকত না।

অধ্যাপক বার্কার (*Barker*) বলেছেন, "প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীন হওয়া উচিত—এই সত্যের মধ্যে আর একটি পরিপূরক এবং অনিবার্য সত্য মিশিয়ে আছে, সেটি হচ্ছে কোন ব্যক্তিই চূড়ান্তভাবে স্বাধীন হতে পারে না।"[2]

তিনি আরও বলেছেন, "রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাধীনতা অথবা আইনসংগত স্বাধীনতা কখনও প্রত্যেকের অবাধ স্বাধীনতা হতে পারে না, এটি সব সময়েই সকলের জন্য শর্ত-সাপেক্ষ স্বাধীনতা।"[3]

সামাজিক জীব হিসেবে বাধানিষেধের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেও অধ্যাপক ল্যাস্কি একটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। তাঁর মতে[4] নিয়মের আকারে বাধানিষেধগুলি আরোপিত সরকার দ্বারা হয়। কিন্তু সরকার বলতে মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক যারা সরকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তাদের

রাষ্ট্রের আরোপিত বাধানিষেধগুলি সম্বন্ধে ল্যাস্কির সতর্কতা

1. Liberty thus involves in its nature restraints, because the separate freedoms I use are not freedoms to destroy the freedems of those with whom I live"—*Laski* Grammar of Politics

2 "The truth that every man ought to be free has for its other side the complementary consequential truth that no man can be absolutely free" —*Barker* Principles of Social and Political Theory

3 "Liberty in the state or legal liberty is never absolute liberty of each but always the qualified liberty of all"—*Barker* Principles of Social and Political Theory.

4 "Liberty therefore, is never real unless the Government can be called into account and should always be called into account when it invades rights"—*Laski* Grammar of Politics.

বোঝায়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেও সরকার বলতে মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকই শাসনযন্ত্র পরিচালনা করেন। এমতঅবস্থায় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বাধীনতায় যখন হস্তক্ষেপ হয় তখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিরাই তাতে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। সুতরাং, অন্ধভাবে তাঁদের আরোপিত সব কিছুকেই গ্রহণ করা ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী হতে পারে। অতএব, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হলেই সরকারের কাছ থেকে তার কৈফিয়ত চাওয়া উচিত। সরকার দায়িত্বহীন হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতাও বিপদগ্রস্ত হতে বাধ্য।

হেগেল (*Hegel*) প্রভৃতি আদর্শবাদী চিন্তানায়কদের মতে রাষ্ট্রের সমস্ত আইনকানুন মানার অর্থই স্বাধীনতা। ল্যাস্কি (*Laski*) তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এবং যুক্তি দিয়ে এই অভিমতকে অস্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রের আইন বলতে সরকারের রচিত আইনকে বোঝায়। ভুলত্রুটি সমন্বিত মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তিই সরকার। প্রত্যেক মানুষের একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে, নিজস্ব সত্তা আছে। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্যই রাষ্ট্র। সুতরাং, রাষ্ট্রকে এক গৌরবোজ্জ্বল আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব সত্তাকে অস্বীকার করা যেতে পারে না। সেই কারণে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধাসৃষ্টিকারী বাধানিষেধগুলি ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী। অধ্যাপক ল্যাস্কি[1] (*Laski*) তাঁর *Liberty in the Modern State* নামক পুস্তকে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, সম্পূর্ণ প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে মানুষ নিজের মত করে তার নিজস্ব জীবনধারার সূত্রটিকে বেছে নেবে এবং সেইখানেই তার সত্যিকারের স্বাধীনতা।

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বাধানিষেধের অভাবের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করলে কেবলমাত্র স্বাধীনতার নেতিবাচক দিকটির (Negative aspect) উল্লেখ করতে হয়। কিন্তু স্বাধীনতার আলোচনা সম্পূর্ণ করতে হলে তার অস্তিবাচক দিকটিও (Positive aspect) উল্লেখ করা দরকার। মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির আবশ্যকতা আছে। দেশে যদি উপযুক্ত শিক্ষা বা জীবিকা সংস্থানের উপযুক্ত সুযোগ না

স্বাধীনতার অস্তিবাচক দিক

---

1 I mean by liberty the absence of restraint upon those social conditions which in modern civilisation are the necessary gurantees of individual happiness —*Laski* Liberty in the Modern State

থাকে তাহলে সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। তাই ল্যাস্কি[1] (*Laski*) স্বাধীনতা বলতে সেইরূপ পরিবেশ রক্ষার কথাই বুঝতেন, যেখানে মানুষ তার পরিপূর্ণ সত্তাকে বিকাশ করার সুযোগ লাভ করে।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এখানে বাধানিষেধের অভাবের পরিবর্তে, প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

উপসংহারে বলা যায় যে, স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র বাধানিষেধের অভাবকে বোঝায় না; প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধার পরিবেশ সৃষ্টিকেও বোঝায়।

২। স্বাধীনতার প্রকারভেদ (Different kinds of liberty):

অধ্যাপক ল্যাস্কি তাঁর *Grammar of Politics* নামক পুস্তকে তিন প্রকার স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন, যথা—(ক) **ব্যক্তিগত স্বাধীনতা** (Private liberty), (খ) **রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা** (Political liberty) এবং (গ) **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** (Economic liberty)।

(ক) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Private liberty): কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছার ফল যখন মুখ্যতঃ তাকেই প্রভাবিত করে—তখন সেটি তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (Private liberty)। ধর্মীয় স্বাধীনতাও একটি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। ফ্রান্স যখন *Edict of Nantes* নাকচ করেছিল তখন সে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল।

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা (Political liberty): রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অধিকারগুলিকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political liberty) বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় নির্বাচনগুলিতে ভোট দেওয়া, নির্বাচিত হওয়া, সরকারী কাজে নিযুক্ত হওয়া এবং সরকারের কার্যাবলীর ন্যায়সংগত সমালোচনা করা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার অন্তর্গত। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতাকে সফল করার জন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি দুটি শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ, শিক্ষার প্রসার, শিক্ষার অভাব হলে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার যথার্থ উপভোগ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ পরিবেশনে সততা।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপে ঠিকভাবে অংশ গ্রহণ করতে হলে স্বাস্থ্যকর জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। জনসাধারণকে

1 "By liberty I mean the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves" – *Laski* Grammar of Politics

নিরপেক্ষ অভিমত পোষণ করতে হলে,—এই অভিমতের মালমশলাও নিরপেক্ষ ভাবে পরিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় জনমত একদেশদর্শী প্রচার কার্যের ফলে বিভ্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এইজন্যই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সংবাদ পরিবেশনে সততার প্রয়োজন।

(গ) **অর্থনৈতিক স্বাধীনতা** (Economic liberty): অনেকে বলেন মানুষের অভাবের শেষ নেই। তাই জীবনধারণের মান নির্ণয় করে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা বৃথা। ল্যাস্কি প্রমুখ আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাবিদেরা এই মত স্বীকার করেন না। ল্যাস্কির মতে প্রাথমিক প্রয়োজন বলে একটা জিনিষ আছে এবং প্রতিটি ব্যক্তির সেই প্রাথমিক প্রয়োজনের অভাবকে পরিতৃপ্ত করতে হবে। তিনি আরও বলেছেন, "কতিপয় লোকের অপর্যাপ্তভাবে পাবার আগে সকলের পর্যাপ্তভাবে পাওয়া উচিত" (There should be sufficiency for all before there is superfluity for the few.)। আগামীকাল কি খেয়ে আমি বেঁচে থাকব—এই চিন্তাই যাদের অবিরত করতে হয়, কোন স্বাধীনতাই তাদের উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতিরেকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। অনেক লেখকের মতে মানুষের জন্য এমন কতকগুলি সুযোগ সৃষ্টি করা উচিত যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির উপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং ন্যায়সংগত পরিশ্রমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা থাকবে এবং শিল্প সংগঠনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া বিদ্যমান থাকবে।

অনেকে আবার স্বাধীনতা বলতে ল্যাস্কি উল্লিখিত স্বাধীনতাগুলি ছাড়া, (১) প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural liberty), (২) পৌর স্বাধীনতা (Civil liberty) এবং (৩) জাতীয় স্বাধীনতার (National liberty) কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) **প্রাকৃতিক স্বাধীনতা** (Natural liberty): কল্পনা করা হয় যে, রাষ্ট্র সংগঠনের আগে প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত। প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে প্রয়োগ করে নিজেদের পরিচালিত করত। সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমর্থকদের লেখায় আমরা প্রাকৃতিক রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়মের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখতে পাই। স্বাধীনতা বলতে আমরা যদি সকলের স্বাধীনতা বুঝি তাহলে রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করত তা বলবানের স্বাধীনতাকেই বোঝাতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় মানুষের অবাধ ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করার কেউই ছিল না।

(২) **পৌর স্বাধীনতা** (Civil liberty): গেটেলের (*Gettell*) মতে রাষ্ট্র নাগরিকদের জন্য যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করে এবং রক্ষা করে তাদের পৌর স্বাধীনতা বলে ("Civil liberty consists of the rights and privileges which the state creates and protects for its subjects.")। এই অধিকারগুলি নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়। এই স্বাধীনতাগুলির মধ্যে জীবনধারণের অধিকার, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার, সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, ধর্মাচরণের অধিকার, শিক্ষার অধিকার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(i) **জীবন ধারণের অধিকার** (Right to life): নাগরিক জীবনের শ্রেষ্ঠতম অধিকার হল জীবনধারণের অধিকার। অপর কর্তৃক আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার জন্য অপরকেও হত্যা করার অধিকার সকল সভ্য রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। কিন্তু এই অধিকারকে রক্ষা করার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টাও রাষ্ট্রের চক্ষে অপরাধ বলে বিবেচিত হয় এবং অপরকে হত্যা করলে বা হত্যা করার চেষ্টা করলে রাষ্ট্র অপরাধীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারে।

(ii) **ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার** (Right to personal security): মানুষের দৈহিক নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আইনের অবৈধ বিধিনিষেধ ব্যতিরেকে অবাধে চলা-ফেরা করার অধিকার পর্যন্ত এই স্বাধীনতার অন্তর্গত। অবৈধভাবে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা আটক রাখার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রত্যেক দেশের প্রধান বিচারালয়কে হেবিয়াস কর্পাস রিট (Writ of Habeas Corpus) জারি করার ক্ষমতা দেওয়া হয়।

(iii) **সম্পত্তিরক্ষার অধিকার** (Right to property): কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি ছাড়া সমস্ত দেশেই ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সংবিধানেও সীমাবদ্ধভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে।

প্রুধোঁ (*Proudhou*) ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে লুণ্ঠনবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, সম্পত্তি রক্ষার প্রয়োজন যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য হয় তাহলে এই অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কির মতে মানুষকে সম্পত্তির অধিকারী হতে হলে তাকে সমাজকে কিছু দিতে হবে। সমাজকে কিছু দেওয়ার পুরস্কারই হচ্ছে সম্পত্তি। স্পষ্টতঃই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি অধিকারের বিরুদ্ধে ছিলেন।

সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হলেও এই অধিকার রাষ্ট্র নির্দেশিত আইনের মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। প্রত্যেক দেশেই আইনের বিধানে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, হস্তান্তর প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানে—৩১নং ধারায় সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

(iv) **চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা** (Liberty of thought and Expression): প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চিন্তা ও বাক্-স্বাধীনতার অধিকার স্বীকৃত। বস্তুতঃ, মানুষমাত্রেই স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং চিন্তিত বিষয়-বস্তুকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রকাশ করার অধিকার না থাকলে গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়ে। বিখ্যাত চিন্তাবীর জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলেছেন, "সমাজের সমস্ত লোক যদি এক মতাবলম্বী হয়, আর একজন লোক যদি ভিন্ন মতাবলম্বী হয় তাহলে সেই সমস্ত লোকের মত ঐ একজনের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ততটুকু অন্যায় যতটুকু অন্যায় হবে সেই একজনের মত সমস্ত লোকের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া।"[1]

অবশ্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে অশ্লীল, বিদ্বেষমূলক অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা হানিকর মত প্রকাশের অধিকারকে বোঝায় না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন মত প্রকাশের স্বাধীনতা কোন দেশই স্বীকার করে না। রাষ্ট্রের সংহতি এবং নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর আইনের দ্বারা বাধানিষেধ আরোপ করা সব দেশেই ন্যায়সংগত বলে স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতের সংবিধানের ৩৫২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ভারতের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হলে বা তার সম্ভাবনা থাকলে রাষ্ট্রপতি ১৯নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বাক্-স্বাধীনতা প্রভৃতি সবিশেষ স্বাধীনতার অধিকারগুলি স্থগিত রাখার আদেশ দিতে পারেন।

(v) **ধর্মাচরণের অধিকার** (Right to religion): ধর্মাচরণের স্বাধীনতা বলতে বোঝায় যে, প্রত্যেক নাগরিক তার নিজের বিশ্বাস অনুসারে যে কোন ধর্মমত পোষণ করতে পারে। পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি কোন ধর্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করবে না।

---

1 "If all mankind minus one, were of one opinion, and one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind" —*Mill.*

ভারতের সংবিধানে ২৫ থেকে ২৮ অনুচ্ছেদে ; বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মীয় অভিব্যক্তি, আচরণ এবং প্রচারের স্বাধীনতা ; ধর্মসংক্রান্ত বিষয় পরিচালনার স্বাধীনতা ; কোন বিশেষ ধর্মের উন্নয়নের জন্য কর প্রদান হতে অব্যাহতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষা এবং ধর্মীয় প্রার্থনায় উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি—ধর্মীয় স্বাধীনতার অঙ্গ বলে স্বীকৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্র ধর্মীয় স্বাধীনতার নামে এমন কিছু করতে দিতে পারে না যার ফলে অপরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হয় অথবা রাষ্ট্রীয় শান্তি এবং শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়।

(vi) **শিক্ষার স্বাধীনতা** (Right to Education) : নাগরিক মাত্রেরই শিক্ষালাভের সুযোগ না থাকলে অন্যান্য নাগরিক অধিকার ও কর্তব্যের উপযুক্ত প্রয়োগ সম্ভব নয়। মিল বলেছেন, "প্রত্যেক নাগরিককে ভোট দেবার অধিকার দেওয়ার আগে তাদের শিক্ষিত করে তোলা উচিত" (Universal education must precede universal enfranchisement)। অধ্যাপক ল্যাস্কি রাজনৈতিক অধিকারের শর্তানুসারে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন।

ভারতের সংবিধানে তৃতীয় পরিচ্ছেদে—সংস্কৃতি এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় অংশে সংখ্যালঘুদের ভাষা, লিপি ও সাংস্কৃতিক নিরাপত্তা এবং তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

ভারতের সংবিধানে চতুর্থ পরিচ্ছেদে -রাষ্ট্র পরিচলনার নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

(৩) **জাতীয় স্বাধীনতা** (National liberty) : জাতীয় স্বাধীনতা বলতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত জনসাধারণের বিদেশী শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে সার্বভৌমত্বের অধিকারকে বোঝায়। অতীতে বহু যুদ্ধ এই জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সংঘটিত হয়েছিল। অন্য জাতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন সুসংবদ্ধ জনসমাজের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেও অনেক সময় জাতীয় স্বাধীনতা বলা হয়।

৩। স্বাধীনতার সংরক্ষণ (Safeguards of Liberty) :

সমাজবদ্ধ মানুষের পক্ষে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব নয়। সমাজের সকলের স্বাধীনতা উপভোগ সম্ভব করে তোলার জন্যই সরকার আইন তৈরী

করে মানুষের অবাধ স্বাধীনতায় বাধানিষেধ আরোপ করে থাকেন। সে কারণ সরকার প্রণীত আইন স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

তবে সকল ক্ষেত্রেই যে আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে এমন কথা নয়। সাধারণ মানুষ নিয়ে গঠিত সরকার সমাজের সকলের কল্যাণের অজুহাতে স্বৈরাচার-মূলক আইন তৈরী করতে পারে। আইনের অপপ্রয়োগও অসম্ভব নয়। লর্ড অ্যাকটন বলেছেন, "সকল ক্ষমতাই মানুষকে বিকৃত করে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা মানুষকে চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে" (All power corrupts and absolute power corrupts absolutely)। তাই সরকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে সফল করে তোলার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানে কয়েকটি শর্তকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে ধরে নেওয়া হয়।

উপযুক্ত আইন ব্যবস্থা

মঁতেস্কু (*Montesquieu*), ম্যাডিসন্ (*Madison*), ব্ল্যাকষ্টোন্ (*Blackstone*) প্রভৃতি লেখকেরা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণকে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে মনে করতেন। একই ব্যক্তি বা একই সংস্থার হাতে আইন প্রণয়ন, তার প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যার দায়িত্ব থাকলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সে কারণ তাঁরা এই তিন প্রকারের কাজ তিনটি পৃথক সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সন্দেহ নেই। তবে আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়। আবার ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রে যেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পূর্ণভাবে গৃহীত হয় নাই, সেখানে নাগরিকেরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপভোগ থেকে বঞ্চিত—একথা আদৌ বলা যায় না। আমাদের আরও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে বর্তমানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে পড়ায় ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হওয়ার পরিবর্তে তার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল আইনসভায় তার সমর্থনের সুযোগ নিয়ে যে কোন প্রকার আইন তৈরী করতে এবং তাকে কার্যকরী করতে সক্ষম হয়। স্বাধীনতা সংরক্ষণের শর্ত হিসেবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর বর্তমান যুগে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয় না।

বর্তমানকালে অবশ্য বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা, স্বাধীনতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয়। বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা বলতে বিচারকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত বোঝায়। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রের বিচারালয়ে অভিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষ, এমন কি সরকারও আইনভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারে।

বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের আইনবিভাগ সংবিধান বহির্ভূত আইন প্রণয়ন করতে পারে। আবার সকল প্রকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন-বিভাগ কর্তৃক আইনের অপপ্রয়োগও হতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়—দেশের বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট আইনভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা। মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে 'বন্দীপ্রত্যক্ষী-করণ' (Haboas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus) প্রভৃতি নির্দেশ জারি করার অধিকার রাষ্ট্রের উচ্চতর বিচারালয়গুলিকে দেওয়া হয়। ভারতবর্ষের সংবিধানেও বিচার বিভাগকে এই স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

বিচার বিভাগকে স্বীয় কাজ স্বাধীনভাবে করতে হলে সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে তাকে মুক্ত করতে হবে। বিচারকের চাকুরির স্থায়িত্ব অথবা নিরাপত্তা শাসনবিভাগীয় কর্তাদের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভর করলে বিচারকার্য নিরপেক্ষতা সহকারে নির্বাহ করা বিচারবিভাগের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত বলে স্বীকৃত। মৌলিক অধিকারগুলি সংবিধানে লিখিতভাবে স্থান পেলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা সহজে বোধগম্য হয়। সরকারের পক্ষে তার প্রয়োগবিধি সম্বন্ধেও কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। ভারতের সংবিধানে তৃতীয় পরিচ্ছেদে—(i) সাম্যের অধিকার (Right to Equality), (ii) সবিশেষ স্বাধীনতার অধিকার (Right to Particular freedoms), (iii) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against exploitation), (iv) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to freedom of religion), (v) সংস্কৃতি এবং শিক্ষা-সম্বন্ধীয় অধিকার (Cultural and Educational Rights) (vi) সম্পত্তির অধিকার (Right to Property), (vii) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (Right to constitutional

মৌলিক অধিকার

Remedies) ইত্যাদি অধিকারের অঙ্গ হিসেবে সংবিধানে স্থান পেয়েছে। কতকগুলি বিশেষ অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে লিখিত অবস্থায় স্থান দেওয়ার উদ্দেশ্য হল, সেগুলি সহজে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, সেজন্যে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষও সহজে নাগরিকদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হয় না।

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থিতি এবং কার্য-কারিতার উপর নাগরিকদের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে সাধারণ নাগরিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পায়। এর ফলে নাগরিকেরাও তাদের অধিকারগুলি রক্ষার জন্য যত্নশীল ও আগ্রহান্বিত হয়। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, "যে রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে ক্ষমতা অতিমাত্রায় পুঞ্জীভূত, সেখানে কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকতে পারে না।"[1]

গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা

গণতন্ত্রকে স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে ধরা হয়ে থাকে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একাধিক দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকার জন্য দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয়। গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ছাড়া বিরোধী দল থাকার জন্য সরকারকে তার দোষ ত্রুটি সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। বিরোধীপক্ষ আইন সভার ভিতরে ও বাইরে সরকারের কাজের সমালোচনা করে সরকারের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করে দেয়। সরকার জানে জনসাধারণের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে তাকে বিরোধী পক্ষের সমালোচনার পাত্র হতে হবে। বিরোধীপক্ষ সমালোচনার দ্বারা জনমতকে স্বপক্ষে আনতে সক্ষম হলে সরকারী দলের পক্ষে অধিকদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হবে না। ফলে স্বভাবতঃই তাঁরা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে জনসাধারণের বিরাগভাজন না হবার চেষ্টা করেন।

ইংলণ্ডের শাসন ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law)। আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায়, উচ্চপদস্থ কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক একই আইন ব্যবস্থার অধীন। ফ্রান্সের

---

1 "There will never be liberty in any State where there is an excessive concentration of power at the centre"

—*Laski* Liberty in the Modern State.

শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের বিচারের জন্য পৃথক আইন ও পৃথক বিচারালয় আছে। এই আইনকে 'শাসনসংক্রান্ত আইন' (*Droit administratif*) বলা হয়। এই আইন ব্যবস্থাকে অনেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে মনে করেন। ইংলণ্ডের আইনের অনুশাসন অনুসারে যেহেতু সকলেই একই আইন ব্যবস্থার অধীন, তজ্জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হবার সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য শাসন-সংক্রান্ত আইনের (*Droit administratif*) তুলনায় আইনের অনুশাসনের শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি তর্কসাপেক্ষ।

আইনের অনুশাসন

আইনের অনুশাসনের (Rule of Law) আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আইনের প্রাধান্য। আইনভঙ্গ না করলে কাউকে শাস্তি দেওয়া চলবে না এবং সরকারকে সমস্ত ক্ষমতা আইনের বিধান অনুসারে পরিচালিত করতে হবে। সরকারের তরফ থেকে স্বেচ্ছাচারিতার অবকাশ থাকলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অবশ্যই বিপযস্ত হবে।

জনসাধারণ যদি তাদের অধিকার বিষয়ে সচেতন না হয়, যদি তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সজাগ না হয় তাহলে পূর্বোক্ত শর্তগুলি সত্বেও তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে। গ্রীক দার্শনিক পেরিক্লিস (*Pericles*) বলেছেন, 'সদাজাগ্রত সতর্কতাই স্বাধীনতার মূল্য।' বিনামূল্যে স্বাধীনতার সংরক্ষণ সম্ভব নয়। স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হলেই নাগরিক মাত্রেরই উচিত তার প্রতিবাদ করা এবং প্রয়োজন হলে স্বাধীনতা ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এজন্য একদিকে নাগরিকদের মনে স্বাধীনতার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন, অন্যদিকে প্রয়োজন স্বাধীনতা রক্ষার কঠিন সংকল্প। এ-জাতীয় মনোভাব অকুতোভয় নাগরিকশ্রেণীর পক্ষেই সম্ভব। অধিকার রক্ষার জন্যে প্রয়োজন হলে যেমন নাগরিককে সংগ্রাম করতে হয় তেমন অধিকার বঞ্চিতদেরও অধিকার অর্জনের দাবিতে সংগ্রাম করতে হয়। এদিক থেকে দেখলে স্বাধীনতার সংগ্রাম অন্তহীন—সে সংগ্রামের শেষ নেই।

নাগরিকদের অধিকার সম্বন্ধে চেতনা

সাম্য

১। ভূমিকা (Introduction) :

সাম্য ও স্বাধীনতা শব্দ দুটি পরস্পর নিবিড়ভাবে যুক্ত। স্বাধীনতার ধারণাকে কার্যকরী করে তুলতে হলে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য।

মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য যে সমাজব্যবস্থায় অতি তীব্র ও প্রকট, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখানে স্বাধীনতার উপভোগ অসম্ভব। তাই স্বাধীনতার প্রয়োজনে সাম্যনীতির প্রয়োগ অপরিহার্য।

স্বাধীনতার আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে সাম্যনীতির প্রয়োগ যদি অপরিহার্য হয় তবে 'সাম্য' শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্য আমাদের ভালভাবে বোঝা দরকার।

সাম্যের ধারণা মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে না

মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য প্রকৃতিগত। শরীরের দিক থেকে অথবা বুদ্ধির দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বলে সাম্যের ধারণা অলীক নয়। সাম্য বলতে শারীরিক শক্তি বা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে সকল মানুষ সমান—একথা বোঝায় না। একজন বড় দার্শনিক এবং একজন সাধারণ শ্রমিক সমান প্রতিভার অধিকারী হতে পারে না।

ক্ষমতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে পার্থক্য থাকায় রাষ্ট্রের কাছ থেকে সমান ব্যবহার মানুষ মাত্রেই দাবি করতে পারে না। একজন বড় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের কাছে যে সুযোগ সুবিধা দাবি করতে পারে, একজন কৃষক বা শ্রমিক অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, "একজন গণিতজ্ঞ এবং একজন রাজমিস্ত্রী সমাজের কাছ থেকে সমান পরিমাণ স্বীকৃতি পেলে সমাজের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।"[1] তিনি আরও বলেছেন, "মানুষের অভাব, যোগ্যতা এবং প্রয়োজনে যতদিন পার্থক্য থাকবে ততদিন পযন্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহারের সমতা থাকতে পারে না।"[2] সুতরাং ল্যাস্কির মতে সাম্য বলতে ব্যবহারের সমত্বকে বোঝায়

সাম্যের যথার্থ অর্থ

না (Equality does not mean identily of treatmeant)। সাম্যনীতির যথার্থ অর্থ হচ্ছে, 'বিশেষ সুযোগ সুবিধার অপসরণ' (absence of special privilege) করে, সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি উন্মুক্ত রাখা ('adequate opportunities are laid open to all')। বস্তুতঃ, মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যকে স্বীকার

1 "The purpose of society will be frustrated at the outset if the nature of a mathematician met an identical response with that to the nature of a bricklayer."—*Laski*

2 "There can be no ultimate identity of treatment so long as men are different in want, capacity and need"—*Laski*

করে নিয়েও বলতে হবে যে, ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তিকে যথোপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখা যায় না। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলতে বোঝায় ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য উপযুক্ত সুযোগের সমতা। জাতি, ধর্ম, পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলের জন্য তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধার পথগুলি অবারিত এবং উন্মুক্ত রাখাকেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্য বলা হয়।

২। সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ কি বিপরীতমুখী ? (Are equality and liberty opposed to each other ?) :

মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য প্রাচীন মানবসমাজ থেকেই চলে আসছে। প্রাচীন সমাজে স্বাধীন মানুষ এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পরবর্তী কালে অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ প্রজার মধ্যে পার্থক্য সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। শিল্পোন্নত নিয়ন্ত্রণহীন সমাজেও পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য ছিল। দেশ-কালভেদে এই অসাম্য বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে – কোথাও বা সামাজিক, যেমন—ভারতে ব্রাহ্মণ, শূদ্রের মধ্যে পার্থক্য, কোথাও বা রাজনৈতিক, কোথাও বা অর্থনৈতিক।

সমাজের এই পার্থক্য নাগরিক জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে ধরে নিলে স্বাধীনতার কোন অর্থই থাকে না। তাই প্রতিবাদ ও আন্দোলনের সাহায্যে যুগে যুগে মানুষ চেষ্টা করে আসছে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের এক জ্বলন্ত অভিব্যক্তি ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)। ঐ সালের ফরাসী জাতীয় পরিষদ (National Assembly) সুস্পষ্ট ভাষায় মানুষের সমান অধিকারের দাবি বলিষ্ঠ ভাবে ঘোষণা করল।

টকভিলে (*Tocqueville*), লর্ড অ্যাক্টন (*Lord Acton*) প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা মনে করতেন স্বাধীনতা এবং সাম্য পরস্পর বিপরীতধর্মী আদর্শ। উনবিংশ শতকে হার্বাট স্পেন্সার (*Habert Spencer*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে অঙ্কুরিত করার জন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের প্রসারকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বিরোধী বলে মনে করতেন। অর্থনৈতিক বৈষম্যকে এক স্বাভাবিক ঘটনা বলে মেনে নিলে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর দ্বারা সাধারণ মানুষকে অবাধ শোষণের অধিকারকেও স্বাধীনতার নামে স্বীকার

টকভিলে ও অ্যাক্টনের মত

করে নিতে হয়। আজকের দিনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাই অবাধ ব্যক্তি-স্বাধীনতার নীতি পরিত্যক্ত হতে চলেছে। তাই পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রই আজ নিরঙ্কুশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পথ পরিত্যাগ করে জনকল্যাণমূলক আদর্শের পথে এগিয়ে চলেছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব তাই বেড়ে চলেছে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করে এমন এক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে, যার মধ্যে সত্যিকারের স্বাধীনতার উপভোগ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য-মূলক সমাজব্যবস্থায় যথার্থ স্বাধীনতা থাকতে পারে না

সাম্যের ধারণাটিকে কয়েকটি ভাগে দেখান যেতে পারে, যথা—(ক) **স্বাভাবিক সাম্য**, (খ) **সামাজিক সাম্য**, এবং (গ) **আইনগত সাম্য**।

(ক) **স্বাভাবিক সাম্য** (**Natural Equality**): স্বাভাবিক সাম্য বলতে বোঝায় সকল মানুষ সমান হয়ে জন্মেছে। মানুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য না থাকাকে স্বাভাবিক সাম্য বলে। আমেরিকায় স্বাধীনতা ঘোষণার একটি সূত্রে মানুষের এই জন্মগত সাম্যের ঘোষণা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক আদর্শ এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব হিসেবে স্বাভাবিক সাম্যের মূল্য থাকলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ অসম্ভব। দৈহিক বা বুদ্ধি-বৃত্তির দিক থেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য বাস্তব সত্য। সকল মানুষ সমান প্রতিভা বা সৃজনীশক্তির অধিকারী বলে মেনে নিলে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাম্য সম্বন্ধে বর্তমান ধারণা মানুষের এই জন্মগত বৈষম্যকে অস্বীকার করে না। জন্মগত বৈষম্যকে স্বীকার করে নিলেও মানুষের নিজস্ব সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতার দিকে বিকাশ করার সমান সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। সমাজে অনেক বৈষম্য আছে যেগুলি প্রকৃতিগত নয়। উপযুক্ত পরিবেশ বা সুযোগের অভাবে অনেক সময় মানুষের সঙ্গে মানুষের বিরাট বৈষম্য দেখা যায়। সাম্য সম্বন্ধে বর্তমান ধারণায় এই বৈষম্যমূলক প্রতিবন্ধকগুলি অপসারণ করে সকলকে সমান সুযোগ দেওয়ার কথাই বলা হয়।

(খ) **সামাজিক সাম্য** (**Social Equality**): জাতি, ধর্ম, বংশমর্যাদা, অর্থ, প্রতিপত্তির ভিত্তিতে অনেক সময় মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য দেখা যায়। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার নিগ্রো ও ভারতবাসী প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গদের সেখানকার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মত সমান সুযোগ সুবিধা দিতে রাজী নয়।

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল স্বাধীন নাগরিক এবং ক্রীতদাসদের মধ্যে বৈষম্য প্রয়োজনীয় বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

ভারতেও জাতিগত পার্থক্য সমাজব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সেকালে কেবলমাত্র সম্পত্তির অধিকারীদের মধ্যে সাম্যের প্রসারের যৌক্তিকতার উল্লেখ দেখা যায়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা সম্পত্তির ভিত্তিতে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য সূচিত করা সামাজিক সাম্যের পরিপন্থী।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সংবিধানে কতকগুলি সামাজিক বৈষম্যকে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে অস্পৃশ্যতার কারণে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা আইনতঃ দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

(গ) **আইনগত সাম্য (Legal Equality)ঃ** আইনগত সাম্যকে আবার (i) ব্যক্তিগত, (ii) রাজনৈতিক এবং (iii) অর্থনৈতিক—এই তিনদিক থেকে আলোচনা করা যেতে পারে।

(i) **ব্যক্তিগত সাম্য (Parsonal Equality)ঃ** আইনের দ্বারা সকল নাগরিকের জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বিত্ত নির্বিশেষে পৌর অধিকারগুলি উপভোগের অধিকারী করা হয়। মৌলিক অধিকারগুলি উপভোগের ক্ষেত্রে কোনরূপ পার্থক্য না থাকলে ব্যক্তিগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যেতে পারে।

(ii) **রাজনৈতিক সাম্য (Political Equality)ঃ** বর্তমান যুগে জনবহুল বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষভাবে সকলের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা আর সম্ভব নয়। তাই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করেন। নাগরিক মাত্রেরই নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রাজনৈতিক সাম্যের অন্তর্গত। সমান যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারলে সরকারী চাকরি ইত্যাদি সুযোগসুবিধাগুলিতে সকলের সমান সুযোগ রাজনৈতিক সাম্যের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হয়। মতপ্রকাশ, সভাসমিতি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সকলের সমান অধিকার সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই স্বীকৃত হতে চলেছে।

(iii) **অর্থনৈতিক সাম্য (Economic Equality)ঃ** আজকাল সকল রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক সাম্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। অর্থনৈতিক সাম্যের অভাবে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা সমাজনৈতিক সাম্য আসতে পারে না। যেখানে অধিকাংশ লোক জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনের সুযোগ হতে বঞ্চিত তাদের পক্ষে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী ব্যক্তিদের প্রভাব দ্বারা পরিচালিত

হওয়া স্বাভাবিক। তাই ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে একটা মোটামুটি সাম্য আনা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নতম ভোগ্যবস্তুর সংস্থান থেকে যেখানকার সাধারণ মানুষ বঞ্চিত সেখানে রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যাগুলির কথা তারা চিন্তা করতে পারে না। স্বল্পসংখ্যক ধনীব্যক্তি সাধারণ মানুষের অভাবের সুযোগ নিয়ে অতি সহজেই রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র তখন করায়ত্ত করতে সক্ষম হবে। তাই রাষ্ট্র মাত্রেরই উচিত অর্থ নৈতিক বৈষম্যকে কিছুটা সংকুচিত করা। তার অর্থ এই নয় যে, কোন প্রকার বৈষম্যই সমাজে থাকবে না। প্রতিভা ও বুদ্ধিবৃত্তির দিকে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য অবশ্যই আছে এবং রাষ্ট্র যদি প্রতিভার যথোপযুক্ত স্বীকৃতি না দেয় তাহলে সমাজের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

তবে এমন কোন বৈষম্য রাষ্ট্রে থাকতে দেওয়া উচিত নয় যার ফলে সাধারণ মানুষ নাগরিক জীবনের কোন অর্থই খুঁজে পাবে না। বৈষম্যের একটা ন্যায়সংগত ভিত্তি থাকতে হবে।

যে সামাজিক বৈষম্যের ফলে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়, রাষ্ট্রের উচিত তার অপসারণ করা। রাষ্ট্রকে তাই এগিয়ে আসতে হবে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে, যে পরিবেশে মানুষ সমাজের যে কোন স্তরে থাকুক না কেন তার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতার পথে নিয়ে যাবার সুযোগ থেকে যেন সে কোনরূপ বঞ্চিত না হয়।

৩। সাম্যের আদর্শকে কার্যকরী করার উপায় (Conditions for realisation of the Ideal of Equality):

সাম্যের আদর্শকে কার্যকরী করার জন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করেছেন।

প্রথমতঃ, পার্থক্যমূলক বিশেষ সুবিধাগুলি অপসারণ করতে হবে। যদি কেউ বিশেষ বংশে জন্মলাভ করার জন্য বা বিশেষ ধর্মমতের বিশ্বাসী হওয়ার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়, তবে সেখানে সাম্য বিরাজ করতে পারে না। রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থা কাদের দ্বারা পরিচালিত হবে তা নির্ধারিত হবে যোগ্যতা বা গুণের ভিত্তিতে।

পার্থক্যমূলক বিশেষ সুবিধার অপসারণ

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত সুযোগের পথ সকলের জন্য উপযুক্ত রাখতে হবে। উপযুক্ত সুযোগ বলতে সকলের জন্য একই প্রকার সুযোগ বোঝায় না। মানুষের আদিম গুণগুলি সমান নয়, সুতরাং অবস্থাভেদে

সুযোগের পার্থক্য থাকবেই। উপযুক্ত সুযোগ বলতে প্রত্যেকের নিজের নিজের সম্ভাবনাগুলিকে বিকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে বোঝায়। কোন প্রতিভার যেন উৎসাহের অভাবে অপমৃত্যু না ঘটে। প্রতিটি সম্ভাবনার প্রকৃত মান নির্ণয় করার জন্য রাষ্ট্রকে চেষ্টিত থাকতে হবে। প্রতিটি বালক-বালিকার উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ রাষ্ট্রকে দিতে হবে।

ব্যক্তিত্ববিকাশের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা

তৃতীয়তঃ, যে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট সেখানে সাম্য বিরাজ করতে পারে না। তাই সাম্যনীতিকে কার্যকরী করার জন্য ধনবণ্টনের বৈষম্যকে কমিয়ে আনা একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, "অর্থনৈতিক সাম্যের সঙ্গে একত্রিত না হলে রাজনৈতিক সাম্য কখনও বাস্তব হতে পারে না।"[1]

অর্থনৈতিক সাম্য

ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বৈষম্য থাকলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার রাজনৈতিক অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিত্তশালী সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে শাসন ক্ষমতা হস্তগত করবে এবং সমগ্র শাসনব্যবস্থা তাদের নির্দেশেই পরিচালিত হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সরকার শ্রেণীস্বার্থসিদ্ধির যন্ত্রে পর্যবসিত হতে বাধ্য।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের সংবিধানের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনায় নির্দেশাত্মক নীতিতে (Directive Principles of State Policy) ধনবণ্টনের বৈষম্যকে কমিয়ে এনে অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছে। ঐ উদ্দেশ্যে উপযুক্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার, জাতীয় সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন ও নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ স্বার্থে জাতীয় সম্পদ ও উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় লোকের করতলগত হতে না দেওয়া প্রভৃতির উল্লেখ করা হয়েছে।

অধিকার

১। ভূমিকা (Introduction):

অধিকারের ধারণা সমাজগত। মানুষ সমাজে বাস করে বলেই অধিকারের প্রশ্ন ওঠে। প্রকৃতির অফুরন্ত দান যেখানে মানুষ অবাধে উপভোগ করতে পায় সেখানে অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। সমাজে বাস করতে হয় বলেই

1 "Political equality is never real unless it is accompanied by economic equality ..."—Laski Grammar of Politics

সবকিছুর উপর মানুষ অবাধ ক্ষমতা দাবি করতে পারে না। কারণ অপরেরও প্রয়োজনের তাগিদ আছে। সমাজ জীবন সম্ভব করতে হলে প্রত্যেকের প্রয়োজন এবং সুযোগ সুবিধাগুলির পারস্পরিক বোঝাপাড়া এবং দেওয়া নেওয়ার ভিত্তিতে সামঞ্জস্যবিধান অপরিহার্য। একের ক্ষমতা বা সুযোগ যখন অন্যের দ্বারা স্বীকৃত হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তখন তা অধিকারে পর্যবসিত হয়।

অধিকার একটি সামাজিক ধারণা

স্পষ্টতঃই দেখা যায় অধিকারের বৈশিষ্ট্য মুখতঃ দুটি, প্রথমটি হচ্ছে (১) প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ঈপ্সিত বস্তুকে পাবার জন্য ক্ষমতার ব্যবহার করতে চায়। হব্‌সের ভাষায় এ হল, "আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতা।" কিন্তু এই ক্ষমতা শুধু পশুসুলভ শক্তি বা প্রবৃত্তিমাত্র হলে চলবে না—তাহলে সমাজজীবন সম্ভব হবে না। সমাজ-জীবনকে সম্ভব করতে হলে আরও চাই—(২) অনুরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃতি।

অধিকারের বৈশিষ্ট্য

মানুষ মাত্রেই চায় তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করতে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে আত্মোপলব্ধি করতে পারে বলেই সে মানুষ। মানুষের এই ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য তার প্রয়োজন কতকগুলি ক্ষমতা বা শর্তের। কিন্তু সামাজিক জীব হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অবাধ ক্ষমতা সে দাবি করতে পারে না। সামাজিক জীব হিসেবে তাকে সব সময়েই সজাগ থাকতে হয় যাতে তার কোন কাজ অপরের আত্মোপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি না করে। তাই সামাজিক মানুষের সমস্যাই হচ্ছে অপরের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থের সংগতি রক্ষা করা যাতে সকলেই অনুরূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে সমাজজীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে।

সামাজিক স্বীকৃতির গুরুত্ব

ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্য মানুষের বাঁচবার, সম্পত্তি রক্ষার, মত প্রকাশের, নিজস্ব বিবেক অনুসারে ধর্মাচরণ করবার, এমনি আরও অনেক সুযোগ সুবিধার দরকার। প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য যে, যে-কোন ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার আছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সে অপরের জীবননাশের ক্ষমতা ভোগ করবে। নিজস্ব বিবেক অনুসারে ধর্মাচরণের সুযোগের অর্থ অপরের ধর্মাচারণে উপর হস্তক্ষেপ বোঝায় না, মত প্রকাশের স্বাধীনতা বলতে তেমন মিথ্যা উক্তির দ্বারা অপরের সুনাম নষ্ট করাকে বোঝায় না। মানুষকে বাঁচতে

অধিকার বলতে কি বোঝায়

হবে অপরের বাঁচার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে। অন্যথায় সমাজ-জীবনের কোন সার্থকতা থাকে না। তাই সকলের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের জন্য যে সুযোগ সুবিধাগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয় সেইগুলিই হচ্ছে অধিকার।

সমাজে সকলের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পথকে প্রশস্ত করে সমাজজীবনকে সম্ভব ও সুন্দর করে তোলার জন্য কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধিকার বলতে আমরা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত সুযোগ সুবিধাগুলিকেই বুঝি।

মানুষ সামাজিক জীব। তাকে শুধু নিজের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করলেই হয় না। অপরের সুযোগসুবিধাগুলি সম্বন্ধে সে অবহিত বলেই সমাজ-জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। অপরের অভাবঅভিযোগ, সুযোগসুবিধার কথাও তাকে চিন্তা করতে হয়। পরস্পরের সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে প্রত্যেক মানুষ অবহিত থাকার জন্যই প্রত্যেকে নিজ নিজ অধিকার উপভোগ করে সমাজ জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়। অপরের অভাব অভিযোগ, সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে সহানুভূতি না থাকলে নিজের সুখ-সুবিধার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে কলহ বিবাদের সৃষ্টি করে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থাকেই হয়তো ধ্বংস করে দিত। মৎস্যন্যায় কবলিত সমাজ ব্যবস্থায় অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না। যেখানে বলবানের অপ্রতিহত ক্ষমতা, সেখানে অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। পারস্পরিক সুযোগসুবিধা, অভাবঅভিযোগ সম্বন্ধে নৈতিক সচেতনতা এবং সহানুভূতি সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই অধিকারের অস্তিত্ব সম্ভব। এইজন্য গ্রীন বলেছেন, "পরস্পরের প্রয়োজন সম্বন্ধে নৈতিক চেতনা সম্পন্ন সমাজব্যবস্থা ব্যতিরেকে অধিকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।"[1]

অধিকার সম্বন্ধে আদর্শবাদী গ্রীনের মত

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অধিকারের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে দার্শনিক গ্রীন সমাজের উপরেই বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে নৈতিক শুভ চেতনা সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থাতেই অধিকার থাকতে পারে। অধ্যাপক ল্যাস্কি পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকারের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, "অধিকার রাষ্ট্রের অগ্রবর্তী এই অর্থে যে, স্বীকৃত হোক বা না হোক রাষ্ট্রের বৈধতা

অধিকার সম্বন্ধে ল্যাস্কির মত

1. "Without a society conscious of common moral interest, there can be no rights"—*Green*

নির্ভর করে অধিকারের উপরেই।"[1] ল্যাস্কির বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দ্বারাই অধিকারের সার্থকতা প্রতিপন্ন হয় না। রাষ্ট্র কি পরিমাণে অধিকার প্রদান ও রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েছে তারই উপর নির্ভর করবে কতটা অনুগত্য সে নাগরিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে দাবী করবে। সুতরাং রাষ্ট্র অধিকার সৃষ্টি করতে পারে না—স্বীকার করে মাত্র এবং কতদূর সে তা করতে সক্ষম হয়েছে তারই উপর নির্ভর করে তার আসল স্বরূপ। ইংলণ্ডে ১৮৩২ সালের রিফর্ম এ্যাক্ট (*Reform Act of 1832*) পাস হবার আগে অনেকের ভোটাধিকারের ন্যায়সংগত দাবী স্বীকৃত হয় নি। তাই বলে সেই সময়ে এই অধিকারের দাবি কি অযৌক্তিক ছিল? সুতরাং রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট বা স্বীকৃত না হলে অধিকারের যে কোন নৈতিক ভিত্তিই থাকবে না—এই ধারণা ভুল। অনেক ন্যায়সংগত দাবি বর্তমানের রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত না থাকতে পারে—ফলে হয়ত অনেক ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সংগ্রাম ও দুঃখভোগের পথ বেছে নিতে হতে পারে। তাই বলে আমরা অধিকার হিসেবে সেগুলিকে অযৌক্তিক বা ভিত্তিহীন বলতে পারি না। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, "রাষ্ট্র যেন কতকগুলি স্বীকৃত অধিকার এবং কতকগুলি অস্বীকৃত, অথচ স্বীকারযোগ্য অধিকার সমষ্টির মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।"[2] স্বীকারযোগ্য অধিকারগুলিকে যে পরিমাণে রাষ্ট্র স্বীকৃতির মধ্যে আনতে পারবে সেই পরিমাণে সে তার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রতিপন্ন করতে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তার করে। সুতরাং রাষ্ট্রই মানব-জীবনের শেষ এবং চরম অভিব্যক্তি নয়। মানুষের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই রাষ্ট্র। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন কতকগুলি শর্ত অথবা সুযোগসুবিধার। যে সামাজিক শর্ত বা সুযোগসুবিধাগুলি মানুষকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করে সেইগুলিই তার অধিকার। অধ্যাপক ল্যাস্কির ভাষায় বলা যেতে পারে—"Rights, in fact, are those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best."

1 "Rights, therefore, are prior to the State in the sense that, recognised or no, they are that from which its validity derives"—*Laski* Grammar of Politics

2 "Any given State is set between rights that have been recognised and rights which demand recognition"—*Laski* Grammar of Politics.

মানুষকে তার গুণাবলীর সম্যক বিকাশ সাধন করে তাকে আত্মোপলব্ধিতে সাহায্য করার জন্যই রাষ্ট্র এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি স্বীকার করেই সে তা করতে সমর্থ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অধিকারের ক্ষেত্রে গ্রীন গুরুত্ব দিয়েছেন নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সমাজব্যবস্থার উপর আর ল্যাস্কি গুরুত্ব দিয়েছেন এর অন্তর্নিহিত যাথার্থের উপর।

২। অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights):

সাধারণভাবে অধিকারকে, (ক) **নৈতিক** (Moral) এবং (খ) **আইনগত** (Legal)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(ক) নৈতিক অধিকার (Moral Rights): কোন সমাজের প্রচলিত নীতিবোধ যে অধিকারসমূহের ভিত্তিস্বরূপ সেগুলিকে নৈতিক অধিকার বলা চলে। সমাজের নীতিবোধের দ্বারাই নৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত, এ-অধিকার আইন দ্বারা সমর্থিত নয়। সমাজের প্রচলিত নীতিবোধই যেখানে নৈতিক অধিকারের ভিত্তিস্বরূপ, সেখানে নৈতিক অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্র দণ্ড বিধান করে না, এ ক্ষেত্রে নিয়ম ভঙ্গকারী সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হয় মাত্র। প্রতিবেশীর প্রতি কর্তব্য, বিপন্নের প্রতি সহানুভূতি, প্রিয়জনের প্রতি মমতা, পূজনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সহযাত্রীর প্রতি সৌজন্য বা সাধারণভাবে সদাচার ইত্যাদি সমাজ-সমর্থিত বিধিসমূহকে নৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

(খ) আইনগত অধিকার (Legal Rights): যে সমস্ত অধিকার রাষ্ট্রীয় বিধি বা আইন দ্বারা স্বীকৃত ও সমর্থিত সেগুলিকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এ অধিকার আইন দ্বারা সংরক্ষিত। প্রচলিত নীতিবোধ আইনগত অধিকারকে অভিপ্রেত মনে করতে পারে, আবার এমন আইনগত অধিকারও থাকা সম্ভব যা সমাজের নীতিবোধের বিচারে অনভিপ্রেত। সমাজের নীতিবোধ দ্বারা সমর্থিত হোক বা না হোক, আইনগত অধিকার রক্ষার দায়িত্ব যেহেতু রাষ্ট্রের, সেজন্যে রাষ্ট্র এই অধিকার ভঙ্গকারীকে দণ্ডবিধান করে। অধুনা, আইনগত অধিকারকে (i) পৌর, (ii) রাষ্ট্রনৈতিক ও (iii) অর্থনৈতিক—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে।*

* স্বাধীনতা অংশে এ সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

(i) **পৌর অধিকার** (Civil Rights) : সমাজজীবন ও অস্তিত্ব নির্বাহের জন্য অপরিহার্য সুযোগসুবিধাসমূহকে পৌর অধিকার বলে। এই অধিকার সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। জীবনের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, সভা-সমিতি গঠনের অধিকার, চুক্তির অধিকার, পারিবারিক জীবনের অধিকার প্রভৃতি অধিকারসমূহ পৌর অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

(ii) **রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার** (Political Rights) : যে সুযোগসুবিধার সাহায্যে রাষ্ট্রীয় কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অংশ গ্রহণ সম্ভব হয়, সেই অধিকারসমূহকে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার বলে। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হবার অধিকার, রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, সরকারী চাকুরি পাবার অধিকার, আবেদন করার অধিকার, সরকারকে সমালোচনা করাব অধিকার প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ভুক্ত।

(iii) **অর্থনৈতিক অধিকার** (Economic Rights) : যে অধিকার-সমূহ অভাব ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে, সেই অধিকারসমষ্টিকে অর্থনৈতিক অধিকাব বলে। কাজ পাবার অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, অবকাশের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থনৈতিক অধিকারগুলিকে পৌর অধিকারের অন্তর্ভুক্তরূপেও গণ্য করা চলে, কেননা পৌর অধিকারেরও উদ্দেশ্য জীবন ও অস্তিত্বের নিরাপত্তা বিধান করা। এদিক থেকে বিচার করলে প্রকৃত পৌর অধিকার বলতে অর্থনৈতিক অধিকারকেও বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে অধিকাংশ রাষ্ট্রেই মানুষ অর্থনৈতিক অভাব থেকে মুক্ত নয়। ধন-বৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি ছাড়া জীবনের নিরাপত্তা বিধান অসম্ভব। বর্তমান ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিকারগুলির বিশেষ গুরুত্ব থাকায় এ অধিকার-সমূহকে স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে।

আইনগত অধিকারসমূহের শ্রেণীবিভাগের সংগত কারণ থাকলেও, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই অধিকারগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং অনেক সময় একই অধিকার কখনও পৌর, কখনও বা রাষ্ট্রনৈতিক। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, এক শ্রেণীর অধিকারের স্বীকৃতির মধ্যে অন্য শ্রেণীভুক্ত অধিকারের সংরক্ষণ সম্ভব হয় এবং কোনও বিশেষ অধিকারের অস্বীকৃতির ফলে

অন্য অধিকারও অর্থহীন হয়ে পড়তে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মত প্রকাশের স্বাধীনতা অন্যতম পৌর অধিকার, কিন্তু নাগরিক যখন রাষ্ট্রীয় বিষয় সম্পর্কে স্বাধীন মত ব্যক্ত করে তখন তা রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। আবার প্রতিনিধি নির্বাচন করার ও নির্বাচিত হবার অধিকার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারসমূহের মধ্যে প্রধান দুটি অধিকার। এই দুটি অধিকার ব্যতিরেকে পৌর ও অর্থনৈতিক, এই উভয়বিধ অধিকারই প্রহসনে পরিণত হবে। সেদিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার পৌর ও অর্থনৈতিক অধিকারের ভিত্তিস্বরূপ, আবার যে মানুষ অর্থনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত, তার রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থাকলেও সে ঐ অধিকারের যথাযোগ্য ব্যবহারে অসমর্থ হবে, তাতে কোন ভুল নেই।

৩। মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights):

আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিক যে সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকে তার মধ্যে কতকগুলিকে মৌলিক অধিকার বলা হয়। আইনের দৃষ্টিতে সমতার অধিকার, বাক্ স্বাধীনতার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার, জীবিকা নির্বাহের জন্য কর্মসংস্থানের অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ মৌলিক অধিকার বলা হয়। এগুলিকে মৌলিক অধিকার বলার কারণ এই যে, প্রত্যেক নাগরিককে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করার জন্য এই অধিকারগুলি অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। এইগুলির অভাবে নাগরিক তার ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে সক্ষম নয় বলে এই অধিকারগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বলে অধিকারগুলি আধুনিক কালে প্রায়ই রাষ্ট্রের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধানে এই অধিকারগুলি স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের সংবিধানেও তৃতীয় পরিচ্ছেদে কতকগুলি অধিকার মৌলিক অধিকার বলে লিখিতভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলে কিছু নেই। ব্রিটেনের সংবিধান মূলতঃ অলিখিত। এখানে পার্লামেণ্ট রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। পার্লামেণ্ট সাধারণ উপায়ে সংবিধানগত যে কোন বিধান বা অধিকার পরিবর্তন করতে সক্ষম। ব্রিটেনের সংবিধান মুখ্যতঃ অলিখিত হলেও অন্যান্য দেশের মৌলিক অধিকারগুলির মত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার—যেমন, ম্যাগনাকার্টা

(*Magnacarta*), বিল অব রাইটস্ (*Bill of Rights*) প্রভৃতি—রাষ্ট্রীয় দলিলগুলির মধ্যে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া, অন্যান্য দেশে মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত অনেক অধিকার গ্রেট ব্রিটেনে প্রথাগত নিয়ম ও সাধারণ আইনের মধ্যে (*Common Law*) সংরক্ষিত আছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চূড়ান্ত অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এই বিধানগুলিকে পরিবর্তন করার আইনগত অধিকার থাকলেও পার্লামেণ্ট এইগুলি রক্ষা করেই রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক মর্যাদাকে রক্ষা করেন। অনেক মৌলিক অধিকার লিখিত অবস্থায় নেই বলে ব্রিটেনের লোকেরা মৌলিক অধিকার ভোগ করে না বলে ধরে নিলে আমরা ভুল করব। বস্তুতঃ, অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় ব্রিটেনের নাগরিকেরা এই অধিকার অনেক বেশী পরিমাণে ভোগ করে থাকে।

যে অধিকারগুলি নাগরিক জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় সেগুলি সম্বন্ধে কোন অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের অবকাশ না রাখার জন্যই অধুনা অনেক দেশের সংবিধানে তাদের লিখিত আকারে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাধারণ আইন সহজে পরিবর্তন করা যায় কিন্তু সংবিধান পরিবর্তন কষ্টসাধ্য—বিশেষ করে লিখিত সংবিধান সমন্বিত রাষ্ট্রে। এইরূপ ক্ষেত্রে এক বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তনের ব্যবস্থা থাকায় এই অধিকারগুলির উপভোগের জন্য শাসন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করতে হয় না। তাছাড়া, যেহেতু সংবিধানে বিধানগুলিকে সাধারণ আইন অপেক্ষা অধিকতর সম্ভ্রমের চক্ষে দেখা হয়, সে কারণে সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের খেয়াল খুশি মত পরিবর্তন করতে সাহসী হন না।

৪। অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties):

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। অধিকার একটি সামাজিক ধারণা। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ কর্তব্যহীন অধিকার দাবী করতে পারে না। আমার বাঁচবার অধিকার আছে, মত প্রকাশের অধিকার আছে, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে। এই অধিকার আমি ভোগ করতে পাই কারণ অপরে আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না, অর্থাৎ আমার অধিকার রক্ষা করা অপরের কর্তব্য। আমার বাঁচবার অধিকার আছে এর অর্থ অপরের কর্তব্য আমার জীবননাশ না করা; আমার মত প্রকাশের অধিকার আছে এর অর্থ অপরের কর্তব্য আমার মত প্রকাশে বাধা না দেওয়া। অনুরূপভাবে বলা যেতে পারে, অন্যের জীবনহানি হতে

পারে এরূপ কিছু না করা আমার কর্তব্য। অন্যের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার যে অধিকার আছে তাতে বাধা না দেওয়া আমার কর্তব্য। সুতরাং একের যা অধিকার অন্যের তা কর্তব্য এবং অন্যের যা অধিকার একের তা কর্তব্য। অতএব, অন্যে কর্তব্য পালন করে বলে আমার পক্ষে যদি অধিকার ভোগ করা সম্ভব হয় তবে অবশ্যই অপরের অধিকার ভোগের জন্য অনুরূপ কর্তব্য আমাকেও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের সমর্থন ও স্বীকৃতি থাকে বলেই অধিকার ও কর্তব্য সার্থকতা লাভ করে। রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান ভাবে অধিকার ভোগ করতে পারে, কারণ অধিকারগুলি রাষ্ট্রের দ্বারা রক্ষিত হয়। রাষ্ট্র দ্বারা এগুলি রক্ষিত না হলে সকলের পক্ষে অধিকার ভোগ করে সমাজজীবন নির্বাহ করা সম্ভব হত না। সুতরাং সকলেরই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা অবশ্য কর্তব্য। প্রত্যেক নাগরিকের উচিত-রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রের ব্যয়-ভার নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট কর প্রদান করা এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য করা। রাষ্ট্র তার অধিকার হিসেবে নাগরিকদের কাছ থেকে তাদের এই কর্তব্যগুলি দাবি করতে পারে। কারণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব ক্ষুন্ন হলে নাগরিকদেরও অধিকার বলে কিছু থাকবে না।

সুতরাং অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে যদি (১) প্রত্যেকে অপরের অনুরূপ অধিকার ক্ষুন্ন না করে এবং (২) রাষ্ট্রের পরিচালনা ও নিরাপত্তার জন্য তার প্রতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকে তবেই অধিকার সর্বসাধারণের করায়ত্ত হয়ে সুষ্ঠু সমাজজীবন নির্বাহের সহায়ক হবে।

৫। প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights) :

প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণা রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং ফরাসী বিপ্লবে এই প্রাকৃতিক অধিকারের আদর্শ প্রেরণা জুগিয়েছিল।

এখন আমাদের জানা দরকার, প্রাকৃতিক অধিকার বলতে কি বোঝায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে মানুষ কতকগুলি স্বাভাবিক এবং অপরিত্যাজ্য অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং কোন সমাজ ব্যবস্থাই কোনক্রমেই তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। বাঁচবার অধিকার বা নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুসরণের অধিকার সহজাত অধিকার এবং কোন অজুহাতেই রাষ্ট্র মানুষকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

প্রাকৃতিক অধিকার বলতে এক স্বাভাবিক এবং অপরিত্যাজ্য অধিকারকে বোঝায়

সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকগণ বিভিন্নভাবে প্রাকৃতিক অধিকারের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, এই মতবাদের লেখকগণের মতে রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় মানুষ প্রাকৃতিক অধিকার ভোগ করত এবং সেইগুলিকে যথাসম্ভব রক্ষা করাই হল রাষ্ট্রের কর্তব্য।

হব্‌স্ (*Hobbes*) স্বাভাবিক অধিকার বলতে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রত্যেকের নিজস্ব ধারণা মত যা কিছু করার অবাধ স্বাধীনতাকে বুঝতেন।

হব্‌সের মত

তাঁর মতে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে মানুষ তার অভাবকে পরিতৃপ্ত করার জন্য যে কোন জিনিসের উপর ক্ষমতা দাবি করতে পারে। প্রত্যেক লোকের এ-জাতীয় প্রাকৃতিক অধিকার থাকার জন্যই রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় মানুষের জীবন ছিল সংঘর্ষপূর্ণ।

ইংরেজ দার্শনিক লক (*Locke*) জীবন স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষার অধিকারকে প্রাকৃতিক অধিকার বলে বর্ণনা করেছেন।[1]

লকের মত

স্বাস্থ্য রক্ষার অধিকারকেও তিনি ক্ষেত্র বিশেষে প্রাকৃতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি রক্ষার প্রাকৃতিক অধিকারগুলিকে বজায় রাখার জন্য প্রাকৃতিক অধিকারের কিছু অংশকে পরিত্যাগ করে মানুষ চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের পত্তন করেছিল।

রুশোর মতে মানুষ প্রাকৃতিক রাজ্যে যে অধিকার ভোগ করত তা তার নিজেকে রক্ষা করার প্রবৃত্তি এবং তার সঙ্গে যুক্ত ছিল অপরের দুঃখকষ্টের অনুভূতি বোধ। তিনি আরও বলেছেন, মানুষ

রুশোর মত

প্রাকৃতিক রাজ্যে কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করত। এগুলির মূলে ছিল মুখ্যতঃ দু'টি প্রবৃত্তি: একটি হচ্ছে তার আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি এবং অপরটি হচ্ছে অপরের দুঃখ অনুভূতির প্রবৃত্তি। চুক্তির দ্বারা মানুষ তার সমস্ত অধিকারকে সমাজের কাজে সমর্পণ করে এবং ব্যক্তি-ইচ্ছাগুলি সাধারণ ইচ্ছার (General will) সঙ্গে একীভূত করে সাধারণ ইচ্ছাকেই ব্যক্তি-ইচ্ছা বলে স্বীকার করে নেয়। ফলে ব্যক্তির সাধারণ অধিকার এবং স্বাধীনতা সমাজের সাধারণ ইচ্ছার (General will) মধ্যে সংরক্ষিত হয়।

1. "Man hath by nature a power ..to preserve his property—that is, his life, liberty and estate"—*Locke* · Treatises of Government

আদর্শবাদী গ্রীন (*Green*) প্রাকৃতিক অধিকারকে এক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেক মানুষের একটি নৈতিক প্রকৃতি আছে এবং সেই নৈতিক প্রকৃতির উপলব্ধির জন্য যে অধিকারগুলি প্রয়োজন সেগুলিকে তিনি স্বাভাবিক অধিকার বলে আখ্যা দিয়েছেন। রাষ্ট্র সেই অধিকারগুলি রক্ষা করে মানুষের নৈতিক সত্তার উপলব্ধির পথে অন্তরায়গুলি দূরীভূত করতে পারে।

গ্রীনের মত

ইউটিলিটেরিয়ান (utilitarian) মতবাদের প্রচারক বেন্থাম (*Bentham*) প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাকে সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সমাজ নিরপেক্ষ কোন অধিকাব থাকতে পারে না। অধিকারের অস্তিত্ব তখনই সম্ভব যখন সমাজ তাকে স্বীকার করে নেয়। ইউটিলিটেরিয়ানদের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য তথাকথিত প্রাকৃতিক অধিকারগুলি রক্ষা করা নয়—সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। সমাজ যে অধিকারগুলি স্বীকার করে নেয় তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে অধিকাংশ লোকের অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য—ব্যক্তিবিশেষের অপরিত্যজ্য সহজাত অধিকার স্বীকার তার উদ্দেশ্য নয়।

সমালোচনা

বিখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ হল্যাণ্ডের (*Holland*) মতে অধিকার সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রের আইন দ্বারা সৃষ্ট বা স্বীকৃত। রাষ্ট্রের সমর্থন ও সাহায্যের দ্বারা একে অন্যের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। সুতরাং রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতাই অধিকার।

স্বাভাবিক অধিকারের ধারণার বিরুদ্ধে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, 'প্রাকৃতিক' কথাটি কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় কতকগুলি তথাকথিত অধিকারকে কোন কোন লেখক স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক অধিকার বলে আখ্যা দিয়েছেন। আবার অনেকে প্রাকৃতিক অধিকার বলতে সমাজ জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলির দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করেছেন।

অধিকারের ধারণা সমাজগত। রাষ্ট্র-পূর্ব অবস্থায় বা রাষ্ট্রের বাইরে কোন অধিকার থাকতে পারে না। সমাজ নিরপেক্ষ অধিকারের ধারণা অলীক। ব্যক্তিবিশেষের যে দাবি অন্যের স্বীকৃতির উপর দাঁড়িয়ে নেই সেখানে অধিকার বলে কোন কিছু থাকতে পারে না। শক্তিমানের যথেচ্ছাচার স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না। এই ক্ষমতা যেখানে সে অবাধে প্রয়োগ করতে পারে সেখানে সমাজব্যবস্থা বলতে কিছু নেই।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বাধীনতা বলতে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে বোঝায় না। রাষ্ট্র মানুষের অবাধ স্বাধীনতায় বাধানিষেধ আরোপ করে সমাজজীবন সম্ভব করে তোলে। তাই রাষ্ট্রের আরোপিত বাধানিষেধ এবং স্বাধীনতা পরস্পর বিরোধী ধারণা নয়।

স্বাধীনতার প্রকারভেদ :

অধ্যাপক ল্যাস্কি (১) ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, (২) রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং (৩) অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উল্লেখ করেছেন। এগুলি ছাড়া পৌর স্বাধীনতা এবং জাতীয়-স্বাধীনতারও উল্লেখ করা যেতে পারে। পৌর-স্বাধীনতার মধ্যে (ক) জীবন-ধারণের অধিকার (খ) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার (গ) সম্পত্তি রক্ষার অধিকার (ঘ) চিন্তা ও মত-প্রকাশের স্বাধীনতা (ঙ) ধর্মাচরণের অধিকার এবং (চ) শিক্ষার অধিকার উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার সংরক্ষণ :

স্বাধীনতার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির প্রয়োজন : (১) উপযুক্ত আইন-ব্যবস্থা, (২) ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ, (৩) 'বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা', (৪) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি (৫) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের অবস্থিতি (৬) একাধিক দলপ্রথা সমন্বিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং (৭) আইনের অনুশাসন।

সাম্য :

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সাম্যের ধারণা মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অস্বীকার করে না। রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সাম্য বলতে সকলের জন্য যথোপযুক্ত সুযোগসুবিধাগুলিকে উন্মুক্ত রাখা এবং বিশেষ সুযোগসুবিধাগুলির অপসারণকে বোঝায়।

সাম্য ও স্বাধীনতা :

টকভিলে, অ্যাকটন প্রভৃতি লেখকেরা সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে বিপরীতমুখী বলে প্রচার করেছেন। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় সত্যিকারের স্বাধীনতার উপভোগ সম্ভব নয়। স্বাধীনতা যথার্থভাবে উপভোগ করতে হলে অর্থনৈতিক সাম্য-প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন।

সাম্যের শ্রেণীবিভাগ :

সাম্যের ধারণাটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে দেখান যেতে পারে। যথা—(১) স্বাভাবিক সাম্য, (২) সামাজিক সাম্য এবং (৩) আইনগত সাম্য। আইনগত সাম্যকে আবার (ক) ব্যক্তিগত, (খ) রাজনৈতিক এবং (গ) অর্থনৈতিক—এই তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

সাম্যের আদর্শকে কার্যকরী করার উপায় :

সাম্যের আদর্শ কার্যকরী করতে হলে—(১) পার্থক্যমূলক বিশেষ সুবিধাগুলির অপসারণ, (২) ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত সুযোগ এবং (৩) অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।

অধিকার :

অধিকারের ধারণা সমাজগত। মানুষ তার আত্মতৃপ্তির জন্য চায় অবাধ ক্ষমতা। কিন্তু এই অবাধ ক্ষমতা অপরের আত্মোপলব্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করলে চলে না। তাই মানুষের আত্মোপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও শর্তগুলির সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন। সকলের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের জন্য যে সুযোগসুবিধাগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত হয় সেগুলিই হচ্ছে অধিকার। মানুষ অপরের অভাবঅভিযোগ, সুযোগসুবিধা সম্বন্ধে সজাগ বলেই সমাজজীবন সম্ভব হয়।

আদর্শবাদীরা যথার্থ অধিকারের জন্য নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সমাজব্যবস্থার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। ল্যাস্কির মতে শুধুমাত্র সমাজের স্বীকৃতির উপর আইনের যাথার্থ নির্ভর করে না। তার নিজস্ব বৈধতার জন্যই অধিকার। এই হিসেবে অধিকার রাষ্ট্রেরও অগ্রবর্তী।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ :

অধিকারকে সাধারণতঃ (১) নৈতিক ও (২) আইনগত—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আইনগত অধিকারকে আবার (১) পৌর, (২) রাষ্ট্রনৈতিক ও (৩) অর্থনৈতিক—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

মৌলিক অধিকার :

মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে অধিকারগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায় সেইগুলিকেই মৌলিক অধিকার বলা হয়। মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে আইনের দৃষ্টিগত সমতার অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার অধিকার, সাংস্কৃতিক অধিকার, কর্ম-সংস্থানের অধিকার অন্যতম।

অধিকার ও কর্তব্য :

অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একের অধিকার অন্যের তা কর্তব্য, আবার অন্যের যা অধিকার একের তা কর্তব্য।

প্রাকৃতিক অধিকার :

মানুষ যে স্বাভাবিক এবং অপরিত্যাজ্য অধিকারগুলি নিয়ে জন্মায় সেগুলিকে সাধারণভাবে প্রাকৃতিক অধিকার বলা হয়। সামাজিক চুক্তি মতবাদের লেখকেরা প্রাকৃতিক অধিকারের ধারণাকে তাদের পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আলোচনা করেছেন। গ্রীনের মতে মানুষের নৈতিক প্রকৃতির উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অধিকারগুলিই প্রাকৃতিক অধিকার।

Exercise

1. What is meant by the concept of liberty ? "Sovereignty and liberty are not contradictory terms"—Examine the proposition (C. U 1957)

2 "Liberty of an individual is not always in inverse ratio to the amount of state legislation"—Discuss.

3 Explain the concept of liberty What are the methods for safeguarding individual liberty ? (C. U. 1961)

4. Define equality. Do you think that liberty and equality are opposed to each other ? Give reasons for your answer.

5 What are rights ? Distinguish between Civil and Political rights How are Civil rights guaranteed in (a) U S.A., (b) England and (c) India ? (C U. 1946)

6. Enumerate the important fundamental rights which a citizen in a modern state enjoys. (C U 1951)

7 "Rights imply duties"—Discuss.

8 Briefly discuss the concept of Natural Rights.

দশম অধ্যায়

সরকার ও তার শ্রেণীবিভাগ

১। ভূমিকা (Introduction) :

বর্তমান কালে আমরা সরকারের বিভিন্ন প্রকারের অস্তিত্ব দেখতে পাই—গণতান্ত্রিক অথবা একনায়কতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক অথবা প্রজাতান্ত্রিক প্রভৃতি। সরকারের এই বিভিন্ন প্রকারকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রেণীবিভাগ করে, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান কাজ।

অনেক লেখক সরকারের শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে আমরা বুঝব সকল রাষ্ট্রই মূলতঃ একই প্রকারের। জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার ও সার্বভৌম ক্ষমতা—এই চারটি উপাদান নিয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি। অবশ্য জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের ভিত্তিতে রাষ্ট্র বড় অথবা ছোট হতে পারে, তবে তার আসল স্বরূপের কোন পার্থক্য তা দ্বারা সূচিত হয় না। সুতরাং এর ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণী-বিভাগ করা অথবা পার্থক্য নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। অধ্যাপক গার্ণারের (*Garner*) মতে আজকের দিনে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের ধারণার পার্থক্য সম্বন্ধে সচেতন থেকে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

শ্রেণীবিভাগ সরকারের ক্ষেত্রে সম্ভব, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়

২। সরকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Government) :

(ক) **প্রাচীন শ্রেণীবিভাগ :** সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটলপ্রমুখ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকগণ সরকারের শ্রেণীবিভাগের প্রচেষ্টা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস সরকারকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন—যথা, রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র। তাছাড়া, রাষ্ট্র জ্ঞানীব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, সক্রেটিস এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো তাঁর গুরুর অনুগামী হযে সরকারকে গুণ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। প্লেটো যেমন সক্রেটিসের অনুগামী ছিলেন আরিস্টটলও সেরূপ প্লেটোকে অনুসরণ করে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। আরিস্টটল

তাঁর *Politics* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করেন। আরিস্টটল রাষ্ট্রকে দুটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ভাগ করেন—প্রথমটি হচ্ছে সংখ্যা এবং দ্বিতীয়টি গুণ। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একজনের হাতে থাকলে সেটি হচ্ছে রাজতন্ত্র, কয়েকজনের হাতে থাকলে অভিজাততন্ত্র এবং বহুর হাতে থাকলে সেটি গণতন্ত্র। এগুলি সরকারের স্বাভাবিক রূপ। কিন্তু সরকার সাধারণ অবস্থায় না থেকে বিকৃতরূপ গ্রহণ করতে পারে। সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য পরিচালিত না হয়ে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের উদ্দেশ্যে সরকারের কাজ পরিচালিত হলে তার স্বরূপ বিকৃত হয়। রাজতন্ত্রের বিকৃতরূপ স্বেচ্ছাতন্ত্র, অভিজাততন্ত্রের বিকৃতরূপ ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের বিকৃতরূপ জনতাতন্ত্র।

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগটি এইভাবে দেখানো যেতে পারে:

সংখ্যা	স্বাভাবিক রূপ (Normal)	বিকৃত রূপ (Perverted)
একজনের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (Tyranny)
কয়েকজনের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র (Oligarchy)
অনেকের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা	গণতন্ত্র (Polity)	জনতাতন্ত্র (Democracy)

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ আজকের দিনে রাষ্ট্রের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্দেশের কাজে অচল। আমরা যে সব রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত তাদের কোনটিকেই আরিস্টটলের ছকে ফেলে বিচার করা যেতে পারে না। আজকাল নিছক রাজতন্ত্র বলে কোন শাসন-ব্যবস্থা নেই। রাজার ক্ষমতা আজ নানাভাবে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ বা প্রকারভেদ দেখা যায়; যেমন, পার্লামেণ্ট পরিচালিত গণতন্ত্র বা প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত গণতন্ত্র প্রভৃতি।

সমালোচনা

আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ মূলতঃ সংখ্যাভিত্তিক। তাছাড়া, গুণের দিক থেকে তিনি যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন বর্তমান যুগে তা আর গ্রহণযোগ্য নয়। অন্ততঃ প্রকাশ্যভাবে সব রাষ্ট্রই আজকের দিনে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র।

আরিস্টটলের বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে তিনি যে-সব রাষ্ট্রকে চোখের সামনে রেখে তাঁদের শ্রেণীবিভাগ করেছেন, সেগুলি হল তখনকার দিনের গ্রীসের নগর-রাষ্ট্র।

বর্তমান যুগে শাসনব্যবস্থার বৈচিত্র্য, প্রসার ও জটিলতাকে আরিস্টটলের মাপকাঠিতে বিচার না করা গেলেও তিনি যে দুটি মূল নীতির উল্লেখ করেছেন, সাধারণভাবে তাকে আজও অস্বীকার করা চলে না।

(খ) **বর্তমান শ্রেণীবিভাগ :** আধুনিককালে যে শ্রেণীবিভাগ সর্বজন-গ্রাহ্য এবং বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃত হয়েছে তা হচ্ছে অধ্যাপক লীককের (*Leacock*) শ্রেণীবিভাগ। অবশ্য আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে অধ্যাপক লীককের পক্ষে এই শ্রেণীবিভাগের কাজ সহজতর হয়েছিল, তার কারণ এই শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে ছিল তাঁর পূর্ববর্তীদের ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনা।

ঐতিহাসিক ম্যারিয়ট (*Marriott*), বদাঁ (*Bodin*), হবস্ (*Hobbes*), লক (*Locke*) প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরাও রাষ্ট্রের শ্রেণীকরণ করেছেন। ইতালীর দার্শনিক মেকিয়াভেলিও গ্রীক্ দার্শনিক আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে মুখ্যতঃ গ্রহণ করে তাঁর রাষ্ট্রীয় আলোচনাকে মূলতঃ রাজতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক সরকারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেছেন। তিনি মনে করতেন, দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর আদর্শ রাষ্ট্রীয় কাঠামো নির্ভরশীল।

বদাঁর শ্রেণীবিভাগ

বদাঁ (*Bodin*) প্রধানতঃ সংখ্যার ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেন। তাঁর মতে কোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, তদপেক্ষা কমসংখ্যক লোক অথবা একজনমাত্র ব্যক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। এরূপ শাসনব্যবস্থাকে যথাক্রমে গণতান্ত্রিক (Democratic), অভিজাততান্ত্রিক (Aristocratic) এবং রাজতান্ত্রিক (Monarchy) সরকার বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তিনি আবার রাজার স্বরূপ অনুসারে *Despotism*, *Royal Monarchy* এবং *Tyranny*—এই তিন ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন।

লকের শ্রেণীবিভাগ

লকের শ্রেণীবিভাগও প্রধানতঃ সংখ্যাভিত্তিক। তবে তাঁর মতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতার উপর সরকারের শ্রেণীবিভাগ নির্ভর করে। যদি কোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় একজন মাত্র আইন প্রণেতা থাকে তবে তা রাজতান্ত্রিক (Monarchy), যদি কয়েকজন মাত্র লোকেরা হাতে সেই অধিকার থাকে তবে সে সরকার ধনিকতান্ত্রিক (Oligarchy) এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে এই ক্ষমতা থাকলে সেই শাসনব্যবস্থাকে তিনি গণতান্ত্রিক (Democracy) সরকার বলেছেন।

ফরাসী দার্শনিক রুশো গণতন্ত্র (Democracy), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং রাজতন্ত্র (Monarchy)—এই তিন ভাগে সরকারের ভাগ করেছেন।

তিনি অভিজাততন্ত্রকে আবার প্রাকৃতিক (Natural), নির্বাচিত (Elective) এবং বংশানুক্রমিক (Hereditary)—এই তিন ভাগে ভাগ করেছেন।

সুইস লেখক ব্লান্‌চলি (*Bluntschli*) আরিস্টটলের শ্রেণীবিভাগকে গ্রহণ করেছেন এবং ধর্মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Theocracy) বলে এক চতুর্থ প্রকার নূতন শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন। যে শাসনব্যবস্থায় শাসক ভগবানের ইচ্ছাকে ঠিকমত আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগাতে পারেন তাকে তিনি *Theocratic* শাসনব্যবস্থা বলেছেন।

ব্লান্‌চলির শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক ম্যারিয়ট (*Marriott*) তিন প্রকার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমতঃ, তিনি ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই ভিত্তি অনুসারে সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা হতে পারে। যখন রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বলে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক শাসন সংস্থাগুলি এখানে কেন্দ্রীয় সরকারেরই সৃষ্টি।

ম্যারিয়টের শ্রেণীবিভাগ

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা দু'প্রকার সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বণ্টিত হয়ে থাকে। প্রাদেশিক সরকারগুলি এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্ট নয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের ক্ষমতার উৎস এক। সুতরাং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার ক্ষেত্রকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।

তাঁর দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে সংবিধানের পরিবর্তনশীলতা। তাঁর মতে সংবিধান সুপরিবর্তনীয় অথবা দুষ্পরিবর্তনীয় হতে পারে। রাষ্ট্রের যে আইনসভা আইন তৈরী করতে পারে সেই আইনসভাই যদি সংবিধান প্রণয়ন অথবা পরিবর্তন করতে পারে তবে তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা যেতে পারে। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য যদি আইনসভার এক বিশেষ গঠন অথবা বিশেষ রকমের নিয়ম বা প্রণালী অনুসরণ করতে হয় তবে তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়।

ম্যারিয়টের তৃতীয় ভিত্তি হচ্ছে আইনসভার সঙ্গে শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তি। এই ভিত্তি অনুসারে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ক্ষমতা, সমক্ষমতা অথবা অধঃস্তন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। যেখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের চাইতে অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী সেই

শাসনব্যবস্থাকে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যেখানে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ সমান ক্ষমতায় অধিকারী সেই শাসনব্যবস্থাকে প্রেসিডেন্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসক বিভাগ আইন বিভাগের সঙ্গে প্রায় সম ক্ষমতাসম্পন্ন। যেখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের অধঃস্তন, সেই শাসনব্যবস্থাকে মন্ত্রীসভা চালিত বা দায়িত্বশীল (Responsible Government) শাসনব্যবস্থা বলা যেতে পারে। যেমন, গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এই নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

ডাঃ লীককের শ্রেণীবিভাগ

লীকক (*Leacock*) সরকারকে প্রথমতঃ, একনায়কতান্ত্রিক (Despotic) এবং গণতান্ত্রিক (Democratic)—এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। গণতন্ত্রকে আবার নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (Limited monarchy) এবং প্রজাতন্ত্র (Republic)—এই দুইভাগে ভাগ করেছেন। এদের প্রত্যেকটিকে এককেন্দ্রিক (Unitary) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)—এই দুইভাগে ভাগ করে তাদের আবার মন্ত্রীসভা পরিচালিত (Cabinet or Parliamentary) এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত (Presidential or Non-Parliamentary)—এই দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন।

লীককের শ্রেণীবিভাগটি নিম্নলিখিত ভাবে দেখান যেতে পারে :
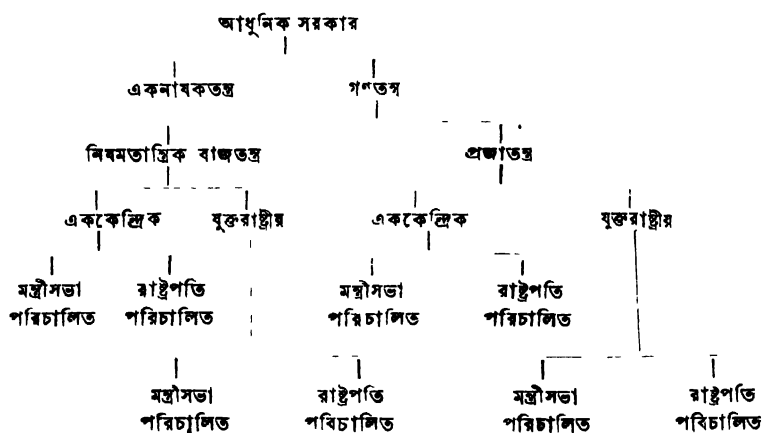
৩। রাজতন্ত্র (Monarchy) :

যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে রাজতন্ত্র বলে।

মানব সমাজের আদিস্তরে রাষ্ট্রীয় সংগঠন ছিল রাজতান্ত্রিক। শারীরিক শক্তি অথবা চাতুর্য যে কোন প্রকারেই ব্যক্তি বিশেষ সমাজের প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেকে নেতৃত্বপদে অধিষ্ঠিত করুক না কেন মানুষ তাকে কালক্রমে রাজপদে অভিষিক্ত করে তার শক্তি এবং কর্তৃত্বের উপর দৈবিক শক্তি আরোপ করেছিল। দৈবিক শক্তি বলে বলীয়ান রাজা সমাজের আদিস্তরে মানুষকে আইনানুগ এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সাহায্য করে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পথকে সুপ্রশস্ত করেছেন। রাষ্ট্রকে যদি আমরা সামাজিক বিবর্তনের পরিণতি বলে মনে করি, তাহলে সেই বিবর্তনের এক বিশেষ অবস্থায় রাজতন্ত্রের অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

রাষ্ট্রের বিবর্তনে রাজতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

রাজতন্ত্র উত্তরাধিকারসূত্রে এবং নির্বাচনসূত্রে হতে পারে। আধুনিক কালের সমস্ত রাজতন্ত্রই অবশ্য উত্তরাধিকারসূত্রে গঠিত। ইংলণ্ড, জাপান, আফগানিস্থান, গ্রীস প্রভৃতি রাষ্ট্রে রাজারা উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। প্রাচীন রোমে রাজারা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হতেন। অতীতে পোল্যাণ্ডেও এই প্রথা প্রবর্তিত ছিল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের (Holy Roman Empire) সম্রাটেরা নির্বাচিত হতেন। ইংলণ্ডের রাজারাও এককালে প্রবীণ পরিষদ দ্বারা নির্বাচিত হতেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের রাজারানীরা উত্তরাধিকারীসূত্রে সিংহাসনের অধিকারী হলেও, ১৭০১ সালের *Act of Parliament* রাজার সিংহাসন প্রাপ্তিকেও কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করেছে। সুতরাং এক হিসেবে ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে নির্বাচনমূলক বলা যেতে পারে।

রাজতন্ত্র আবার অসীম ক্ষমতা বিশিষ্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক হতে পারে। অসীম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাজতন্ত্রে রাজাই সর্বশক্তিমান। জনসাধারণের ইচ্ছার সেখানে কোন স্থান নেই। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলেছিলেন, 'আমিই রাষ্ট্র।' গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যদি রাজা থাকেন তবে সেটি হবে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। গ্রেট বৃটেনে প্রকৃত শাসন কর্তৃত্ব মন্ত্রীপরিষদের হাতে ন্যস্ত। সেখানে রাজা নিয়মতান্ত্রিক প্রধান মাত্র। আধুনিক রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সব রাজাই নিয়মতান্ত্রিক প্রধান রূপে আছেন।

উত্তরাধিকারীসূত্রে অথবা নির্বাচনমূলক রাজতন্ত্র

রাজতন্ত্রের গুণাগুণ: রাষ্ট্রের বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরে রাজতন্ত্র মানুষকে আইনানুগ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে সাহায্য করেছিল। রাজার ক্ষমতার সঙ্গে দৈবিক শক্তি আরোপ করা হত। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজাকে প্রজাপতির জীবন্ত প্রতিনিধি বলে মনে করা হত।

রাজাকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে মনে করলে রাজার প্রতি বশ্যতা স্বীকার ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা যখন মানুষের আসেনি ধর্মের অনুশাসনই তখন বিভিন্ন মানবগোষ্ঠিকে সুসংবদ্ধ ও একতাবদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় সংগঠনের প্রথম পত্তন করেছিল।

রাজতন্ত্র মানুষকে আইনানুগ হতে শিক্ষা দিয়েছে

আধুনিক জাতীয়তাবাদ রাজতন্ত্রের নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ দেশের জনগণের সমর্থন। পোপের নৈতিক অধঃপতন এবং স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মানুষ রাজশক্তিকেই সমর্থন জানিয়েছিল। এক অখণ্ড ধর্মীয় ভাবধারার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে রাজাকে কেন্দ্র করে এক নূতন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা গড়ে উঠতে লাগল। রাজকেন্দ্রিক এই নূতন রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারাই জাতীয়তাবাদ। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথ যখন স্পেনের রাজা ফিলিপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন সমগ্র ইংরেজ জাতি রাজশক্তির সমর্থনে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় সম্মান ও গৌরবের প্রশ্নই তখন বড় হয়ে দাঁড়ায়। রাজতন্ত্রের আর একটি বড় সুবিধা এই যে, এর শাসনব্যবস্থা সহজ ও সরল ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে এটি সহজেই বোধগম্য ছিল। ইংলণ্ডের সবকিছু রাজার—'রাজার আইন' 'রাজার সরকার' 'রাজার বিচার' 'রাজার নৌবাহিনী' এবং মন্ত্রীপরিষদ পর্যন্ত রাজভৃত্য এবং বিরোধী পক্ষ 'রাজার বিরোধী পক্ষ'। সবকিছু রাজময় হওয়ার ফলে তারা স্বভাবতই আইনানুগ।

আধুনিক জাতীয়তাবাদ রাজতন্ত্রের কাছে ঋণী

আজকের দিনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দলেব ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এক বা একাধিক দল শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে এবং অন্য দল বা দলগুলি বিরোধীপক্ষ হিসেবে সরকারের সমালোচনা করে থাকে। এমতঅবস্থায় রাজা সমস্ত প্রকার দলাদলির উর্ধ্বে থাকায় তার নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে রাজা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে তাঁর নিরপেক্ষ নীতি দেশের কলহ বিদ্বেষের তীব্রতাকে কমিয়ে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। ফরাসী রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বঁদা মনে করতেন রাজাকে অপরের উপর নির্ভর করতে হয় না বলে এই শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রের জরুরী অবস্থায় বিশেষ কার্যকারী। ইংলণ্ডের বিখ্যাত

রাজতন্ত্রের নিরপেক্ষ ভূমিকা

বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক রাজতন্ত্রের বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে ইতিহাস রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় না এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যখন রাজতন্ত্রকে বজায় রেখেও পরিচালিত হতে পারে তখন এই প্রতিষ্ঠানকে তুলে দেওয়া একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।

রাজতন্ত্রের পূর্বোক্ত সুবিধাগুলি থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই শাসনব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে পর্যবসিত হতে পারে। রাজা ভাল না হলে দেশবাসীর দুর্দশার অন্ত থাকে না। সব রাজাই যে স্বার্থশূন্য হয়ে দেশের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করবেন তার কোন স্থিরতা নেই। তাছাড়া, কোন রাজা সং, নিরপেক্ষ এবং দূরদর্শী হলে তাঁর উত্তরাধিকারীও সমান গুণসম্পন্ন হবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

রাজতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রে পর্যবসিত হতে পারে

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, অনুন্নত অথবা রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাবিহীন সমাজব্যবস্থায় রাজতন্ত্র বিশেষভাবে কার্যকারী শাসনব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু আদর্শ এবং নীতির দিক থেকে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রকে আদৌ সমর্থন করা যেতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের আচরণের উপর সমগ্র দেশের ভাগ্য যেখানে নিয়ন্ত্রিত হয় মানবত্বও সেখানে বিড়ম্বিত এবং অবহেলিত। ঐশ্বরিক শক্তির দোহাই দিয়ে মানুষের বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করে রাখা যেতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় চেতনা ও বিচারশক্তি জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করবে—এ কথা অনস্বীকার্য।

রাজতন্ত্রে নৈতিক সমর্থনের অভাব

৪। অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) :

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) শব্দটি গ্রীক শব্দ *Aristos* থেকে এসেছে। Aristos শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং শাসনব্যবস্থা হিসেবে aristocracy বলতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলতে দেশের যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের বোঝায়। গ্রীক দার্শনিকেরা বিশেষ করে আরিস্টটল এই শাসনব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা বলে মনে করতেন।

ফরাসী দার্শনিক রুশো (*Rousseau*) অভিজাততন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন ; যথা—**স্বাভাবিক** (**natural**), **নির্বাচনমূলক** (**elective**) এবং

বংশানুক্রমিক (hereditary)। দেশের শাসনব্যবস্থা যখন স্বল্পসংখ্যক জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয় তখন তাকে স্বাভাবিক অভিজাততন্ত্র বলা চলে। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে যখন স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি শাসন পরিচালনার সুযোগ পান তখন সেই শাসন-ব্যবস্থাকে নির্বাচনমূলক অভিজাততন্ত্র বলা যেতে পারে। আবার ঐশ্বর্যশালী কয়েকটি পরিবার যখন বংশানুক্রমিকভাবে শাসন পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে তখন সেই শাসনব্যবস্থা হল বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্র।

রুশোর শ্রেণীবিভাগ

অধ্যাপক জেলিনেক (*Jellinek*) অভিজাততন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে তার সামাজিক দিকটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অভিজাততন্ত্র বলতে তিনি এমন এক শাসনব্যবস্থার কথা বুঝতেন যেখানে এক বিশেষ শ্রেণী শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে। এই শ্রেণী পুরোহিত, যোদ্ধা, কোন বৃত্তিগত অথবা ভূম্যাধিকারী সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে।

জেলিনেকের শ্রেণীবিভাগ

অভিজাততন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এই শাসনব্যবস্থা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবে। এই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগোষ্ঠী যে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারে অথবা যে কোন প্রকারে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে পারে।

অভিজাততন্ত্রের মূল কথা

অধ্যাপক গার্ণার অভিজাততন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন—"ঠিকভাবে বলতে গেলে অভিজাততন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক নাগরিকের সরকারী কর্মচারী নির্বাচনের এবং সরকারের নীতি নির্বাচনের ক্ষমতা আছে।"[1]

সাধারণভাবে অভিজাততন্ত্র বলতে কয়েকজন তথাকথিত উচ্চস্তরের লোকের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। সুতরাং বাস্তবে এক অবাঞ্ছিত এবং অপ্রীতিকর ধারণা বহন করে এই শাসন-ব্যবস্থা। নিজেদের স্বার্থে মুষ্টিমেয় ধনিক সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থাকে গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল '*Oligarchy*' বা ধনিকতন্ত্র বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ধনিকতন্ত্র অভিজাততন্ত্রের বিকৃতরূপ। অভিজাততন্ত্র

---

1. "It would seem, therefore, to be more exact to define aristocracy as a form of Government in which a relatively small proportion of the citizens have a voice in the choosing of public officials and in determining public policies."—*Garner*

বলতে তিনি জ্ঞানী-গুণী লোকদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝতেন। সাধারণ লোকের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকে না। তাই স্বল্পসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের দ্বারা সর্বসাধারণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে তিনি শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

অভিজাততন্ত্রের গুণাগুণ (Merits and Demerits of Aristocracy): অভিজাততন্ত্রের বড় একটি সুবিধা এই যে, এই শাসনব্যবস্থায় সংখ্যার পরিবর্তে গুণের উপর বেশী জোর দেয়। অভিজ্ঞ এবং যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয় বলে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষ উচ্ছ্বাস এবং আবেগের বশে পরিচালিত হয়। আবেগ ও অনভিজ্ঞতা দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত হলে সাধারণ মানুষের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। মহামতি কার্লাইল বলেছেন, 'বিজ্ঞজনদের দ্বারা শাসিত হওযাই মূর্খের চিরন্তন অধিকার।'[1]

অভিজাততন্ত্রে সংখ্যার চাইতে গুণের উপর জোর দেওয়া হয়

রক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তাকে অনেক সময় অস্বীকার করা চলে না। সর্ব প্রকার উগ্রতাকে পরিহার করলে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে এক সুষ্ঠু এবং শান্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। স্যার হেনরী মেন বলেছেন, "অভিজাততন্ত্রের উত্থান পতনের দ্বারা, এক অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে অন্য এক অভিজাতগোষ্ঠীর সৃষ্টির দ্বারা অথবা এক অভিজাত গোষ্ঠীর উত্তরাধিকারী হিসেবে আর এক অভিজাত শ্রেণীর উত্থানের ফলেই" মানব সমাজের যাবতীয় উন্নতি সম্ভব হচ্ছে।

রক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা

অভিজাততন্ত্রের রক্ষণশীল প্রবণতার বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে যে শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র নিপুণতা সহকারে পরিচালিত হলেই দেশের মঙ্গল সূচিত হয় না। সময় বিশেষে অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক উন্নতির জন্য বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আসতে পারে।

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

ভাল সরকারের একটা বড় লক্ষণ এই যে, দেশের অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরকারও সেই পরিবর্তিত

---

1 "It is the everlasting privilege of the foolish to be governed by the wise" —*Carlyle*

অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু অভিজাততন্ত্রে শাসকগোষ্ঠীর ভয় থাকে যে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে হয়তো বা শাসনক্ষমতাও তাদের হস্তচ্যুত হবে। তাই অভিজাতবর্গকে সর্বাবস্থায় অচলায়তনের পক্ষপাতী হতে হয়।

অভিজাততন্ত্র অচলায়তনের পক্ষপাতী

অভিজাততন্ত্রের শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীচেতনা ও আত্মসম্মানবোধ উগ্র আকার ধারণ করে। এই শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখা হয়। শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রকে ব্যবহার করে। আরিস্টটল অভিজাততন্ত্রের (Aristocarcy) এই বিকৃত রূপকে ধনিকতন্ত্র (Oligarchy) বলে আখ্যা দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ এবং তার স্বার্থকে উপেক্ষা করে সরকার যখন শ্রেণীবিশেষের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয় তখন গণবিক্ষোভ এবং আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সম্ভাবনা দানা বাঁধতে শুরু করে।

অভিজাততন্ত্রের বিকৃতি

সাধারণ মানুষ শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অযোগ্য—নীতির দিক থেকে এই ধারণা আজকের দিনে পরিত্যক্ত। নৈতিক গুণ অথবা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে মানুষের যথাযথ পার্থক্য নির্ণয় করার কোন মাপকাঠি নেই। ধনীর দুলালেরা নৈতিক বা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠতর নয়—একথা বাস্তব সত্য। সুতরাং সরকার পরিচালনার একচেটিয়া দায়িত্ব, তথাকথিত উচ্চতর গুণসম্পন্ন অল্পসংখ্যক কয়েকটি লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়।

অভিজাততন্ত্রের দুর্বল ভিত্তি

অভিজাততন্ত্রের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি গ্রহণযোগ্য না হলেও আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সকল সরকারই এক হিসেবে অভিজাততান্ত্রিক। গ্রেট ব্রিটেনের মত রাজতান্ত্রিক দেশেও প্রথমের দিকে কর্তৃত্ব করত উইটান বা প্রবীণ পরিষদ বলে এক অভিজাত গোষ্ঠী। মধ্যযুগে সেই ক্ষমতা এসে পড়ে সামন্ত সম্প্রদায়ের হাতে। অষ্টাদশ শতকে হুইগ অভিজাতচক্র রাজাকে সামনে রেখে সব কিছু নিজেরাই করতেন। আজকের দিনে সকল গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের বিরাট জনসংখ্যার পক্ষে সরাসরিভাবে সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমানযুগে গণতন্ত্র পরোক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। জনসাধারণের নির্বাচিত

সকল সরকারই এক হিসেবে অভিজাত-তান্ত্রিক

প্রতিনিধিরাই জনসাধারণের হয়ে আইন প্রণয়ন করে বা শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই প্রতিনিধিবর্গ সমগ্র জনসংখ্যার একটি অংশ মাত্র। অন্ততঃ নীতির দিক থেকে এই প্রতিনিধিবর্গ আইন প্রণয়ন বা শাসন পরিচালনার কাজে শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতার অধিকারী। শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতাসম্পন্ন সমগ্র জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ যখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করে তখন তাকে 'অভিজাততন্ত্র' বলে আখ্যা দিলে খুব অন্যায় করা হয় না। তাছাড়া, ধন, বুদ্ধি বা শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতার প্রভাবে সাধারণ মানুষকে বশীভূত করার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরাই আজকাল নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। সেহেতু আধুনিক গণতন্ত্র অভিজাতগোষ্ঠীর প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত—এ কথা মনে করলে ভুল করা হবে।

৫। প্রজাতন্ত্র (Republic):

যে রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন সেটি একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। অবশ্য আধুনিক কালে প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থাও বোঝায়। অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে একনায়ক-তন্ত্রের স্থান নেই।

প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত

ভারতের বর্তমান সংবিধানে ভারতকে একটি 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' (Sovereign Democratic Republic) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু প্রজাতন্ত্র বলতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেও বোঝায় সেহেতু ভারতীয় গণপরিষদের কোন কোন সদস্য 'গণতান্ত্রিক' (democratic) শব্দটি নিষ্প্রয়োজনীয় মনে করে বাদ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

ভারতের সংবিধানে ভারত একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র

অবশ্য গণতন্ত্র বলতে কেবলমাত্র প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে বোঝায় না। গণতন্ত্রের মধ্যে রাজতন্ত্রেরও স্থান আছে। তবে এই শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র থাকতে হলে সেটিকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র হতে হবে। গণতন্ত্রের মধ্যে রাজার স্থান থাকলে রাজার ক্ষমতা হতে হবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পদাধিকারী হবেন জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত কোন ব্যক্তি (যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রে) অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে পদাধিকারী কোন নিয়মতান্ত্রিক রাজা বা রানী (যেমন—গ্রেট ব্রিটেনে)।

গণতন্ত্র নিয়মতান্ত্রিক, রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতান্ত্রিক হতে পারে

৬। আমলাতন্ত্র (Bureaucracy):

অধ্যাপক গার্ণার বুরোক্রেসীর নিম্নলিখিতরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন—

গার্ণারের সংজ্ঞা

"যথার্থভাবে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে এমন এক শাসন-ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সরকার মুখ্যতঃ সরকারী দপ্তরখানার সহকারীবৃন্দ দ্বারা পরিচালিত হয়, যেখানে এই সমস্ত দপ্তরের বিভাগীয় প্রধান কার্যনির্বাহকদের দ্বারা সরকারী সিদ্ধান্তগুলি স্বীকৃত হয় এবং মূল নীতিগুলি নির্ধারিত হয়।"[1]

আমলাতন্ত্রের মূল কথা

সাধারণভাবে বলা যায় যে, সরকারের মূলনীতি যখন সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা নির্ধারিত হয় তখন তাকে আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে ;

ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে বিদেশী শাসকবর্গ যখন শুধুমাত্র শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেই অধিকতর যত্নবান ছিলেন, তখন শাসনযন্ত্রকে পরিচালিত করার জন্য এক সুদক্ষ কর্মচারীমণ্ডলী তাঁরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সরকারের সিদ্ধান্ত ও নীতি নির্ধারণে এবং সাধারণভাবে তাকে পরিচালনায় এই কর্মচারীমণ্ডলীর ছিল একচেটিয়া কর্তৃত্ব। বিদেশী শাসকবর্গ তাদের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য শাসনতন্ত্রের কাঠামোটি বজায় রেখে দেশে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সঠিকভাবে অনুভব করেছিলেন। তাই সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে তাঁরা প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং কর্মঠ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে এক সুনিপুণ আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই দপ্তরশাহী শাসনব্যবস্থা জনমতের ধার ধারত না। নিজেদের যোগ্যতায় কর্মচারীমণ্ডলীর ছিল অগাধ বিশ্বাস এবং কর্তৃত্ব রক্ষার ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অতি মাত্রায় আগ্রহশীল। জনমতকে অগ্রাহ্য করে তথাকথিত উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন মুষ্টিমেয় অল্পসংখ্যক ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে আজও অনেকে ভাল নজরে দেখেন না। লর্ড রিপনও (*Lord Ripon*) আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীগোষ্ঠীর এই বিশেষ মনোভাবকে সুনজরে দেখতে পারেননি। গ্ল্যাড্‌স্টোনকে

1. "Strictly speaking a bureaucratic government is one which is carried on largely by ministerial bureaus and in which important policies are determined and decisions rendered by the administrative chiefs of such bureaus "—*Garner*

(*Gladstone*) লিখিত এক পত্রে[1] তিনি একাধারে এই আমলাতন্ত্রের যোগ্যতা ও গুণাবলীর প্রশংসা করেছেন এবং জনসাধারণের হস্তক্ষেপ বিরোধী মনোভাবের বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

জনমতের সঙ্গে সংযোগ না রেখে বিভাগীয় নিয়মকানুনের শুষ্ক নিগড়ে বেঁধে, মন্থর গতিতে শাসনযন্ত্রকে পরিচালিত করাই বুরোক্রেসীর প্রধান ত্রুটি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকারী নীতি নির্ধারণ করেন। কিন্তু এই নীতিকে কাজে রূপায়িত করতে হয় সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে। সরকারের বিভাগীয় কর্মচারীরা দীর্ঘকাল ধরে স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা রূপায়ণে জনপ্রতিনিধিদের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বিভাগীয় সিদ্ধান্তকে কাজে রূপ দিতে গিয়ে তাঁরা আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে যে সময় নষ্ট হয় তার জন্য জনসাধারণ অনেক সময় এই সিদ্ধান্তগুলির কার্যকারিতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর ধরে একই বিষয় বিভিন্ন দপ্তরের বিভাগীয় প্রক্রিয়া এবং সংগতির অপেক্ষায় হয়ত দপ্তরবন্দী থাকে। চলতি কথায় একেই আমরা বলে থাকি 'লাল ফিতার শাসন'। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্পূর্ণ সদিচ্ছা থাকলেও, লাল ফিতার প্রভাবকে অতিক্রম করে জনসাধারণের ইচ্ছাকে কাজে রূপ দেওয়া, সেই প্রতিনিধিদের ব্যক্তিত্ব এবং কর্মনৈপুণ্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রী যদি বিশেষ দুর্বলচেতা 'ভাল মানুষ' হন তবে তার সমস্ত সদিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রেই কোন কাযকরী ব্যবস্থা অবলম্বনে তিনি অপারগ হবেন।

আমলাতন্ত্রের ত্রুটি

জনমত এবং জনসাধারণের হস্তক্ষেপকে অবজ্ঞার চোখে দেখা আমলাশাহীর এক চিরন্তন নীতি। ব্রিটিশ আমলে গভর্নর জেনারেল লর্ড রিপনও আমলাশাহীদের এই বিশেষ মনোভাবের প্রশংসা করতে পারেননি। বর্তমান কালে ভারতের মত বিশাল রাষ্ট্রে যেখানে পঞ্চায়েতীরাজ প্রবর্তনের দ্বারা শাসন ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হতে চলেছে সেখানে আমলাশাহীর এই পুরনো

1 India is governed by a bureaucracy which though I sincerely believe it to be the best of that the world has ever seen has still the faults and dangers which belongs to every institution of that kind, among these faults are conspicuously a jealousy of allowing non-officials to interfere in any-way whatever with any portion, however, restricted of the administration of the country"—*Ripon's letter to Gladstone* vide, *Anil Banerjee,* Constitutional Documents of India.

মনোভাব পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কর্মচারীদের 'জীপ গাড়ীর মনোবৃত্তি' (*Jeep-mentality*) পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

আমলাতন্ত্রের এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে আমলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির অনেকগুলি অনিবার্য কারণ আছে। সমাজতান্ত্রিক বা জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজ বেড়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে রূপ দেওয়ার প্রশ্নও দিন দিন জটিল হয়ে পড়েছে। কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আইনসভাও আজকাল আইনের মূল কাঠামোটি নির্ধারণ করে তাকে কাজে পরিণত করার জন্য পূর্ণ রূপ দেওয়ার ভার শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের হাতে ছেড়ে দেন। সুতরাং শাসন বিভাগীয় কর্মচারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির এই প্রবণতা এক স্বাভাবিক পরিণতি।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির অপরিহার্যতা

গণতন্ত্রের নৈতিক প্রয়োজনীয়তা এবং আমলাতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিণতির মধ্যে এক স্বাস্থ্যকর সামঞ্জস্য বিধান আজকের দিনে সকল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যারূপে দেখা দিয়েছে।

৭। একনায়কতন্ত্র (Dictatorship):

একনায়কতন্ত্র বলতে আমরা এমন ব্যবস্থাকে বুঝি যেখানে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যক্তিবিশেষ বা কোন রাজনৈতিক দল দ্বারা অধিকৃত।

প্রাচীন গ্রীসে ধনিকতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে শক্তিশালী সেনাধ্যক্ষের পরিচালনায় স্বৈরাচারতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রাচীন রোমেও কোন কোন সময় বিশেষ জরুরী অবস্থায় নগর-রাষ্ট্রের লোকেরা প্রয়োজনের খাতিরে সাময়িকভাবে একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করত।

প্রাচীন একনায়কতন্ত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সে নেপোলিয়ন এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে অলিভার ক্রমওয়েল সৈন্য-বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন।

অলিভার ক্রমওয়েল ও নেপোলিয়নের একনায়কতন্ত্র

প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইতালীতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাজিপার্টি এবং ইতালীতে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ফ্যাসিস্টপার্টির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক একনায়কতন্ত্র

বর্তমান শতাব্দীতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে রুশ দেশে লেলিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট পার্টির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, আধুনিক কালে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ইটালীতে যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা দলীয় একনায়কতন্ত্র, কিন্তু নেপোলিয়ন ও ক্রমওয়েল যে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা মুখ্যতঃ ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ক্রমওয়েল এবং নেপোলিয়ন প্রথমে সৈন্যবাহিনীর উপর আধিপত্য বিস্তার করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। অবশ্য আধুনিক কালেও সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে একনায়কতন্ত্রের অভ্যুত্থানও বিরল নয়। পাকিস্তানে আয়ুব খানের নেতৃত্বে, ব্রহ্মদেশে নি উইনের এবং সম্প্রতি বর্তমান বৎসরে (১৯৬৩) ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আরিফের নেতৃত্বে ইরাকে মুখ্যতঃ সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

একনায়কতন্ত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি: গ্রীক ও জার্মান দার্শনিকদের রাষ্ট্রীয় দর্শনই একনায়কতন্ত্রের মূল তত্ত্বগত ভিত্তি। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলে প্রচার করেন বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট। হেগেল রাষ্ট্রকে একটি সদাজাগ্রত নৈতিক সত্তা বলে আখ্যা দিয়েছেন।[1]

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্র বিশ্বে ঈশ্বরের পদক্ষেপ ("State is the march of God on earth")। সুতরাং আগে রাষ্ট্র, পরে মানুষ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মানুষের কোন অধিকার থাকতে পারে না। রাষ্ট্রের বেদীতলে প্রয়োজন হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য, অধিকার সব কিছুই উৎসর্গ করতে হবে। কারণ রাষ্ট্রই মানুষকে মনুষ্যত্ব দান করে ("A man is what he is because of the state, and he is not what he is not without the state")। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যে মতবাদ ব্যক্তির উর্ধে রাষ্ট্রকে স্থান দেয় তা একনায়কতন্ত্রবাদের প্রধান দার্শনিক ভিত্তি।

একনায়কতন্ত্রের আর একটি তত্ত্বগত সমর্থন নীৎসের (*Neitzsche*) দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি জাতিকে শান্তির পথ পরিত্যাগ করে শক্তির সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে শান্তি দুর্বলের নীতি। দুর্বলের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। শক্তিমান ও বীর্যবানেরাই বাঁচবার অধিকারী। প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান জাতি ও রাষ্ট্রের অনুসরণ করা উচিত।

1 "A self conscious ethical substance and a self-knowing and a self actualising individual."—*Hegel*

জার্মান দার্শনিক ট্রিটস্‌কেও (*Treitschke*) রাষ্ট্রকে শক্তির প্রতীক বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র শক্তিমান হয়ে নিজেকে বিস্তৃত করে যাবে। বৃহত্তই রাষ্ট্রকে মহত্ত্ব দান করে। সুতরাং যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া রাষ্ট্র মাত্রেরই কর্তব্য।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ঃ আমরা বিভিন্ন রাষ্ট্রে যে একনায়কতন্ত্রের উল্লেখ করলাম, নীতিগত ভিত্তিতে সেগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(১) সামরিক (Military) (২) সাম্যবাদী (Communistic) এবং (৩) ফ্যাসীবাদী (Fascist)।

একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ

লক্ষ্য এবং নীতির দিক থেকে এদের মধ্যে মূলগত পার্থক্য থাকলেও একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হিসেবে এগুলির কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ, একনায়কতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক মত এবং তার ভিত্তিতে দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় না। 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র এবং এক নায়ক'— একনায়কতন্ত্রের মূল কথা। একনায়কতন্ত্র মতবিরোধ বা দলগত পার্থক্য রাষ্ট্রের স্বার্থের অন্তরায় মনে করে। এই শাসনব্যবস্থায় মাত্র একজন নেতা একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের সাহায্যে চূড়ান্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে বাকি সমস্ত রাজনৈতিক দলেব বিলোপ সাধন করে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নেতা বা দলের আদর্শ অনুসারে জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিক নিয়ন্ত্রিত হয়; ফলে আধুনিক একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অনিবার্যভাবে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণে (totalitarianism) বিশ্বাসী। এখানে মানুষের চিন্তা ও কার্যাবলীর সামরিকীকরণের (Regimentation) সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দল স্থায়ীভাবে কর্তৃত্ব বহাল রাখতে চায়।

একনায়কতন্ত্র মত ও দলের বিভিন্নতাকে স্বীকার করে না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতার স্থায়িত্ব বিধানের জন্য একনায়কতান্ত্রিক সরকার মাত্রই প্রধানতঃ রাষ্ট্রের শক্তির উপর নির্ভরশীল। এই উদ্দেশ্যে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারী প্রচার এবং সংবাদ সংগ্রহ বিভাগকে সুনিপুণ এবং দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করা হয়। মুসোলিনীর কালকোর্তা (*Black shirt*) বাহিনী, হিটলারের 'গেষ্টাপো' (*Gestapo*) বাহিনী এবং বর্তমান সোভিয়েত দেশে অগ্‌পু (*Ogpu*) পৃথিবী বিখ্যাত।

একনায়কতন্ত্র শক্তির উপর নির্ভরশীল

তৃতীয়তঃ, একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মাত্রই রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা করে। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে এবং অকম্যুনিস্ট দুনিয়ার সাথে চিন্তা এবং সংস্কৃতির আদান প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

রাষ্ট্র পরিচালনার গোপনীয়তা রক্ষা

চতুর্থতঃ, এই শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরতা অবলম্বন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে জনমতকে স্বপক্ষে রাখার জন্য সমগ্র সরকারী শাসনযন্ত্রকে প্রচার কার্যের জন্য ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হয়।

কঠোরতার সঙ্গে পরিকল্পনার রূপদান

পঞ্চমতঃ, সামরিক নেতা যে কোন প্রকারেই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোন না কেন, তিনি তাঁর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে আইনসিদ্ধ বলে রূপ দেবার চেষ্টা করেন। আইনের দিক থেকে মুসোলিনী ছিলেন ইটালীর রাজার প্রধান মন্ত্রী এবং হিটলার জার্মান প্রজাতন্ত্রের সভাপতি।

একনায়কতন্ত্র ক্ষমতার অধিষ্ঠানকে আইনসিদ্ধ করে

সাধারণভাবে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করার পর, বিভিন্ন প্রকার একনায়কতন্ত্রগুলির পৃথক নীতি এবং উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্য-গুলির উল্লেখ না করলে, এই পর্যায়ের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের তুলনা

জার্মানীর নাৎসীবাদ এবং ইটালীর ফ্যাসিবাদের সঙ্গে রুশিয়ার সাম্যবাদের মূলগত পার্থক্য রয়েছে। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হল রাষ্ট্র এবং জাতি। ফ্যাসীবাদে রাষ্ট্রের স্বার্থ সকল স্বার্থের উর্ধে। রাষ্ট্র সর্বশক্তিমান— রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তার কর্তৃত্ব অপ্রতিহত। ফ্যাসিবাদ যেমন রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে, নাজিবাদ তেমনি করেছে জাতির উপর। তারা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপকে জাতির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করার পক্ষপাতী।

নাজি ও ফ্যাসিবাদ জাতি ও রাষ্ট্রের উপর গুরুত্ব দেয়

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রচলিত সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। এই শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কাজে

রাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে হবে একটি যন্ত্রের মত। সুতরাং রাষ্ট্রই সব কিছু নয়। শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে বড় কথা। মার্কসবাদের মতে অর্থনীতি রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রেণীবৈষম্যকে স্থায়িত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য সাম্যবাদে বিশ্বাসী মেহনতী শ্রমিক, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে আয়ত্ত করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে সারা পৃথিবীতে।

কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলিতে সাম্যবাদ অর্থনৈতিক সাম্যের উপর গুরুত্ব দেয়

সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হলে সামাজিক সংগঠন রূপে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীতা লুপ্ত হবে

নাৎসী ও ফ্যাসিবাদী একনায়কতন্ত্রে শ্রেণীবৈষম্য অবলুপ্ত না করে বিভিন্ন শ্রেণীকে জাতি বা রাষ্ট্রের কাজে নিয়োগ করার কথা বলা হয়। ফ্যাসিবাদে শ্রম এবং পুঁজি সহযোগিতা সহকারে রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা করবে। এখানে শ্রেণী সংঘর্ষের স্থান নেই।

নাৎসী ও ফ্যাসিবাদ অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যকে স্বীকার করে

নাৎসী ও ফ্যাসিবাদে রাষ্ট্র বা জাতিকে অতিরিক্ত গৌরবান্বিত করে প্রচারিত করার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে। পবিত্র আর্যরক্ত সম্ভূত জার্মান জাতির অন্যতম কর্তব্য তার কর্তৃত্বের সীমাকে বিস্তৃত করা। হিটলারের মতে মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতি সব কিছুই মুষ্টিমেয় জার্মান জাতির অবদান। জাতি সজীব এবং সতেজ থাকলে স্বভাবতঃই নিজেকে প্রসারিত করবে। জার্মানজাতি সম্ভাবনাপূর্ণ প্রাণবন্ত জাতি, তাই সে তাকে প্রসারিত করবেই। লেবেন স্রাউম (*Lebensraum*) নাৎসীবাদের অন্যতম আদর্শ, এর তাৎপর্য হল স্বীয় স্বাভাবিক বিকাশের জন্য যতখানি প্রয়োজন, রাষ্ট্র তার আয়তন ও সীমা ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে নেবে। সাম্যবাদী নীতির যে আদর্শ শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা তা একটি রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। অনিবার্য কারণে তাকেও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদে রূপ নিতে হবে। সুতরাং এই নীতি অনুসারে কম্যুনিজমও সম্প্রসারণবাদী, তবে কম্যুনিস্টসম্প্রসারণ জাতি বা রাষ্ট্রের গৌরবের জন্য নয়, পৃথিবীর মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভব করে তোলার জন্য।

নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিস্তৃতি চায় তবে, তার উদ্দেশ্য পৃথক

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলি বস্তুবাদী। ইতিহাস এবং [illegible] বস্তুগত ব্যাখ্যার সাহায্যে মার্কসবাদ তার প্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠিত

করেছে। কিন্তু নাৎসী এবং ফ্যাসিবাদ মুখ্যতঃ ভাবগত। মুসোলিনীর 'রাষ্ট্র' (State) অথবা হিটলারের 'ভোক' (Volk) অমূর্ত ধারণা হতে উদ্ভূত। সুতরাং দেখা গেল—নাৎসীবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হলেও ফ্যাসিবাদ এবং নাৎসীবাদের সঙ্গে সাম্যবাদের মৌলিক ও নীতিগত পার্থক্য রয়েছে।

কম্যুনিজম্ বাস্তববাদী কিন্তু ফ্যাসি ও নাৎসীবাদ ভাববাদী

অধ্যাপক স্যাবাইনের (*Sabine*) মতে একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নানা বিষয়ে সামঞ্জস্য থাকলেও কম্যুনিজম্ নীতি ও তত্ত্বের দিক থেকে নাৎসীবাদের চেয়ে অনেক উচ্চস্তরে অবস্থিত। এর মধ্যে একটি উদার মানবিকতার আবেদন আছে যা এই জাতীয় অন্য কোন শাসনব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় না।[1]

উপসংহার

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালীতে ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানীতে নাৎসীবাদের অভ্যুত্থান যুগান্তকারী ঘটনা। তাই একনায়কতন্ত্রের আলোচনায় এই দুই মতবাদের বিস্তৃত বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ফ্যাসিবাদ ও তার উত্থান : ফ্যাসিবাদের উত্থানকে বুঝতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনার প্রয়োজন। প্রথম মহাযুদ্ধে ইটালী মিত্র শক্তির পক্ষে যোগ দিলেও আশানুরূপ সুবিধা সে লাভ করতে পারে নি। পূর্ব অ্যাড্রিয়াটিকের দিকে তার উপনিবেশ স্থাপনের আশা ফলবতী হয়নি। নিজেকে বঞ্চিত এবং আশাহত মনে করে স্বভাবতঃই সে মিত্রশক্তির প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন হয়েছিল।

ফ্যাসিবাদের উত্থানের অব্যবহিত কারণ অবশ্য অর্থনৈতিক। কৃষি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন হ্রাস, ঘাটতি বাজেট, তীব্র বেকার সমস্যা, যুদ্ধোত্তর ঋণভার ইত্যাদি ইটালীর অর্থনৈতিক কাঠামোর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। সমাজের সকল শ্রেণী, বিশেষ করে যুদ্ধ-প্রত্যাগত সৈনিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ দিন দিন পুঞ্জীভূত হতে শুরু করল।

দেশজোড়া এই অশান্তি এবং বিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করলেন বেনিটো মুসোলিনী (*Benito Mussolini*) নামে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী সমাজতন্ত্রবাদী। শ্রমিক, ছাত্র, সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী, প্রাক্তন সৈনিক প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন

1 "Despite these similarities, however, it is certain that communism was on a far higher level, both morally and intellectually than national socialism Initially at least the underlaying purpose of communism was Generous and humane".—*Sabine* A History of Political Theory.

শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত এক 'যোদ্ধৃদল' (*Fascio di Combattimento*) তিনি সৃষ্টি করেন। ১৯২২ সালের ২৮ শে অক্টোবর মুসোলিনী এবং তাঁর অনুচরেরা রোমের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন। প্রথম দিকে মুসোলিনী এবং তাঁর অনুচরবর্গের উদ্দেশ্য ছিল রাজার কাছ থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কার আদায় করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু কালক্রমে মুসোলিনী এতই ক্ষমতাশালী হয়ে পড়েন যে, রাজা এবং দুই কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার সংবিধানগত কাঠামো বজায় রেখেও রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা তিনি এবং তাঁর দল করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বৃত্তি এবং জীবিকার ভিত্তিতে কতকগুলি সংস্থার (Corporation) মাধ্যমে সারা দেশ সংগঠিত হয়েছিল। এই সংস্থাগুলি (Corporatoin) পার্লামেন্টের নিম্নতম কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকারী ছিল। কিন্তু কারা নির্বাচিত হবেন ঠিক করে দিত 'গ্রাণ্ড ফ্যাসিস্ট কাউন্সিল' (Grand Fascist Council)। বিল উত্থাপনের একচেটিয়া অধিকার ছিল ফ্যাসিস্ট পার্টির। পার্লামেণ্ট কেবলমাত্র আলোচনা করার অধিকারী ছিল কিন্তু বিল নাকচ করার অধিকারী ছিল না। সমস্ত সরকারী অফিসারদের ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতার কাছে দায়ী থাকতে হত।

ফ্যাসিবাদের তাত্ত্বিক আলোচনা : ফ্যাসিবাদকে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক তত্ত্ব বলে মনে করলে ভুল করা হবে। ফ্যাসিস্ট পার্টির সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা করায়ত্ব করার সমর্থনে মুসোলিনী এক রাষ্ট্রীয় দর্শনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। তাই জেনটিলে (*Giovanni Gentile*) নামক তদানীন্তন হেগেলপন্থী এক ইটালীয় দার্শনিকের সহায়তায় তিনি জোড়াতালি দিয়ে তাঁর ফ্যাসিবাদের দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করলেন।

ফ্যাসীবাদের মূল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু পরিচালিত হতে হবে। অল্প কথায় ফ্যাসীবাদের আসল নীতি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে—সবকিছু রাষ্ট্রের জন্য—রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু হতে পারে না এবং রাষ্ট্রের বাইরে কিছু থাকতে পারে না ('Everything for the state, nothing against the state, nothing out side the state')। আপাত দৃষ্টিতে এই মতবাদ হেগেলের রাষ্ট্রীয় দর্শনের অনুগামী বলে মনে হতে পারে।

হেগেলও রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন।

হেগেলের জাতীয়তাবাদ কখনও সাম্রাজ্যবাদের পর্যায়ে নেমে আসেনি, যেটি হয়েছিল ফ্যাসিস্ট ইটালী এবং নাৎসী জার্মানীর ক্ষেত্রে। মুসোলিনী তাঁর রাষ্ট্রীয় মতবাদের দুর্বলতা সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন বলেই বোধ হয় বলতেন—'আমি কাজে বিশ্বাস করি—কথায় নয়' ('My programme is action, not talk')।

শ্রেণীবৈষম্য

রাষ্ট্রের কাজে সবাই আত্মনিয়োগ করবে। শ্রমিক ও পুঁজিবাদী মালিক সকলেই সহযোগিতা সহকারে কাজ করে যাবে রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য। এখানে শ্রেণীর বিলুপ্তি সাধন না করে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সমন্বয় সাধনে ফ্যাসিবাদ বিশ্বাস করে।

জাতীয় ঐক্য

রাষ্ট্রকে এক গৌরবময় শিখরে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই জাতীয় ঐক্য। একাধিক রাজনৈতিক মত ও দল থাকলে জাতীয় ঐক্য বিঘ্নিত হবে। তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক মত ও দলকে নিশ্চিহ্ন করে একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের একাধিপত্যে এই মতবাদ বিশ্বাসী।

বিবাদমান ব্যক্তি বা দলের অস্তিত্ব নেই

জনসাধারণের পারদর্শিতা ও কর্তৃত্বে এই মতবাদ বিশ্বাস করে না। কোন বলিষ্ঠ জাতীয় পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করবার বা তাকে বাস্তবে রূপ দেবার ক্ষমতা সাধারণ মানুষের থাকতে পারে না। জীবিকা ও বৃত্তির ভিত্তিতে গঠিত সংস্থা ভিত্তিক সমগ্র রাষ্ট্রই জাতির ইচ্ছাকে ঠিকমত বুঝতে পারে এবং তাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরস্পর সংঘর্ষমান অসংখ্য ব্যক্তি কখনই জাতীয় উন্নয়নের কাজে সংঘবদ্ধ হতে পারে না। ফ্যাসিস্ট পার্টির ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যেহেতু সাধারণ লোকের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিমান এবং যোগ্যতা সম্পন্ন, তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব তাদের হাতেই থাকবে।

ফ্যাসিবাদে শান্তির স্থান নেই

মুসোলিনী বলতেন স্ত্রীলোকের যেমন মাতৃত্বই তার বৈশিষ্ট্য, পুরুষের বৈশিষ্ট ফুটে উঠে তেমনি যুদ্ধে। কাপুরুষেরাই যুদ্ধকে ভয় করে। রাষ্ট্রের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রচারিত হয় যুদ্ধের দ্বারাই।

৮। নাৎসীবাদ (Nazism):

অর্থনৈতিক কারণ

ইটালীর অনুরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যে জার্মানীতে নাৎসী-বাদের জন্ম হয়। মুদ্রা সংকট, তীব্র বেকার সমস্যা, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ-জনিত চাপ জার্মান জাতির জীবনে এক দারুণ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। এই অর্থনৈতিক সংকটের ফলে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

ভার্সাইসন্ধির অপমানজনক শর্তগুলি জার্মানীর জাতীয় সম্মানে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। বিজেতা শক্তিবর্গ শুধুমাত্র জার্মানীর রাষ্ট্রীয় এলাকা খর্ব করেই ক্ষান্ত হয়নি—তার শিল্প এবং খনিজ সম্পদে সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী এলাকা সাইলেশিয়া অঞ্চলকে বিদেশী সৈন্যের দখলে রেখে—জার্মান জাতির মিত্র-শক্তির বিরুদ্ধে যুগপৎ ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছিল।

রাজনৈতিক কারণ

এই অর্থনৈতিক সংকট এবং জাতীয় সম্মানে আঘাতজনিত পুঞ্জীভূত অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণ করে হিটলার ওয়েমার সংবিধানের মত এক গণতান্ত্রিক সংবিধানকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য জার্মানীতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ঐতিহ্যের অভাবও হয়ত এই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী।

ফ্যাসিবাদে যেমন চরম গুরুত্ব দেওয়া হয় রাষ্ট্র ও তার কর্তৃত্বের উপর, নাৎসীবাদে তেমনি গুরুত্ব আরোপ করা হয় জার্মান জাতির (*Volk*) শ্রেষ্ঠত্বের উপর। পবিত্র আর্য অথবা নর্ডিক রক্তসম্ভূত জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কৃষ্টির ধারক ও বাহক। জাতির উন্নতির জন্যই শিল্প-সম্পদ-কৃষ্টি সবকিছুই রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। এই অর্থে নাজীবাদকে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ (National socialism) বলা হয়। জাতীয় বলতে নাজীবাদীরা সর্বশক্তিমান এবং শ্রেষ্ঠতম সভ্যতার অধিকারী জার্মান জাতিকে বুঝত এবং সমাজতন্ত্রবাদ বলতে জাতির সেবায় রাষ্ট্র কর্তৃক শিল্প ও কৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকে বুঝত। বলা বাহুল্য, এই সমাজতন্ত্রবাদে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থে জাতীয় আয়ের পুনর্বণ্টনের কোন স্থান নেই।

জনতা, অভিজাতবর্গ এবং নেতা

জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের তিনটি মূল উপাদান হচ্ছে জনতা (Masses) শাসকশ্রেণী (Elite) এবং নেতা (Leader)।

সাধারণ মানুষ সবলের পূজা করে এবং দুর্বলের ধ্বংস সাধন করে। প্রাকৃতিক রাজ্যের এই নিয়ম মানুষের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুতরাং স্বভাবতঃই সাধারণ মানুষ তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতাসম্পন্ন স্বল্পসংখ্যক শাসকশ্রেণী (elite) দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে। প্রকৃতির রাজ্যে অবিরতই যেমন ক্ষমতার লড়াই চলছে মানব সমাজেও তেমনি যোগ্যতা এবং কৃতিত্বের লড়াই চলেছে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা অপরের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাদের দ্বারাই সাধারণ মানুষ নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত হবে। শ্রেষ্ঠতর যোগ্যতাসম্পন্ন শাসকসম্প্রদায়ের

ঊর্ধে থাকবেন নেতা (leader) যার নামে রাষ্ট্রের সবকিছু পরিচালিত হবে। এই নেতাই সবকিছুর জন্য দায়ী কিন্তু সকল প্রকারের কৈফিয়তের ঊর্ধে।

নাজীবাদের পরিণতি সাম্রাজ্যবাদ

নাজীবাদের জাতীয় গৌরবের পরিণতি সাম্রাজ্যবাদে। যে রাষ্ট্রের বিস্তৃতি নেই তা মৃত। আর্থৎ পৃথিবীতে অবদানের তার সব কিছুই ফুরিয়ে গেছে। জার্মান জাতি যেহেতু সজীব, প্রাণবন্ত জাতি এবং সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ, তাই তার বিস্তৃতিও স্বাভাবিক।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্রঃ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সকল মানুষ সমান—এই নীতিতে বিশ্বাস করে গণতন্ত্র প্রত্যেককে শাসনকার্য পরিচালনার সমান সুযোগ দেবার পক্ষপাতী, কিন্তু একনায়কতন্ত্র সাম্যের নীতিতে বিশ্বাস করে না। শাসনকার্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় বুদ্ধি ও যোগ্যতা সাধারণ মানুষের থাকে না, তারা ভাবপ্রবণ, উচ্ছৃঙ্খল, নির্বোধ এবং অক্ষম। তাই প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারাই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হতে হবে।

গণতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, একনায়কতন্ত্রে সাম্য ও স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী।

একনায়কতন্ত্রের মূল ভিত্তি শক্তি, গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্মতি। একনায়কতন্ত্রে সরকারী পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিবিশেষ তার সিদ্ধান্তকে জনসাধারণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়। এই শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষ সরকারের সমস্ত কিছুই বিনা প্রতিবাদে শুধু গ্রহণ করে যায় এবং সরকারের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্যই সাধারণ মানুষের কর্তব্য বলে প্রতিপন্ন করা হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কার্যাবলীকে জনসাধারণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেবার অবকাশ নেই। গণতন্ত্রে সরকারের পরিচালকরা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত হন। জনসাধারণের আস্থা-ভাজন থাকাকালীন তাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন। আস্থার অভাব ঘটলে তাদের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয় অধিকতর আস্থা-ভাজন ব্যক্তিদের নিকট। মতের আদান-প্রদান, আলাপ-আলোচনা এবং সামঞ্জস্য বিধানের দ্বারাই গণতন্ত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এখানে পশুশক্তির সাহায্যে সবকিছু অভ্রান্ত বলে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেবার অবকাশ নেই। গণতন্ত্র রাষ্ট্রকেই সবকিছু বলে মনে করে না। মানুষের জন্যই রাষ্ট্র। একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রকে মানুষের ঊর্ধে স্থান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মানুষের কোন অধিকার থাকতে পারে না।

গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্মতি, একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি ও শক্তি

একনায়কতন্ত্র উগ্র জাতীয়তাবাদী এবং যুদ্ধবাদী। গণতন্ত্র সহঅবস্থানের নীতিতে বিশ্বাসী এবং শান্তিকামী।

গণতন্ত্রে বিভিন্ন মত ও দলের অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। কিন্তু একটি মাত্র দল বা ব্যক্তিবিশেষের আধিপত্যকে একনায়কতন্ত্র স্বীকার করে নেয়। তাই একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দলের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে জাতির অর্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমস্ত দিকই নিয়ন্ত্রিত হয়।[1] এই কারণে একনায়কতান্ত্রিক সরকার নিয়ন্ত্রণবাদী (Totalitarian) শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়।

একনায়কতন্ত্র নিয়ন্ত্রণবাদী, গণতন্ত্র বিরোধী মতের সহ অবস্থানে বিশ্বাস করে

একনায়কতন্ত্রের গুণ ও ত্রুটি (Merits and defects of Dictatorship):

গুণ: একনায়কতন্ত্রের সুবিধাগুলি অস্বীকার করার উপায় নেই। যোগ্য এবং কর্মকুশল ব্যক্তির হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হলে রাষ্ট্রের অনেক সমস্যারই সহজ এবং দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।

জার্মানীর ওয়েমার সংবিধান দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি সমাধান করতে অক্ষম হয়েছিল বলেই জার্মান জাতি হিটলারের নেতৃত্বে একনায়কতন্ত্রের সমর্থন করেছিল। ইটালীর মুসোলিনীকে সমর্থনের ক্ষেত্রেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। একনায়কতন্ত্র সাহসিকতার সঙ্গে দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলির সম্মুখীন হয় এবং তার বলিষ্ঠ কার্যপ্রণালীর দ্বারা উদ্ভাবিত সমাধানগুলি বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি শাসনক্ষমতা দখল করলে একনায়কতন্ত্র কর্মকুশল হয়।

এই শাসনব্যবস্থা কর্মকুশল

একনায়কতন্ত্রে দলীয় কলহের অবকাশ নেই। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মত ও দল থাকায় অনেক সময় দেশ ও জাতির স্বার্থের চাইতে দলের স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির কল্যাণের উপর জোর দেওয়া হয়।

একনায়কতন্ত্রে দেশ ও জাতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়

1. Nothing lay outside its (govt) province Every interest and value—economic, moral and cultural—being part of national resources were to be controlled and utilized by government —*Sabine* A History of Political Theory, Page 745

গণতন্ত্রে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শাসক কর্তৃপক্ষকে তার কাজের জন্য আইনসভা এবং জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকতে হয় এবং কৈফিয়ত দিতে হয়। ফলে কোন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অধিনায়ককে কারও কাছে কৈফিয়ত বা জবাবদিহি করতে হয় না। ফলে যে কোন সিদ্ধান্ত তিনি দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন এবং তাকে কাজে পরিণত করতে পারেন—বিশেষ করে আপৎকালীন অবস্থায়, গণতন্ত্রের চেয়ে একনায়কতন্ত্রকেই বেশী কার্যকরী হতে দেখা গিয়েছে।

দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক

একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই বেশী করে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি হতে দেখা যায়। দর্শন ও বিজ্ঞানে জার্মানীর অগ্রগতি এবং বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা স্মরণ করে এই যুক্তিকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি

ত্রুটি : একনায়কতন্ত্রের বহুমুখী গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও একনায়কতন্ত্রের ত্রুটিগুলি সুস্পষ্ট ও মারাত্মক। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সাম্যকে অস্বীকার করে একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ বা মুষ্টিমেয় শাসক গোষ্ঠীর যোগ্যতা ও কর্মকুশলতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে সাধারণ মানুষের আত্মোপলব্ধির পথ রুদ্ধ হয়। রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্বন্ধে তারা অবহিত থাকার প্রয়োজন বোধ করে না। ফলে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধেও তারা উদাসীন হয়ে পড়ে।

একনায়কতন্ত্রে স্বাধীনতা ও সাম্য পর্যুদস্ত

গুচ (Gooch) তাঁর *Dictatorship in Theory and Practice* নামক গ্রন্থে বলেছেন, একনায়কতন্ত্রে নিয়মের অনুশাসনের পরিবর্তে স্বেচ্ছাচারিতার অনুশাসন প্রবর্তিত করা হয়। মানুষের অধিকার রক্ষার জন্যই অসম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থায় শক্তির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আইনের প্রয়োগের সঙ্গে তা সম্পর্কযুক্ত না হলে, তা বিপজ্জনক হতে বাধ্য।

একনায়কতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারিতা

একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রনায়ক অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করেন। আইনসভা বা জনসাধারণকে তাঁর কাজের জন্য কৈফিয়ত দিতে হয় না। অবাধ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা উপভোগের অনিবার্য ফল ক্ষমতার বিকৃত রূপ পরিগ্রহণ। লর্ড অ্যাকটন যথার্থই বলেছেন,

অপ্রতিহত ক্ষমতার বিকৃতি অবশ্যম্ভাবী

"সমস্ত ক্ষমতা মানুষকে বিকৃত করে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে বিকৃত করে" ("All power corrupts and absolute power corrupts absolutely")।

উগ্র জাতীয়তাবাদ

অতীতের একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলিকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হতে দেখা গেছে। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করলে তার পরিণতি হবে উগ্র জাতীয়তাবাদ। যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদ উগ্রজাতীয়তাবাদের অনিবার্য ফল।

গণতন্ত্রে যুক্তিতর্ক, আলাপ-আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একনায়কতন্ত্রে ব্যক্তি বা দল বিশেষের সিদ্ধান্তকে শক্তির জোরে সকলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এখানে যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। সমালোচনাই সৃজনশীলতার উৎস। সমালোচনা ও তর্কের অবকাশকে কঠোর হস্তে দমন করে একনায়কতন্ত্র সম্ভবনাপূর্ণ প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটায়।

৯। গণতন্ত্র (Democracy):

গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থা বলে ধরে নিলে ভুল করা হবে। সমাজের বিভিন্ন সংগঠনের ক্ষেত্রে আমরা গণতান্ত্রিক আবহাওয়ার কথা উল্লেখ করে থাকি। কোন এক শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পরিচালকেরা শ্রমিক শ্রেণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে কোন নিয়মকানুন চাপিয়ে দিলে আমরা তাঁদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের উল্লেখ করে থাকি। আবার জাত্যাভিমানের বশবর্তী হয়ে সমাজের তথাকথিত নীচ জাতির লোকেদের যাঁরা মানবীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করার পক্ষপাতী তাঁদেরও অগণতান্ত্রিক মনোভাবের আমরা নিন্দা করে থাকি। সুতরাং গণতন্ত্রকে আমরা কেবলমাত্র এক বিশেষ শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা বলতে পারি না। গণতন্ত্র বলতে একটি বিশেষ মানবিক ধারণা এবং ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত একটি বিশিষ্ট জীবন দর্শনকে মনে করতে পারি। স্বাধীনতা ও সাম্য এই জীবনদর্শনের মূল কথা। যে সমাজ ব্যবস্থায় মানুষকে সমঅধিকারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়, সেটি অগণতান্ত্রিক সমাজ। শিল্প, রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক প্রভৃতি সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের ক্ষেত্রে একথা সমভাবে প্রযোজ্য। আজকের দিনের জটিল সমাজব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক কারণে যে বিভিন্ন শ্রেণী সংগঠন গড়ে ওঠে তাদের মধ্যে সহনশীলতার অভাব থাকলে সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারে না। পারস্পরিক ধারণা, বিনিময় এবং সহানুভূতি সহকারে অপরের অভাব অভিযোগকে বুঝবার প্রবণতা এবং সর্বোপরি অপরের ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল

হওয়ার উপর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করছে। পারস্পরিক সহনশীলতা ও শ্রদ্ধাশীলতা জাতীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে যাঁরা সক্ষম, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার যোগ্য ধারক ও বাহক তাঁরাই। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে সেই সমাজেই যেখানকার মানুষ গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলতে পেরেছে।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র : গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও একান্ত প্রয়োজন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যে-সমাজে অতি প্রকট সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না। যেখানকার সাধারণ মানুষকে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হতে হয়, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অধিকারের সদ্ব্যবহার তারা করতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন, "অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতিরেকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন" (Political democracy is meaningless without economic democracy)।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বুনিয়াদকে গড়ে তোলার জন্য অধ্যাপক ল্যাস্কি দুটি শর্তের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে—প্রত্যেক নাগরিকের প্রাথমিক ন্যূনতম অভাব ("Basic minimum requirement") মেটাতে হবে। অনেকে যুক্তি দিয়ে বলে থাকেন অভাবের শেষ নেই, ভোগ্যবস্তুর অভাবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি কখনই সম্ভব নয়, একটি অভাব পূরণ হলে আর একটি আকাঙ্ক্ষা অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এই ধরণের যুক্তি মেনে নিলেও আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে জীবনধারণের উপযোগী কতকগুলি প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় অভাব প্রত্যেক মানুষেরই পরিতৃপ্ত হওয়া দরকার।

প্রাথমিক ন্যূনতম অভাব (Basic minimum requirement) বলতে ল্যাস্কি অন্ন-বস্ত্র, সাধারণ শিক্ষা প্রভৃতি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির কথাই বুঝেছিলেন। কোন তর্কের অবতারণায় না গিয়ে ল্যাস্কির এই যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দৈনন্দিন জীবনে ভাত-কাপড়ের সংস্থান যেখানকার সাধারন মানুষের নেই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের কথা তারা চিন্তা করবে কেমন করে? সাময়িক প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক অধিকারের সদ্ব্যবহার যদি তারা করতে না-ই পারে তাদের দোষী করা চলে না। তাই মুষ্টিমেয় লোকের জন্য বিলাসব্যসনের প্রচুর উপকরণ

এবং সাধারণ মানুষের নিম্নতম ভোগ্যবস্তুর অভাব যে সমাজে, সে সমাজের ভিত্তিভূমি বালুকারাশির উপর।[1]

তাই ল্যাস্কি বলেছেন, প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাথমিক ন্যূনতম অভাব থেকে মুক্ত করতে হবে। সে কারণে রাষ্ট্রকে প্রত্যেক সুস্থ ও সবল মানুষের জন্য উপযুক্ত বেতনসহ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু তাই নয়—বার্ধক্য, অসুস্থতা ও আকস্মিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে সাধারণ নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় কর্তব্য। তাই মুষ্টিমেয় লোকের প্রাচুর্যের সংস্থানের পূর্বে অধিকাংশ মানুষের প্রাথমিক অভাব মেটানো সরকারের সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য আর একটি শর্ত হচ্ছে শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর স্বাধীনতা। শিল্প সংগঠন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনেক সময় মালিক, পরিচালক অথবা ম্যানেজার শ্রেণীর স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন লোকের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা হয়। এই সিদ্ধান্তগুলি অনেক সময় শ্রমিকদের শ্রেণীগত স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। তাই এইসব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ অবশ্যই থাকা উচিত।

১০। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা (Democracy as a form of Government):

গণতন্ত্রের ইংরেজী ডিমোক্রাসী (*Democracy*) শব্দটি গ্রীক শব্দ '*demos*' অর্থাৎ 'জনসাধারণ' থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ হতে পারে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রলিতে সমস্ত নাগরিক সম্প্রদায়ের পক্ষে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ সহজসাধ্য ছিল। সেখানে রাষ্ট্রের সীমারেখা ছিল অল্প এবং জনসংখ্যাও ছিল কম। তাছাড়া, জনসাধারণের অধিকাংশ যেমন স্ত্রীলোক, ক্রীতদাসদের সেখানে নাগরিক বলে গণ্য করা হত না। এই সমস্ত কারণে তখনকার দিনে গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র।

কিন্তু আধুনিক কালের রাষ্ট্রের সীমারেখা প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলির মত ক্ষুদ্র নয়। আধুনিক রাষ্ট্রের জনসংখ্যাও বিরাট। এই সমস্ত কারণে আধুনিক কালে রাষ্ট্রের সমস্ত জনসাধারণের পক্ষে সরাসরি ভাবে শাসন পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সরকারী কার্যাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি,

1 "A society divided between the rich and the poor is built upon the foundations of sand."—*Laski*

গুরুত্ব ও জটিলতার জন্যও সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সরকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই সমস্ত কারণে আধুনিক গণতন্ত্রকে অনিবার্যভাবে অপ্রত্যক্ষ (Indirect) বা প্রতিনিধিমূলক (Representative) গণতন্ত্রের রূপ নিতে হয়েছে।

আধুনিক গণতন্ত্র অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাণীর মধ্যে সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি গণতন্ত্রকে জনসাধারণের, জনসাধারণের জন্য এবং জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। (Government of the people, by the people, and for the people)।

আধুনিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

এই শাসন ব্যবস্থা স্পষ্টতই সাম্য ও স্বাধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার স্বীকৃত হয় এবং এই স্বীকৃত অধিকারবলেই তারা নিজেদের পছন্দমত সরকার গঠন করতে সমর্থ হয়। আধুনিক অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের পছন্দমত সরকার গঠনের সুযোগ পায়। তাই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের অধিকার আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়।

চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা

নির্বাচনের অধিকার

চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে স্বীকৃত, সেখানে এই চিন্তার ভিত্তিতে সংগঠন সৃষ্টি করে সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকেও স্বীকার করে নিতে হয়। তাই রাজনৈতিক দলপ্রথার প্রবর্তন আধুনিক অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। বর্তমানে ভারতে আচার্য বিনোবাভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি অনেক চিন্তাশীল মণীষী গণতন্ত্রকে কার্যকরী করার জন্য রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করেন না।

দলপ্রথার অপরিহার্যতা

১১। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রয়োগ (Methods of Direct Democracy as applied to Modern Democracy):

আধুনিক গণতন্ত্রকে অপ্রত্যক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলা হয়। আধুনিক গণতন্ত্রকে যদিও অনিবার্যভাবে অপ্রত্যক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র

হতে হয়, তথাপি এই ব্যবস্থার কয়েকটি অসুবিধা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। প্রথমতঃ, অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হওয়ার পর জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারেন না। তাছাড়া, তাঁদের পক্ষে সবসময় জনসাধারণের ইচ্ছাকে ঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। জনমত সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তিত জনমতের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলা আইনসভার প্রতিনিধিদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই আধুনিক গণতন্ত্রে সবকারের নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের দ্বারা সরাসরি এবং সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের কতকগুলি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ড, আইরিশ ফ্রি স্টেট ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে এই নীতিগুলি অনুসৃত হয়। এই উপায়গুলি হচ্ছে—(ক) গণনির্দেশ (Referendum), (খ) গণপ্রস্তাব (Initiative), (গ) প্রত্যাবর্তনেব আদেশ (Recall) এবং (ঘ) গণভোট (Plebiscite)।

(ক) গণনির্দেশ (Referendum) : ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ-নীতি অথবা আইনের খসড়া রাষ্ট্রের অধিকাংশ জনসাধারণের সমর্থনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। গণনির্দেশ দু'প্রকারের হতে পারে : (১) বাধ্যতা-মূলক (Compulsory) এবং (২) ঐচ্ছিক (Optional)। বাধ্যতামূলক গণনির্দেশের বিধানগুলি সাধারণতঃ সংবিধানে উল্লেখ থাকে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, সংবিধানের পরিবর্তন অথবা গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রবর্তন বা সংশোধনের ক্ষেত্রে গণনির্দেশ বাধ্যতামূলক করা হয়। জনসাধারণের একাংশ, আইনসভার নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্য অথবা শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে দাবী উত্থাপিত হলে অনেক সময় ঐচ্ছিক গণনির্দেশের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) গণপ্রস্তাব (Initiative) : আইনসভা কোন বিষয়ের উপর আইন-প্রণয়ন করতে অনিচ্ছুক বা উদাসীন হলে জনসাধারণ অনেক সময় আইনের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে। এই নীতিকে গণপ্রস্তাবের নীতি বলা হয়। গণপ্রস্তাব সম্পূর্ণ (Formulated) অথবা অসম্পূর্ণ (unformulated) হতে পারে। জনসাধারণের তরফ থেকে সরাসরি ভাবে প্রস্তাবিত এই আইনের খসড়া যদি বিস্তারিত বিবরণ সমন্বিত ও সুসম্পূর্ণ হয় তবে সেটি সম্পূর্ণ গণপ্রস্তাব (Formulated Initiative), আর মোটামুটিভাবে একটি সাধারণ প্রস্তাবরূপে পেশ করলে সেটিকে অসম্পূর্ণ গণপ্রস্তাব (Unformulated Initiative) বলা হয়। গণপ্রস্তাব সাধারণতঃ অধিকাংশ জনসাধারণের সমর্থনের জন্য আইনসভা কর্তৃক জনসাধারণের নিকট প্রেরিত হয়।

(গ) **প্রত্যাবর্তনের আদেশ** (**Recall**): আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্তৃপক্ষের কার্যাবলীতে অসন্তুষ্ট হলে জনসাধারণ তাদের পদত্যাগ দাবি করতে পারে। এই দাবি অবশ্য গণভোটের মাধ্যমে কার্যকরী করা হয়।

(ঘ) **গণভোট** (**Plebiscite**): শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জনমত গ্রহণের নীতিকে গণভোট (Plebiscite) বলা হয়। ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার সময় ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ ভারত অথবা পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে তা গণভোটের সাহায্যে ঠিক হয়।

আধুনিক অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের এই উপায়গুলির কার্যকারিতা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর। প্রথমতঃ, জনসাধারণকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে হবে। এক উন্নত স্তরের রাজনৈতিক চেতনার উপর এই নীতির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সীমা ও জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত স্বল্প হতে হবে। বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে এই নীতিগুলি প্রযোজ্য না-ও হতে পারে। সুইজারল্যাণ্ডে এই নীতি কার্যকরী হয়েছে, তার কারণ হচ্ছে সেখানকার জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও রাষ্ট্রের সীমারেখার ক্ষুদ্রতা। ফরাসী দার্শনিক রুশো সুইজারল্যাণ্ডের এই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের একজন বড় সমর্থক ছিলেন।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে কার্যকরী করার দুটি প্রধান শর্ত

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আধুনিক কালে রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনের গুরুত্ব ও জটিলতা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতি কতটা জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে, তা ভেবে দেখার বিষয়। তাছাড়া, নিয়ন্ত্রণক্ষমতা পুনঃ পুনঃ জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হলে সরকারের তরফ থেকে দায়িত্বহীনতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

আধুনিক কালে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অসুবিধা

১২। গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy):

স্বাধীনতা ও সাম্য গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। সকল মানুষই সমান—এই নীতিতে বিশ্বাস করে গণতন্ত্র সকল মানুষকে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণে সমান অধিকার দেবার পক্ষপাতী। কতকগুলি লোক শাসন করার জন্য জন্মেছে আর বাকী সকলে হবে শাসিত—গণতন্ত্র এই নীতিতে বিশ্বাস করে না। শাসনযন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে সকলকে সমান সুযোগ দিয়ে এবং আইনের চোখে

স্বাধীনতা ও সাম্য গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি

সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখে গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছে। যে শাসনব্যবস্থায় সাধারণ মানুষকে শাসনকার্যের অনুপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়, সেখানকার মানুষ স্বাধিকার ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মানুষকে যখন ভাবতে শেখান হয় যে, তার কাজ শুধু বশ্যতা স্বীকার করা এবং ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষের আদেশকে অবনত মস্তকে গ্রহণ করা, তখন সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। আত্মপ্রত্যয়ের যেখানে অভাব, সমাজ সেখানে ব্যাধিগ্রস্থ। শাসনের অধিকাব সকলের জন্য উন্মুক্ত রেখে গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার সাবলীল বিকাশের পথ সুপ্রশস্ত করে দিয়েছে। ডিউই (*Dewey*), হবহাউস (*Hobhouse*) প্রভৃতি লেখকগণেব মতে গণতন্ত্র মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে নেয় বলেই এটি শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা।

বর্তমানে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ সমর্থক হলেন বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (*John Stuart Mill*)। মিল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Representative Government*-এর তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়েছেন যে, সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন করা যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই তা সম্ভব। প্রত্যেক "মানুষের অধিকার এবং স্বার্থ তখনই যথাযথভাবে রক্ষিত হয় যখন ব্যক্তি নিজেই তা রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হয়।"[1] তিনি আরও বলেছেন যে, "জনকল্যাণের উৎকর্ষ ও ব্যাপকতা নির্ভর করে কি পরিমাণে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টা এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হয়েছে তার উপর।"[2]

সকলেব অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ

মিল মনে করতেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত করতে হলে তাদের আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। তাদের নিজেদের এগিয়ে আসতে হবে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণের জন্য। যে ব্যক্তি নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে সজাগ নয়, তার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং সরকার পরিচালনার অধিকার থেকে যারা বঞ্চিত তাদের স্বার্থ সাধারণতঃ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। যখন কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে সেই শ্রেণী যে অনিবার্যভাবে অপরের স্বার্থকে উপেক্ষা করবে তা না-ও হতে পারে। আসলে দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যা

1 " the rights and interests of every or any person are only secure fr m being disregarded when the person interested in himself able, and habitually disposed, to stand up for them "—*Mill*

2. " .the general prosperity attains a greater height, and is more widely diffused, in proportion to the amount and variety of the personal energies enlisted in promoting it "—*Mill*

সমাধানের জন্য যে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কোন এক বিশেষ শ্রেণীর পক্ষে তার অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। অধ্যাপক বার্কার বলেছেন, বহুজনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই সাধারণের কল্যাণজনক রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব।

শাসন কর্তৃপক্ষের জনসাধারণের আস্থাভাজন ও নির্ভরশীল হওয়ার সুফল

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার ততদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে সমর্থ হয় যতদিন জনসাধারণের তার উপর আস্থা থাকে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাতেই নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর শাসকগোষ্ঠীকে নির্বাচকমণ্ডলীর দ্বারস্থ হতে হয়। জনসাধারণের অধিকাংশ কর্তৃক সমর্থিত ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলই শাসন পরিচালনার সুযোগ পায়। তাছাড়া, মন্ত্রীসভা পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলী ততদিনই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন যতদিন তাঁরা জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার আস্থাভাজন থাকেন। আইনসভার অধিকাংশ সদস্যের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে হয় পদত্যাগ করতে হয় যার ফলে নূতন করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় অথবা আইনসভা ভেঙে দিয়ে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টকে অবশ্য অনাস্থা প্রস্তাবের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করা যায় না। তবে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর অন্তর এখানেও জনসাধারণ আইনসভার সদস্য এবং শাসনবিভাগের প্রধান অধিকর্তা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সুযোগ পায়। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি কোন রাষ্ট্রদ্রোহিতায় লিপ্ত মনে করলে আইনসভা তার বিচারের ব্যবস্থা করে (Impeach) তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে 'রিকল প্রথা' (Recall) প্রবর্তিত থাকায় সেখানকার জনসাধারণ জনস্বার্থক্ষুণ্নকারী সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ জনসাধারণকে উপেক্ষা করে বেশীদিন ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারে না। অধ্যাপক ম্যাকাইভারের মতে যাঁরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের চিরকালের জন্য ক্ষমতাকে ধরে রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই সম্ভাবনা প্রকটভাবে দেখা যায় যদি শাসন ক্ষমতা দায়িত্বহীন এবং বাধাহীনভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে। গণতন্ত্রে শাসন ক্ষমতা একটি পবিত্র ট্রাস্টের মত। এই ক্ষমতার সুষ্ঠু ও ন্যায়সংগত প্রয়োগ হলেই শাসনকর্তৃপক্ষ নির্বিঘ্নে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন। অন্যথায় জনস্বার্থ বিরোধী শাসন কর্তৃপক্ষের পতন অবশ্যম্ভাবী।

গণতন্ত্রে চিন্তার স্বাধীনতা আছে। প্রতিটি সিদ্ধান্তই এখানে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিশদ্‌ভাবে বিবেচিত হওয়ার অবকাশ থাকে। যে কোন মতবাদ বা চিন্তাধারা স্বচ্ছভাবে প্রকাশ হবার সুযোগ থাকে বলে সবাই এখানে চিন্তা করতে শেখে। প্রতিটি নাগরিকই বুঝতে শেখে প্রতিটি রাষ্ট্রীয় আদেশকে নীরবে মেনে চলাই তার মানব জীবনের একমাত্র কর্তব্য নয়, দেশকে দেওয়ার মতও তার কিছু আছে। তাই প্রত্যেক নাগরিক সংকীর্ণ আত্মকেন্দ্রিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে দেশের ও দশের কথা ভাবতে শেখে। তাই নাগরিক মাত্রেই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয় এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবার অবকাশ একমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই সম্ভব হয়।

সংকীর্ণ স্বার্থের উর্ধে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিতি

সরকারের দায়িত্বকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তন সাধন সহজসাধ্য বলে আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের সম্ভাবনা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কম। সরকারের সমস্যাগুলির সাথে জনসাধারণের যোগসূত্র থাকার ফলে সহানুভূতি সহকারে তারা সেগুলি বুঝবার চেষ্টা করে। বিপ্লবের সম্ভাবনা দূরীভূত হওয়ার এটিও একটি অন্যতম কারণ। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেমন সাম্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি সকল রাষ্ট্রের সহ অবস্থানের নীতিতে বিশ্বাস করে। 'নিজে বাঁচ এবং অপরকে বাঁচতে দাও'—এই নীতি আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে সাহায্য করেছে।

পরিবর্তন সহজসাধ্য হওয়ার বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে না

গণতন্ত্র আন্তর্জাতিক শান্তির অনুপন্থী

১৩। গণতন্ত্রের ত্রুটি (Demerits of Democracy):

সরকার রাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যাঁরা বিরোধী তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সাধারণ মানুষের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নন্। জনসাধারণের কল্যাণসাধনই যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয় তবে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থির বুদ্ধি এবং যোগ্যতার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই দুইটি গুণের একান্ত অভাব দেখা যায়। সাধারণ মানুষ ভাবপ্রবণ। অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর অথবা বাগ্মী রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া তাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

গণতন্ত্রে যোগ্যতার চাইতে সংখ্যার উপর জোর দেওয়া হয়

ঘটনাপ্রবাহে তারা অস্থির এবং উত্তেজিতও হয়ে পড়ে। আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সমস্যাগুলি জটিল আকার ধারণ করেছে। এই সমস্যাগুলি বুঝবার জন্য এবং তার সমাধান করার জন্য যে শিক্ষা ও যোগ্যতার প্রয়োজন, অধিকাংশ লোকের মধ্যে সে শিক্ষা ও যোগ্যতা আশা করা যায় না। কিন্তু গণতন্ত্র যোগ্যতার পরিবর্তে সংখ্যার উপর বেশী জোর দেয়। সমাজে বিজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের চাইতে অজ্ঞ এবং মূর্খের সংখ্যাই বেশী থাকে। তাই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে বলেছেন যে, গণতন্ত্র আসলে মূর্খেরই শাসন। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচকেরা বলেন যে, কেবলমাত্র সংখ্যাধিক জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত হলেই সরকার যে ভাল সরকার হবে তার কোন কথা নেই। তাঁরা বলেন সরকার পরিচালনার যোগ্যতার মাপকাঠি হওয়া উচিত গুণ, সংখ্যা নয়। গণতন্ত্র জনতাতন্ত্রেরই নামান্তর মাত্র।

সকল মানুষ সমান যোগ্যতার অধিকারী নয়

সব মানুষই সমান—এই নীতিগত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গণতন্ত্র সকল মানুষকে সরকার পরিচালনায় সমান সুযোগ দেবার ও সব কাজ দেবার পক্ষপাতী। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ফ্রেডারিক নীট্‌সে (*Friedrich Nietzsche*) গণতন্ত্রের এই নীতিগত ভিত্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। আর একজন জার্মান দার্শনিক ট্রিটস্‌কে (*Treitschke*) এই কারণেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর আমলে প্রাশিয়ায় যে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল সেটি তাঁর মতে তখনকার দিনে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড অথবা সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল। আধুনিক কালে প্রেসকট হল (*Prescott Hall*), এলেন আয়ারল্যাণ্ড (*Alleyane Ireland*)

জীববিজ্ঞানের দিক থেকে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুক্তি

প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা জীববিজ্ঞানের দিক থেকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন, যেহেতু মানুষের বুদ্ধিগত ও নীতিগত পার্থক্য জন্মগত এবং তা অর্জনসাপেক্ষ নয়, 'সেজন্য সকল মানুষই সমান'—গণতন্ত্রের এই মূল ভিত্তি একটি ফাঁকা নৈতিক তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

গণতন্ত্র স্বাধীনতার অনুগামী—এ কথাও অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন না। বিখ্যাত ইংরাজ রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক লেকী (*Lecky*) বলেছেন, "গণতন্ত্র সুশাসন প্রতিষ্ঠা অথবা অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভব করার কাজে

সাহায্য করে না। প্রকৃত পক্ষে, গণতান্ত্রিক নীতিগুলি ব্যক্তি স্বাধীনতার বিরোধী।"[1] এর কারণস্বরূপ লেকী দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা যখন নির্বোধ লোকের হাতে থাকে তখন তারা স্বভাবতই কোন শক্তিশালী নেতার দ্বারা পরিচালিত হয়। সুতরাং সর্বসাধারণের হাতে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হলে কার্যতঃ তা ব্যক্তিবিশেষের ক্ষমতায় পরিণত হয়।

লেকীর যুক্তি

হেনরি মেন (*Henry Maine*), গুস্তাব লিবন (*Gustave Le Bon*), ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*) প্রভৃতি লেখকগণের মতে গণতন্ত্র শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি উন্নততর সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিপন্থী। গুস্তাব লিবন বলেছেন, "সভ্যতার অগ্রগতির পক্ষে এটা খুব সৌভাগ্যের কথা যে বড় বড় শিল্প এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি হওয়ার পরে জনসাধারণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।" সাধারণলোক শিল্প, কলা, সাহিত্য প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির মর্যাদা বোঝে না। তাই এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করতেও জানে না।

গণতন্ত্র শিল্প, কলা বিজ্ঞানের পরিপন্থী

আর একটি কারণেও গণতন্ত্র এই বৃত্তিনিচয়ের পরিপন্থী। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা স্বভাবতই শক্তি, সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। তাছাড়া, রাজনৈতিক জীবনে তাঁরা যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন শিল্পী এবং বিজ্ঞানীরা তা পান না। ফলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া বা রাজনৈতিক জীবনযাত্রাকে বেছে নেওয়া প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের কাছেও একটা আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি এক্ষেত্রে ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক।

স্থায়িত্বের অভাব গণতন্ত্রের আর একটি প্রধান ত্রুটি। হেনরি মেন, লেকী প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এই কারণে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। হেনরি মেন তাঁর 'পপুলার গভর্নমেণ্ট' নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন যে জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল জনতা এবং সৈন্যবাহিনীর একত্র আক্রমণে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়েছে। তিনি আরও বলেছেন, যেহেতু এই শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা

স্থায়িত্বের অভাব

1. "Democracy ensures neither better Government nor greater liberty, indeed, some of the strongest democratic tendencies are adverse to liberty."
—*Lecky*

2 "It is fortunate for progress of civilisation that the power of crowds only began to exist when great discoveries of science and industry had already been effected."—*LeBon*

জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে এবং সাধারণ লোক অজ্ঞ ও নির্বোধ, তাই এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। শাসনকার্য পরিচালনার এই দুরূহতাই লেকিব মতে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অস্থায়িত্বের কারণ।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসিতের প্রতি শাসককে দায়িত্বসম্পন্ন হতে বাধ্য করা সম্ভব বলে যে যুক্তি দেখান হয়, তার সারবত্তা অনেক লেখক অস্বীকার করেছেন। বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিজউইকের (*Sidgwick*) মতে গণনির্বাচনে স্বল্প স্থায়ী প্রতিনিধিত্ব ও কার্যকাল প্রভৃতির জন্য জনসাধারণের প্রতি সরকারের দায়িত্ব আদায় করে নেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর মতে শাসকবর্গকে সত্যিকার দাযিত্বসম্পন্ন করতে হলে তাদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান প্রয়োজন। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যেহেতু দীর্ঘকাল ধরে কার্যাধিকারকদের স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা এবং দীর্ঘকাল পর নির্বাচন ব্যবস্থা ইত্যাদি ভাল চোখে দেখা হয় না, সেজন্য দায়িত্ব নির্দিষ্ট করাও এই শাসন-ব্যবস্থায শক্ত হয়ে ওঠে।

সিজিউইকের বক্তব্য—শাসিতের প্রতি দাযিত্ব আদায় সম্ভব হয় না

অদক্ষতা এবং মন্থর গতি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি। জরুরী অথবা বিপদকালীন অবস্থা উপস্থিত হলে এই ত্রুটি প্রকটভাবে দেখা দেয়। বিপদকালীন অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে হলে সরকারকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনায়কের সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয় তবে তার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং কার্যপ্রণালীর দ্বারা দেশ অতি সহজেই বিপদকালীন অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সম্মতি, পার্লামেণ্টের অনুমোদন এবং অন্যান্য বহু প্রকার আনুষ্ঠানিক সংগতি বজায় রাখতে গিয়ে যে সময় এবং শক্তি ব্যয় হয় আপদকালীন অবস্থায় দেশের পক্ষে তা ভীষণভাবে ক্ষতিকর। এই কারণে কোন গণতান্ত্রিক দেশ কোন যুদ্ধ বিগ্রহে জড়িয়ে পড়লে সাময়িকভাবে গণতান্ত্রিক নীতি এবং অনুষ্ঠানগুলি স্থগিত রাখতে হয়। বিপদকালীন অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান এবং রীতিনীতিগুলিকে তাই সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের ভারতীয় সংবিধানে বিপদকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রপতির হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যে আপাতদৃষ্টিতে তা গণতন্ত্রবিরোধী মনে হয়, কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন আছে তা

গণতন্ত্র অদক্ষ এবং মন্থর

অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। আমাদের দেশে চৈনিক আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারি।

আজকের দিনে শাসনকার্য পরিচালনায় দলপ্রথার প্রবর্তন গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার আর একটি বড় ত্রুটি। রাজনৈতিক দলই দেশের কার্যপ্রণালী নির্দিষ্ট করে এবং প্রচার কার্যের মাধ্যমে জনসাধারণকে স্বমতে আনবার চেষ্টা করে। এককভাবে পরিকল্পনা নির্ণয় এবং তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া আজকের দিনে বিশাল রাষ্ট্রে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই দলপ্রথার প্রবর্তন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু রাজনৈতিক দলের দলীয় সদস্যদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের অবকাশ কমই থাকে। আসল ক্ষমতা তখন কেন্দ্রীভূত হয় দলীয় নেতাদের হাতে। দেশের বিভিন্নমুখী জটিল সমস্যাদি তখন নিরপেক্ষ যুক্তি সহকারে বিবেচিত হয় না। দেশের স্বার্থ অপেক্ষা দলের স্বার্থ বড় হয়ে দাঁড়ায়। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের প্রচার যন্ত্র, আর্থিক শক্তি প্রভৃতি দিয়ে নির্বাচনের সময় অবিশ্রাম গতিতে প্রচারকার্য চালিয়ে যায়। সাধারণ মানুষের তখন এই দলীয় প্রচার এবং অন্যান্য মামুলি নির্বাচন প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। শাসনকার্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা যখন একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত হয় এবং সেই দল যখন তার নেতাদের নির্দেশে পরিচালিত হয় তখন গণতন্ত্র আর গণতন্ত্র থাকে না। গণতন্ত্র তখন পর্যবসিত হয় অভিজাততন্ত্রে।

দলপ্রথাজনিত ত্রুটি

উপসংহার ঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এটি যে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা বিগত দুটি মহাযুদ্ধ তার প্রমাণ করেছে। গণতন্ত্র মূর্খতন্ত্রের নামান্তর মাত্র, এই ধারণা ভুল। জনসাধারণের হাতে ক্ষমতা থাকার অর্থ হচ্ছে যে, তারা সরকারের সাধারণ নীতিগুলি স্থির করে দেন মাত্র। এই সাধারণ নীতি নির্ধারণের জন্য কোন বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপক ল্যাস্কির (*Laski*) মতে, কোন সিদ্ধান্ত ঠিকভাবে বিবেচিত হতে হলে সাধারণ জ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তার বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষজ্ঞদের বিচার শক্তি কোন একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিশেষজ্ঞদের স্থান নেই, এ ধারণাও ভুল। গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের মূল নীতি বিষয়ে নির্দেশ দেন। এই ইঙ্গিত নির্দেশ করা অথবা বাস্তবে রূপায়িত করার ভার থাকে বিশেষজ্ঞদের হাতে।

সাধারণ মানুষ অজ্ঞ ও বিচারবুদ্ধি রহিত এ ধারণাও ঠিক নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনের জনসাধারণের রায়ের উপর গভীর আস্থা ছিল। তিনি বলেছিলেন যে কিছু সংখ্যক লোককে চিরকালের জন্য অথবা সমস্ত লোককে কিছুকালের জন্য হয়তো বোকা বানিয়ে রাখা যায় কিন্তু সমস্ত লোককে চিরকালের জন্য বোকা বানানো যায় না। ভারতের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত কিন্তু তাদের সাধারণ বিচারবোধ অত্যন্ত প্রখর ও শক্তিশালী। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যই এই যুক্তির একটি বড় প্রমাণ।

জীববিদ্যায় মানুষের অসমতার তত্ত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের যে বিরূপ সমালোচনা করা হয় তার উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এই তাত্ত্বিক আবিষ্কার এখনও অসম্পূর্ণ। এই তত্ত্বটি এখনও পরীক্ষামূলক অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া, মানুষের জন্মগত অসমতাকে স্বীকার করে নিলেও শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্রের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। গণতন্ত্র সবাইকে সমান সুযোগ দেবার পক্ষপাতী মাত্র। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে মানুষ এই সুযোগ গ্রহণ করবে। প্রতিটি মানুষকে যোগ্যতা হিসেবে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুগম ও সুপ্রশস্ত করাই গণতন্ত্রের আসল উদ্দেশ্য। অন্যথায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার কোন নৈতিক ভিত্তিই সরকারের থাকতে পারে না।

লর্ড ব্রাইস (*Lord Bryce*) তদানীন্তন কয়েকটি গণতান্ত্রিক সরকারের পরিচালন ব্যবস্থা অনুধাবন করে গণতন্ত্রের সমস্ত দোষত্রুটি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত এবং নিরপেক্ষ অভিমত প্রকাশ করেছেন ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর *Modern Democracies* নামক বিখ্যাত দু'খণ্ড পুস্তকে। এই পুস্তকে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে গণতন্ত্র শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিনিচয়ের অগ্রগতিকে সাহায্য করে না, এই ধারণা ভুল। তাঁর মতে শিল্প, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রসার বা অবনতি কোন বিশেষ শাসনব্যবস্থার উপর নির্ভর করে না। রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র অথবা গণতন্ত্র সকল প্রকার শাসনব্যবস্থাতেই শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটেছে। আসলে শিল্পকলা প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রকাশ এত রহস্যজনক, এত সূক্ষ্ম এবং তাদের গতি এত বিচিত্র যে শুধু বাহ্যিক ঘটনাবলী থেকে তাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করলে তা ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হয়তো বা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত শাসন ব্যবস্থা নয়। কিন্তু একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চাইতে এটি যে শ্রেষ্ঠতর শাসনব্যবস্থা সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ

নেই। যতদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র অপেক্ষা উন্নততর শাসনব্যবস্থার সন্ধান মানুষ না পাবে ততদিন অন্ততঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে শ্রেষ্ঠতম শাসনব্যবস্থা বলে গ্রহণ করতে হবে।

১৪। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Conditions essential for the success of Democracy) ঃ

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হতে হলে কয়েকটি শর্ত পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

রাজনৈতিক চেতনা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যে রাষ্ট্রে প্রচলিত হয়েছে সেখানকার মানুষকে এই শাসনব্যবস্থার উপযুক্ত হতে হবে। যেখানকার নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা নেই অথবা যেখানকার মানুষ নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত নয় সেখানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সফল হতে পারে না।

অধিকার সম্বন্ধে যেখানকার মানুষ সচেতন নয়, অধিকারের উপর ক্রমাগত হস্তক্ষেপ সেখানে স্বাভাবিক। অধিকার ভোগ করতে হলে তার জন্য মূল্য দিতে হয়। অধিকার সম্বন্ধে নাগরিকদের সদাজাগ্রত চেতনাকেই স্বাধীনতার মূল্য রূপে ধরা হয়; কেননা এই চেতনা ব্যতিরেকে অধিকার রক্ষা করা কঠিন। 'Eternal vigilance is the price for liberty'—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি সুপ্রচলিত সত্য উক্তি।

সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধেই কেবল সচেতন থাকলে চলবে না, নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধেও অবহিত থাকতে হবে।

অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে নাগরিকদের সচেতনতার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার। শিক্ষিত নাগরিকদের পক্ষেই আধুনিক রাষ্ট্রের জটিল সমস্যাগুলির

শিক্ষা

বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করা সম্ভব। দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি বুঝবার মত প্রয়োজনীয় শিক্ষা যে সকল নাগরিকের নেই, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে প্রেরণা তাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করেই এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না।

তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয়। যে শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু বশ্যতা এবং আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দেয়, মানুষকে শুধু নিজের কথাই চিন্তা করতে শেখায় এবং সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে ঔদাসীন্যের সৃষ্টি করে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় চরিত্র সৃষ্টি করা সে শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে বলা যেতে পারে, যে শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়, সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে তার অনুসন্ধিৎসা ও বিশ্লেষণী শক্তিকে জাগ্রত করে এবং সহনশীলতা ও ত্যাগের আদর্শে তাকে অনুপ্রাণিত করে—সেই শিক্ষাই গণতন্ত্রের উপযোগী প্রকৃত শিক্ষা।

গণতন্ত্রের ঐতিহ্য ব্যতিরেকে গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করা এক দুরূহ সমস্যা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ওয়েমার সংবিধান দ্বারা এক সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত করা হয়। কিন্তু এই শাসন ব্যবস্থাকে পর্যুদস্ত করে অতি সহজেই হের হিটলারের পক্ষে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। জার্মানীতে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অভাব ছিল বলেই সেখানে অত সহজে একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। একনায়কতন্ত্রের তত্ত্বগত ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন হেগেল, নীট্‌সে ও ট্রিটস্‌কে প্রমুখ জার্মান দার্শনিকেরা।

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য

প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের বড় সমর্থক মিল (*Mill*) গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য তিনটি শর্তের উল্লেখ করেন। তাঁর মতে (১) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে গ্রহণ করার মত ইচ্ছা এবং শক্তি জনসাধারণের থাকা প্রয়োজন, (২) এ ব্যবস্থাকে রক্ষার জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে এবং (৩) তাদের পক্ষে কর্তব্যপালন ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হলে তাকে রক্ষার জন্য সংগ্রামে ইচ্ছুক ও সমর্থ হতে হবে।

মিলের তিন দফা শর্ত

লিখিত সংবিধান গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। গণতন্ত্রের সমালোচক হেনরী মেন স্বীকার করেছেন যে 'বিজ্ঞ সংবিধান' (wise constitution) দ্বারা গণতন্ত্রের উচ্ছ্বাসকে খানিকটা কমানো যেতে পারে। গণতন্ত্রের আর একজন সমালোচক লেকীর (*Lecky*) মতে, যে সব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু আছে তাকে সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত করতে হলে একটি লিখিত সংবিধানের (written constitution) একান্ত প্রয়োজন।

লিখিত সংবিধান

লিখিত সংবিধানের একটি বড সুবিধা এই যে এটি সাধারণ লোকের বোধগম্য। সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও দায়িত্ব, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, নাগরিকের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি বিষয় এই সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকার জন্য সরকারী স্বেচ্ছাচারের অবকাশ কম থাকে।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, গ্রেট ব্রিটেনের মত রাষ্ট্রে সংবিধান প্রধানতঃ অলিখিত কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সেখানে সাফল্যমণ্ডিত। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সেখানকার জাতীয় জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গ্রেট ব্রিটেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যদিও তার সংবিধান অলিখিত

সেখানে আইনের চোখে রাজা সর্বশক্তিমান কিন্তু কার্যত তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। জনপ্রতিনিধিমূলক পার্লামেন্টের অধিকার, মন্ত্রিসভার দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রভৃতি অনেক সাংবিধানিক বিধান সেখানে প্রথাগত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। কাগজে কলমে অনেক কিছু লেখা না থাকলেও সরকারের সব কিছুই সেখানে সুষ্ঠুভাবে চলছে। তার কারণ সেখানকার জাতীয়জীবন এক গৌরবময় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অধিকারী।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রেরও একান্ত প্রয়োজন। ধন বণ্টনের বৈষম্য যেখানে উগ্র সেখানে গণতন্ত্র বেশীদিন চলতে

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র

পারে না। মুষ্টিমেয় ধনিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত না হলে সাধারণ মানুষের পক্ষ রাজনৈতিক অধিকারগুলির সদ্ব্যবহার করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করা যেতে পারে। অন্যথায় স্বল্প সংখ্যক ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের উর্ধে শাসনযন্ত্রকে সাধারণের হিতার্থে পরিচালিত করা সম্ভব হবে না, একথা অবশ্যই বলা যেতে পারে।

গণতন্ত্রকে সাফাল্যমণ্ডিত করতে হলে যথোপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা চলে না। আজকের দিনে বৃহৎ ও জটিল

উপযুক্ত সংগঠন ও নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের আগ্রহ শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত। দেশের ও দশের সমস্যা সম্বন্ধে সে কারণে সাধারণ মানুষের আগ্রহের অভাব দেখা যায় এবং রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিক হিসেবে কর্তব্য সম্বন্ধেও তারা অনেক সময় উদাসীন থাকে।

মানুষের চিন্তাকে জাগ্রত করে তাকে সুস্থ পথে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন সৎ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের। তাই গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই ধরণের নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি দলবিশিষ্ট রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলতে পারে কিনা—এই প্রশ্ন অনেকের কাছে তর্কের বিষয়বস্তু হলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধিকাংশ চিন্তাবিদ্ গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একাধিক রাজনৈতিক দলপ্রথার পক্ষপাতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় '*Can Democracy function in one party State?*' নামক এক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব একান্ত আবশ্যক।

১৫। গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ (Future of Democracy):

আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থা বলে অনেকে এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য যে শাসন ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট্য, নির্বাচনের ব্যবস্থা সেখানে অর্থহীন। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে আত সহজেই এখানে পুঁজিবাদীশ্রেণী নিজেদের নিবাচিত করতে সক্ষম হয়। তাই নির্বাচন ব্যবস্থাকে যথার্থভাবে কার্যকরী করতে হলে ধনবণ্টনের বৈষম্যকে সংকুচিত করা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় নির্বাচন এক প্রহসনে পর্যবসিত হয় বলে—এক শ্রেণীর লোক যুক্তি দিয়ে থাকেন। এই ধরনের যুক্তির উত্তরে বলা যায়, গণতন্ত্র যে সর্বক্ষেত্রে পুঁজিবাদীশ্রেণীর প্রভাবাধীন—এই ধারণা ঠিক নয়। আধুনিক প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্রেও জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনার সাহাযো ধনী-দরিদ্রের ব্যবধানকে সংকুচিত করার চেষ্টা চলেছে। তাছাডা, জনসাধারণ সর্বক্ষেত্রেই যে পুঁজিবাদীদেব প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে স্বীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে এক বিশেষ শ্রেণীর লোককেই যে শাসনক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করবে—এ ধারণাও ভুল প্রতিপন্ন হয়েছে। জনসাধারণ তার দারিদ্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও উপযুক্ত প্রাতনিধি নির্বাচনে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দোহাই দিয়ে আধুনিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখানো হয় তা একান্তই অমূলক।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গণতন্ত্র অসম্ভব—এই যুক্তিব অসারবত্তা

আধুনিক কালের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি জটিল এবং তা সমাধানের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয়। সাধারণ মানুষ পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ ও বাগ্মীতায় আজ বীতশ্রদ্ধ। তারা চায়, সাধারণ মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান। গণতন্ত্র

এই উদ্দেশ্য সাধনে একান্তই অপারগ। তাই প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপের জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি রাষ্ট্রে—একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

গণতন্ত্র জটিল সমস্যা সমাধান এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম—এই যুক্তির সারবত্তা

এই যুক্তিকেও মেনে নিয়ে আমরা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারি না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলির পতন এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলির সাফল্যই এই শাসন-ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। ইংলণ্ডে যুদ্ধকালীন ক্ষুদ্রতর মন্ত্রিসভা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগ্যতর নেতৃত্বাধীনে উক্ত রাষ্ট্রগুলি তার বিপদকালীন সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধা করেছে। তাছাড়া, জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভা এবং দেশের নেতৃস্থানীয় শাসনকর্তৃপক্ষ জটিল অর্থনৈতিক ও সমাজ-নৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানে দেশের জ্ঞানী, গুণী ও যোগ্যতর ব্যক্তিদের কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধযুক্তিগুলির অসারত্ব প্রতিপন্ন করেছে।

সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতা গণতন্ত্র আজও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি সত্য। কিন্তু তাই বলে এই শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে আমরা একনায়কতন্ত্র বা স্বৈরাচারতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি না। পৃথিবীর সকল গণতন্ত্রই আজ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যগুলিকে দূরীভূত করে আদর্শ সমাজব্যবস্থার পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

গণতন্ত্র ক্রটিমুক্ত না হলেও একনায়কতন্ত্র গ্রহণযোগ্য নয়

গণতন্ত্র পরিপূর্ণ আস্থা রাখে সাধারণ মানুষের উপর। সাধারণ মানুষকে চিরকালের জন্য ধোঁকা দিয়ে পুঁজিবাদীশ্রেণী চিরকালের জন্য তার কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখবে এই ধারণাকে স্বীকার করার অর্থই হচ্ছে সাধারণ মানুষের আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস। সাধারণ মানুষকে হয়তো সাময়িকভাবে বিপথে পরিচালিত করা সম্ভব হতে পারে কিন্তু সকলকে চিরকালের জন্য বিপথে পরিচালিত করা যায় না—এই উক্তির সারবত্তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। গণতন্ত্র সাধারণ মানুষের যোগ্যতা ও শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে মানবতার মহান ভবিষ্যৎকেই স্বীকার করে নিয়েছে।

উপসংহার

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের শ্রেণীবিভাগ ঃ

আরিস্টটল সরকারকে গুণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। গুণের ভিত্তিতে ভাগ করে তিনি দেখিয়েছেন, সরকার স্বাভাবিক ও বিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। অপরপক্ষে এই ব্যবস্থা

সংখ্যার ভিত্তিতে ভাগ করে তিনি দেখিয়েছেন সরকার একজন, কতিপয় এবং বহুব্যক্তির হাতে থাকতে পারে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে বদাঁ, হবস্, লক, ম্যারিয়ট, লীকক প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ভিত্তিতে রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। এই সমস্ত শ্রেণীবিভাগের মধ্যে লীককের শ্রেণী বিভাগই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। লীকক সরকারকে একনায়কতান্ত্রিক এবং গণতান্ত্রিক—এই দুইভাগে ভাগ করে গণতন্ত্রকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। গণতন্ত্রকে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র, এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং মন্ত্রীসভা চালিত ও রাষ্ট্রপতি চালিত এই ভাবে ভাগ করেছেন।

রাজতন্ত্র :

শাসনক্ষমতা একজন ব্যক্তি বা রাজার হাতে ন্যস্ত থাকলে তাকে রাজতন্ত্র বলে। রাজতন্ত্রে মানুষকে আইনানুগ হয়ে বাস করতে শিক্ষা দিয়ে রাষ্ট্রের বিবর্তনকে সাহায্য করেছে। রাজতন্ত্র নির্বাচনমূলক অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে হতে পারে। আধুনিক জাতীয়তাবাদ রাজতন্ত্রের কাছে ঋণী। তাছাড়া, আধুনিক গণতন্ত্রে দলীয় রাজনীতির প্রভাব থাকায়, রাজা সকল দলের উদ্দেশ্যে জাতির স্বার্থে নিরপেক্ষ ভূমিকা অবলম্বন করতে পারেন। রাজতন্ত্র স্বৈরাচারতন্ত্রে পর্যবসিত হতে পারে এবং নৈতিক দিক থেকে তা সমর্থনযোগ্য নয়।

অভিজাততন্ত্র :

অভিজাততন্ত্র বলতে কয়েকজন তথাকথিত উচ্চস্তরের লোকের দ্বারা নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। অভিজাততন্ত্রে সংখ্যার চাইতে গুণের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়। এই শাসনব্যবস্থা রক্ষণশীল এবং অচলায়তনের পক্ষপাতী। এখানে শ্রেণী চেতনা এবং শাসকশ্রেণীর আত্মসম্মানবোধ অত্যন্ত উগ্র।

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

একনায়কতন্ত্র বলতে এক ব্যক্তি বা দলের দ্বারা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায়। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) দল ও মতের পার্থক্যকে স্বীকার না করা, (২) শক্তির উপর নির্ভরশীলতা, (৩) গোপনীয়তা রক্ষা এবং (৪) কঠোরতা। একনায়কতন্ত্রের বিভিন্নরূপ—(১) সামরিক, (২) সাম্যবাদী ও ফ্যাসিবাদী।

ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু রাষ্ট্র এবং জাতি। সাম্যবাদে রাষ্ট্র সবকিছু নয়। রাষ্ট্রের সাহায্যে শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই এই মতবাদের লক্ষ্য। ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদ শ্রেণীবৈষম্যকে স্বীকার করে। সাম্যবাদ শ্রেণী-বৈষম্যকে উৎখাত করতে চায়। এই তিন প্রকার শাসন ব্যবস্থাই স্ব স্ব আদর্শ বিস্তারের জন্য রাষ্ট্রের বিস্তৃতি কামনা করে। ফ্যাসিবাদ এবং নাজিবাদ মূলত, ভাববাদী, সাম্যবাদ—বস্তুবাদী। সাম্যবাদের মধ্যে একটি মানবিকতার আবেদন আছে যেটি ফ্যাসিবাদ ও নাজিবাদে দেখা যায় না।

ফ্যাসিবাদ :

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইটালিতে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই ফ্যাসিবাদের উত্থানের কারণ। হেগেল-পন্থী ইটালির দার্শনিকদের সহায়তায় মুসোলিনী এই মতবাদ প্রচার করেন। এই মতবাদের মূল কথা রাষ্ট্রই সবকিছু এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু থাকতে পারে না। ফ্যাসিবাদ জাতীয় ঐক্যের উপর জোর দেয় এবং শ্রেণী-বৈষম্যকে স্বীকার করে নেয়।

ইটালির মত অনুরূপ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মধ্যেই প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে নাজিবাদের উত্থান হয়। ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তগুলিও এই উগ্র মতবাদের

অন্যতম কারণ। নাজিবাদে পবিত্র আর্যরক্ত সম্ভূত জার্মান জাতির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতির স্বার্থে এই মতবাদ শিল্পসম্পদ সবকিছুই রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী এই অর্থে নাজিবাদকে জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়।

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র :

গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। একনায়কতন্ত্র সাম্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। গণতন্ত্রের ভিত্তি সম্মতি, একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি শক্তি। গণতন্ত্র বিরোধী মতের সহঅবস্থানে বিশ্বাস করে, একনায়কতন্ত্র নিয়ন্ত্রাবাদী।

একনায়কতন্ত্রের গুণাগুণ :

একনায়কতন্ত্র (১) কর্মকুশল, (২) সামগ্রিকভাবে দেশ ও জাতির গুরুত্বে বিশ্বাসী, (৩) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সহায়ক।

একনায়কতন্ত্রে (১) স্বাধীনতা ও সাম্য পর্যুদস্ত হয়, (২) স্বেচ্ছাচারীতার অনুশাসন প্রবর্তিত হয় এবং (৩) ক্ষমতা অপ্রতিহত হওয়ায় অনিবার্যভাবে তা বিকৃতির দিকে এগিয়ে যায়।

গণতন্ত্র :

গণতন্ত্র একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থাকেই বোঝায় না, গণতন্ত্র একটি বিশেষ নৈতিক আদর্শ হিসেবে সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নীতির স্বীকৃতির প্রয়োজন। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুই-ই হতে পারে। আধুনিক গণতন্ত্র পরোক্ষ গণতন্ত্র। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক নীতির কয়েকটি পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। এগুলি হচ্ছে : (১) গণনির্দেশ, (২) গণ-প্রস্তাব, (৩) প্রত্যাবর্তনের আদেশ এবং (৪) গণভোট। গণতন্ত্রের গুণগুলি হচ্ছে : (১) স্বাধীনতা ও সাম্যের স্বীকৃতি, (২) সকলের অধিকার ও স্বার্থের সংরক্ষণ, (৩) আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ফলে স্বাধীনতার রক্ষার সুবিধা, (৪) শাসিতের প্রতি শাসকের দায়িত্ব আদায়ের সুবিধা, (৫) সকল স্বার্থের উর্ধে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিতি, (৬) বিদ্রোহের সম্ভাবনা কমে যাওয়া। এবং (৭) আন্তর্জাতিক শান্তির অনুপন্থী হওয়া।

গণতন্ত্রের ত্রুটি হচ্ছে : (১) যোগ্যতার চাইতে সংখ্যার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়. (২) শিল্প, কলা বিজ্ঞানের পরিপন্থী (৩) স্থায়িত্বের অভাব, (৪) শাসিতের প্রতি দায়িত্ব আদায়ের অসুবিধা (৫) মন্থর গতি এবং (৬) দলপ্রথাজনিত অসুবিধা।

এই অসুবিধাগুলি সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার চাইতে শ্রেষ্ঠতর সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার শর্তগুলি হচ্ছে : (১) রাজনৈতিক চেতনা (২) শিক্ষা বিস্তার, (৩) গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য (৪) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কার্যকরী করার ইচ্ছা ও শক্তি, (৫) স্বাধিকার রক্ষায় সংগ্রামশীলতা, (৬) লিখিত সংবিধান এবং (৭) অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রচলন।

আধুনিক গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত না হলেও গণতন্ত্রের মহান ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত হতে পারি।

Exercise

1. How do you classify forms of Government ?

(*C. U. 1951*)

2. Estimate the strength and weakness of modern democracy as a form of Government. (*C. U. 1949*)

3 Distinguish between democracy and dictatorship and point out the conditions essential to the success of democracy. *(C. U 1962)*

4. Discuss the aims and ideals of totalitarian States How far do these ideals differ from those of democratic States ? *(C. U. 1954)*

5. What conditions are required for the successful operation of democracy ? Indicate the merits and defects of such a Form of Government. *(C. U. 1955)*

6. What are the aims and ideals of a democratic State ? How do they differ from those of a dictatorial State ? *(B. U. 1963)*

7. Distinguish between democracy and dictatorship. Can democracy function in one-party State ? Give reasons for your answer.

8. Do you think democracy will survive ? Give reasons for your answer

9. What are the important features of a Democratic Form of Government ? Considering the problems which present democracy has failed to solve, do you think democracy will survive ?

একাদশ অধ্যায়

রাজ্যসংঘ ও সরকারের বিভিন্ন রূপ
(Unions of States and Forms of Government)

১। এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সঙ্গে পার্থক্য : (Characteristics of a unitary Form of Government : how it differs from a Federal Type) :

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসনকার্য একটি মাত্র সরকারের দ্বারা পরিচালিত হয়। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন সংস্থা থাকতে পারে, তবে তাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সকল ক্ষমতার অধিকারী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত ক্ষমতা তার পরিচালনা করে মাত্র। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর সরকার থাকে—কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক। এই দুই শ্রেণীর সরকার নিজ নিজ এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করে। একে অপরের কাজে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সমগ্র শাসনব্যবস্থা একটিমাত্র সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক বিষয়গুলি দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকারের নিয়ন্ত্রাধীন।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার, যুক্তরাষ্ট্রে দুইশ্রেণীর সরকার

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সকল ক্ষমতার উৎস কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধানই কেন্দ্র ও আঞ্চলিক—এই উভয় সরকারেরই ক্ষমতার উৎস। সংবিধান-নির্দিষ্ট ক্ষমতার বাইরে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কিছু করতে পারে না। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অসুবিধার প্রশ্ন ওঠে না। একটি মাত্র জাতীয় সরকার এখানে সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট যা করে সেইটিই আইনসংগত। পার্লামেণ্টই এখানে প্রয়োজনমত সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। পার্লামেণ্টের কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সেখানে কোন বিচারালয়ের নেই। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান যেহেতু কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়, সে কারণে এই সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতা অতিক্রম করলে, সেখানকার প্রধান বিচারালয় কেন্দ্রীয়

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রধান শক্তি কেন্দ্রীয় সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্তি সংবিধান

বা প্রাদেশিক সরকারের যে কোন আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক এবং এখানকার সংবিধান অলিখিত।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও অলিখিত কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত

লিখিত সংবিধান সমন্বিত এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্স, আইরিশ ফ্রি স্টেট, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় যেহেতু ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন জড়িত সেহেতু এখানকার সংবিধান অনিবার্যভাবে লিখিত হতে হবে। কারণ ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নে কোন অনিশ্চয়তার স্থান নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বলতে

'এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় সংবিধান নমনীয় ও অনমনীয়, যুক্তরাষ্ট্রে অনমনীয়

এমন একটি চুক্তিকে বোঝায়, যেখানে কোন একপক্ষের ইচ্ছায় সংবিধান পরিবর্তিত হওয়া বিধেয় নয়; কিন্তু এককেন্দ্রিক সংবিধান নমনীয় বা অনমনীয়, দুই-ই হতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন নিয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হতে পারে। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান-নির্দিষ্ট বিধানগুলিকে

উচ্চ বিচারালয়ের স্থান

যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় থাকে যার সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় শ্রেণীর সরকারকে মেনে নিতে হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্ন নিয়ে সংবিধান ব্যাখ্যার কাজে কোন উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয়কে এগিয়ে আসতে হয় না।

২। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও দোষ (Merits and defects of unitary Form of Government):

গুণ (Merits): প্রথমতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সারা দেশের শাসনকার্য একটিমাত্র সরকার দ্বারা চালিত হয়।

শাসনকার্যে জটিলতার সৃষ্টি হয় না।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার একই প্রকার আইন সারা দেশের জন্য প্রণয়ন করে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে এই আইনগুলিকে চালু করা হয়। ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় কোন জটিলতা দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় সরকার সকল প্রকার আইন প্রণয়নের অধিকারী হয় বলে কোন বিচারালয় কর্তৃক এই আইনগুলিকে অবৈধ ঘোষণা করার

সম্ভাবনা থাকে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধান বিচারালয় অনেক সময় সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রণীত সমাজ কল্যাণমূলক আইনকে অবৈধ ঘোষণা করে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের আমলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এককেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থায় এই সম্ভাবনা নেই। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট দেশের কল্যাণের জন্য যেকোন আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং তাকে অবৈধ ঘোষণা কবার অধিকার কোন বিচারালয়ের নেই।

আইন অবৈধ বলে ঘোষিত হবার সম্ভাবনা কম

তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকায় প্রশাসনিক ব্যয় কম হয়। ফলে জনসাধারণের উপর করভারের মাত্রা তীব্র হতে পারে না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের উপর করভার বেশী হয়।

ব্যযভার কম

চতুর্থতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনে বিচারালয় কর্তৃক আইনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করার সম্ভাবনা না থাকায় সরকার দেশের জন্য যে কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে আইন তৈরী করে সেগুলিকে বাস্তবে চালু করতে পারে। প্রশাসনিক ব্যয় কম হওয়ার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য এই শাসনব্যবস্থা স্বভাবতই বেশী ব্যয় করতে সক্ষম হয়। সুতরাং উচ্চকাঙ্ক্ষী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং বলিষ্ঠভাবে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সহজ হয় বলে অনেকে মনে করেন।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়িত করা সম্ভব

পঞ্চমতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সর্বক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত থাকায় আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তগুলি অতি সহজেই পূরণ করা সম্ভব হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গরাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব না থাকায় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ শর্তগুলি সব সময় পালন করা সম্ভব হয় না।

আন্তর্জাতিক চুক্তি পালনের সুবিধা

ষষ্ঠতঃ, এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকে বলে সরকারের পক্ষে দায়িত্ব এড়ানোর প্রশ্ন উঠে না। দায়িত্ব ভাগ না হওয়ার জন্য শাসনব্যবস্থা দুর্বল হতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ হওয়ায় সমগ্র শাসনব্যবস্থা ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বল হয়ে পড়ে।

দায়িত্ব ভাগ না হওয়ায় শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী থাকে

সপ্তমতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকার না থাকায় আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সম্ভাবনা কম থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে মতানৈক্য ঘটলে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তাদের অবস্থিতির দাবি জানাতে পারে। দাস প্রথাকে কেন্দ্র করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি এক সময় কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে সম্পর্ক ছেদের দাবি করায় দেশকে এক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা কম।

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা কম

দোষ (Defects): এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় পূর্বোক্ত গুণগুলি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার দিকে প্রবণতাই বেশী। যে দেশে বিভিন্ন ভাষা, কৃষ্টি, অর্থনৈতিক সমস্যা আছে সেখানে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা অচল। প্রকৃতপক্ষে বৈচিত্র্যপূর্ণ রাষ্ট্রে এক আইন, এক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী হতে পারে। প্রত্যেক অঞ্চলের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিতে হলে এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে পৃথক অঞ্চলগুলির পৃথক সরকারী কাঠামোর সাহায্যেই তা করা যেতে পারে।

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না

দেশ বড় হলে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে দেশের দূরতম অংশে উদ্ভূত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান সম্ভব হয় না। স্থানীয় সরকার থাকলে যে কোন সমস্যার সমাধান কল্পে দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব।

সমস্যা সমাধানে দ্রুত কার্যকরী শক্তির অভাব

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকার থাকায় কাজের চাপ বেশী পড়ে। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকারের কাজের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে, একটিমাত্র সরকার উপযুক্তভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্রে দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকার থাকায় স্থানীয় সমস্যাসংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব অতি সহজেই স্থানীয় সরকারগুলি পালন করতে পারে।

কাজের চাপ বৃদ্ধি

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটিমাত্র সরকার থাকায় অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। অধিক সংখ্যক লোক শাসনকার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেলে তাদের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং নাগরিক হিসেবে তাদের যথাকর্তব্য পালনে তারা আগ্রহশীল হয়।

কমসংখ্যক লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ

কাজের চাপ বেশী পড়ায় এবং কমসংখ্যক লোকের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণে সুযোগ থাকায় এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্রের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়া গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়।

আমলাতন্ত্রের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

৩। রাজ্যসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা (Unions of States and Federalism):

সংহতির দিক থেকে অধ্যাপক জেলিনেক (*Jellinek*) রাষ্ট্রগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন ; যথা—**অসংগঠিত** (Unorganised) এবং **সংগঠিত** (Organised)। এককেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা অথবা সাধারণ সংগঠনের অবস্থিতির ভিত্তিতে তিনি এই শ্রেণীবিভাগ করেন। অসংগঠিত রাষ্ট্রবন্ধনগুলিতে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা অথবা সাধারণ সংগঠন নেই, অপর পক্ষে সংগঠিত রাষ্ট্রবন্ধনগুলিতে এই জাতীয় সংগঠনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সন্ধিবন্ধন (alliances), আঁতাত (entete), লীগ (league) প্রভৃতি অসংগঠিত রাষ্ট্রবন্ধনের অন্তর্ভুক্ত, এগুলিতে কোন প্রশাসনিক সংস্থা বা সাধারণ সংগঠন নেই। অপর পক্ষে ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘ (Personal union), প্রকৃত রাজ্যসংঘ (Real union), রাষ্ট্রসমবায় (Confederation), যুক্তরাষ্ট্র (Federal union) প্রভৃতি সংগঠিত রাষ্ট্রবন্ধনের অন্তর্ভুক্ত, এগুলিতে একটি প্রশাসনিক সংস্থা বা সাধারণ সংগঠন থাকে। বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখানো যেতে পারে :

রাজ্যসংঘ

অসংগঠিত (Unorganised)	সংগঠিত (Organised)
[সন্ধিবন্ধন, আঁতাত, লীগ প্রভৃতি]	[ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘ প্রকৃতরাজ্যসংঘ রাষ্ট্রসমবায়, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি]

৪। মৈত্রীবন্ধন (Alliance):

মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে কতকগুলি রাষ্ট্র সাধারণতঃ বহিঃশক্তির আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্র তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে এবং রাষ্ট্র হিসেবে তাদের

স্বাধীন সত্তা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। মৈত্রীবন্ধনে যে কোন রাষ্ট্র এই বন্ধন ছিন্ন করতে পারে। আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক ব্যক্তি (International person) হিসেবে কোন স্বীকৃতি নেই। তাছাড়া, এই বন্ধন সাময়িক, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এই বন্ধনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সন্ধিবন্ধনে কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকে না। এই অর্থে, মৈত্রীবন্ধনকে দুর্বলতম বন্ধন বলা যেতে পারে। মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গভীরতর হলে রাষ্ট্রসমবায় (Confederation) গঠিত হতে পারে। সুতরাং সহযোগিতার দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রসমবায়কে মৈত্রীবন্ধনের পরবর্তী পর্যায় বলে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘ ও প্রকৃত রাজ্যসংঘ (Personal Union and Real Union) :

ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘ (Personal union) এবং প্রকৃত রাজ্যসংঘকে (Real union) একাধিক রাষ্ট্রের সমষ্টিবদ্ধ রূপ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে আদর্শযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। এই রাষ্ট্রসংঘগুলির আসল স্বরূপ বুঝতে পারলে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে এদের পার্থক্য বুঝতে পারব

ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে বন্ধনযুক্ত হয়। উত্তরাধিকার, বিবাহ ইত্যাদি কারণে এই বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে। ইংলণ্ডের হ্যানোভার বংশীয় রাজারা একসময়ে হ্যানোভার এবং ইংলণ্ড এই উভয় রাষ্ট্রেরই রাজা ছিলেন। স্কটলণ্ডের রাজা জেমস ইংলণ্ডেরও রাজা হওয়ায় দুটি রাষ্ট্র একই রাজার অধীনে বন্ধনযুক্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য স্কটলণ্ডের রাষ্ট্র হিসেবে পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়। ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজস্ব রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বজায় রাখে। যে রাজার অধীনে তারা বন্ধনযুক্ত হয়—পৃথক রাষ্ট্রে তিনি পৃথক ক্ষমতা বা মর্যাদার অধিকারী হতে পারেন। একটি রাষ্ট্রে তিনি হয়তো নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, অন্য রাষ্ট্রে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। যে কোন প্রকার ক্ষমতায় তিনি অধিকারী হোন না কেন এই বন্ধনের মূল কথা হচ্ছে এই যে, দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের এই বন্ধন সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং তার জন্য তাদের রাষ্ট্রও একবারে ক্ষুণ্ণ হয় না। প্রকৃত রাজ্যসংঘে (Real union) যুক্ত রাষ্ট্রগুলি ব্যক্তিভিত্তিক রাজ্যসংঘ অপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রকৃত রাজ্যসংঘের রাষ্ট্রগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে

তাদের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা একটি রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের পরিচালিত করে। প্রকৃত রাজ্যসংঘে সাধারণতঃ একজন রাজা থাকলেও পৃথক রাষ্ট্রগুলি তাদের আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্র্য লোপ করে না। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তারা একটি রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী একই সম্রাটের অধীনে এইভাবে সংঘবদ্ধ ছিল।

৬। রাষ্ট্রসমবায় (Confederation):

রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে আমরা কতকগুলি রাষ্ট্রকে তাদের রাষ্ট্রত্ব বজায় রেখে এক বিশেষ উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হতে দেখি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন বহিঃশক্তির আক্রমণের সম্ভাবনা থেকে নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই সমবায়ের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে প্রধান লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকে স্ব স্ব সার্বভৌমিকতা বজায় রাখে। সুতরাং রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে প্রত্যেক রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য সমন্বিত রাষ্ট্র, অর্থাৎ, এই বন্ধনের মধ্যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির রাষ্ট্রত্ব কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্র সমবায়ের পার্থক্য এইখানেই। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি রাষ্ট্রের একতাবদ্ধ হবার প্রশ্ন আসে না। এখানে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রের কার্যাবলী পরিচালনা করে। সুতরাং এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রসমবায়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট বলা চলে। এই প্রকার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রসমবায়ের কোন সাদৃশ্যই নেই। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র সমবায় কিছু পরিমাণে সম্পর্কযুক্ত মনে হলেও, দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব থাকে না। সুতরাং এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ায় তাদের রাষ্ট্রত্বও লোপ পায়। অঙ্গরাজ্যগুলির পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সরকার এবং সংবিধানের নির্দেশমত কিছু পরিমাণ আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকলেও, তাদের সার্বভৌমত্ব থাকে না, সুতরাং, তারা কেউই রাষ্ট্র নয়। কিন্তু রাষ্ট্র সমবায়ের মধ্যে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌমিকতা বজায় থাকে, সুতরাং তাহা প্রত্যেকেই রাষ্ট্র। কোন এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা সংঘবদ্ধ হয় মাত্র। সুতরাং রাষ্ট্রসমবায়ের ফলে কোন নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় না, সদস্য রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকেই রাষ্ট্র।

রাষ্ট্রসমবায়ে সদস্য-রাষ্ট্রদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, তাই তারা রাষ্ট্র

রাষ্ট্র সমবায়ের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, রাষ্ট্র সমবায়ের ভিত্তি সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি, যুক্তরাষ্ট্রের মত কোন সাংবিধানিক আইনের প্রশ্ন এখানে আসে না।

রাষ্ট্র সমবায়ের ভিত্তি সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক চুক্তি

রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্য-রাষ্ট্রগুলির চুক্তির ফলে সরকারের মত একটি কেন্দ্রীয় সম্মেলন থাকলেও এই সম্মেলন এককেন্দ্রিক বা যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় সরকারের মত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার নয়। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিকে কাযকরী করার জন্য রাষ্ট্রসমবায়ের কোন প্রশাসনিক যন্ত্র বা বিচার বিভাগ থাকে না। সুতরাং কেন্দ্রীয় সম্মেলনের কনফারেন্স (Conference), কংগ্রেস (Congress) অথবা ডায়েট (Diet) সিদ্ধান্তগুলিকে কাযকরী করতে হলে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির ইচ্ছার উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। রাষ্ট্রসমবায়ের সিদ্ধান্তগুলি সদস্য-রাষ্ট্রদের জানিয়ে দেওয়া হয় মাত্র এবং সদস্য-রাষ্ট্রগুলি স্বস্ব সরকারের এলাকায় সেগুলি চালু না করা পর্যন্ত সেগুলি কার্যকরী হয় না।

রাষ্ট্র সমবায়ের কেন্দ্রীয় সংস্থার স্বরূপ

রাষ্ট্রসমবায়ের কোন নিজস্ব নাগরিক সম্প্রদায় নেই। সুতরাং তার সিদ্ধান্তগুলি সরাসরিভাবে নাগরিকদের উপর আরোপিত হতে পারে না। রাষ্ট্রসমবায়ের যাবতীয় কার্যকলাপ সদস্য-রাষ্ট্রের সরকারের মাধ্যমেই নাগরিকদের উপর কার্যকরী করা হয়।

রাষ্ট্র-সমবায়ের নিজস্ব নাগরিক নেই

রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলি যেহেতু রাষ্ট্র, তাদের রাষ্ট্রসমবায় হতে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্র হিসেবে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব দাবী করতে পারে না। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য অঙ্গরাজ্যগুলির বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সংবিধান স্বীকার করে নিয়েছে। তবে বাস্তবে এই নীতি কতটা কার্যকরী হতে পারে, আমাদের জানা নেই।

রাষ্ট্রসমবায়ে সদস্য-রাষ্ট্রগুলি সমবায় থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে

রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্য রাষ্ট্রগুলি আন্তর্জাতিক ব্যক্তি (International person) হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং তারা সদস্য-রাষ্ট্রের অন্যান্য সদস্যদের লিপ্ত না করে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে অথবা সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য-রাষ্ট্ররা আন্তর্জাতিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয় না।

রাষ্ট্রসমবায়ের সদস্য-রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য হয়

রাষ্ট্রসমবায়ের উদাহরণ হিসেবে ১৮১৫-১৮৬৭ সালের জার্মান রাষ্ট্র-সমবায়ের (The German Band, 1815-1867) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই রাষ্ট্রসমবায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্যায়ের রাষ্ট্রগুলির বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই এই রাষ্ট্রসমবায় সৃষ্টি হয়েছিল।

রাষ্ট্রসমবায়ের উদাহরণ

১৯০৭ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত স্থায়ী, মধ্য আমেরিকার ফেডারেশান (The Central American Federation, 1907-1918) আধুনিক কালের রাষ্ট্র সমবায়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মধ্য আমেরিকার গোয়েতামালা, কোষ্টারিকা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া এবং সলভেডর—এই পাঁচটি রাষ্ট্র মিলে এই রাষ্ট্রসমবায়ের সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হলে, তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য এই রাষ্ট্রগুলি এই সমবায়ে মিলিত হত। ১৯১৮ সালে এই সমবায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাষ্ট্রসমবায় এবং মৈত্রীবন্ধনের মধ্যে পার্থক্য এই যে—(১) মৈত্রীবন্ধনে কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা বা সংগঠন থাকে না, কিন্তু রাষ্ট্রসমবায়ে কনফারেন্স (Conference), ডায়েট (Diet) অথবা কংগ্রেস (Congress) নামে কোন না কোন কেন্দ্রীয় সংস্থা থাকে। এই কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য-রাষ্ট্রদের প্রতিনিধিবর্গ তাদের স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নির্দেশমত এখানে মত প্রকাশ করে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনসভার মত আইন প্রণয়নের অধিকার এই সংস্থার নেই। সময় সময় এই প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হয়ে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির কাছে কার্যকরী করার জন্য প্রেরিত হয়। (২) মৈত্রীবন্ধন এবং রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে স্থায়িত্বের দিক থেকেও পার্থক্য বিদ্যমান। মৈত্রীবন্ধন রাষ্ট্রসমবায় অপেক্ষা স্বল্প স্থায়ী। রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে যেহেতু সহযোগিতা গভীরতর সেহেতু এই সমবায় স্বভাবতই মৈত্রীবন্ধন অপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী।

মৈত্রী-বন্ধন ও সন্ধি-সমবায়ের পার্থক্য

ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা রাষ্ট্রসমবায়ের বন্ধনের সূত্র অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত বন্ধনে আকস্মিক কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে দুটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃত হন। কিন্তু রাষ্ট্রসমবায় সদস্য রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা রক্ষা বা অন্য কোন ব্যাপকতর উদ্দেশ্যে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ হয়।

ব্যক্তিগত-বন্ধন ও রাষ্ট্রসমবায়ের পার্থক্য

প্রকৃতবন্ধনে বন্ধনের সূত্র ব্যক্তিগত বন্ধন অপেক্ষা গভীরতর। এখানে দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে একজন মাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকাই কেবলমাত্র

বৈশিষ্ট্য নয়—কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটি সাধারণ প্রতিষ্ঠান তারা তৈরি করে। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হলেও একটি সাধারণ সাংবিধানিক আইনের সাহায্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা তারা তৈরী করে। রাষ্ট্রসমবায়ের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধনের পার্থক্যই এইখানে। রাষ্ট্রসমবায়ে কোন কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা থাকে না, কিন্তু প্রকৃত বন্ধনে কতকগুলি সাধারণ বিষয় পরিচালনার জন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা থাকে।

প্রকৃত বন্ধন ও রাষ্ট্র-সমবায়ের পার্থক্য

উদ্দেশ্যের দিক থেকেও রাষ্ট্রসমবায় সাধারণতঃ সদস্য-রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে গঠিত হয় কিন্তু প্রকৃত বন্ধনে বন্ধনের সূত্রে কেবলমাত্র রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নয়—এককেন্দ্রীয় সংগঠনের দ্বারা নিরাপত্তা ও কতকগুলি সাধারণ বিষয় পরিচালনার জন্য এই বন্ধনের সৃষ্টি হয়।

৭। যুক্তরাষ্ট্র (Federal Form of Government):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে হলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান উদ্ভাবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে এই জাতীয় শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়েছিল তার আলোচনা করা দরকার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান চালু হয় ১৭৮৯ সালের ৩০শে এপ্রিল থেকে। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান অঙ্গরাজ্যগুলি এক রাষ্ট্রসমবায়রূপে (Confederation) পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। এই রাষ্ট্রসমবায়ের প্রত্যেক সদস্য ছিল সার্বভৌম ক্ষমতা-সম্পন্ন রাষ্ট্র। কিন্তু কালক্রমে তারা বুঝতে পারল যে ইংলণ্ডের মত শক্তিশালী রাষ্ট্র তাদের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন থাকলে সার্বভৌম রাষ্ট হিসেবে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হবে না। তাই এক রাষ্ট্রসমবায়ের তেরোটি রাষ্ট্র ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া নগরীতে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অবশ্য এক সাধারণ শক্তিশালী শত্রুর ভয় এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে এই রাষ্ট্রসমবায়কে একতাবদ্ধ করেছিল। সকল ক্ষেত্রেই যে একটিমাত্র প্রেরণাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার কারণ হবে এমন কোন নেই। এক ভাষা এবং সংস্কৃতি, একই অর্থনৈতিক সমস্যা, বহুদিন বিদেশী শক্তির অধীনে শাসিত হয়ে আভ্যন্তরীণ সংহতির প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনেরও কারণ হতে পারে। একই শাসনব্যবস্থার অধীনে দীর্ঘকাল বাস করে ভারত জাতীয়

সংহতির প্রয়োজনীয়তায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত ঐক্য অস্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উদ্ভবের হেতুস্বরূপ হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এই পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাদের অস্তিত্ব এবং অধিকার একবারে অবলুপ্ত না করে এক নূতন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে একতাবদ্ধ হয়ে একটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে, তখনই উৎপত্তি হয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বললে আমরা এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বুঝব (১) যেখানে অঙ্গরাজ্যগুলি রাষ্ট্র হিসেবে তাদের সার্বভৌমত্ব লোপ করলেও (২) পৃথক শাসনব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন (Local Autonomy) বজায় রখতে চায় এবং (৩) এক নূতন কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে সকলে সংযুক্ত হয়ে একটি নূতন রাষ্ট্র গঠন করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা

অধ্যাপক ডাইসি (*Diecy*) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, "এটি এমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক কৌশল যার উদ্দেশ্য জাতীয় ঐক্য এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার সামঞ্জস্য বিধান করা" (It is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights)। হ্যামিলটন (*Hamilton*) তাঁর *'Federalisty'* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "এটি কতকগুলি রাষ্ট্রের সমবায় যারা একটি নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করে" ("an association of states that forms a new one")। মঁতেস্কু (*Montesquieu*) তাঁর *'Spirit of the Laws'* নামক গ্রন্থে বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এমনই একটি চুক্তি যার দ্বারা কতকগুলি একই প্রকার রাষ্ট্র অপর একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের সদস্য হতে সম্মত হয়।"[1]

যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে কি রাষ্ট্র বলা চলে?

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার এই উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাগুলির সাথে পরিচিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এই সংজ্ঞাগুলির প্রত্যেকটিতে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যগুলিকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও এদের 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পূর্বকার জার্মান প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রেও তাদের 'রাষ্ট্র' বলা হত।

1 "A convention by which several similar states agree to become members of a larger one"—*Montesquieu*

কিন্তু আসলে তারা রাষ্ট্র নয়। তাদের জনসংখ্যা, ভূখণ্ড, সরকার ইত্যাদি থাকলেও সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সার্বভৌমত্ব লোপ পায়। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাষ্ট্রগুলিকে 'রাষ্ট্র' বলে গণ্য করতে পারি না। সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পৃথক শাসন ব্যবস্থা সমন্বিত অঞ্চলগুলিকে ক্যাণ্টন (*Canton*) আখ্যা দেওয়া হয়। ক্যানাডায় তাদের 'প্রদেশ' (Province) বলা হয়েছে। সেদিক থেকে সদস্য আঞ্চলিক সরকারগুলিকে রাষ্ট্র বলে অভিহিত না করলেই বোধ হয় ভাল হত। ভারতের সংবিধান রচনার সময় অঙ্গরাজ্যগুলির নামকরণ নিয়ে তীব্র বিতর্কের সূত্রপাত হয় এবং শেষ পর্যন্ত শ্রীনেহেরুর ইচ্ছা অনুসারে এদের রাষ্ট্র বলেই অভিহিত করা হয়। ভারতের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'প্রদেশ' বলে আখ্যা দেওয়ার স্বপেক্ষ অনেকে মত প্রকাশ করেছিলেন। অবশ্য প্রদেশ নামকরণ না করার পিছনে একটি যুক্তি আছে। 'প্রদেশ' শব্দটির সঙ্গে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতবর্ষ কতকগুলি 'প্রদেশে' বিভক্ত ছিল। কাজেই অপ্রীতিকর স্মৃতি বিজড়িত এই শব্দটিকে সংবিধানের পৃষ্ঠায় স্থান না দিয়ে সংবিধান প্রণেতারা বোধ হয় ভালই করেছেন। ক্যানাডাতে অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'প্রদেশ' নাম দেওয়ার কোন বিশেষ আপত্তি না থাকারই কথা। কারণ তারা ব্রিটিশ জাতির জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং কমনওয়েলথের সদস্য হিসেবে তাদের সর্বোচ্চ পদাধিকারী গভর্ণর জেনারেল ব্রিটেনের রাণীর প্রতিনিধি। এই দিক থেকে বিচার করলে প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধানে 'প্রদেশ' শব্দটির বর্জন যুক্তি-যুক্ত বলেই মনে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করার কারণ এই যে তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একতাবদ্ধ হবার আগে প্রত্যেকেই রাষ্ট্র ছিল। তাই নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান রচনার কালে সৌজন্যের খাতিরে তাদের 'রাষ্ট্র' নামকরণই রয়ে গেছে। ভারতের ক্ষেত্রেও অঙ্গরাজ্যগুলিকে আঞ্চলিক মর্যাদা ও স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই বোধ হয় 'রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৮। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Essential conditions or elements of a federal Form of Government):

আমরা পূর্বে দেখেছি যে, অধ্যাপক ডাইসি (*Diecy*) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, "এটি এমন একটি রাষ্ট্রনৈতিক কৌশল

যার উদ্দেশ্যে জাতীয় ঐক্য এবং অঙ্গরাষ্ট্রগুলির অধিকারের সমন্বয় সাধন করা" ("It is a political contrivance intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights)। এই সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় দুটি বিপরীতমুখী প্রেরণার সমন্বয় সাধন হয় এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে। প্রথমতঃ, জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা থাকতে হবে—অর্থাৎ এই শাসন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলির একটি সাধারণ সংগঠনের অধীনে একত্রীভূত হবার বাসনা থাকা চাই। কোন্ কোন্ ঘটনার প্রভাবে এই একত্রীভূত হবার বাসনা জাগ্রত হয় তা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, এক সাধারণ শত্রুর ভয়, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার আশা, ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় ঐক্যের প্রেরণা জাগ্রত হয়। ঐক্যের প্রেরণায় বিভিন্ন সম্প্রদায় একত্রীভূত হয় বলে তাদের পৃথক অস্তিত্ব একবারে লোপ পায় না। যে যে অঙ্গরাষ্ট্র একত্রীভূত হয় তারা তাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামো একবারে অবলুপ্ত করে না। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি নিজ নিজ আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে তাদের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে দুটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সমন্বয় দেখা যায়—একটি হচ্ছে কেন্দ্রাভিগামী শক্তি (Centripetal force) যার ফলে একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি হয় এবং আর একটি কেন্দ্রাতীগ (Centrifugal force) যার ফলে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের চেষ্টা করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমরা দুই প্রকার সরকার দেখতে পাই—একটি সাধারণ কেন্দ্রীক সরকার এবং আর একটি হচ্ছে কতকগুলি আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকার।

দুটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সমন্বয় করতে দু-শ্রেণীর সরকার

এই শাসন ব্যবস্থায় যেহেতু দুই শ্রেণীর সরকার থাকে, স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে কোন্ কোন্ ক্ষমতাগুলি কেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পরিচালনা করবে এবং কোনগুলিই বা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষমতা বণ্টনের জন্য প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি সংবিধান থাকে। সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য যে ক্ষমতাগুলি নির্ণয় করে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার কেবল সেই ক্ষমতাগুলিই পরিচালনা করে এবং যে ক্ষমতাগুলি আঞ্চলিক সরকারের

সংবিধানের প্রাধান্য

জন্য নির্দিষ্ট হয়, আঞ্চলিক সরকার সেই ক্ষমতাগুলি পরিচালনা করে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা বণ্টন করে থাকে এবং উভয় সরকার সংবিধানের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে, সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে না নিলে কোন যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ভালভাবে চলতে পারে না। অধ্যাপক হোয়্যার (*Wheare*) বলেছেন, "আমার মনে হয়, যথাযথভাবে বলতে গেলে একটি সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র হতে হলে তার সংবিধানকে সর্বোচ্চ হতে হবে—সে সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হোক অথবা আংশিকভাবে লিখিত বা আংশিকভাবে অলিখিত হোক।"[1]

সংবিধান লিখিত হতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রে শুধুমাত্র সংবিধানের শ্রেষ্ঠত্বকে মেনে নিলেই হয় না। এই সংবিধানকে লিখিত হতে হবে। কারণ ক্ষমতা বণ্টনের প্রশ্নকে অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা চলে না। অধ্যাপক ডাইসির (*Dicey*), ভাষায় 'একটি জটিল চুক্তিকে' ('*Complicated Contract*') ভিত্তি করে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান দাঁড়িয়ে থাকে। এই চুক্তির মধ্যে কোন প্রথাগত নিয়মকানুনের অবকাশ নেই। এক বা একাধিক দলিলের মধ্যে সুস্পষ্ট এবং লিখিত অবস্থায় বিভিন্ন ক্ষমতাগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে যাতে কোন্ সরকার কি কি ক্ষমতা পরিচালনা করবে সে সম্বন্ধে কোন অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তা না থাকে।

সংবিধান অনমনীয় হতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে অনমনীয়ও হতে হবে। সংবিধানে নির্দিষ্ট ক্ষমতার বণ্টন যদি কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা অনুসারে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়, তাহলে শাসনকার্য পরিচালনায় অনেক জটিলতা এবং অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সুতরাং লিখিত সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থাকতে হবে

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চতম বিচারালয় থাকতে হবে যার সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারকেই মেনে নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে যেহেতু দু শ্রেণীর সরকার থাকে, সেহেতু এই দু শ্রেণীর সরকারের মধ্যে ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে

---

1. "I think it is more accurate to say that if a government is to be federal, its constitution, whether it be written or unwritten, or partly written and partly unwritten, must be supreme"

—*Wheare* Federal Government

মতানৈক্য উপস্থিত হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান অবশ্য ক্ষমতা বণ্টন করে দেয়—কিন্তু এই সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এমত অবস্থায় এই শাসনব্যবস্থায় এমন একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থাকতে হবে যা সংবিধানকে যথোপযুক্তভাবে ব্যাখ্যা করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় অথবা আঞ্চলিক সরকার সংবিধান বহির্ভূত কাজ করলে তাকে অবৈধ ঘোষণা করবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের নির্দেশ উভয় সরকার মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

পূর্বোক্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছাড়া, আরও দুটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলি হচ্ছে: (১) দুই-কক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা এবং (২) দ্বিনাগরিকত্ব।

দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার উর্ধতন কক্ষের গুরুত্ব

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থরক্ষার জন্য দুটি কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একান্ত প্রয়োজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যাণ্ডের আইনসভার উচ্চতন কক্ষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে জনসংখ্যা নিরপেক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যই এই নীতি অনুসৃত হয়। অবশ্য ভারতের সংবিধানে এই নীতির ব্যতিক্রম হয়েছে।

কোন কোন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকত্ব প্রচলিত থাকলেও দ্বিনাগরিকত্বকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে না। ভারতের সংবিধানে

দ্বি নাগরিকতা

দ্বিনাগরিকত্ব স্বীকৃত হয়নি। ভারতের নাগরিক-সম্প্রদায় কেবলমাত্র ভারতেরই নাগরিক। অঙ্গরাজ্য-গুলির কোন নাগরিকত্ব নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যাণ্ডে দ্বিনাগরিকত্ব প্রচলিত আছে। সুইজারল্যাণ্ডে কোন নাগরিক কোন এক ক্যাণ্টনের নাগরিক ও সুইস্ রাষ্ট্রের নাগরিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিশেষ এক অঙ্গরাজ্যের নাগরিক। সকল যুক্তরাষ্ট্রেই অবশ্য দ্বিনাগরিকত্বের নীতি স্বকৃত হয়নি।

৯। যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি (Methods of distribution of powers in a Federal Government):

যুক্তরাষ্ট্রে সন্তোষজনক ক্ষমতা বণ্টন নীতির উপর এই শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে নির্ভর করে। জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সাধারণ বিষয়গুলি, যথা—বৈদেশিক সম্পর্ক ও বাণিজ্য মুদ্রা, প্রতিরক্ষা, ডাক ও তার বিভাগ প্রভৃতি বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। আর স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে

সম্পর্কযুক্ত আঞ্চলিক শায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান, কৃষি ও শিল্পজ সম্পদ, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং অন্যান্য স্থানীয় বিষয়গুলি আঞ্চলিক সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা বণ্টনে দুটি পদ্ধতি সাধারণতঃ অনুসরণ করা হয়। একটি পদ্ধতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং বাকী সমস্ত ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। অপরটি অনুসারে আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতাগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এবং বাকী সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। প্রথম পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি অনুসৃত হয়েছে ক্যানাডায়। অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতিটি অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রে একটি পৃথক নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে তিনটি তালিকা আছে, যথা—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), প্রাদেশিক তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়নের অধিকারী। রাজ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্য সরকার আইন প্রণয়নের অধিকারী। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য—এই উভয় আইন-সভাই আইন প্রণয়ন করতে পারে। ইহা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, যে-সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, সেটিই অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয় এবং যে-সরকারকে নির্দিষ্ট ক্ষমতা বাদে বাকী ক্ষমতাগুলি দেওয়া হয় সে-সরকার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট, সেজন্য এই সরকার অঙ্গ-রাজ্যগুলির চাইতে কম শক্তির অধিকারী, এখানে অঙ্গরাজ্যগুলিই অধিকতর শক্তিশালী। অপরপক্ষে ক্যানাডায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলির অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আজকাল অবশ্য সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

এক্ষণে বর্তমান পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলির ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি আলোচনা করা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Federalism in U S A): পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি নির্দিষ্ট

করে দেওয়া হয়েছে এবং এই নির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতিরেকে বাকী সমস্ত ক্ষমতা পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে অঙ্গরাজ্যগুলিকে। সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে—"সংবিধানের দ্বারা যে ক্ষমতাগুলি যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া হয়নি অথবা যে ক্ষমতা-প্রয়োগ বিষয় অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কোন নিষেধ আরোপ করা হয়নি, সেগুলি অঙ্গরাজ্যগুলি অথবা জনসাধারণের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।"[1] সাধারণভাবে বলা যায়—কর ধার্য, বৈদেশিক সম্পর্ক, পদাতিক, নৌ ও বিমান বাহিনী, আন্তর্জাতিক এবং আন্তর্রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য, ডাক বিভাগ, পেটেণ্ট ও কপি রাইট এবং নূতন অঙ্গরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিকরণ প্রভৃতি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ভার দেওয়া হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা কংগ্রেসকে। এই সম্বন্ধে পরবর্তী অংশে আমরা আরও বিস্তৃত আলোচনা করব।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি অনুসরণ করলে দেখা যায় এখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্বল করা হয়েছে। এর কারণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়াতে বর্তমান সংবিধান গৃহীত হওয়ার আগে এক রাষ্ট্র সমবায়ে যুক্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলি স্বকীয় রাষ্ট্র ছিল, সুতরাং তথায় ঐ সময়ে এক নূতন যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গ্রহণ করলেও তারা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ আগ্রহশীল ছিল। অতএব স্থানীয় ব্যাপারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলি যতটা সম্ভব তাদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে।

বর্তমানে অবশ্য কয়েকটি অনিবার্য কারণবশতঃ, যথা—যুদ্ধ পরিচালনা, নূতন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টও সংবিধানের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধিকে সাহায্য করে আসছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Federalism in India) : ভারতের সংবিধানে তিনটি তালিকা আছে ; যথা—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। স্পষ্টতঃই কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় আইনসভার, রাজ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে রাজ্য আইনসভার এবং যুক্ত তালিকার

---

1 "The powders not delegated to the limited States by the constitution, nor prohibited by it to the States, are reserved to the States respectively, or to the people."—*Article*

অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির উপরও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য উভয় আইনসভার। এই তিনটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির বাইরে কোন বিষয়ের উপর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা সেই আইন প্রণয়ন করতে পারবে। তাছাড়া, যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভার প্রণীত কোন আইনের মধ্যে অসংগতি থাকলে কেন্দ্রীয় আইনসভার আইনটি বলবৎ হবে। এ ছাড়া, জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে, রাজ্যসভা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হলে কেন্দ্রীয় আইনসভা রাজ্য-তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপরেও আইন প্রণয়ন করতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারকেই অতিমাত্রায় ক্ষমতাশালী করা হয়েছে। এজন্য অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কাঠামোটি বজায় রাখা হয়েছে মাত্র, কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে এটি এককেন্দ্রিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভারতের সংবিধান স্পষ্টভাবে এককেন্দ্রিকতা প্রবণতাসম্পন্ন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Federalism in Switzerland): সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে সুইজারল্যাণ্ডকে রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) নামে অভিহিত করা হলেও আসলে এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান। এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী সমস্ত ক্ষমতা ক্যাণ্টনগুলির জন্য সংরক্ষিত আছে। সুইজারল্যাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবশ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে বেশী ক্ষমতাশালী করা হয়েছে। ক্যাণ্টন সরকারগুলির সংবিধান, ভৌগোলিক সীমারেখা এবং তাদের নাগরিকদের স্বাধীনতা সংক্রান্ত .নিরাপত্তা রক্ষার ভার দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। প্রত্যেক ক্যাণ্টনের পৃথক সংবিধান আছে কিন্তু সেই সংবিধনেকে গণতন্ত্রসম্মত এবং প্রজাতান্ত্রিক হতে হবে। তাছাডা, এই সংবিধানগুলির মধ্যে এমন কিছু থাকতে পারবে না যা কেন্দ্রীয় সংবিধান বিরোধী। ক্যাণ্টনগুলির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিচারের জন্য তা উপস্থিত করতে হবে। ক্যাণ্টনের মধ্যে কোন আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সেখানে শৃঙ্খলা আনয়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। সুইজারল্যাণ্ডের উচ্চ বিচারালয়ের মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের বিচারালয়ের মত কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রণীত আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বা অবৈধ বলে ঘোষণা করার অধিকার নেই। এদিক থেকে বিচার করলেও সুইজারল্যাণ্ডের ক্যাণ্টনগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মত স্বাতন্ত্র্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত।

সুইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কেন্দ্রীয় সরকারের আইনগুলিকে চালু করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ক্যাণ্ট সরকারগুলির প্রশাসনী যন্ত্রকে ব্যবহার করা হয়।

ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য (Canadian and Australian Federalism): অস্ট্রেলিয়ার যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের (Commonwealth Government) ক্ষমতাগুলির মত নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়েছে। অস্ট্রেলিয়া একটি বিরাট ভৌগোলিক সীমারেখা সমন্বিত রাষ্ট্র এবং (১৯০০ সালে) সংবিধান প্রণয়নের সময় যান বাহনের ব্যবস্থা খুব বেশী উন্নত হয়নি। ফলে অঙ্গরাজ্যগুলির পক্ষে তাদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার আগ্রহ বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে যে ছয়টি উপনিবেশ এক যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হয়েছিল তাদের সামনে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলির আক্রমণের ভয় না থাকলে তারা হয়তো যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পথ গ্রহণ করত না। এমত অবস্থায় স্বভাবতই তারা যে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেছিল, তাকে কম-সংখ্যক ক্ষমতা দিয়ে নিজেদের আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যই বেশী করে বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল। অপরপক্ষে, ক্যানাডায় ফরাসী ও ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অবিরাম কলহ থেকে উদ্ভূত অন্তর্দ্বন্দ্বই ছিল বড় সমস্যা। দুর্বল কেন্দ্রীয় সরকারের ভয়াবহ পরিণতি তারা লক্ষ্য করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের মধ্যে। সুতরাং তারা যে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার গঠন করেছিল সেটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের মত দুর্বল নয়। প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাগুলি যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করে তারা বাকী ক্ষমতাগুলি (*Residuary Powers*) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার হয়েছে সবল এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি হয়েছে অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রকারভেদ (Other Variations in Federal Government): ক্ষমতা বণ্টনের দিক থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার যুক্ত-রাষ্ট্রের পার্থক্যগুলি উল্লেখ করেছি। এই পদ্ধতি ছাড়া সংবিধানের

সংশোধন পদ্ধতি এবং তার ব্যাখ্যা প্রণালীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হতে দেখা যায়। ভারতের সংবিধান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি অনুসৃত হয়েছে। ক্ষমতা বণ্টনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির বিশেষ সংখ্যাধিক্যের সম্মতি নেওয়ার বিধান আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধানের ধারা সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পরিবর্তিত হতে পারে, আবার বিশেষ সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি ও ভোটের দ্বারা সাধারণ সংখ্যাধিক্যেও কোন কোন ধারার পরিবর্তিত হওয়ার বিধান আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতি প্রয়োজন কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে সংবিধান সংশোধনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থা আছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন আইনসভার প্রণীত কোন আইন সেখানকার যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয় সংবিধান বহির্ভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের বিচারালয়ের অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার নেই। সেখানে আইন বিচার করার মালিক যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা।

১০। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও অসুবিধা (Merits and Weakness of a Federal Form of government):

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ (Merits of a Federal Form of Government): যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বলতে দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকারের কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সহ-অবস্থিতিকে বোঝায়। এই দুই শ্রেণীর সরকারের সহ-অবস্থিতির ফলে কেন্দ্রাভিমুখী (Contripetal) এবং কেন্দ্রবিমুখী (Centrifugal)—এই দুই শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। অধ্যাপক গার্ণারের ভাষায় বলা যায়—"এই ব্যবস্থা ভিন্নমুখী প্রবৃত্তি-সম্পন্ন কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিমুখী এবং কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার উপায় নির্দেশ করে।"[1] কতকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যেখানে একটি

দুই বিপরীতমুখী শক্তির সমন্বয়

নূতন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ, সেখানে তারা কতকগুলি সাধারণ সুবিধা ভোগ করে। এগুলি হচ্ছে, শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধা, আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত থাকার সুবিধা এবং জাতীয় ঐক্য থেকে উদ্ভূত এক নূতন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অধিকারী হওয়ার সুবিধা।

1 "It furnishes the means of maintaining an equilibrium between the centrifugal and centripetal forces in a State of widely different tendencies" —Garner

অপরপক্ষে, প্রত্যেক অঞ্চলের কতকগুলি নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বজায় রাখার চেষ্টা করা হয় আঞ্চলিক সরকারের মাধ্যমে। প্রত্যেক অঞ্চলের যে পৃথক অর্থনৈতিক সমস্যা থাকে সেগুলির যথোপযুক্ত সমাধান আঞ্চলিক সরকারের সাহায্যেই সম্ভব। তাই যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আমরা এমনই একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করতে পাই যেটিকে সমন্বয়ধর্মী বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সমন্বয় জাতীয় ঐক্য ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যেরই সমন্বয়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের আর একটি বড় সুবিধা এই যে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য একটি পৃথক সরকার থাকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর কাজের বেশী চাপ পড়ে না। বর্তমান জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কাজের পরিধি দিন দিন বেড়ে চলেছে। এমত অবস্থায় একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে নিপুণতা সহকারে তাব প্রশাসনিক কর্তব্য পালন করা সম্ভব হয় না। দেশ বড় হলে এই সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি পায়। তাই এক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার থাকলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাজের চাপ অনেক পরিমাণে কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

কাজেব চাপ কমে যায়

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কতকগুলি আঞ্চলিক সরকারের অস্তিত্ব থাকার জন্য অধিক সংখ্যক লোক শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। এর ফলে তাদের দেশের সমস্যাগুলিকে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ জন্মায়। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তারা অবহিত হয় এবং সর্বোপরি দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হয়।

রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি হয়

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অসুবিধা (Weakness of a Federal Form of Government): অধ্যাপক লীককের (Leacock) মতে রাজনৈতিক এবং বাহ্যিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা বলে প্রমাণিত হয়েছে কিন্তু অর্থনৈতিক এবং আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিচার করলে এই শাসনব্যবস্থা দুর্বল। অধ্যাপক গার্ণারের মতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে এমন কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যেগুলি থেকে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ মুক্ত। সাংবিধানিক নিয়ম অনুসারে সমস্ত বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত না থাকায়, এই সরকার অনেক সময় তার আন্তর্জাতিক চুক্তির শর্তগুলি পালন করতে সক্ষম হয় না।

লীককের মত—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী কিন্তু আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দুর্বল

দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকার থাকার ফলে শাসনব্যবস্থায় জটিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জটিলতা থেকে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক উভয় সরকারকেই নানা প্রকার প্রশাসনিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাছাড়া, শাসনব্যবস্থা দুভাগে বিভক্ত হওয়ার ফলে দায়িত্বও বিভক্ত হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার ভুল-ত্রুটির জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে পরস্পরের উপর দোষারোপ করতে দেখা যায়। তাছাড়া, দায়িত্ব বিভক্ত হলে সরকার দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক।

শাসনকার্যের জটিলতা ও দায়িত্ব বিভক্ত হওয়ায় দুর্বলতা

এই শাসনব্যবস্থার আর একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে শাসনকার্যের ব্যয়ভার সংক্রান্ত সমস্যা। দুটি পৃথক শ্রেণীর সরকার পরিচালনা ব্যয়সাপেক্ষ। এই ব্যায়ভার বহন করার জন্য জনসাধারণের উপর করভারও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দুটি সরকার পরিচালনার ব্যয়ভারের কথা চিন্তা করেই দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

ব্যয়াধিক্য

১১। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Some Pre-Requisites of Federal Government):

অধ্যাপক হোয়্যার (*Wheare*) তাঁর *Federal Government* নামক গ্রন্থে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় শর্তগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ইচ্ছা ও যোগ্যতা দুই-ই থাকতে হবে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির এককেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার বাসনা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় শর্ত। এই ইচ্ছার অভাবের জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েথের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি এই একই কারণে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে একতাবদ্ধ হতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার ইচ্ছা বলতে এককেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার ইচ্ছাকেই শুধু বুঝলে চলবে না, কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণমুক্ত আঞ্চলিক সরকার প্রতিষ্ঠার ইচ্ছাও তাদের থাকতে হবে। অর্থাৎ কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এক সাধারণ সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার

অধ্যাপক হোয়্যার উল্লিখিত যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনার দুটি প্রধান শর্ত—
(১) ইচ্ছা ও
(২) যোগ্যতা

ইচ্ছা এবং অন্য কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়ন্ত্রণমুক্ত কতকগুলি আঞ্চলিক সরকার গঠনের ইচ্ছাও তাদের থাকতে হবে। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, তাদের একতাবদ্ধ হবার ইচ্ছা থাকবে কিন্তু এককেন্দ্রিক হবার ইচ্ছা নয়। অধ্যাপক হোয়্যারের (Wheare) ভাষায়—"...they must disire to be united, but not to be unitary."

এককেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার উপাদান

এক সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার ইচ্ছা এবং পৃথক পৃথক আঞ্চলিক সরকার গঠন করে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখা কতকগুলি বাহ্যিক পরিবেশ ও ঘটনার উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটি সাধারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার ইচ্ছা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভর করে।

(ক) যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে নিরাপত্তার অভাব এবং তজ্জনিত সাধারণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এই উপাদান বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

(খ) বিদেশী শক্তির অধীনতা পাশ হতে মুক্ত হবার বাসনা এবং একতাবদ্ধ হলেই স্বাধীনতা বজায় রাখা সম্ভব বলে ধারণা। ভারতের ক্ষেত্রে এক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে সংঘবদ্ধ হবার প্রধান প্রেরণা এই উপাদানটি।

(গ) অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা লাভ করার আশা।

(ঘ) একই প্রকার রাজনৈতিক উত্থান-পতন এবং সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা। ভারত, অস্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একতাবদ্ধ হওয়ায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

(ঙ) ভৌগোলিক সান্নিধ্য। অধিক দূরত্বের ব্যবধান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টির পথে প্রধান অন্তরায়। জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে কিছু পরিমাণ ভৌগোলিক নৈকট্য একান্ত প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সংগঠন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন কোন দিনই ওঠেনি। বিরাট ভৌগোলিক ব্যবধান তার অন্যতম কারণ।

(চ) ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য। আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উপাদান। এই ঐক্যবোধ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষেও একান্ত প্রয়োজন। অধ্যাপক গিলক্রাইস্টের

(*Gilchrist*) মতে, "যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং এই নূতন রাষ্ট্রকে যদি সাফল্যমণ্ডিত হতে হয়, এর পিছনে জনসাধারণের ঐক্যবোধের শক্তিকে অবশ্যই কার্যকরী হতে হবে।"[1] অধ্যাপক হোয়্যারের (*Wheare*) মতে "ভাষা, জাতি ও ধর্মগত ঐক্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টির অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে পারে না। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পূর্বে রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, এই জাতীয় বৈষম্যগুলি সত্ত্বেও এরা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সংগঠন করতে সক্ষম হয়েছিল। সুতরাং এই উপাদানগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পূর্ব শর্ত বলে বর্ণনা করা উচিত নয়।"[2]

আমরা এককেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে অঙ্গরাজ্যগুলির ঐক্যবদ্ধ হবার হেতু বিশ্লেষণ করলাম। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হলে শুধুমাত্র এই উপাদানগুলি থাকলেই চলে না। এই শাসনব্যবস্থার জন্য এমন আর কতকগুলি উপাদান থাকা প্রয়োজন, যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলিকে তাদের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করারও প্রেরণা দেবে। অন্যথায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা। যে উপাদানগুলি আঞ্চলিক বা স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করতে প্রেরণা যোগায় সেগুলি এইরূপ :

আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উপাদান

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সংগঠনকারী বিভিন্ন অঞ্চলগুলির এই শাসন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে পৃথক উপনিবেশ অথবা রাষ্ট্র হিসেবে অবস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

(খ) অর্থনৈতিক স্বার্থের বৈষম্যও তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে বাধ্য করে। অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে তারা যেমন এককেন্দ্রীয় সরকার গঠন করে, এই স্বার্থের বশেই তারা আবার তাদের পৃথক আঞ্চলিক সংগঠনের মধ্যে তাদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতেও আগ্রহশীল হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার ভৌগোলিক বিরাটত্ব। এই বিরাট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে পৃথক পৃথক অঞ্চলের পৃথক অর্থনৈতিক

1 Federalism makes a new State, and the new State, if it is to be successful, must have behind it the national force of the people '—*Gilchrist*

1 "Community in these matters (i e , Community of language, of race of religions, of nationality) cannot therefore be described as an essential pre-Requisite of federal government ' —*Wheare*.

সমস্যা থাকাই স্বাভাবিক এবং এই কারণে তারা নিজ নিজ সরকারী সংগঠনের সাহায্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। যেমন, পশ্চিম বাংলায় খনিজ সম্পদ তার বিশেষ সম্পদ। নিজস্ব সরকারের সাহায্যে এই সম্পদ-গুলিকে কাজে লাগিয়ে তার অর্থনৈতিক মানকে উন্নততর করার বাসনা পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক।

(গ) ভৌগোলিক সান্নিধ্য যেমন বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের একই সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ করে তেমনি ভৌগোলিক ব্যবধান বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আঞ্চলিক চেতনা ও স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করে। আমরা বাঙালীরা আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি ইত্যাদির জন্য গর্ববোধ করি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরাও আমাদের মত তাদের নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সজাগ। আমাদের বাঙালীত্ব লোপ করে সমগ্র ভারতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে আমরা কিছুতেই রাজী হব না। মাদ্রাজ, পাঞ্জাব বা মহারাষ্ট্রের লোকেরাও তেমনি তাদের স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে আগ্রহশীল। ভৌগোলিক ব্যবধান এই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ও চেতনা সৃষ্টির অন্যতম কারণ। সুতরাং এই উপাদানটিকেও এক সাধারণ সরকারের অধীনে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক অস্তিত্ব বজায় রাখার অন্যতম কারণ বলে ধরে নিতে হবে।

অধ্যাপক হোয়্যারকে (*Wheare*) অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলেই শুধু হয় না, এই শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত করার যোগ্যতাও বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের থাকা একান্ত প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনার যোগ্যতা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে দুটি বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। পূর্বোক্ত উপাদানগুলি এই শাসনব্যবস্থা সংগঠনের ইচ্ছা যেমন সৃষ্টি করে, একে পরিচালনা করার যোগ্যতাও তেমনি সৃষ্টি করে থাকে। ... অঞ্চলের অধিবাসীরা তাদের নিজস্ব সরকারের মাধ্যমে নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়ে থাকে, কেন্দ্রীয় সরকার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তারা অঞ্চলগত শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে সক্ষম হয়। আঞ্চলিক সরকার পরিচালনার ঐতিহ্য যাদের নেই, এক নূতন কেন্দ্রীয় শক্তির চাপে তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা বেশী। এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হওয়ার মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সার্থকতা।

সরকার পরিচালনার ঐতিহ্যের প্রয়োজনীয়তা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার যোগ্যতা সৃষ্টির জন্য আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে—(১) আঞ্চলিক সংগঠনগুলির আকার এবং (২) তাদের অর্থনৈতিক সামর্থ্য।

অঙ্গরাষ্ট্রগুলির আকারগত সমস্যা

যখন এক বা একাধিক আঞ্চলিক গোষ্ঠী তাদের সংখ্যাধিক্য বা অন্য কোন কারণে বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়ে তখন তারা অন্য অঙ্গরাজ্যগুলির উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে সেটি একটি বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই জন্য বোধহয় পৃথিবীর অনেক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায়—যথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার আইনসভায় দ্বিতীয় কক্ষে প্রত্যেক আঞ্চলিক সরকার থেকে জনসংখ্যা নির্বিশেষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক স্ট্রং (*Strong*) যথার্থই বলেছেন—"এই সমত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, কারণ প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রসংগঠনকারী অঙ্গরাষ্ট্রগুলি যে সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করেছে তাদের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কর্তৃপক্ষের হাতে অথবা তাদের চাইতে অতিমাত্রায় শক্তিশালী কোন সংগঠনের কাছে তাকে ত্যাগ করেনি।"[1] দুঃখের বিষয় ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসৃত হয়নি।

উপসংহারে বলতে হয় যে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্যও থাকা প্রয়োজন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক —এই দুই শ্রেণীর সরকার থাকতে হবে। স্পষ্টতই এই দুই সরকারী ব্যবস্থাকে পরিচালনা করা ব্যয়সাপেক্ষ। যে দেশের অর্থনৈতিক সম্পদ যথেষ্ট নয়, তারা এই শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে সক্ষম হবে না। অর্থনৈতিক সম্পদের স্বল্পতাই ল্যাটিন আমেরিকার প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সৃষ্টির পথে প্রধান অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়।

অর্থনৈতিক সামর্থ্যজনিত সমস্যা

১২। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রবণতা (Modern tendencies of Federalism):

পৃথিবীর সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার নীতিই হচ্ছে, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার

1 "This equality is an essential feature of it, since in a true federation the sovereignty which the federating units have abandoned should not be surrendered into the hands of a body outside their control or one in which the strength of anyone of them is overwhelming."—*Strong*.

সংবিধান নির্দিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে তাদের নিজ নিজ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখবে। কিন্তু কতকগুলি অনিবার্য কারণবশতঃ আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতা কমে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। অধ্যাপক হোয়্যার (*Wheare*) এই প্রবণতার চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন। এগুলি হচ্ছে: (১) যুদ্ধ (war), (২) অর্থনৈতিক সংকট (economic depression) (৩) উন্নয়নমূলক কার্য (Social services) এবং (৪) পরিবহন ও শিল্পের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক বিপ্লব (mechanical revolution in transport and industry)।

কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতার কারণ

প্রত্যেক যুক্তরাষ্ট্রে বৈদেশিক সম্পর্ক এবং যুদ্ধ পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। যুদ্ধ আজ জাতীয় জীবনের প্রতিটি দিককে প্রভাবিত করে। যুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এই সমস্যাকে সমাধান করতে হলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন। যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্যা এই সমস্যাগুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাছাড়া, যুদ্ধের সময় দেশের অসামরিক জনসাধারণও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় রসদসৃষ্টির কাজে লিপ্ত থাকে। তাই যুদ্ধ আজ কেবলমাত্র সেনাবাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। অসামরিক জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপও যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যার সঙ্গে জড়িত। তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে যুদ্ধ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানকল্পে জাতীয় জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিস্তৃত করতে হয়।

যুদ্ধ

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রবাহ সমান থাকে না। অর্থনৈতিক সংকটের সময় ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমাগত মন্দার দিকে যেতে শুরু করে, তীব্র বেকার সমস্যা দেখা দেয় এবং মানুষের সাধারণ ক্রয় ক্ষমতাও কমতে শুরু করে। এমতাবস্থায় স্বভাবতই অঙ্গরাষ্ট্রগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

অর্থনৈতিক সংকট

বর্তমানে কোন রাষ্ট্রই নিরঙ্কুশ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী নয়। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার জন্য সরকারের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা আজ সকল দেশেই স্বীকৃত। বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান, শিক্ষা-ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বৃদ্ধ ও রোগীদের ভাতার ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাপ্রকার জনকল্যাণমূলক

উন্নয়নমূলক কার্য

পরিকল্পনা নিয়ে সরকারকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। কোন কোন রাষ্ট্রে সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাহায্যে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করায় প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য। দেশের সামগ্রীক স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক জীবনের সমতা রক্ষার জন্যও এই নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন।

আমরা আগেই দেখেছি যে, যুক্তরাষ্ট্রে ভৌগোলিক সান্নিধ্য যেমন জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি করে, ভৌগোলিক ব্যবধানও তেমনি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে আঞ্চলিক সরকারগুলির মাধ্যমে সংরক্ষিত করা হয়। কিন্তু আধুনিক কালে যান্ত্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হওয়ায় ভৌগোলিক ব্যবধান জনিত সমস্যা আজ তীব্র হতে পারে না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করে তার সমাধানের জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা আজ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের পক্ষে তাই কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রমবর্ধমান কার্যাবলীকে দেশের বিভিন্ন অংশে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে।

পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি

কি কি কারণে যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেড়ে চলেছে তার উল্লেখ করা হল। সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষমতাগুলির পরিষ্কার উল্লেখ না থাকলেও পূর্বোক্ত আধুনিক পরিণতিগুলিই এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণ। আপাতঃ দৃষ্টিতে এগুলিকে সংবিধানে লিখিত নির্দেশের অভাবে সংবিধান-বহির্ভূত বলে মনে হতে পারে কিন্তু এই শাসনব্যবস্থায় অনেক সময় এই শক্তিবৃদ্ধি এক স্বাভাবিক ও ক্ষেত্র বিশেষে অত্যাবশ্যকীয় মনে করে প্রধান বিচারালয় এই পরিণতিকে মেনে নেয় এবং কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক নূতন নূতন বিষয়ে আইনপ্রণয়নের অধিকারকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে না। উচ্চ বিচারালয়ের এইভাবে সংবিধান ব্যাখ্যার নীতিকে 'অনুমিত ক্ষমতার নীতি' (Doctrine of Implied Powers) বলা হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ তাদের নীতিতে আস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিচারপতি পদে নিয়োগ করে থাকেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এইভাবে বিচারপতিদের নিয়োগ করে তাঁর অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্তর্গত প্রিয় আইনগুলিকে বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ ঘোষণার সম্ভাবনা থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর নিউ ডীল (*New Deal*) পরিকল্পনার

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও উচ্চ বিচারালয়ের ভূমিকা

মাধ্যমে জাতির অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছিলেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধি শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য নয়, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেই আজ এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতের সংবিধান প্রণেতারা অবশ্য প্রথম থেকেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সরাসরিভাবে শক্তিশালী করেন। পৃথিবীর সকল যুক্তরাষ্ট্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা এবং ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা প্রসূত অতীত ইতিহাসের কথা স্মরণ করে, তাঁদের অনুসৃত এই নীতির যাথার্থ আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না।

অনেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এই ক্ষমতা বৃদ্ধির কথা স্মরণ করে এই শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এইভাবে বেড়ে চললে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তির রথচক্রে কোন জাতির আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিষ্পেষিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তথা গণতন্ত্রের যথার্থ উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়—এই ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে জাতির অর্থনৈতিক শক্তি সংহত হলে জাতির সর্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক উন্নতির কাজে তাকে লাগানো যেতে পারে। এই প্রয়োজনীয়তার দরুনই আজকাল সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতেই অঙ্গরাজ্যগুলিকে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। এই নির্ভরশীলতার ফলে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণশক্তি বেড়ে গেলেও তাদের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের অবলুপ্তির কারণ ঘটে না। তাছাড়া, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আজ পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রে হাত মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে একতাবদ্ধ হওয়ার কথা কল্পনা করছে। পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে এরূপ একটি যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের প্রস্তাব আমরা ইতিপূর্বেই শুনেছি। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তরাষ্ট্রে একত্রিত হওয়ার এই প্রবৃত্তির মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য হানির আশঙ্কার কোন সংগত কারণ থাকতে পারে না।

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

১৩। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা (Problems of Federal Government):

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার কতকগুলি পৃথক সমস্যা আছে। এই সমস্যাগুলির যথোপযুক্ত সমাধানের উপর এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। এই সমস্যাগুলি হচ্ছে: (ক) কেন্দ্র ও তার অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সন্তোষজনকভাবে

ক্ষমতা বণ্টন, (খ) বৃহত্তর অঙ্গরাজ্যগুলির প্রভাব থেকে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে রক্ষা, (গ) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, (ঘ) সংবিধানের সন্তোষজনক সংশোধন পদ্ধতি এবং (ঙ) অঙ্গরাজ্যগুলির তরফ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা।

(ক) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সন্তোষজনকভাবে ক্ষমতা বণ্টন : কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কিভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হয় ইতিপূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য, মুদ্রাপ্রচলন ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া উচিত এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, উন্নয়নমূলক স্থানীয় কার্যাবলী, স্থানীয় অধিকার, বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি অঙ্গরাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রাধীন হওয়া উচিত। যে সমস্ত অনিবার্য কারণবশতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে আমরা আগেই তা উল্লেখ করেছি। এই অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে বলা যেতে পারে যে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য যতটা বজায় রাখা সম্ভব যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(খ) বৃহত্তর অঙ্গরাজ্যগুলির প্রভাব থেকে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে রক্ষা : বৃহত্তর অঙ্গরাজ্যগুলির প্রভাব থেকে ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে রক্ষার জন্য সাধারণতঃ দুটি উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চতর কক্ষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি অনুসৃত হয়েছে। দুঃখের বিষয় ভারতে এই নীতির ব্যতিক্রম ঘটেছে। দ্বিতীয়তঃ, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র জনসাধারণের সংখ্যাধিক্যের সম্মতি থাকলেই চলবে না, অধিকাংশ রাষ্ট্রেরও সংখ্যাধিক্য থাকতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের সংশোধনের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির তিন-চতুর্থাংশের সম্মতির প্রয়োজন।

(গ) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ : নীতির দিক থেকে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির সংবিধান-নির্দিষ্ট স্ব-স্ব ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকা উচিত। কিন্তু এই ব্যাপারে আমরা পূর্বে দেখেছি কিভাবে কেন্দ্রের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলির

স্বাতন্ত্র্যকে দিন দিন খর্ব করে চলেছে। এই প্রবণতা কিছুটা অপরিহার্য বলে আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে।

অঙ্গরাজ্যগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এইটুকু বলা যেতে পারে, প্রত্যেক অঞ্চলের নিজ নিজ সরকারের কার্যাবলীকে চালু করার সুযোগ থাকা উচিত। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প ও কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অবাধ আদান প্রদানের ব্যবস্থা থাকাও বাঞ্ছনীয়। তবে, যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে কোনপ্রকার রাজনৈতিক সম্পর্ক অথবা সন্ধি চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

(ঘ) **সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি**ঃ এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্যগুলির এককভাবে সংবিধান সংশোধনের বিধান থাকা উচিত নয়। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি একত্রযোগে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা থাকাই বাঞ্ছনীয়। ভারতে এই নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। অবশ্য ভারতে কেন্দ্রবিমুখী শক্তির প্রাবল্যের কথা চিন্তা করলে এই নীতির ব্যতিক্রমের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলে না।

(ঙ) **অঙ্গরাজ্যগুলির তরফ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা**ঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাব ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দক্ষিণাঞ্চলের কতকগুলি রাষ্ট্র কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার চেষ্টা করলে ১৮৬১ সালে সেখানে এক গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং অস্ত্রের সাহায্যে এই অধিকারের পরিসমাপ্তি ঘটান হয়। বর্তমান অবস্থায় কোন অঙ্গরাষ্ট্রের তরফ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রচেষ্টাকে বর্তমানে রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কখনই সমর্থন করা যেতে পারে না।

১৪। মন্ত্রিসভা অথবা পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থা (Cabinet or Parliamentary Form of Government and Presidential Form of Government)ঃ

(ক) **মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characterstics of Parliamentary Form of Government)**ঃ কোন শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ধর্মকে বজায় রাখতে হলে তার প্রশাসনিক

কর্তৃপক্ষকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই প্রশাসনিক দায়িত্ব দুটি পৃথক উপায়ে কার্যকরী করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তার কার্যকরণের জন্য জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার কাছে দায়ী করে এবং অপরটি হচ্ছে আইনসভার পরিবর্তে বৃহত্তর জনসমষ্টির কাছে দায়ী করে। প্রথমটিকে পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়টিকে প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসন ব্যবস্থা বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, ক্যানাডা প্রভৃতি রাষ্ট্র মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার উদাহরণ।

মন্ত্রিসভা ও প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, মন্ত্রিসভার সদস্যদের আইনসভার সদস্য হতে হবে। ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার সদস্য পূর্ব থেকে পার্লামেণ্টের সদস্য না থাকলে, মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত হবার ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হবে। ভারতের সংবিধান অনুসারে পার্লামেণ্টের সদস্য নন এমন ব্যক্তিকে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা যেতে পারে কিন্তু সংবিধানের ৭৫ (৫) অনুচ্ছেদ অনুসারে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত ব্যক্তিকে ছয় মাসের মধ্যে সংসদের যে কোন কক্ষের সদস্য হতে হবে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেণ্টের সদস্য হতে হবে

এই ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শাসনকার্যের আসল কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে মন্ত্রী পরিষদের হাতে। এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন বটে, তবে তাঁর কোন আসল ক্ষমতা নেই। ব্রিটেনে পার্লামেণ্টের নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্ব প্রথাগত নিয়মের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের আমলে পার্লামেণ্ট রাজার কাছে গ্রাণ্ড রিমনস্ট্রান্স্ (*Grand Remonstrance*) নামে যে আবেদন পত্র দাখিল করে তাতে পার্লামেণ্টের আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরই মন্ত্রীপদে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়েছিল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে পার্লামেণ্টের একচ্ছত্র আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। রানী অ্যানের রাজত্বকালে ওয়াপোলের নেতৃত্বে আমরা বর্তমান অবস্থার অনুরূপ সুশাসিত মন্ত্রিসভার অস্তিত্ব দেখতে পাই। ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ অনুচ্ছেদে মন্ত্রিসভাকে সুস্পষ্টভাবে আইনসভার নিকট দায়ী করা হয়েছে।

মূল কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব

ব্রিটেনে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব প্রথাগত, ভারতে সংবিধান-নির্দিষ্ট

এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ নিম্নতন কক্ষের নিকট দায়ী থাকেন। গ্রেট ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা কমন্স সভার কাছে দায়ী থাকেন, ভারতের মন্ত্রিসভার এই দায়িত্ব লোকসভার কাছে।

তাছাড়া, মন্ত্রিসভার আইন বিভাগের নিকট যে দায়িত্ব তা যৌথ দায়িত্ব। অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সামগ্রিকভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।

যৌথ দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়ঃ প্রথমতঃ, (ক) কোন বিশেষ মন্ত্রীর প্রতি আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে সেটি সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা বলে ধরে নিতে হবে।

(খ) কোন বিশেষ মন্ত্রী তাঁর নীতির জন্য আইনসভার কাছে সমালোচনার পাত্র হলে সেটি সমস্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধ সমালোচনা বলে ধরে নিতে হবে।

যৌথ দায়িত্বের বৈশিষ্ট্য

(গ) কোন এক মন্ত্রী আইনসভায় কোন প্রস্তাব উত্থাপন করলে সেটি মন্ত্রিসভার প্রস্তাব বলেই ধরে নিতে হবে।

(ঘ) কোন সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় গৃহীত হলে মন্ত্রিসভার সদস্য থাকাকালীন প্রত্যেক মন্ত্রীকে তা সমর্থন করতে হবে। কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত কোন মন্ত্রীর নিকট গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হলে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। যদি পদত্যাগ না করেন তবে সিদ্ধান্তটির বিরুদ্ধে ভোট দিতে বা অভিমত প্রকাশ করতে পারবেন না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই দায়িত্ব কিভাবে কার্যকারী করা যায়?

মন্ত্রিসভার দায়িত্ব কার্যকরী করার উপায়

আইনসভার নিম্নতন কক্ষ সাধারণতঃ অনাস্থা প্রস্তাব, প্রশ্ন, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, সরকারী বিলের বিরুদ্ধাচরণ ইত্যাদির মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইনসভা অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রিসভা হয় পদত্যাগ করেন অথবা রাষ্ট্রপতি বা রাজাকে পার্লামেণ্ট ভেঙে দেবার জন্য পরামর্শ দেন। পার্লামেণ্ট ভেঙে দেওয়ার পর নতুন করে নির্বাচন হয় এবং এই নির্বাচনের ফলের উপর মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। যদি নির্বাচনের ফল মন্ত্রিসভার স্বপক্ষে হয় তাহলে মন্ত্রিসভা স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকে, যদি বিপক্ষে হয় তবে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে এবং আইনসভার আস্থাভাজন নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

আইনসভা কর্তৃক অনাস্থা প্রস্তাবের পরিণাম

আজকাল মন্ত্রিসভা পদত্যাগ না করে আইনসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে

আজকাল মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আইনসভায় অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভা প্রথমেই পদত্যাগ না করে আইনসভা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনমতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করেন। ব্রিটেনে এই ব্যবস্থা প্রচলনকে লক্ষ্য করে ওয়ালটেয়ার বেজহট (*Walter Bagehot*) বলেছেন যে, সৃষ্টির নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে যে ক্যাবিনেট পার্লামেন্টের সৃষ্ট সে তার স্রষ্টাকেই ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে।

নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত

আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে মতবিরোধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের মাধ্যমে এই মতবিরোধ অভিব্যক্ত হলে মন্ত্রিসভার পক্ষে পদত্যাগ না করে নির্বাচকমণ্ডলীর দরবারে নিজেদের উপস্থিত করা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। বস্তুতঃ, জনমত স্বপক্ষে থাকলে মন্ত্রিসভার পক্ষে পদত্যাগ করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, সরকারের আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটলে গণতান্ত্রিক সমাধান হওয়া উচিত গণসমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে। আইনসভা ভেঙে দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর রায়কে গ্রহণ করা, আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মতবিরোধের নিষ্পত্তি করার শ্রেষ্ঠতম ব্যবস্থা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতির ব্যতিক্রম

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভা ভেঙে দিতে পারেন না। বস্তুতঃ, আইনসভা ভেঙে দেওয়ার নীতি প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। যেখানে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ আইনসভার কাছে দায়ী নন সেখানে আইনসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও তার থাকতে পারে না।

রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল থেকে নির্বাচিত হবেন এবং তাঁরা পার্লামেন্টের সদস্য হবেন —এই প্রথার উদ্ভব ঘটেছে।

মন্ত্রিসভার সদস্যদের আইনসভার সদস্য হওয়ার প্রথা গড়ে উঠেছে শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক নীতিকে কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তার খাতিরে। কিন্তু সরকারী পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রয়োজন শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ঐক্য, সংহতি ও একত্ববোধ এবং শাসনবিভাগের সঙ্গে আইন বিভাগের সহযোগিতা। এই প্রয়োজনীয়তার খাতিরে গ্রেট ব্রিটেনের

মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হওয়ার প্রথা গড়ে উঠেছে। মন্ত্রিসভার সংহতি, মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অনেকটা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। মন্ত্রীসভা কি পরিমাণে এক সুসংবদ্ধ সংস্থা হিসেবে পার্লামেন্টের সম্মুখীন হতে পারবে তা নির্ভর করে অনেকটা প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর। অধ্যাপক স্ট্রং (*Strong*) বলেছেন, "It is the party system which gives the cabinet its homogeneity, it is the position of the Prime Minister which gives solidarity"

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভব ও তার কার্যকারিতা

প্রেসিডেন্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট এবং আইনসভার সদস্যগণ জনসাধারণ কর্তৃক পৃথকভাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট এবং আইন-সভার অধিকাংশ সদস্য পৃথক রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ (Merits and defects of Parliamentary government): মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে আইন ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ-যোগসূত্র ও সহযোগিতা। মন্ত্রিসভার সদস্যরা এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য একই রাজনৈতিক দলের সভ্য হওয়ার জন্য আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব হয় না। মন্ত্রি-সভার সদস্যেরা আইনসভার গরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পরিচালনায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল তার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। সুতরাং সেই পরিকল্পনাকে সরকারের সাহায্যে রূপায়ণের ক্ষেত্রে আইনসভার অধিকাংশ সদস্য তাদের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হন। এর ফলে এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ও আইনসভার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকে। প্রেসিডেন্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব দেখা যায়। এই শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য পৃথক রাজনৈতিক দলভুক্ত হতে পারেন। ফলে প্রেসিডেন্ট এবং আইনসভার মধ্যে মতানৈক্য ঘটতে পারে। প্রেসিডেন্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনসভা আইন নাও প্রণয়ন করতে পারে এবং অপর পক্ষে আইনসভার প্রণীত আইনকেও প্রেসিডেন্ট

শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা

প্রেসিডেন্ট চালিত শাসন ব্যবস্থায় সহযোগিতার অভাব

সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন। ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় ক্ষেত্রে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

প্রত্যেক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই আইন বিভাগকে পরিচালনা করার জন্য এক পরিচালন শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। আইনসভার সদস্য-সংখ্যা ও কাজের পরিধি বাড়ার জন্য এই পরিচালন শক্তির প্রয়োজনীয়তা আজকের দিনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইনসভার পরিচালন শক্তি হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রিসভার সদস্যরাই আইনসভায় বিল উত্থাপন করেন, বাজেট পেশ করেন, দেশের সাধারণ অবস্থা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করেন এবং তাদের দলভুক্ত অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের সাহায্যে আইনসভাকে তাঁদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হন।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগকে পরিচালনা করার সুবিধা

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য না হওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন বিল প্রত্যক্ষভাবে আইনসভায় উপস্থাপিত করা যায় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট দেশের অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ দিয়ে মাঝে মাঝে বাণী প্রেরণ করে থাকেন। এই বাণীর মধ্যে কংগ্রেস কর্তৃক কোন্ জাতীয় আইন প্রণীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত থাকে।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগকে পরিচালনা করার অসুবিধা

প্রেসিডেণ্টের প্রয়োজন এবং ইচ্ছা অনুসারে আইন প্রণয়নের জন্য সাধারণতঃ প্রেসিডেণ্টের দলভুক্ত ও তাঁর আস্থাভাজন কংগ্রেসের কোন সদস্য আইনসভায় বিল উত্থাপন করেন।

স্বভাবতই মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় বিভাগীয় মন্ত্রীরা সরকারের নীতিকে ব্যাখ্যা করে যে-ভাবে সরাসরি বিল আনয়ন করার সুযোগ পান, প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় সে সুযোগ না থাকায়, এই শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার জন্য প্রয়োজনীয় পরিচালন শক্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের আইনসভার সদস্য হিসেবে আইনসভায় আসন গ্রহণ করতে হয়। ফলে আইনসভার সদস্যরা সরাসরিভাবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের প্রশ্ন করতে বা সমালোচনা করতে পারেন। মন্ত্রিমণ্ডলীকে স্বভাবতই তাদের কার্যাবলীর পরিণতি এবং যাথার্থ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হয়।

আইন বিভাগ মন্ত্রিসভায় কাজের তত্ত্বাবধান করতে পারে

এইভাবে মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় আইন বিভাগ কর্তৃক শাসন বিভাগের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান সম্ভব হয়; ফলে শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতার পথ রুদ্ধ হয়।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত ব্যবস্থায় আইনসভা শাসন বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য নন। তাঁর পরামর্শদাতা মন্ত্রিপরিষদের সভ্যরাও আইনসভার সদস্য হতে পারেন না। সুতরাং আইনসভার সভ্য হিসেবে আইনসভায় উপস্থিত হয়ে এই সংস্থার প্রশ্ন বা সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় না। অতএব আইনসভা সরাসরিভাবে শাসন বিভাগের সমালোচনা ক'রে তাকে নিয়ন্ত্রিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীদের সব সময়েই আইনসভার অধিকাংশ সদস্যদের আস্থাভাজন থাকতে হয়। মন্ত্রিসভা কোন কারণে আইনসভার আস্থা হারালে আইনসভা অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন। ফলে শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা স্বৈরাচারী হতে পারে না।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হতে পারে না, প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ সাময়িকভাবে স্বৈরাচারী হতে পারে

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইন বিভাগ প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল সংবিধান-নির্দিষ্ট এবং সেই সময়ের মধ্যে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার আইন বিভাগের নেই। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে প্রেসিডেণ্টের কংগ্রেসের কাছে কোন দায়িত্ব নেই। জনসাধারণের আস্থা হারালে তিনি আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত না হতে পারেন, কিন্তু যে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি নির্বাচিত সেই সময়ের ভিতরে কংগ্রেসের অনাস্থা-ভাজন হলেও তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য প্রেসিডেণ্টের বিচারের (Impeachment) ব্যবস্থা আছে। প্রেসিডেণ্ট দেশদ্রোহিতামূলক বা ঘুষ নেওয়া প্রভৃতি কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী বলে বিবেচিত হলে কংগ্রেস তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার আর একটি বড় গুণ এই যে, এই ব্যবস্থা শিক্ষামূলক। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল এবং বিরোধী দলকে নিজেদের

কার্যপ্রণালী এবং জনসাধারণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। আগামী নির্বাচনে কোন্ রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করার সুযোগ পাবে তা জনসাধারণের আস্থার উপর নির্ভর করবে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা শিক্ষা-মূলক

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে—এই ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলাদলির তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। সরকারের বিরোধী পক্ষ সরকারের ভালমন্দ সমস্ত প্রকার কাজেরই বিরূপ সমালোচনা করে। ফলে কোন প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে তর্ক এবং সমালোচনার ঝড় অবিশ্রান্ত গতিতে বইতে শুরু করে। সরকার সমর্থক এবং বিরোধীদলের এই তর্কযুদ্ধ ও পারস্পরিক বিরূপ সমালোচনা—এমনকি নিন্দা, কুৎসা প্রভৃতি সংবাদপত্র, সভাসমিতি ইত্যাদির দ্বারা সারা দেশে প্রচারিত হয়ে দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে।

মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় দলাদলির তীব্রতা

আজকের দিনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটধিকারের জন্য আইনসভার সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনসভাকে আজ অধিক সংখ্যায় আইন প্রণয়নও করতে হয়। তাছাড়া, আইন প্রণয়নের কাজও এখন জটিল রূপ ধারণ করেছে। এই সমস্ত নতুন পরিস্থিতির উদ্ভবের জন্য কোন দেশের আইনসভার পক্ষেই আজ শাসনকর্তৃপক্ষের কাজের বিস্তৃত তত্ত্বাবধান করা সম্ভব নয়। একান্ত অনিবার্য কারণেই তাই আইন-সভাকে শাসন বিভাগের কর্তৃত্বের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। যে আইনসভা একদিন ছিল শাসন বিভাগের মনিব—প্রকৃত নিয়ন্ত্রাকারী, সেই আইনসভা আজ শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। রাজনৈতিক দল প্রথার উদ্ভবের ফলে এই অবস্থা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের নেতৃস্থানীয় মন্ত্রিসভার সদস্যরা পার্লামেণ্টকে যে পথে চালিত করেছেন পার্লামেণ্ট সেই পথেই আজ অন্ধভাবে চালিত হচ্ছে। যে কোন প্রস্তাব বা বিল মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইনসভায় উত্থাপিত হয়, আইনসভার অধিকাংশ সদস্যদের কাজ তাকে সমর্থন জানানো। প্রত্যেক মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই এখন নায়ক আর আইনসভা তার সমর্থনকারী এক সংস্থামাত্র।

মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তার কুফল

আইন প্রণয়নের জটিলতার জন্য আজকেরদিনে আইনসভার পক্ষে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আইনের সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ করানো সম্ভব নয়। তাই

আইনসভা আইনের মূল কাঠামোটি স্থির করে দিয়ে তার বিস্তৃত প্রয়োগের বিধানগুলি রচনা করার ভার ছেড়ে দেন প্রাশাসনিক কর্তৃপক্ষের উপর। সমাজ জীবনের জটিলতা এবং আইন প্রণয়নের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রবণতা এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। আইনসভার ক্ষমতা কমে যাওয়ার এটিও একটি কারণ।

বহুদলীয় মন্ত্রিসভার উদ্ভবজনিত অসুবিধা

দেশে দুটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু যেখানে বহু রাজনৈতিক দল রয়েছে এবং কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয়নি, সেখানে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা গঠন অপরিহার্য। একাধিক রাজনৈতিক দল জোড়াতালি দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করলে বলিষ্ঠভাবে কোন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না, মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বও থাকে না। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি সেখানে ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। ফ্রান্সে বহু সংখ্যক রাজনৈতিক দল থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ মন্ত্রসিভার পরিবর্তন সেখানকার রাজনৈতিক জীবনে এক গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বহুদল বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা চালিত শাসন ব্যবস্থায় এই ত্রুটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

(খ) প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Presidential Form of Government) : প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টই রাষ্ট্রপতি এবং তিনি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিসভা চালিত শাসন-

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী

ব্যবস্থায় যেমন একজন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন—তিনি রাজা বা প্রেসিডেণ্ট হতে পারেন—প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় তেমন থাকে না। এখানে প্রেসিডেণ্ট বা রাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী এবং প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

মন্ত্রিপরিষদ ও তার স্বরূপ

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় যে অর্থে মন্ত্রিপরিষদ প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সেরূপ কোন মন্ত্রিপরিষদ প্রেসিডেণ্ট-চালিত শাসনব্যবস্থায় নেই। প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সিনেটের অনুমোদনক্রমে নিযুক্ত। তাঁরা জনসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত নন বা আইন সভার সদস্য নন। শাসন কার্যের জন্য তাঁদের কোন দায়িত্বও নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুসারে শাসনব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব প্রেসিডেণ্টের উপর ন্যস্ত।

প্রেসিডেণ্ট যিনি চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী তিনি আইনসভার সদস্য নন। সুতরাং তাঁকে আইন সভার কাছে দায়ী থাকতে হয় না। প্রত্যক্ষভাবে তিনি আইনসভায় কোন বিল উত্থাপন করতে পারেন না। আইনসভাও কোন অনাস্থা প্রস্তাব এনে প্রেসিডেণ্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না।

প্রেসিডেণ্ট ও আইন সভার সম্বন্ধ

এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ। এই শাসনব্যবস্থায় সংবিধান, আইন বিভাগ এবং শাসন বিভাগকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছে। এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আইনসভা আইন প্রণয়ন করবে, শাসন বিভাগের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে প্রেসিডেণ্টের কর্তব্য হবে সেই আইনকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনসভা আইন তৈরী করলে সাময়িকভাবে অবশ্য প্রেসিডেণ্ট তাকে নাকচ করতে পারেন তবে স্থায়ীভাবে তাকে নাকচ করার ক্ষমতা প্রেসিডেণ্টের নেই।

এই ব্যবস্থা ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত

প্রেসিডেণ্ট আইন সভার আস্থা হারালেও আইনসভা তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না। প্রেসিডেণ্টের দায়িত্ব জনসাধারণের কাছে। জনসাধারণের আস্থা হারালে স্বভাবতই তিনি আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত হবার সুযোগ পাবেন না। কিন্তু যে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি নির্বাচিত সেই সময়ের জন্য আইনসভা কোন প্রকার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে তাকে গদিচ্যুত করতে পারে না। অবশ্য সংবিধানের কোন বিধান ভঙ্গ করলে অথবা দুর্নীতি বা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতামূলক কোন কাজে লিপ্ত থাকলে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচ্‌মেণ্টের (Impeachment) এর ব্যবস্থা আছে।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার গুণাগুণ : (Merits and defects of Presidential Form of Government) প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে এর স্থায়িত্ব। প্রেসিডেণ্ট যেহেতু নির্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য নির্বাচিত, সে কারণে তিনি দৃঢ়তার সহিত তাঁর নীতিকে কার্যকরী করার সুযোগ পান। আইনসভার সম্মতির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হতে হলে শাসনকার্যের উপর অধিকতর মনঃসংযোগ তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। আইনসভার কোন অনাস্থাসূচক প্রস্তাব যেহেতু তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে না, সেহেতু দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি সাহসিকতার সহিত অবলম্বন করতে সক্ষম।

স্থায়িত্ব

দেশে জরুরী আপৎকালীন অবস্থা উপস্থিত হলে এই শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকরী। মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় যে কোন সিদ্ধান্ত প্রথমে মন্ত্রিপরিষদে গৃহীত হলে সেটি আবার আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট-চালিত ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। মন্ত্রিপরিষদ সেখানে প্রেসিডেণ্টকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবে মাত্র। প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করলে সেই পরামর্শ গ্রহণ নাও করতে পারেন। সুতরাং বিপদকালীন অবস্থায় যে সিদ্ধান্ত তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তিনি তা গ্রহণ এবং কার্যকরী করতে পারেন। তাছাড়া, প্রেসিডেণ্টকে তার কার্যাবলী সম্বন্ধে আইনসভার প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করতে হয় না, কারণ তাঁর কার্যকাল সংবিধান নির্দিষ্ট। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট (*Roosevelt*) একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। কারণ ঘটনার অবনতিকে বাধা দেওয়ার জন্যে তিনি নিজে যে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারতেন -তার জন্য আইনসভার উপর নির্ভরশীল হতে হত না।

জরুরী অবস্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী

প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রধান অসুবিধা এই যে, শাসন বিভাগের প্রধান কর্তা প্রেসিডেণ্ট এবং আইন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হলে সরকার পরিচালনায় দুর্বলতা—এমন কি অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট এবং আইনসভার অধিকাংশ সদস্য বিরোধী দলভুক্ত হলে এই সম্ভাবনা অধিকতর বেড়ে যাবে। প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা অনুসারে আইন প্রণীত না হলে কোন নীতিকেই কার্যকরী করা সম্ভব হবে না। এমত অবস্থায় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হতে বাধ্য। আইনসভার প্রণীত অনেক আইনকেও প্রেসিডেণ্ট অন্ততঃ সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট তাঁর ভিটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনেক আইনকেই নাকচ করে দিয়েছেন। যদিও চূড়ান্তভাবে ভিটো প্রয়োগ করার ক্ষমতা তাঁর নেই, তথাপি সাময়িক ভিটোর গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে না। এছাড়া, আইনসভার অধিকাংশ সদস্য প্রেসিডেণ্টের দলভুক্ত না হলে, প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা অনুসারে আইনসভার দ্বারা আইন না'ও প্রণীত হতে পারে। এমতঅবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে অসহযোগীতার জন্য সমগ্র শাসনব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে।

আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের অসহযোগিতাজনিত অসুবিধা

প্রেসিডেণ্ট-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি হচ্ছে, এই ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট স্বেচ্ছাচারী হবার যথেষ্ট সুযোগ পান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরূপ স্বেচ্ছাচারী প্রেসিডেণ্টের অভাব নেই। প্রেসিডেণ্ট সংবিধান বহির্ভূত কিছু না করেও অনেক সময় একনায়কের মত স্বেচ্ছাচারিতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। আইনসভাও তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারী হলে অবশ্য তাঁর বিচারের (Impeachment) ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিচারে প্রেসিডেণ্টকে অভিযুক্ত করতে হলে তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা, ঘুষ নেওয়া প্রভৃতি গুরুতর অপরাধের অভিযোগ আনতে হবে এবং সেগুলি প্রমাণ সাপেক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে একবার মাত্র প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে বিচারের (Impeachment) অভিযোগ আনা হয়েছিল, কিন্তু প্রমাণ অভাবে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

স্বেচ্ছাচারীতার সম্ভাবনা

দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয়ের দুরূহতা প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার আর একটি ত্রুটি। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা মন্ত্রিসভার নির্দেশ এবং ইচ্ছা অনুসারেই আইন প্রণয়ন করে কিন্তু প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা আইন তৈরী করে কয়েকটি কমিটিতে বিভক্ত হয়ে যেখানে সরকার পক্ষের বক্তব্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের দ্বারা যথোপযুক্তভাবে উপস্থাপিত করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন আইনের জন্য পৃথক পৃথক কমিটি থাকার ফলে আইন প্রণয়নের দায়িত্বও বিভক্ত হয়ে যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে দায়িত্বের অনিশ্চয়তা শাসনতন্ত্রের গণতান্ত্রিক ধর্মের পরিপন্থী।

দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয়ের দুরূহতা

১৫। মন্ত্রিসভা ও প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার তুলনা (Comparison between Parliamentary and Presidential Form of Government) :

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতাকে কার্যকরী করার জন্য দুটি উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে : একটি হচ্ছে পার্লামেণ্টারী বা মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা ; অপরটি হচ্ছে প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। দায়িত্বশীলতাকে কেন্দ্র করে এই দুই শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে বলে এদের প্রত্যেকটি তুলনামূলকভাবে আলোচিত

হওয়াই বাঞ্ছনীয়; নচেৎ কোন এক শাসনব্যবস্থার সামগ্রীক রূপটি অস্পষ্ট থেকে যায়। এখন সরকারের বৈশিষ্টগুলি তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা যাক:

(১) প্রথমেই বলতে হয়, মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা শাসনকার্যের অধিকারী হলেও এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থাকেন, যেমন—ইংলণ্ডে রাজা বা রানী এবং ভারতে রাষ্ট্রপতি। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী, আবার তিনিই শাসনকার্যে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।

(২) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এখানে মন্ত্রিপরিষদ আছে বটে, তবে তাঁদের কোন দায়িত্ব নেই; তাঁরা প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা মাত্র। প্রেসিডেণ্ট ইচ্ছা করলে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ নাও করতে পারেন। তাঁরা আইন পরিষদের সদস্য নন, প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক সিনেটের সম্মতিক্রমে নিযুক্ত হন মাত্র।

(৩) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসনকর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য, কিন্তু প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য নন।

(৪) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে দায়ী, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভার কাছে দায়ী নন।

(৫) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইনসভায় সরাসরি বিল উত্থাপন করতে পারেন এবং সরকারী নীতির ব্যাখ্যাও সমর্থন করতে পারেন। প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট কোন বিল উত্থাপন করতে পারেন না বা আইনসভায় উপস্থিত হয়ে কোন সরকারী নীতির সমর্থন বা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। তাঁর ইচ্ছামত কোন বিল আইনে পরিণত করতে হলে আইনসভায় প্রেরিত বাণীর মাধ্যমে তার ইঙ্গিত দেন এবং তাঁর দলের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য সেই বিল উত্থাপন করেন।

(৬) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন, প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অনাস্থা প্রস্তাব এনে

তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেনা। প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল সংবিধান নির্দিষ্ট এবং সেই কয়েক বৎসরের জন্য তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অবশ্য প্রেসিডেণ্ট সংবিধান ভঙ্গ করলে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করলে বা কোন গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে তাঁর বিরুদ্ধে ইমপীচমেণ্টের (Impeachment) ব্যবস্থা আছে।

(৭) মন্ত্রীসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা পার্লামেণ্টের সংগ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্য হওয়ার জন্য আইনসভাকে পরিচালিত করার সুযোগ পান, ফলে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বিদ্যমান থাকে। এই সহযোগিতায় শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রেসিডেণ্ট ও আইনসভার অধিকাংশ সদস্য ভিন্ন দলভুক্ত হলে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য ঘটতে পারে, ফলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য না হওয়ায় আইনসভাকে পরিচালনা করার সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত। প্রেসিডেণ্ট ভিন্ন দলভুক্ত হলে এই অসুবিধা আরও তীব্রতর হয়।

(৮) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় বহুদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হলে, মন্ত্রিসভা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘটলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে। প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্বের অভাবজনিত অসুবিধা থেকে মুক্ত।

(৯) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় বিপদকালীন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টকে কারোর উপর নির্ভর করতে হয় না বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

(১০) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন বিভাগ আইনসভাকে পরিচালনা করার জন্য দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় সহজসাধ্য হয়। প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় দুরূহ।

সংক্ষিপ্তসার

এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার দ্বারা সমগ্র শাসনকার্য পরিচালিত হয়। (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত সংবিধান এখানে প্রধান নয়। (৩) এই শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত ও অলিখিত দুই-ই হতে পারে। (৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত এখানে প্রধান বিচারালয়ের প্রাধান্যও গুরুত্বপূর্ণ নয়।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের গুণ ও দোষ ঃ

এই শাসনব্যবস্থায়—(১) শাসনব্যবস্থার জটিলতার সৃষ্টি হয় না, (২) আইন অবৈধ বলে ঘোষিত হয় না, (৩) ব্যয়ভার কম, (৪) অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়িত করণের, ও (৫) আন্তর্জাতিক চুক্তি পালনের দিক থেকে সুবিধাজনক, (৬) সরকার শক্তিশালী এবং (৭) গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনা কম। এই শাসনব্যবস্থার অসুবিধাগুলি হচ্ছে—(১) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয় না, (২) স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান হয় না, (৩) কাজের চাপ বৃদ্ধি হয়, (৪) কম সংখ্যক লোক শাসন-কার্যে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায় এবং (৫) আমলাতন্ত্রের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রধান পার্থক্যগুলি হচ্ছে—(১) এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে একটিমাত্র সরকার থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে দুই শ্রেণীর সরকার থাকে, (২) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান শক্তি কেন্দ্রীয় সরকার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান শক্তি সংবিধান এবং (৩) এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত এবং নমনীয় বা অনমনীয় দুই-ই হতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে লিখিত ও অনমনীয় হতে হবে।

রাজ্য সংঘ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ঃ

সংহতির প্রকারভেদ অনুসারে সমবায় রাষ্ট্রগুলিকে মৈত্রীবন্ধন, ব্যক্তিগতবন্ধন, প্রকৃতবন্ধন, রাষ্ট্র সমবায় ও যুক্তরাষ্ট্র—এইভাবে ভাগ করে দেখান যেতে পারে। রাষ্ট্র সমবায়ে সদস্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, তাদের সমবায়ের ভিত্তি স্বাধীন চুক্তি, তাদের নিজস্ব নাগরিকত্ব নেই এবং রাষ্ট্র সমবায় থেকে যে কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে, সুতরাং সদস্য রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র-পদবাচ্য।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

যুক্তরাষ্ট্রে দুটি পৃথক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকার থাকলেও একটিমাত্র রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে, (১) দুই শ্রেণীর সরকার—কেন্দ্রীয় ও কতকগুলি প্রাদেশিক, (২) লিখিত ও অনমনীয় সংবিধান, (৩) উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় এবং (৪) দ্বিকক্ষ-বিশিষ্ট আইনসভা ও (৫) দ্বিনাগরিকত্বের অবস্থান।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা বণ্টন পদ্ধতি ঃ

যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সাধারণ বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালাধীন থাকে এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অন্যান্য স্থানীয় বিষয়গুলি আঞ্চলিক সরকারের অধীনে থাকে।

ক্ষমতা বণ্টনের উদ্দেশ্যে সংবিধান কোন কোন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলি উল্লেখ করে দেয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয়গুলি অনুল্লেখিত থাকে। আবার কোন রাষ্ট্রে বিপরীতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রের ক্ষমতাগুলি অনুল্লেখিত অবস্থায় থাকে। যে সরকারের ক্ষমতাগুলি উল্লেখ করে দেওয়া হয় সেই সরকার দুর্বল, যে সরকারের ক্ষমতা উল্লেখ করে দেওয়া হয় না তারাই অধিকতর শক্তিশালী। কোন কোন ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারেরই নিয়ন্ত্রণ থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের গুণ ও অসুবিধা ঃ

যুক্তরাষ্ট্রের গুণগুলি হচ্ছে—(১) দুই বিপরীতমুখী শক্তির সমন্বয়, (২) কাজের চাপ কম হয়, (৩) রাজনৈতিক চেতনা ও দেশাত্মবোধ বৃদ্ধি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ত্রুটিগুলি হচ্ছে—(১) শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় জটিলতা, (২) সরকারের দায়িত্ববোধ কমে যায় এবং (৩) ব্যয়াধিক্য বৃদ্ধি পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের শর্ত :

অধ্যাপক হোয়্যার যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলির কথা বলেছেন। এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনায়—(১) ইচ্ছা ও (২) যোগ্যতার উপর এই শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে। একই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একতাবদ্ধ হবার ইচ্ছা নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থেকে উদ্ভূত হয়—(ক) নিরাপত্তার অভাব, (খ) অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার আশা, (গ) সাধারণ সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা, (ঘ) ভৌগোলিক সান্নিধ্য, (ঙ) ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার ইচ্ছা নিম্নলিখিত উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল—(ক) রাষ্ট্রীয় অথবা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য, (খ) অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং (গ) ভৌগোলিক ব্যবধান ইত্যাদি।

উপরোক্ত উপাদানগুলি যুক্তরাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় যোগ্যতাও সৃষ্টি করে। এই উপাদানগুলি ছাড়া প্রয়োজনীয় যোগ্যতার সৃষ্টি জন্য আরও তিনটি প্রয়োজনীয় উপাদান হচ্ছে—(১) সরকার পরিচালনার ঐতিহ্য, (২) আঞ্চলিক সংগঠনগুলির আকার ও (৩) তাদের অর্থনৈতিক সমস্যা।

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রবণতা :

যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রবণতা কেন্দ্রের শক্তি বৃদ্ধির দিকে। তার কারণগুলি হচ্ছে—(১) যুদ্ধ, (২) অর্থনৈতিক সংকট, (৩) উন্নয়নমূলক কার্য এবং (৪) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি।

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা :

যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যাগুলি হচ্ছে—(১) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সন্তোষজনক ক্ষমতাবণ্টন, (২) ক্ষুদ্রতর রাজ্যগুলিকে বৃহত্তর রাজ্যগুলি থেকে রক্ষা, (৩) কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলি এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের সুনিয়ন্ত্রণ, (৪) সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি এবং (৫) অঙ্গরাজ্যগুলির তরফ থেকে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবণতা।

মন্ত্রিসভা এবং প্রেসিডেন্ট-চালিত শাসনব্যবস্থা :

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পার্থক্য (২) মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য, (৩) তাঁরা আইনসভার কাছে যৌথভাবে দায়ী। এই যৌথ দায়িত্বের অর্থ (ক) কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থার সামিল, (খ) কোন এক বিশেষ মন্ত্রীর প্রস্তাব মন্ত্রিসভার প্রস্তাব বলে ধরে নেওয়া হয়, (গ) কোন বিশেষ মন্ত্রীর প্রস্তাব সকল মন্ত্রীকেই সমর্থন করতে হয়।

মন্ত্রিসভার দায়িত্ব আদায় করা হয়—(১) অনাস্থা প্রস্তাব, (২) প্রশ্ন এবং (৩) নিন্দাসূচক প্রস্তাব প্রভৃতির দ্বারা।

মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভা হয় পদত্যাগ করে অথবা আইনসভা ভেঙে দেবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে আইনসভা ভেঙে দিয়ে গণনির্বাচনের ব্যবস্থা করাই অধিকতর গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। রাজনৈতিক দলপ্রথার ভিত্তিতে এই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হওয়া এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(১) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে, শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে সহযোগিতা, প্রেসিডেন্ট-চালিত শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতারই অভাব দেখা যায়।

(২) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভাকে পরিচালনা করার সুবিধা, প্রেসিডেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় এই সুবিধা নেই।

(৩) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ শাসনবিভাগের কাজের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়, প্রেসিডেন্ট-চালিত শাসনব্যবস্থায় এই সুযোগ নেই। (৪ মন্ত্রিসভা চালিত

শাসনব্যবস্থার শাসক কর্তৃপক্ষ স্বৈরাচারী হতে পারে না, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় এই সম্ভাবনা আছে। (৫) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে শিক্ষামূলক। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলি হচ্ছে—(১) রাজনৈতিক দলাদলির তীব্রতা। এই তীব্রতাজনিত অসুবিধা প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় নেই, (২) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিদের ক্ষমতা বেড়ে চলার ফলে প্রকৃত গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হয়েছে, (৩) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় বহু রাজনৈতিক দল থাকলে মন্ত্রিসভা স্থায়িত্বলাভ করে না, ফলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়। প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যাবস্থায় এই অসুবিধা নেই।

(১) প্রেসিডেণ্ট-চালিত শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এখানে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান ও প্রকৃত ক্ষমতাধিকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (২) এই শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিমণ্ডলীর কোন দায়িত্ব নেই, তাঁরা প্রেসিডেণ্টের পরামর্শদাতা মাত্র। (৩) এই শাসনব্যবস্থা ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হচ্ছে-(১) শাসন কর্তৃপক্ষের স্থায়িত্ব (২) জরুরী অবস্থায় বিশেষভাবে কার্যকরী। এই শাসনব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে—(১) শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হলে অচল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে এবং প্রেসিডেণ্টের পক্ষে স্বৈরাচারী হবার সম্ভাবনা আছে। (৩) দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয়ও অন্যতম সমস্যা।

মন্ত্রিসভা ও প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার তুলনা ঃ

(১) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় এই পার্থক্য নেই। (২) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই প্রকৃত কর্তৃত্বের অধিকারী, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট সমস্ত কর্তৃত্বের অধিকারী। এখানে মন্ত্রি পরিষদ প্রেসিডেণ্টের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। (৩) প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইন পরিষদের সদস্য নন। (৪) মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে আইন পরিষদ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে, প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে কোনরূপ অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। তাঁর বিরুদ্ধে ইম্‌পিচ্‌মেণ্টের ব্যবস্থা আছে। (৫) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইন সভাকে পরিচালনা করার সুযোগ পান, প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট এই সুযোগ পান না। (৬) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বিদ্যমান, প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় এই সহযোগিতার অভাব হতে পারে। (৭) মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় বহু দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকলে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের জন্য দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে কিন্তু প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থা এই সম্ভাবনা থেকে মুক্ত। (৮) প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় জরুরী অবস্থায় মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা অপেক্ষা দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে। (৯) প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য।

Exercise

1. How would you distinguish a Federal Union from (a) Confederation and (b) a Unitary state? (*C U. 1957*)

2. What are the essential features of a Federal Form of Government?

3. State the nature of Federalism and discuss its advantages and disadvantages (*C. U. 1954, 1956*)

4. What are the conditions for the success of a Federal Union? How far do they exists in India? (*C U. 1958*)

5. What are the conditions essential to the formation of a Federal Union? Explain the necessity of a written constitution for a Federal Union? (*C. U. 1949*)

6. What are the conditions for the success of a Federal Union? How far do they exist in India? (*C. U. 1958*)

7. What are the essential features of the Cabinet Form of Government? How does the legislature exercise control over the executive in such a Form of Government? (*C. U. 1956*)

8 Differentiate between the Presidential Form of Government and Cabinet Form of Government. What are the essential requisities of the latter? (*B. U. 1962*)

9. Account for the present trend of centralisation in a Federal Form of Government.

10. Discuss what particular problems a Federal Form of Government has to face.

দ্বাদশ অধ্যায়

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি

(Theory of Separation of Powers)

১। ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায় (Separation of powers : What it implies) :

কোন এক সরকারের কাজগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা : আইন প্রণয়নসংক্রান্ত কাজ, শাসনসংক্রান্ত কাজ এবং বিচারসংক্রান্ত কাজ। এই প্রত্যেক শ্রেণীর কাজের জন্য একটি করে পৃথক বিভাগ থাকে। আইন প্রণয়নের কাজ করা হয় আইন বিভাগের দ্বারা, শাসনসংক্রান্ত কাজ করা হয় শাসনবিভাগের দ্বারা এবং বিচারসংক্রান্ত কাজ করা হয় বিচার বিভাগের দ্বারা। ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে এই প্রত্যেকটি বিভাগ স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কাজ করে যাবে, কোন একটি বিভাগ অপর বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না বা তাকে প্রভাবিত করবে না।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায়

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ধারণা ও তার প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত আধুনিক হলেও প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটলের লেখায় আইন নীতির উল্লেখ দেখা যায়। আরিস্টটল সরকারের কাজগুলিকে তিনভাগে ভাগ করেছেন, যথা— আলোচনামূলক (deliberative), শাসনমূলক (magisterial) এবং বিচারমূলক (judicial)। আরিস্টটল ছাড়া রোমান দার্শনিক সিসিরো ও পলিবিয়াসের লেখায়ও এই নীতির উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদের লেখায় এই নীতির উল্লেখ থাকলেও, গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলির শাসন-ব্যবস্থা এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হত এমন কথা বলা যায় না। এথেন্সের অ্যাসেম্বলী (Assembly) একাধারে আইন প্রণয়ন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করত। রোমের কমিশিয়ার (comita) ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীন ইতিহাসে রাজন্যবর্গকে আমরা দেখতে পাই একাধারে আইন প্রণেতা, প্রধান শাসক এবং চূড়ান্ত বিচারক রূপে। মধ্যযুগেও ক্ষমতার পৃথকীকরণ সম্বন্ধে খুব একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ক্রমে সরকারের কাজ বাড়তে শুরু করলে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কাজ পরিচালনার প্রথা সাধারণভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

আজকের দিনে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি শুধুমাত্র কাজের সুবিধার জন্যই প্রয়োগ করা হয় না, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলেও বিবেচিত হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সংবিধান প্রণেতারা এই নীতির ভিত্তিতেই সংবিধান প্রণয়ন করেন।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক রূপ দেন মঁতেস্কু ও ব্ল্যাকস্টোন

ষোড়শ শতাব্দীতে বঁদার লেখার মধ্যে এই মতবাদের উল্লেখ দেখা গেলেও এই মতবাদকে আধুনিক রূপ দিয়ে তাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ বলে প্রচার করেন ফরাসী দার্শনিক মঁতেস্কু (*Montesquieu*) এবং ইংরেজ আইন্‌বিদ্ ব্ল্যাকস্টোন (*Blackstone*)।

মঁতেস্কু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *L' Esprit De Lois* (Spirit of the Laws) নামক গ্রন্থে এই নীতির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রত্যেক সরকারের তিন প্রকারের ক্ষমতা আছে যথা, আইন প্রণয়নসংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত এবং বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা। যখন আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত এবং শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা একই ব্যক্তি বা এক শাসকগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে পারে না, কারণ সে ক্ষেত্রে একই রাজা অথবা সিনেট (senate) আইনগুলিকে নিষ্ঠুরভাবে প্রয়োগ করার জন্য নিষ্ঠুর আইন প্রণয়ন করতে পারেন। আবার, বিচার বিভাগকে যদি শাসনবিভাগ এবং আইন বিভাগ থেকে পৃথক না করা যায়, তাহলে তখনও স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। ইংরেজ আইনবিদ্ ব্ল্যাকস্টোন তাঁর *Commentaries on the constitution of England* নামক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, আইনবিভাগ এবং শাসনবিভাগের কাজ একই ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে কিছু থাকে না। বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার সঙ্গে এক হলে নাগরিকদের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি স্বেচ্ছাচারী বিচারকদের হাতে ন্যস্ত থাকবে। এই ক্ষমতা আবার শাসন ক্ষমতার সঙ্গে এক হলে আইন বিভাগের পক্ষে ভারসাম্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গৌরবের অধিকারী ম্যাডিসনের (*Madison*) মতে আইন, শাসন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে স্তূপীকৃত হওয়া স্বৈরাচারের নামান্তর মাত্র।

আমরা ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির শ্রেষ্ঠ লেখকদের ব্যাখ্যা [illegible] আলোচনা করলাম। সংক্ষেপে বলা যায়, সরকারের আইন প্রণয়ন, তা[illegible] বাস্তবে

কার্যকরী করা এবং তার ব্যাখ্যার কাজ তিনটি পৃথক বিভাগের হাতে ন্যস্ত থাকে। আইনবিভাগ কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করে যাবে, সে শাসন সংক্রান্ত বা বিচার সংক্রান্ত কাজ করবে না; শাসনবিভাগ আইন সংক্রান্ত বা বিচার সংক্রান্ত কোন কাজ করবে না এবং বিচারবিভাগ শাসন ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করবেন না। প্রত্যেকটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবে এবং অপর দুই বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না বা তাদের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করবে না।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির মূলকথা

সমালোচনা: ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কাজের জন্য যথাক্রমে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ থাকবে। প্রত্যেক বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে যাবে, একে অপরের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। বাস্তবে এই নীতিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে পরিণত করার অসুবিধা আছে। সরকারের কাজগুলিকে এইভাবে নিখুঁত উপায়ে ভাগ করা যায় না। প্রত্যেক বিভাগের কাজের সঙ্গে অন্য বিভাগের কাজের ওতঃপ্রোত যোগসূত্র রয়েছে। আইন বিভাগকে শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত কাজ কিছু কিছু করতে হয়, শাসন বিভাগকে আইন ও বিচার সংক্রান্ত কাজ কিছু কিছু করতে হয় এবং বিচার বিভাগকেও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ অনিবাযভাবে করতে হয়। আইনসভাকেও অনেক সময় বিচারকার্য করতে হয়। সরকারের উচ্চপদাধিকারীদের বিচার বিচার বিভাগের দ্বারা পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি দেশদ্রোহিতামূলক কোন কাজ করলে, সংবিধান ভঙ্গ করলে অথবা কোন জঘন্য অপরাধে লিপ্ত থাকলে সিনেটের দ্বারা বিচারের ব্যবস্থা আছে। ভারতের আইনসভা কর্তৃক রাষ্ট্রপতির বিচারের ব্যবস্থা আছে। গ্রেট ব্রিটেনে লর্ডসভা আপীল সংক্রান্ত মামলার শ্রেষ্ঠ আদালত।

এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব নয়

শাসন বিভাগকেও ক্ষেত্রবিশেষে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ করতে হয়। আজকাল আইনসভার কাজ বেড়ে যাওয়ায় আইনসভা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আইনের সমস্ত বিধান তৈরী করে না। তাই সাধারণভাবে আইনসভা কর্তৃক আইন প্রণীত হওয়ার পর শাসন বিভাগকে আইনগুলিকে চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম তৈরী করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাছাড়া, আইনসভার অধিবেশনের মধ্যবর্তীকালীন অবস্থায় শাসন বিভাগ সাময়িকভাবে

আইন তৈরী করতে পারেন। জরুরী অথবা বিপদকালীন অবস্থায় শাসন বিভাগ কর্তৃক জরুরী আইন প্রণয়নের অধিকার সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। বিচার বিভাগকেও আইন প্রণয়নের কাজ প্রায়শঃই করতে হয়। বিচারকার্য পরিচালনার কালে কোন এক বিষয়ে আইনের সুস্পষ্ট লিখিত নির্দেশের অভাবে বিচারক তাঁদের ন্যায়বোধ অনুসারে এই কার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীকালে বিচারকেরা এইগুলি অনুসরণ করেন এবং আইনের মতই চালু হয়ে যায়। তাছাড়া, বিচারপতিরা আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনের পরিধিকে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত করে পরোক্ষভাবে নূতন আইনের সৃষ্টি করে থাকেন।

আমরা দেখলাম অনিবার্য কারণবশতঃ প্রত্যেক বিভাগকেই অন্য বিভাগের কাজ কিছু পরিমাণে করতে হয়। তাছাড়া, ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির সূক্ষ্ম প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়ও নয়। আইনবিভাগের সদস্যরা শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাঁরা মাঝে মাঝে আইনসভায় সমবেত হয়ে আইন প্রণয়ন করেন মাত্র। শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশের সমস্যাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। সুতরাং এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কি ধরনের আইন প্রয়োজন, তাঁরাই ভাল বোঝেন। তাঁদের এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে আইন প্রণয়নের কাজে জড়িত না করলে আইনগুলির বাস্তব সমস্যা নিরপেক্ষ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রীরা আইনসভায় সরাসরিভাবে আইনের প্রস্তাব উত্থাপনের সুযোগ পান। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্টের এই সুযোগ না থাকলেও তিনি মাঝে মাঝে আইনসভায় বাণী প্রেরণ করে কোন্ জাতীয় আইন প্রণীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত দেন এবং আইনসভা সেই ইঙ্গিত অনুসারে আইন প্রণয়ন করে থাকেন। বস্তুতঃ, সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ অপর বিভাগগুলির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই প্রত্যেক বিভাগ অন্য বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা সহকারে কাজ করলেই সরকারের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালিত হতে পারে। সরকারের তিনটি বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা সহকারে কাজ না করলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া, প্রত্যেক বিভাগ অপর দুই বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করাই যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা —তথা, গণতন্ত্রের সহায়ক, এই ধারণাও ভ্রমাত্মক। গ্রেট ব্রিটেনে মন্ত্রিসভা

এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় নয়

তার কার্যাবলীর জন্য আইনসভার কাছে দায়ী, অর্থাৎ এই সভা কোন কারণে মন্ত্রিসভার অনাস্থাভাজন হলে তাদের পদত্যাগ করতে হয়—এই নীতি সম্পূর্ণ গণতন্ত্রসম্মত। শাসনবিভাগ যদি জনপ্রতিনিধিমূলক আইনসভার কাছে দায়ী না থাকে তাহলে শাসনব্যবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতার উদ্ভব হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। এই ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত তা চিন্তা করার বিষয়। আইন বিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে তা যদি ত্রুটিপূর্ণ হয়, তবে তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করা এবং চালু করাও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য। ক্ষমতা-স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি যথাযথ ভাবে প্রযুক্ত না হলেও, সেখানকার লোকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা নির্ভর করে জনগণের স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা এবং অবহিতির উপর। নাগরিক সম্প্রদায় তাদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ না হলে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ভিত্তিতে গঠিত শাসনব্যবস্থা ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবে না।

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ
নীতির মূল্যায়ণ

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির এই ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও, এই নীতি যে গণতন্ত্র তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতার অনুপন্থী, একথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাতেই এই নীতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়। বিচারক সম্প্রদায়কে যদি শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হতে হয়—অর্থাৎ বিচার কার্য পরিচালনায় তাঁরা যদি স্বাধীনতা সহকারে কাজ করতে না পারেন, তা হলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবারই সম্ভাবনা বেশী। আমাদের দেশে জেলার প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে বিচার কার্য পরিচালনারও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই নীতি কখনই গণতন্ত্রসম্মত বলে বিবেচিত হতে পারে না। সুখের বিষয়, ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র-পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে শাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে।

২। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ:

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় শাসন কর্তৃপক্ষ হিসেবে মন্ত্রিসভা, আইন প্রণেতা হিসেবে পার্লামেণ্ট এবং একটি পৃথক বিচার বিভাগ থাকার

জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হয়েছে বলে মনে হতে পারে। শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনার পদ্ধতির দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে, এখানে এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়নি। কারণ এখানকার শাসন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা, আইন বিভাগ অর্থাৎ পার্লামেন্টের উপরে নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে এখানে মন্ত্রিসভাকে পার্লামেন্টের একটি কমিটি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মন্ত্রিসভার সদস্যদের প্রত্যেককেই পার্লামেন্টের সদস্য হতে হয়। মন্ত্রিসভাই পার্লামেণ্টকে বাস্তবে পরিচালিত করে, কারণ মন্ত্রিসভার সদস্যরা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠদলের সদস্য। তাছাড়া, মন্ত্রিসভার সদস্যদের কার্যকালের স্থায়িত্বও পার্লামেন্টের আস্থাভাজন হওয়ার উপর নির্ভর করে। মন্ত্রিসভার সদস্য লর্ড চ্যান্সেলার (Lord Chancellor) পার্লামেন্টের উর্ধতন কক্ষ, অর্থাৎ লর্ডসভার সভাপতি এবং প্রধান বিচারপতি।

এই সব দিক থেকে বিচার করলে গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্ত হয়নি—একথা আমাদের স্বীকার করতে হবে।

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ:

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা অনেকটা ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে প্রেসিডেণ্ট শাসন ক্ষমতার প্রকৃত অধিকারী। এই হিসেবে কংগ্রেস প্রণীত আইনগুলিকে বিশ্বস্ততা সহকারে প্রয়োগ করা তাঁর কাজ। তিনি আইনসভার সদস্য নন। আইন সভায় তিনি কোন বিল আনয়ন করতে পারেন না বা আইন সভার কাছে দায়ী নন। আইনসভাও তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রকার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব এনে তাঁকে পদচ্যুত করতে পারেন না। এদিক থেকে বিচার করলে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনেকটা প্রযোজ্য বলা যায়। কিন্তু সংবিধানে এমন কতকগুলি বিধান আছে যার জন্য প্রেসিডেণ্টকেও আইন সভার উপর নির্ভর করতে হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের নিয়োগ সেখানকার উচ্চপরিষদ অর্থাৎ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। রাষ্ট্রপতি কোন বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে কার্যকরী করার জন্য সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন। এদিক থেকে প্রেসিডেণ্টকে আইন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

তাছাড়া, আইন বিভাগ আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে অনেকটা মুক্ত হলেও, আইনসভায় প্রণীত আ[illegible] প্রেসিডেণ্ট

অন্ততঃ সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন। এদিক থেকে আইন বিভাগ শাসন বিভাগের উপর কিছুটা নির্ভরশীল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভব হওয়ার ফলে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ও আইনসভার অধিকাংশ সদস্য একই রাজনৈতিক দলভুক্ত হলে শাসন বিভাগ এবং আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা বহুলাংশে বেড়ে যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই সহযোগিতা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে অপরিহার্যও বটে। আইনসভায় প্রণীত আইন প্রেসিডেণ্ট যদি সাময়িকভাবেও নাকচ করেন এবং প্রেসিডেণ্টের ইচ্ছা অনুসারে যদি কংগ্রেস কর্তৃক আইন প্রণীত না হয় তা হলে শাসনকার্য পরিচালনায় অচল অবস্থা সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৪। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য:

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যেই এই নীতিকে বর্জন করেছে। সাম্যবাদী সোভিয়েত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মতে বণিক শ্রেণীর স্বার্থকে কায়েম করার জন্যই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয়। সাম্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য শ্রেণী বৈষম্যের বিলোপসাধন করে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিতে একাধিক দলপ্রথা লোপ করে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একটিমাত্র রাজনৈতিক দল—কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রীম সোভিয়েত, প্রেসিডিয়াম, মন্ত্রিসভা, এমন কি বিচার বিভাগ পর্যন্ত কম্যুনিস্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত হয়। স্পষ্টতঃই এখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির স্বাধীনভাবে কাজ পরিচালনা করার অবকাশ নেই।

৫। ভারতের ক্ষেত্রে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য:

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য হিসেবে আইনসভায় বিল উত্থাপন করার অধিকারী এবং আইনসভার কাছে তাঁদের দায়ী থাকতে হয়। মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা যায়, স্পষ্টতঃই এখানে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতের শাসনব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনের মতই মন্ত্রিসভাচালিত। এখানে মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের সদস্য এবং বিল উত্থাপনের অধিকারী। তাছাড়া,

লোকসভার আস্থার উপরেই মন্ত্রিসভার কার্যকালের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কারণ, মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের কাছে তাঁদের কার্যাবলীর জন্য দায়ী। এদিক থেকে বিচার করলে মন্ত্রিসভা লোকসভার উপরে নির্ভরশীলও বটে। এই সব কারণে আমরা এখানে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ ঘটেছে এমন কথা বলতে পারি না।

তাছাড়া, শাসন বিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতিকে অর্ডিন্যান্স প্রণয়নের ক্ষমতা এবং জরুরী অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী করা হয়েছে। এদিক থেকে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ব্যতিক্রম সুস্পষ্ট।

ভারতের সংবিধানে অবশ্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের সাধারণভাবে পদচ্যুত করা যায় না। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের অনুরোধ ক্রমে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ ব্যতিরেকে তাঁদের অপসারিত করা চলে না। তাছাড়া, তাঁদের বেতন ইত্যাদির ব্যাপারেও যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রাদেশিক আইনসভা অথবা পার্লামেণ্ট তাঁদের স্বভাব বা কার্যকলাপ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে আলোচনা করতে পারেন না। এই দিক থেকে, আমরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত হয়েছে বলতে পারি।

তবে ভারতে জেলা ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। জেলা শাসক একাধারে জেলার প্রধান শাসনকর্তা ও ফৌজদারী মামলার বিচারকর্তা। অন্যান্য শাসন বিভাগীয় কর্মচারিদেরও এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই নীতি ব্রিটিশ আমল থেকেই চলে আসছে। তবে আশার কথা যে, ভারতে কোন কোন প্রদেশে ইতিপূর্বেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ইচ্ছা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্তসার

প্রাচীনকালে গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদের লেখায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির অস্পষ্ট উল্লেখ দেখা গেলেও প্রাচীন গ্রীস, রোম ও অন্যান্য রাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ছিল না। মঁতেস্কু ও ব্ল্যাকস্টোনই এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। তাঁরা ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এই নীতি গ্রহণের অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানপ্রণেতারা এই নীতির অন্যতম সমর্থক। এই মতবাদের মূল কথা—আইনবিভাগ, শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ স্বাধীনভাবে যথাক্রমে আইন প্রণয়ন, শাসন পরিচালনা ও

বিচারকার্য পরিচালনা করবে। এক বিভাগ অপর দুই-বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না বা তাদের নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করবে না। এই নীতির সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। তাছাড়া, তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদ ব্যক্তি-স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে একথা অনস্বীকার্য।

গ্রেট ব্রিটেন, ভারত প্রভৃতি মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগের ব্যতিক্রম ঘটেছে। অবশ্য ভারতে বিচারবিভাগের স্বাধীনতার সংবিধানগত ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অনেকটা প্রয়োজ্য হলেও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়নি। নিয়োগ, সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টকে সিনেটের উপর নির্ভর করতে হয়, আবার আইনবিভাগ প্রণীত আইনও প্রেসিডেণ্ট সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারেরা প্রকাশ্যভাবে ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি বর্জন করেছেন। সেখানে সরকারের সমস্ত বিভাগ কম্যুনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রণাধীন।

Exercise

1. "The strict separation of powers is not only impracticable as a working principle on Government, but it is not one to be desired in practice"—Discuss. *(C. U. 1943)*

2 Discuss the doctrine of separation of powers How far has it been translated into practice in India, the U. S. A and the U K. *(C. U. 1949, '61)*

3 Discuss the value and limitations of the doctrine of separation of powers. *(C. U. 1959)*

4. How far is it possible and desirable to carry out the principle of separation of powers in the Governmental organisation of a State ? *(C U. 1958, B. U. 1962)*

5. Explain carefully the statement that the system of 'Separation of Powers' and 'checks and balance' prevent chaos of authority and unity of Governmental powers *(C.U. 1941)*

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Different Organs of the Government)

১। আইন বিভাগ (Legislature) :

সরকারের কার্য পরিচালনার জন্য আইন, শাসন এবং বিচার বিভাগের মধ্যে, আইন বিভাগের গুরুত্বই সর্বাপেক্ষা বেশী। আইন সভার মাধ্যমেই জনগণের ইচ্ছা সুপরিস্ফুট হয়। জনসাধারণের যে ইচ্ছা আইন সভার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাকে কার্যকরী করা হয় শাসন বিভাগের মাধ্যমে এবং বিচার বিভাগের কাজ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা। আইন সভার কাজ ত্রুটিপূর্ণ হলে অপর দুটি বিভাগের কাজও অনিবার্যরূপে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আইন বিভাগের গুরুত্ব

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আইনসভার ক্ষমতার তারতম্য দেখা যায়।

গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় পার্লামেণ্টই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে আইন প্রণয়ন করে তাকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সেখানকার বিচার বিভাগের নেই। তর্কের খাতিরে বলা হয় যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এমন আইন তৈরী করতে পারে যাতে প্রত্যেক নীল চোখসম্পন্ন ছেলেদের খুন করা যেতে পারে এবং আইনের দিক থেকে এই আইন বৈধ। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টই সেখানকার সমগ্র শাসনব্যবস্থার ধারক এবং বাহক। সংবিধান সংক্রান্ত আইনকে সাধারণভাবে পরিবর্তন করার ক্ষমতা এই পার্লামেণ্টের আছে। তাছাড়া, মন্ত্রিসভাও পার্লামেণ্টর নির্দেশক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করে। মন্ত্রিসভা এখানে পার্লামেণ্টের কাছে যৌথভাবে দায়ী এবং পার্লামেণ্ট মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে মন্ত্রিসভাকে পদিচ্যুত করতে পারে।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় আইন-বিভাগের স্বরূপ

অবশ্য বর্তমানকালে দলীয় প্রথার প্রভাবের ফলে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন ঘটেছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরাই পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। সুতরাং তাঁদের নির্দেশক্রমেই পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সদস্য পরিচালিত হন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত পার্লামেণ্টে [illegible]ীত হবার আগে

রাজনৈতিক দলে তা আলোচিত ও গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা স্বভাবতই পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্যের থাকে না। ফলে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এখন কমে গিয়ে সেটা মন্ত্রিসভার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। মন্ত্রিরা যে প্রস্তাব দেন পার্লামেন্ট সেটিকে প্রায় অন্ধভাবে সমর্থন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এই প্রথার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানকার আইনসভা সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে যেতে পারে না। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের সংবিধান কেন্দ্রীয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষমতার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট এই ক্ষমতার বাইরে কোন বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারগুলি কোন আইন তৈরী করলে সেটিকে সংবিধান বহির্ভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সেখানকার প্রধান বিচারালয়ের আছে। সেখানে শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদাধিকারী প্রেসিডেন্ট 'কংগ্রেস' অর্থাৎ আইনসভার সদস্য নন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁকে গদিচ্যুত করার ক্ষমতাও আইনসভার নেই।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন-সভার স্বরূপ

২। আইনসভার কাজ (Functions of the Legislature) :

আইনসভার প্রধান কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়নের কাজটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি হচ্ছে, যে আইনটি প্রণীত হবে সর্বপ্রথমে তার মূল বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, এই নির্ধারিত বিষয়বস্তুটিকে আইনের আকারে রূপ দেওয়া।

আইনের মূল বিষয়বস্তু নির্ধারণ ও তাকে বাস্তবে রূপায়িতকরণ

আইনসভার সদস্যরা যে আইন প্রণীত হতে চলেছে তার মূল বিষয়বস্তু স্থির করেন। আইনসভার সদস্যরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। কাজেই তাঁরা জনমতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। আইন-সভায় তাঁরা যে মতামত প্রকাশ করেন সেটি জনমতেরই অভিব্যক্তি। আইন সভার সদস্যরা প্রস্তাবিত আইন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে জনমতকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করেন।

মূল বিষয়বস্তুটিকে আইনের আকারে রূপ দেওয়া বিশেষজ্ঞদের কাজ। আইনসভার প্রতিনিধিদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট বিষয়টিকে জেনে নিয়ে বিশেষজ্ঞরা সেটিকে বিলের আকারে রূপ দেন। আইনসভার যথা নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সেটি আইন সভার অধিকাংশ সদস্যদের দ্বারা গৃহীত হওয়ার পর

রাষ্ট্র-প্রধানের সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। তাঁর সম্মতিলাভের পর বিলটি আনুষ্ঠানিক ভাবে আইনে পরিণত হয়।

আইনসভার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করা। পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণের কাজ আইনসভার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে করা সম্ভব। কারণ, এখানে মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য এবং যৌথভাবে তাঁরা আইন-সভার কাছে দায়ী থাকেন। আইনসভায় তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাস হলে তাঁরা পদত্যাগ করতে বাধ্য। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে শাসন বিভাগকে পরিচালিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আইনসভা সরকারী কার্যের সমালোচনা ইত্যাদি করে সরকারকে অপ্রত্যক্ষভাবে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করে।

শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ

আইনসভা সাধারণতঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, জাতীয় অর্থের নিয়ন্ত্রণ প্রয়াস ইত্যাদির সাহায্যে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন।

অনেক রাষ্ট্রে আইনসভার বিচার সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতাও থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের লর্ডস্ সভা (House of Lords) সেখানকার উচ্চতন আদালতও বটে। অনেক রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চতন কক্ষ, রাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চ কর্মচারিদের বিচার (Impeachment) করার অধিকার আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য নন এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে তাঁকে গদিচ্যুত করা যেতে পারে না। কিন্তু প্রেসিডেণ্টের নিয়োগ, সন্ধি ইত্যাদি ক্ষমতা আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

বিচারসংক্রান্ত কাজ

"সমস্ত বড অভিযোগের বিচার ক্ষমতা সিনেটের থাকবে" ("The Senate shall have the sole power to try all impeachments.")। সেখানকার আইনসভার নিম্নতন কক্ষ (House of Representatives)—এই অভিযোগ আনার অধিকারী এবং সিনেট তার বিচার করবে। ভারতের সংবিধানেও প্রেসিডেণ্টকে ইমপীচ করবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টকে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আইনসভার সদস্যদের সদস্য হিসেবে অধিকার এবং আচরণ সংক্রান্ত বিচারের কাজও আইনসভা করে থাকে।

বিগত বৎসরের সরকারী আয়ব্যয়ের আলোচনা এবং আগামী বৎসরের রাজস্ব নীতি এবং ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করা আইনসভার অন্যতম প্রধান

কাজ। আইনসভার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন নতুন কর ধার্য করা যেতে পারে না। ইহা ছাড়া, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ প্রভৃতির উৎস থেকে সরকারের যে আয় হয় তার জন্যও সরকারকে আইনসভার অনুমোদন নিতে হয়। বিভিন্ন খাতে ব্যয়বরাদ্দও আইনসভার অনুমোদন সাপেক্ষ।

সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ

কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভার কিছু নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ এবং রাজ্যগুলির আইনসভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়। সুইজারল্যাণ্ডে আইন-সভার নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচুর ক্ষমতা রয়েছে। সেখানকার রাষ্ট্রপতি Chancellor তো আইন সভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ই, সেখানকার মন্ত্রিসভার সদস্যরা (Members of the executive Council), এমন কি বিচারপতিরাও আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন।

নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডিয়াম (Presidium) নামক সংস্থার সদস্যরা সেখানকার আইনসভার (Supreme Soviet) সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

সংবিধান সংক্রান্ত কাজও আইনসভার থাকে। ভারতীয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার এক বিশেষ ও নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংবিধান পরিবর্তিত করার ক্ষমতা আছে। অবশ্য ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ রীতি অনুসরণ করতে হয় না। যেভাবে পার্লামেণ্ট সাধারণ আইন তৈরী করে ঠিক সেই ভাবেই পার্লামেণ্ট সংবিধান সংক্রান্ত আইনও তৈরী অথবা পরিবর্তন করতে পারে।

সংবিধান সংক্রান্ত কাজ

৩। আইনসভার গঠন (Organisation of the Legislature) :

আধুনিক কালে অধিকাংশ রাষ্ট্রের আইনসভা দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট—উচ্চতন কক্ষ এবং নিম্নতন কক্ষ। ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। গ্রীস, তুরস্ক, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট।

দ্বিকক্ষ ও এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা

ফরাসী লেখক আবিসিয়ে, ইংরেজ দার্শনিক বেন্থাম, প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কি প্রভৃতি চিন্তানায়কেরা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার বিরোধী হলেও আজকাল দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভাই রাষ্ট্রের সুষ্ঠু আইন প্রণয়নের জন্য

অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়েছে। ইংলণ্ডে ক্রমওয়েলের শাসনকালে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রচলন করা হয়। পরে দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পুনঃ প্রবর্তন করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের পর সেখানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কিছুদিনের জন্য চালু করা হয়। কিন্তু কয়েক বৎসর পর আবার সেখানেও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কনফেডারেশনের আমলে আইনসভা ছিল এক কক্ষবিশিষ্ট, কিন্তু পরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, অনেক রাষ্ট্রই এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে আইন প্রণয়নের কাজে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলেও এই প্রথার কতকগুলি অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্যই এই রাষ্ট্রগুলি শেষ পর্যন্ত দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়।

এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বৈশিষ্ট্য (Some features of Unicameral Legislature): আইনসভার দুটি কক্ষের নিম্নতন কক্ষটি জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকারের অধিকার প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই প্রচলিত।

নির্বাচক মণ্ডলী ও ভোটদান প্রথা

নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রের সীমাকে কয়েকটি ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে আইনসভার নিম্নতন কক্ষের সদস্য হন। এই নির্বাচন সাধারণতঃ গোপন ভোট দান প্রথায় (Secret ballot system) পরিচালিত হয়।

আইনসভার প্রতিনিধিরা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় অতিক্রান্ত হলে আবার নতুন করে নির্বাচনের কাজ শুরু হয়। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পক্ষে এই নিয়ম একান্ত প্রয়োজনীয়। খুব বেশী সময় ধরে সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকলে প্রতিনিধিদের পক্ষে গণসংযোগ হারিয়ে ফেলা স্বাভাবিক এবং জনস্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

কার্যকাল

ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় সদস্যরা পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ব্রিটিশ কমনস্‌সভার সদস্যরাও পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। অবশ্য আজকাল মন্ত্রিসভা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের আগেই আইনসভাকে বাতিল (Dissolve) করার ক্ষমতা শাসন কর্তৃপক্ষের

হাতে থাকে। ভারতে রাষ্ট্রপতির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্ষমতা রয়েছে। তিনি এই ক্ষমতার প্রয়োগ করলে মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারেই তা করে থাকেন। আইনসভা এবং শাসন বিভাগের মধ্যে কোন মতবিরোধ ঘটলেই অবশ্য এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় এবং আইনসভা বাতিল হলে নতুন করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় অবশ্য প্রেসিডেণ্টের আইনসভাকে বাতিল করার ক্ষমতা নেই। সেখানে আইনসভার সদস্যরা সংবিধান নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সদস্যপদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আইনসভার প্রতি দায়িত্ব

মন্ত্রিসভা শাসিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা সাধারণতঃ নিম্নতন কক্ষের প্রতি যৌথভাবে দায়ী থাকেন। নিম্নতন কক্ষের অনাস্থা প্রস্তাবে তাঁরা পদত্যাগ করেন। অবশ্য মন্ত্রিসভা যদি বুঝতে পারেন তাঁদের কাজের পিছনে জনসমর্থন রয়েছে তবে তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা বাতিল করার পরামর্শ দেন এবং নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য নন এবং তিনি সভার কাছে দায়ীও থাকেন না। অনাস্থা-সূচক প্রস্তাব এনে তাঁকে পদচ্যুত করা যেতে পারে না।

উর্ধতন পরিষদ (Upper Chamber)ঃ আইন সভার উর্ধতন পরিষদ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিন্ন পদ্ধতিতে গঠিত হয়। ব্রিটেনে লর্ডস্ সভার (House of Lords) অধিকাংশ সদস্য উত্তরাধিকারসূত্রে আইনসভার সদস্যপদ পেয়ে থাকেন। এই সভার সদস্য সংখ্যা আট শতেরও কিছু বেশী। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্টের আইন অনুসারে লর্ডস সভার ক্ষমতা অনেক খর্ব করা হয়েছে। লর্ডস্ সভা আদৌ থাকা উচিত কিনা অথবা পরিবর্তিত ও সংশোধিত অবস্থায় থাকবে—এইটিই এখন ব্রিটেনের সংবিধানগত তর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

গ্রেট ব্রিটেনে লর্ডসভার সংগঠন ও ক্ষমতা

মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে সেখানকার উর্ধতন সিনেটের সদস্যরা নির্বাচিত হন। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য সমানসংখ্যক সিনেটের সদস্য—প্রতিরাজ্য থেকে দুজন করে—নির্বাচন করার অধিকারী। সিনেটের সদস্যরা এখন প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তাঁদের কার্যকাল ছয় বৎসর মাত্র। সমস্ত সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্রতি দুই বৎসর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের সংগঠন ও ক্ষমতা

পৃথিবীতে যত উচ্চতন আইন পরিষদ আছে তার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতার অধিকারী। সিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিম্নতন পরিষদ হাউস অব রেপ্রেসেন্‌টেটিভস্ (House of Representatives)-এর মতই আইন প্রণয়ন করার ব্যাপারে সমান ক্ষমতার অধিকারী। কেবলমাত্র অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে সিনেটের ক্ষমতা House of Representatives-এর চাইতে কিছু কম। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে অর্থ সংক্রান্ত বিল প্রথমে House of Representatives-এ উত্থাপিত হতে হবে। কিন্তু উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের নিয়োগ এবং সন্ধি ইত্যাদির অনুমোদন ব্যাপারে সিনেটকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যা House of Representatives-এর নেই।

ভারতে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের উচ্চতন কক্ষের নাম রাজ্যসভা ও নিম্নতন কক্ষের নাম লোকসভা। রাজ্যসভার সদস্য সংখ্যা অনধিক ২৫০। এর মধ্যে কলা, বিজ্ঞান, সমাজ সেবার পারদর্শী লোকদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি ১২ জন সদস্যকে মনোনয়ন করেন। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সংস্থা। এই সভার মোট সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্রতি ২ বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতে উচ্চতন কক্ষের গঠন ও ক্ষমতা

ভারতের রাজ্যসভার সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। কিন্তু যে সব কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নেই তারা একটি নির্বাচন সংস্থার দ্বারা রাজ্যসভার প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা নেই। উত্তরপ্রদেশ রাজ্যসভায় ৩৪জন প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারী কিন্তু ঐ একই সভায় আসামের প্রতিনিধি সংখ্যা মাত্র ৭ জন।

ভারতে রাজ্যসভা লোকসভা অপেক্ষা কম শক্তিশালী। মন্ত্রিপরিষদকে লোকসভার কাছেই দায়ী করা হয়েছে। তাছাড়া, আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সংবিধানের বিধান অনুসারে উভয় পরিষদ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশী হবার জন্য কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটলে শেষ পর্যন্ত যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়ে থাকে। অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারেও রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার চাইতে অনেক কম।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against Bi-Cameral Legislature) : দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইন-

সভার প্রধান সুবিধা এই যে, নিম্নতন কক্ষে কোন বিল আলোচিত হওয়ার পর উচ্চতন কক্ষে তার বিভিন্ন দিক পুনর্বিবেচিত হয় এবং নিম্নতন কক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিলের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা দ্বিতীয় পরিষদ কর্তৃক সংশোধিত হতে পারে।

আইন বিল বিভিন্ন দিক হতে বিবেচনা ও সংশোধনের সুযোগ থাকে

নিম্নতন কক্ষের সদস্যরা সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। তাঁদের পক্ষে কোন এক শক্তিশালী নেতার প্রভাবে অথবা সাময়িক উত্তেজনার বশীভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমত অবস্থায় আইন প্রণীত হলে দেশের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এই অশুভ সম্ভাবনা নিরসন হতে পারে যদি বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থ সমন্বিত আর একটি কক্ষের সদস্যদের দ্বারা আইনটির সমস্ত দিক বিবেচিত হয়। তা ছাড়া, একটি কক্ষে বিলটি আলোচিত হবার জন্য যে সময় অতিক্রান্ত হয় তার ফলেও আইনসভার সদস্যরা আলোচ্য বিল সম্বন্ধে আরও চিন্তা করার সময় পান ও দেশের জনসাধারণ সংবাদপত্র, সভাসমিতির মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পান।

দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার আর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে—বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ। আইনসভায় একটি মাত্র কক্ষ থাকলে সেখানে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ই প্রতিনিধি পাঠাবার সুযোগ পায়। কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে গঠিত আইসভাকে যথার্থ গণতন্ত্রসম্মত বলা যায় না। বিভিন্ন শ্রেণী ও স্বার্থের মধ্যে সংঘাত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রায়শঃই দেখা যায়। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেরই জাতীয় আইনসভায় তাদের বক্তব্য উত্থাপনের সুযোগ অন্ততঃ থাকা উচিত, অন্যথায় গণতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে পর্যবসিত হতে পারে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য তাদের জনসংখ্যার সংখ্যানুসারে উর্ধ্বতন কক্ষে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ

বিভিন্ন ব্যবসায়ী বা শিল্পপতি সম্প্রদায় বা অন্যান্য ধনিকগোষ্ঠীর উচ্চতন কক্ষে প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধা থাকায় এই কক্ষ স্বভাবতই সর্বপ্রকার প্রগতির পথে বাধাস্বরূপ কাজ করে। অনেকে মনে করেন উচ্চতন কক্ষের এই রক্ষণশীল মনোভাবের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। দ্রুতগামী গাড়ির 'ব্রেক' না

উচ্চতন কক্ষের রক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা

থাকলে তাতে হঠাৎ বিপদের সম্ভাবনা থাকে। উচ্চতন কক্ষ তার রক্ষণশীলতা দিয়ে এই 'ব্রেকে'র কাজ করবে। দ্রুততা ভাল কিন্তু হঠকারিতা ভাল নয়। নিম্নতন কক্ষ গতিশীল আর উচ্চতন কক্ষ স্থিতিশীল। উভয় পরিষদের এই বিপরীতমুখী প্রবণতা রাষ্ট্রীয় জীবনের এক সুষ্ঠু এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

কলা, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের সাহায্য ও পরামর্শ সরকার মাত্রেরই গ্রহণ করা উচিত। এঁরা সাধারণতঃ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে চান না।

জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়ার সুবিধা

কিন্তু এঁদের সাহায্য ও সুপরামর্শ থেকে বঞ্চিত থাকা জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর। এমত অবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মনোনয়নের দ্বারা এই সব জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিদের আইনসভার সদস্য পদে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যেহেতু নিম্নতন কক্ষ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সংস্থা, কিছুসংখ্যক গুণী বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে সহজেই উচ্চতন কক্ষে মনোনীত সভ্য হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতন কক্ষের প্রয়োজনীয়তা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে অনেকে মনে করেন। জাতীয় স্বার্থ এবং অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের সমন্বয়সাধন করাই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র আইনসভা থাকলে অধিক জনসংখ্যা সমন্বিত অঙ্গরাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির দ্বারা ক্ষুদ্রতর অঙ্গরাষ্ট্রগুলির উপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবার সম্ভাবনা থাকে। এমত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। তাই প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি উর্ধতন কক্ষের অবস্থান যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিতর্ক ও আলোচনার মাধ্যমে কোন এক বিষয় স্বীকৃত হয় বলে অনেকে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভাকে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার উপযোগী বলে মনে করেন। তাছাড়া, আইনবিভাগের কার্য বৃদ্ধির জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উপযোগীতাকে অস্বীকার করা যায় না।

উচ্চতন কক্ষের বিপক্ষে যুক্তিঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে পূর্বোক্ত জোরালো যুক্তি থাকা সত্ত্বেও বহু মনীষী ও প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই প্রথার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

উচ্চতন কক্ষের সদস্যরা প্রায়শঃই ধনী ও বিভিন্ন প্রকারের স্বার্থ সম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত হন, তার ফলে এই কক্ষ সাধারণতঃ প্রতিক্রিয়াশীল

কক্ষে পরিণত হয়। নিম্নতন কক্ষের প্রগতিমূলক প্রতিটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করাই যেন উচ্চতন কক্ষের কাজ। আজকের দিনে জনমত সদাজাগ্রত।

উচ্চতন কক্ষের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব

আইনসভায় বিল আলোচিত হবার সময় বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমে তাদের বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন। সুতরাং আইনসভার সদা ঘূর্ণায়মান চাকার জন্য যদি কেবল 'ব্রেকে'র দরকার হয় তবে সে অভাব পূরণ করবেন জনসাধারণ। আইনসভার পৃথক কক্ষ সৃষ্টি করে অযথা বিলম্ব ও বিতর্কের অবতারণা করে আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করা নিরর্থক। মনোনয়ন অথবা শ্রেণীবিশেষের প্রতিনিধিদের দ্বারা পৃথক পৃথক শ্রেণীর জন্য আইন প্রণয়ণকে এক হিসেবে গণতন্ত্র বিরোধীও মনে করা যেতে পারে।

জাগ্রত জনমতের যুগে উচ্চতন কক্ষের প্রযোজনীয়তা

ফরাসী লেখক আবিসিয়ে (*Abbe Sieyes*) বলেছেন যে, "উচ্চতন কক্ষ যদি নিম্নতন কক্ষের সঙ্গে একমত না হতে পারে তা হলে তা ক্ষতিকর এবং যদি একমত হয় তা হলে সেটি নিষ্প্রয়োজনীয়" (If a second chamber dissent from the first, it is mischievous; if it agrees with it, it is superfluous)। প্রায় প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে উচ্চতন পরিষদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। নিম্নতন পরিষদই শেষ পর্যন্ত তার সিদ্ধান্তকে বলবৎ করে। এ দিক থেকে বিচার করলে আমরা আবিসিয়ের উক্তির যাথার্থ উপলব্ধি করতে পারি।

আবিসিয়ের মতে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতন কক্ষের নিষ্প্রয়োজনীয়তা

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার অপরিহার্যতা সম্পর্কেও অনেক লেখক সংশয় প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা নির্ধারণ করে এবং উচ্চ বিচারালয় সংবিধানের ব্যাখ্যা করে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উভয় সরকারের অধিকার সংরক্ষণের বৈশিষ্ট্য নিহিত আছে, তারজন্য উচ্চতন কক্ষের অবস্থিতি নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া, রাজনৈতিক দলের সভ্যরাই বর্তমান যুগে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। আইনসভার যেকোন কক্ষেই তারা নির্বাচিত হন না কেন, দলের নির্দেশেই তাঁরা পরিচালিত হন। সুতরাং বিশেষ করে অঙ্গরাজ্যের সদস্য হিসেবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা তাঁদের থাকে না। কোন একটি অঙ্গরাজ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ক্ষমতাশালী হয়ে যাতে সরকার পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার না পায়

তার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে উচ্চতন কক্ষে সমান সংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ভারতের মত যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে উচ্চতন কক্ষে রাজ্যগুলির সম প্রতিনিধিত্ব নেই সেখানে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে অনেকে মনে করেন না।

৪। সার্বভৌম ও অসার্বভৌম আইনসভা (Sovereign and Non-Sovereign Law-Making Bodies):

আইনসভার ক্ষমতার দিক থেকে তাকে সার্বভৌম (Sovereign), এবং অসার্বভৌম (Non-Sovereign)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

সাধারণতঃ এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভা সার্বভৌম। গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেণ্ট যে আইন তৈরী করে তাকে কোন বিচারালয় অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না। তাছাড়া, সেখানে সাংবিধানিক আইনও পার্লামেণ্ট সাধারণ ভাবেই প্রণয়ন ও পরিবর্তন করতে পারে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এত চূড়ান্ত ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে আমরা একে সার্বভৌম আইনসভা (Sovereign Law making Body) বলতে পারি। সুতরাং এই আইনসভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে: (১) এই আইনসভা যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে; (২) সাধারণভাবে সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করতে পারে এবং (৩) ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট প্রণীত আইন কোন বিচারালয় অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে না।

সার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা অসার্বভৌম আইনসভা (Non-Sovereign Law-making Body), কারণ এখানকার আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসকে সংবিধান নির্দিষ্ট বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়ন করতে হয়। সুপ্রীমকোর্ট এই আইনসভায় প্রণীত আইন সংবিধান বহির্ভূত বলে মনে করলে তাকে অবৈধ ঘোষণা করে বাতিল করে দিতে পারেন। তাছাড়া, কংগ্রেস প্রণীত আইনকে রাষ্ট্রপতি ভিটো প্রয়োগ করে সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন। এই সব কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভাকে অসার্বভৌম আইনসভা (Non-Sovereign Law-making Body) বলা যেতে পারে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অসার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি। অসার্বভৌম-আইনসভা (১) নিজস্ব কোন ক্ষমতার বলে আইন প্রণয়ন করতে পারে না, (২) সংবিধান নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তাকে আইন প্রণয়ন

অসার্বভৌম আইনসভার বৈশিষ্ট্য

করতে হয় এবং (৩) এই আইনসভার প্রণীত আইন চূড়ান্ত বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হতে পারে।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, রাজাসহ পার্লামেণ্টকে সার্বভৌম ক্ষমতা বললেও পার্লামেণ্টের ক্ষমতা নানা কারণে আজ কমে গিয়েছে। পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আজ মন্ত্রিসভার কুক্ষিগত। তাছাড়া, কাজের পরিধি বৃদ্ধির জন্য আইনসভার পক্ষে আইনের সমস্ত বিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না। আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ অনিবার্যভাবে শাসন বিভাগের হাতে এসে পড়েছে।

৫। শাসন বিভাগ (Executive):

শাসন বিভাগ শব্দটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। বৃহত্তর অর্থে শাসন বিভাগ বলতে রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক বা পরিচালকবৃন্দ থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ছোট-বড় সকল কর্মচারিগণকে বোঝায়।

শাসন বিভাগের দুটি পৃথক অর্থ

সংকীর্ণ অর্থে এই শব্দটি কেবলমাত্র রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক বা পরিচালকবৃন্দকে বোঝায়। শেষোক্ত অর্থে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে সেখানকার শাসন বিভাগ বলা যেতে পারে। এই অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর মন্ত্রি-সভাকে নিয়ে শাসন বিভাগ গঠিত বলা চলে। বৃহত্তর অর্থে, শাসন বিভাগ বলতে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা অথবা প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত উচ্চপদস্থ ও সাধারণ কর্মচারীবৃন্দকে বোঝায়।

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ ও স্বরূপ (Classification and nature of the executive): কোন কোন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব দেখা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে রাজা বা রানী নামসর্বস্ব কর্তৃপক্ষ এবং মন্ত্রিসভা প্রকৃত শাসন

নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ

বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। এখানে রাজা বা রানী নামে মাত্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী কিন্তু সরকার পরিচালনায় প্রকৃত দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের হাতে। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, ভারতে রাষ্ট্রপতি নামসর্বস্ব কর্তৃপক্ষ এবং প্রধানমন্ত্রীসমেত মন্ত্রি-সভা প্রকৃত শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। অবশ্য ভারতে রাষ্ট্রপতির সংবিধান-গত ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে অনেকে তাঁকে শুধু নামসর্বস্ব কর্তৃপক্ষ বলতে রাজী

নন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, নামসর্বস্ব ও প্রকৃত শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে পার্থক্য পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় নাম সর্বস্ব এবং প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদাধিকারী; আবার তাঁরই উপর শাসনকার্য পরিচালনার প্রকৃত দায়িত্ব অর্পিত আছে।

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের ভিত্তিতেও অনেক সময় উক্ত কর্তৃপক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়।

পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

পার্লামেণ্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় প্রকৃত কর্তৃপক্ষ, অর্থাৎ মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্য হওয়ার জন্য শাসনবিভাগের সঙ্গে আইন বিভাগের একটি ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র বিদ্যমান থাকে। এখানে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের কাছে দায়ী এবং আইন বিভাগের সম্মতির উপর তাদের স্থায়িত্ব ও কার্যকাল নির্ভর করে। আইন বিভাগের অধিকাংশ সদস্য এবং শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ মন্ত্রিসভা সাধারণতঃ এক রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ার জন্য দুটি বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়। মন্ত্রিসভার সদস্যদের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত এবং তাঁদের নেতৃস্থানীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রভাবের জন্য মন্ত্রিসভার সংহতি রক্ষাও সম্ভব হয়।

প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় প্রেসিডেণ্ট আইনসভার সদস্য নন। তিনি পৃথকভাবে জনসাধারণ কর্তৃক অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। শাসনকার্য পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত। পরামর্শদাতা মন্ত্রিসভার সাহায্যে তিনি এই কাজ পরিচালনা করে থাকেন।

প্রেসিডেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

তিনি আইনসভার সদস্য না হওয়ার জন্য আইনসভাকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন না। আইনসভাও শাসনবিভাগের প্রভাবমুক্ত হওয়ার জন্য ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যকরণ নীতির বহুলাংশে প্রয়োগ এই শাসনব্যবস্থায় সম্ভব হয়।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় (১) মন্ত্রিমণ্ডলীর সভ্যেরা আইন বিভাগের সদস্য হওয়ার জন্য এবং (২) তারা আইনসভার নিকট দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে জন প্রতিনিধিমূলক আইনসভা কর্তৃক শাসন বিভাগকে পরিচালিত করা সম্ভব হয়। আবার (১) উভয় বিভাগে একই রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকায় এবং (২) প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে

গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের জন্যই বহু-পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সফলতার সঙ্গে কার্যকরী করা সম্ভব হয়েছে।

৬। শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পদ্ধতি (Methods of appointment of the Executive):

শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেব নিয়োগের জন্য চারটি প্রথার উল্লেখ করা যেতে পারে।

একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে অথবা অন্য কোন কৌশলে শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করা হয়। পাকিস্থানে আয়ুব খাঁ এইভাবে শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করেন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশগুলিতে সৈন্যাধ্যক্ষরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করেন। জার্মানীতে হিটলার ভয়েমার সংবিধানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নাজী পার্টি ও নিজেকে চূড়ান্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সৈন্যবাহিনীর উপর কর্তৃত্বের সুযোগ নিয়ে অথবা কৌশলে ক্ষমতা হস্তগত করা

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির গুরুত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচনের সম্ভাবনাকে বন্ধ করার জন্য অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের পথ গ্রহণ করা হয়। জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা অনেক সময় যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচন সম্ভব হয় না। তার অনেক সময় কৌশলী অথবা বাগ্মী রাজনৈতিক নেতাদের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে অযোগ্য ব্যক্তিদেরও নির্বাচিত করে থাকে। রাষ্ট্রপতির মত গুরুত্বপূর্ণ পদে একরূপ ব্যক্তি নির্বাচিত হলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে এই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের নিয়ম অনেকটা শুষ্ক নিয়মতান্ত্রিক বিধিতে পর্যবসিত হয়েছে। সেখানে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করেন এবং নির্বাচনী সংস্থায় সদস্যরাও রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নির্বাচনী দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন। ফলে নির্বাচনী সংস্থার নির্বাচনের পরেই কোন্ পার্টির মনোনীত প্রার্থী রাষ্ট্রপতি হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হতে পারেন। বলিভিয়া, পেরু, ব্রেজিল প্রভৃতি রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা রাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের

নিয়োগ করা হয়। ভারতে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালদের নিয়োগের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচনের প্রস্তাবও গণপরিষদে হয়েছিল। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধান জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হলে তাঁর পক্ষে শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই প্রথা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে রাষ্ট্র-প্রধান নিয়মতান্ত্রিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধান হলে অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলে তাঁকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

আইনসভার দ্বারাও অনেক সময় রাষ্ট্রের কর্মকর্তারা নির্বাচিত হন। সুইজারল্যাণ্ডে ফেডারেল কাউন্সিলের সদস্যদের আইনসভার দুটি কক্ষ মিলিত ভাবে নির্বাচিত করে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রধানকে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যরা নিয়োগ করেন। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের নেতাকে রাষ্ট্র-প্রধান প্রথমে প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে সাধারণতঃ আইনসভার সদস্যদের মধ্য থেকে অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে রাজনৈতিক দল নির্বিশেষে মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন

আইনসভার দ্বারা নির্বাচন

৭। শাসন বিভাগের কাজ (Functions of the Executive):

শাসনবিভাগের কার্যাবলীকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (i) শাসন সংক্রান্ত কাজ, (ii) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ, (iii) পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ, (iv) সামরিক বিভাগের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ, (v) অর্থ সংক্রান্ত কাজ এবং (vi) বিচার সংক্রান্ত কাজ।

(i) শাসন সংক্রান্ত কাজ (Administrative functions): আইনবিভাগ যে আইন প্রণয়ন করে শাসনবিভাগের কাজ সেই আইনকে চালু করা। আইনভঙ্গকারীকে বিচারালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা এবং বিচারকের প্রদত্ত রায় অনুসারে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি শাসন-বিভগের কাজ। এই কাজগুলি শাসনবিভাগের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত

কাজের অন্তর্ভুক্ত। আজকের দিনে কেবলমাত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা রাষ্ট্রের কাজ বলে বিবেচিত হয় না। মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বর্তমানযুগে রাষ্ট্র জাতীয়জীবনের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করছে। রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক সরকারের প্রশাসনিক সমস্যাও জটিল আকার ধারণ করছে। ভারতে জাতীয় সম্প্রসারণমূলক পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ার পর স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে উক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত সরকারী কর্মচারিদের সমন্বয় সাধনের প্রশ্ন এক গুরুতর আকার ধারণ করেছে। প্রদেশ, জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মচারিদের মধ্যে কাজের সঙ্গতি রক্ষা করা এবং দ্রুততার সঙ্গে স্থানীয় পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করা আজ এক বিরাট সমস্যা অথচ এই সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধানের উপর যে কোন পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। আমাদের দেশে এই উদ্দেশ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় গবেষণা হওয়া উচিত।

(২) **আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ** (Legislative functions): প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, বর্তমানে পার্লামেন্ট পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় যেহেতু আইনসভা মন্ত্রিসভার নির্দেশে পরিচালিত হয় সেহেতু সেখানে অধিকাংশ আইনই সরকারী আইন এবং স্বভাবতই শাসনবিভাগের তরফ থেকে আইনের যে খসড়া তৈরী হয় আইনসভা সেইটিই প্রায় গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইনসভায় বাণী প্রেরণ করে এবং এই বাণীতে তিনি কি জাতীয় আইন প্রণীত হওয়া উচিত তার ইঙ্গিত দেন।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভার কাজ বেশী হওয়ায় এবং প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আইনসভার পক্ষে আজকের দিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আইনের সমস্ত বিধান তৈরী করা সম্ভব হয় না। আইনসভা মোটামুটি আইনের প্রধান ধারাগুলি তৈরী করে দেয় এবং তার প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধানগুলি তৈরী করার ভার থাকে শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের হাতে। বর্তমানে প্রায় সমস্ত পার্লামেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় এই নীতি অনুসৃত হয়।

তৃতীয়তঃ, অধিকারপ্রাপ্ত (Delegated power) ক্ষমতার বলে শাসনবিভাগের কর্মচারিরা অনেক সময় শাসন সংক্রান্ত নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে।

চতুর্থতঃ, জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ অনেক সময় সাময়িকভাবে আইন চালু করে। এ রকম আইনকে অর্ডিন্যান্স (ordinance) বলা হয়।

(iii) **পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ** (Deplomatic functions): আজকের দিনে এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সরকারের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজের গুরুত্ব ও পরিধিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। এই কাজের জন্য শাসনবিভাগকে পররাষ্ট্র সম্পর্কীয় নীতি নির্ধারণ করতে হয় এবং এই ব্যাপারে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ক্ষমতা সর্বত্রই স্বীকৃত। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার নির্ণীত পররাষ্ট্রনীতি সাধারণভাবে আইনসভা কর্তৃক স্বীকৃত হওয়া প্রয়োজন। পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা থাকায়, এই ব্যাপারে শাসনবিভাগের ক্ষমতা দিন দিন বেড়ে চলেছে। পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট চালিত উভয় শাসনব্যবস্থাতেই রাষ্ট্র-প্রধানের বিদেশে দূত নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকে। বিদেশ হতে আগত দূতদের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করতে হয় এবং তাদের দ্বারা গৃহীত হতে হয়। সাধারণতঃ এই দূতদের মাধ্যমেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা হয়। বৈদেশিক দূতেরা অধীন তাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক নীতি ব্যাখ্যা ও প্রচার করার জন্য যে সব প্রতিষ্ঠান আছে, শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের তাদের কার্যাবলীর উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়।

(iv) **সামরিক বিভাগ পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ** (Military functions): কোন বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী পরিচালিত করতে হলে রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাদের নির্দেশ ক্রমেই তা করা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে পদাতিক, নৌ এবং বিমান এই তিনটি বিভাগ থাকে। প্রত্যেক বিভাগের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ থাকেন যাঁদের পরামর্শ ক্রমে শাসনবিভাগীয় কর্তারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বা সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(v) **অর্থ সংক্রান্ত কাজ** (Financial functions): রাষ্ট্রের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা কোন দেশেই আজকাল সরকারের একমাত্র কাজ বলে বিবেচিত হয়না। বিভিন্নমুখী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা নিয়ে বর্তমানযুগে সকল সরকারকেই এগিয়ে আসতে হচ্ছে। এর জন্য সরকারের ব্যয়ভারও বেড়ে চলেছে। সরকারের ব্যয়ভার বাড়ার জন্য আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের গুরুত্বও দিন দিন বেড়ে চলেছে। কোন্ খাতে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা, বিভিন্ন বিভাগের খরচের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা, কর, শুল্ক ও

আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক ঋণ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করাও আজ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(vi) **বিচার সংক্রান্ত কাজ** (Judicial functions): রাষ্ট্রের উচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতিরা সাধারণতঃ রাষ্ট্র-প্রধানের দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে রাষ্ট্র-প্রধান গুরুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে ক্ষমা করতে পারেন অথবা দণ্ডের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে পারেন।

মর্তেস্কু এবং কোন কোন ইংরেজ লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজার দণ্ড মার্জনা করার ক্ষমতা থাকা উচিত কিন্তু প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা থাকা উচিত নয়

৮। শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পারদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Some Requisites for the efficiency of the Executive Organ):

যথাযথভাবে বিভাগীয় কর্তব্য পালন করতে হলে শাসন কর্তৃপক্ষের কয়েকটি গুণ থাকা দরকার। আইন বিভাগের কাজ হচ্ছে আইন প্রণয়ন করা। শাসন বিভাগের কাজ সেই আইনকে চালু করা। আইন প্রণয়ন করতে হলে অল্পবিস্তর কিছু সংখ্যক লোকের প্রয়োজন—কারণ নীতি নির্ধারণের কাজ একজনের চাইতে বেশী লোক ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সেই নীতিকে যখন কাজে পরিণত করার প্রশ্ন আসে তখন ব্যক্তিবিশেষ বা খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তি সেই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অধিক সংখ্যক লোকের দ্বারা কোন নীতিকে কার্যকরী করতে গেলে নানা অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হতে পারে। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, "শাসনবিভাগীয় ক্ষমতাকে কতকগুলি সম ক্ষমতাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের মধ্যে ভাগ করে দিলে এই বিভাগ দুর্বল হয়ে পড়বে। বিশেষ করে বিপদকালীন অবস্থায় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্ন হবার সম্ভাবনা বেশী থাকায় যখন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তখন এই সম্ভাবনা বেশী করে দেখা যায়।"[1] সংক্ষেপে বলা যায়, দায়িত্ব ভাগ হলে সরকারও অনিবার্যভাবে দুর্বল

সংহতি ও দ্রুত সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা

1 "To organise the executive power by deviding it among a member of co-ordinate and equal authorities would necessarily lead to its enfeeblement, specially in times of crisis when promptness of decision and action may be essential to the preservation of the life of the State."—*Garner.*

হয়ে পড়বে। অধ্যাপক গার্ণার শাসন বিভাগের প্রয়োজনীয় গুণগুলির উল্লেখ করে বলেছেন, "এই কাজগুলি শাসনবিভাগের পারদর্শিতা সহকারে পালন করার জন্য প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে, দ্রুত সিদ্ধান্ত, উদ্দেশ্যের ঐক্য এবং কখনও কখনও প্রশাসনিক গোপনীয়তা" ("The prime requisites for efficiency in the discharge of such functions are, therefore, promptness of decision, singleness of purpose, and sometimes secrecy of procedure".—Garner)।

সংহতির প্রয়োজনীয়তা

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, পার্লামেণ্ট চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ও আইনসভার মধ্যে যে সহযোগিতা দেখা যায় সুষ্ঠুভাবে শাসন বিভাগের কাজ পরিচালনার জন্য তা একান্ত প্রয়োজন। প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার দলগত ঐক্য এবং মন্ত্রিসভা শাসন বিভাগের সংহতি সরকারকে বলিষ্ঠভাবে তার কার্যপ্রণালী রূপায়ণে সাহায্য করে। বাস্তব সমস্যাগুলির সঙ্গে শাসন বিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত; কাজেই শাসনবিভাগ এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সম্পর্কে আইনসভার সমর্থনের অনিশ্চয়তা থাকলে শাসনবিভাগের পক্ষে বলিষ্ঠভাবে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ বা তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হবে না। পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থায় আইনসভার সমর্থন সম্পর্কে শাসনবিভাগ কিছুটা নিঃসন্দেহ থাকে বলেই এক বিশেষ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ়তা সহকারে সরকারের কার্যাবলী পরিচালিত করতে সক্ষম হয়। এই সহযোগিতার অভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সময় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং শাসনকর্তৃপক্ষ যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হয়।

স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা

জাতীয় নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কার্যকালের কিছুটা স্থায়িত্ব থাকা প্রয়োজন। ফ্রান্সে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিসভার পরিবর্তন হওয়ার ফলে সরকারের নীতিও পরিবর্তিত হয় এবং এর ফলে সর্বাঙ্গীণ প্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। রাষ্ট্রের সমস্যাগুলির সাথে পরিচিত হতে হতে শাসন কর্তৃপক্ষের আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে যায়, ফলে শাসন বিভাগ তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে না। তাছাড়া, রাষ্ট্রের প্রধান কর্মকর্তাদের খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হলে দেশব্যাপী যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তা জাতীয় স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। অথচ শাসনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষের দীর্ঘকাল ধরে

শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাও গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত নয়। দীর্ঘ আয়ুকাল হলে আবার শাসন বিভাগের পক্ষে স্বৈরাচারী হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। অবশ্য শাসনবিভাগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বাচনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কার্যকাল পরিবর্তন গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সমস্ত সরকারী কর্মচারির কার্যকালও স্বল্পস্থায়ী হবে। প্রকৃত পক্ষে, প্রশাসনিক বিভাগের কর্মচারিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বজায় রাখা শাসনব্যবস্থায় একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত রাষ্ট্রেই এই জাতীয় কর্মচারিদের কাজের নিয়োগ, শর্ত, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী থাকে।

প্রশাসনিক কর্মচারিদের কার্যকালের স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তা

৯। বিচার বিভাগ (Judiciary):

আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, শাসন বিভাগ আইনকে চালু করে আর বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করে। সে কারণে বিচার বিভাগ তার কাজ যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে অপর দুই বিভাগের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। শাসন বিভাগ আইন বিভাগের প্রণীত আইনকে অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। সংবিধান বহির্ভূত আইন প্রণীত হলে সরকারের স্বৈরাচার হবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বিচার বিভাগের সততা ও যথার্থ বিবেচনা শক্তির উপর সরকারের কার্যাবলীর যাথার্থ অনেকাংশে নির্ভর করে। অধ্যাপক ল্যাস্কি যথার্থই বলেছেন "কিভাবে একটি রাষ্ট্র তার বিচারকার্য নির্বাহ করছে জানলে, তা থেকে সেই রাষ্ট্রের নৈতিক চরিত্রের রূপ আমরা অনেকটা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে সক্ষম হই।"[1]

বিচার বিভাগের কার্যাবলী (Functions of the Judiciary): আইন বিভাগের প্রণীত আইনগুলিকে ব্যাখ্যা করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। কোন ব্যক্তি সরকারী কর্মচারিদের দ্বারা অথবা অন্য ব্যক্তি দ্বারা অধিকারচ্যুত হলে বিচার বিভাগকে তার যথার্থ বিচার করতে হয়। এইভাবে বিচার বিভাগ আইনের যথোপযুক্ত প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে পারে

আইনের ব্যাখ্যা

1. "When we know how a nation state dispenses justice, We know with some exactness the moral character to which it can pretend."

—Laski

আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচার বিভাগ কর্তৃক নূতন আইনও সৃষ্টি হয়ে থাকে। বিশদ্‌ভাবে আইনের সমস্ত বিধান লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকা সম্ভব নয়। তাই বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক সময় তার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে বাধ্য হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইনের অভাবে বিচারপতিদের নিজস্ব বিচারশক্তি ও ন্যায়বোধের উপর নির্ভর করে রায় দিতে হয়। বিচারপতিদের নূতন নূতন ব্যাখ্যা এবং নির্দিষ্ট আইনের অভাবে নিজস্ব ন্যায়বোধের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায় অনুরূপ ক্ষেত্রে পরবর্তীকালের বিচারপতিরা যখন অনুসরণ করে অনুরূপ রায় দিয়ে থাকেন তখন কালক্রমে বিচারপতির সিদ্ধান্ত আইনের মর্যাদা লাভ করে।

নূতন আইন সৃষ্টি

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ সংবিধানের রক্ষক হিসেবে কাজ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি লিখিত ও অনমনীয় সংবিধান থাকে এবং এই লিখিত সংবিধানের বিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনসভাগুলি আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য আইনসভা যদি এমন কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে যেটি সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতার বাইরে, তাহ'লে বিচার বিভাগ সেই আইনকে সংবিধান বহির্ভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করে থাকেন। এইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন বিখ্যাত প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন, "বিচারকেরা যেটিকে সংবিধান বলেন সেইটিই সংবিধান" ("The constitution is what the judges say it is")। চতুর্দশ লুইয়ের রাষ্ট্র সম্বন্ধে তার উক্তির মত এটি একটি দম্ভোক্তি বলে মনে হলেও সংবিধানের ব্যাখ্যাতা হিসেবে বিচার বিভাগের গুরুত্ব এই উক্তি থেকে আমরা বুঝতে পারি।

সংবিধানের ব্যাখ্যা

বিচার বিভাগ সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করে। সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেরই বিচার বিভাগের হেভিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus), ম্যানডামাস (Mandamus), কুয়োওয়ারেন্টো (Quo warranto) প্রভৃতি হুকুমনামা জারি করার ক্ষমতা থাকে। এইগুলির বলে স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত যে-কোন ব্যক্তির আবেদন ক্রমে বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে বিচারের জন্য বিচারালয়ে হাজির হতে নির্দেশ দিতে পারেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচার বিভাগের সমস্ত আদালতগুলির শাসন সংক্রান্ত কাজ পরিচালনার দায়িত্ব উচ্চতন বিচারালয়গুলির উপর ন্যস্ত হয়। এগুলিকে বিচার বিভাগের প্রশাসনিক কাজ বলা যেতে পারে।

প্রশাসনিক কাজ

অনেক সময় নাবালকের সম্পত্তি বা কোন দাতব্য উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ

১০। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary):

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের অন্যতম রক্ষা কবচ বলে বিবেচিত হয়। বিচারকগণ যদি শাসন বিভাগ বা আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত না হন তাহলে তাঁদের পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। বিচারকগণ তাঁদের কাজের পরিচালনা, স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যদি সরকারের অন্যান্য বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন তাহলে নিরপেক্ষভাবে তাঁদের বিচারকার্য সম্পাদন করাও সম্ভব হয় না। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হলে ব্যক্তিস্বাধীনতাও অনিবার্যভাবে ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য কয়েকটি শর্তের একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে শর্তগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল:

প্রথমতঃ, বিচার বিভাগকে শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে বিচারকগণ প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বিচারকদের নির্বাচনের মাধ্যমে নিয়োগের ব্যবস্থা তাঁদের নিরপেক্ষ বিচারকার্য পরিচালনার পথে একটি প্রধান অন্তরায়। বিচারক যদি ভাবেন তার কোন রায়ের ফলে তাঁর জনপ্রিয়তা হারাবার সম্ভাবনা আছে যার ফলে তাঁর পুনর্নির্বাচন সম্ভব হবে না, তাহলে নিরপেক্ষভাবে তিনি বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন না। তাছাড়া, বিচারকার্য প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানী এবং স্বাধীন চেতা ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। জনসাধারণ উচ্ছ্বাসের দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনেক সময় উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচন করতে সক্ষম হয় না। তাই বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের ব্যবস্থা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

বিচারকদের অনেক সময় পরোক্ষভাবে আইন সভা কর্তৃক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থাও ত্রুটিপূর্ণ এই অর্থে যে (১) বিচার বিভাগকেও এই ক্ষেত্রে আইন সভার উপর নির্ভরশীল হতে হয় এবং (২) আইন সভার সদস্যরা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য, বিচারকদেরও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দলের আস্থাভাজন হওয়ার প্রয়োজন হয়।

আইনবিভাগ কর্তৃক নির্বাচন

পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্য বিচার বিভাগ যে কোন নির্বাচনের ভিত্তিতে নিযুক্ত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বিচারকগণ তাঁদের স্বাধীনতার জন্য শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হলেই তারা স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। এর ফলে অবশ্য বিচার বিভাগকেও শাসন বিভাগের কিছুটা আস্থাভাজন হতে হয়। তবে তার ফলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ রাষ্ট্র-প্রধান বিচারকদের নিয়োগ করলেও যোগ্যতা ও কয়েকটি নিয়মের ভিত্তিতেই নিয়োগকার্য সম্পাদন করা হয়। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকলেও, তাঁকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নীতি এই নিয়োগের ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়।

বিচারকগণ শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা তাঁদের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। শাসন কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি অনুসারে বিচারকগণের অপসারিত হবার সম্ভাবনা থাকলে তাঁদের পক্ষে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ না করে অথবা নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা অতিক্রম না করে বিচারকগণ যাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সংক্ষেপে বলা যায়, বিচারকদের চাকুরীর নিরাপত্তার উপর তাঁদের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। ভারতে পার্লামেন্টের তরফ থেকে এক বিশেষ সংখ্যাধিক্যে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করার পর, রাষ্ট্রপতির আদেশ অনুসারে তাঁকে পদচ্যুত করা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইম্‌পিচমেন্টের দ্বারা বিচারকদের পদচ্যুত করা হয়।

কার্যকালের স্থায়িত্ব

বিচারকগণ কোনরূপ প্রলোভন বা প্রভাবের দ্বারা যাতে প্রভাবিত না হন সেজন্য তাঁদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিচারপতিদের উপযুক্ত বেতন না দিলে বিজ্ঞ আইনজীবীরা এই দায়িত্ব গ্রহণে

অনিচ্ছুক হতে পারেন। পদের গুরুত্ব ও সামাজিক মর্যাদার জন্যও তাঁদের উপযুক্ত বেতনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

গ্রেটব্রিটেনে বিচার বিভাগীয় স্বাধীনতা

ইংলণ্ডে ১৭০১ সালে এক বিশেষ আইনের দ্বারা (Act of Settlement, 1701) বিচারকগণের স্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়েছে। তাঁরা রাজার দ্বারা নিযুক্ত হন এবং পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের তরফ থেকে রাজার কাছে এক যুক্ত আবেদন ব্যতীত তাঁদের পদচ্যুত করা যায় না।

ভারতের বিচার-বিভাগীয় স্বাধীনতা

ভারতে বিচারপতিদের অপসারণ করতে হলে পার্লামেণ্টের উভয় পক্ষের তরফ থেকে বিচারকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা বা দুষ্কৃতির জন্য অভিযোগ আনতে হবে। এই অভিযোগ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং ভোটের দ্বারা উত্থাপিত হয়ে সমগ্র সদস্যদের মোট সংখ্যাধিক্যের দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। এইভাবে অভিযোগ উত্থাপিত ও সমর্থিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে বিচারকদের অপসারিত করা হয়। তাছাড়া, সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সংবিধানে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে এবং তা প্রত্যেক বৎসর পার্লামেণ্টের সদস্যদের ভোটের উপর নির্ভর করে না। এইভাবে ভারতের সংবিধানে বিচারকদের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১১। আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the legislature and the Executive):

ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতার কথা বলা হলেও কার্যতঃ সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এই তিনটি বিভাগের কাজ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক বিভাগ অপর বিভাগের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার সম্পর্ক

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইন সভার সদস্য। তাঁদের সমষ্টিগতভাবে আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। সুতরাং আইন সভায় অনাস্থা ভাজন হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভব হওয়ার ফলে এবং পার্লামেণ্টের কাজের পরিধি বৃদ্ধি হওয়ার

জন্য আইন বিভাগকে অনিবার্যভাবে শাসন বিভাগের উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছে। এখন কার্যতঃ শাসন বিভাগ অর্থাৎ মন্ত্রিসভাই আইন সভাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা ক্ষমতা স্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রত্যেক বিভাগ কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। এখানে রাষ্ট্রপতি আইন সভার সদস্য নন এবং আইন সভার কাছে দায়ী নন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করতে পারে না। প্রেসিডেন্ট আইন সভা প্রণীত আইনকেও সাময়িকভাবে নাকচ করে দিতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থার সম্পর্ক

সুইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ও প্রেসিডেন্ট চালিত শাসনব্যবস্থার সমন্বয় হয়েছে বলা যেতে পারে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা গ্রেট ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার সদস্যদের মত যৌথভাবে কাজ করেন না। তাদের নীতি বা কার্যক্রম আইন সভা কর্তৃক গৃহীত না হলে তারা পদত্যাগ না করে আইন সভার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন। সুতরাং এখানে মন্ত্রিসভা গ্রেট ব্রিটেনের মন্ত্রিসভার মত ক্ষমতা-সম্পন্ন নয়।

সুইজারল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে সম্পর্ক

১২। শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক (Relation between the Executive and the Judiciary):

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য বিচারকদের শাসন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শাসনবিভাগের প্রধান পদাধিকারী রাজা বা রাষ্ট্রপতির দ্বারাই বিচারকদের নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য শাসন-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি বা নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায় বিচারবিভাগের পক্ষে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

বিচার বিভাগকে শাসন-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হতে হয়

শাসন-কর্তৃপক্ষের প্রধান পদাধিকারীদেরও বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা হয়। সকল দেশেই তাঁদের আইনসভা কর্তৃক বিশেষ বিচারের ব্যবস্থা আছে। শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা অনেক সময় দণ্ডহ্রাস, প্রাণদণ্ড মকুব ইত্যাদি কিছু কিছু বিচার সংক্রান্ত কাজও করে থাকেন। বিচারপতিগণ শাসন সংক্রান্ত কাজও কিছু কিছু করে থাকেন। ট্রাষ্টি ও রিসিভার নিয়োগ

এবং নিজ বিভাগের পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ ইত্যাদি বিচার বিভাগের শাসন সংক্রান্ত কাজ বলা যেতে পারে।

গ্রেট ব্রিটেনে একই আইনব্যবস্থা শাসন বিভাগীয় কর্মচারি এবং সাধারণ নাগরিককে নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু ফ্রান্সে শাসনসংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য প্রশাসনিক কর্মচারিদের পৃথক বিচারালয়ে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

১৩। আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between the Legislature and the Judiciary):

যদিও আইন সভার কাজ আইন প্রণয়ন করা ও বিচার বিভাগের কাজ আইনের ব্যাখ্যা করা, তা সত্ত্বেও বিচার বিভাগকেও অনিবার্যভাবে কিছু কিছু আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করতে হয়। বিচার বিভাগ আইনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইনের ক্ষেত্রকে পরিবর্ধিত করে কার্যতঃ নূতন আইনই সৃষ্টি করে থাকেন। অনমনীয় শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বেশী। কারণ এই ব্যবস্থায় বিচার বিভাগই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা কর্তা। সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকারী হিসেবে আইনসভা প্রণীত আইনগুলির ভাগ্য নির্ধারণও অনেক সময় বিচার বিভাগের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। গ্রেট ব্রিটেনের বিচার বিভাগ এই অধিকার থেকে বঞ্চিত। পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার সেখানকার বিচার বিভাগের নেই।

আইন বিভাগকে বিচার সংক্রান্ত কাজও করতে হয়। সাধারণতঃ আইন সভাই রাষ্ট্রের প্রধান পদাধিকারীদের বিচার করেন। গ্রেট ব্রিটেনের লর্ড সভা আপীল সংক্রান্ত মামলার প্রধান বিচারালয়। সুইজারল্যাণ্ড ও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি আইন সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিদের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আইনসভায় তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ বা সমালোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংবিধানের নিয়ম অনুসারে তাঁদের কার্যকালের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার বিধান থাকা উচিত।

সংক্ষিপ্তসার

সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে আইন বিভাগের কাজ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার আইনবিভাগ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার আইন বিভাগ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী।

আইন বিভাগের কাজ ঃ

আইনবিভাগের কাজগুলি পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—আইনের বিষয়বস্তু নির্বাচন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়ন সংক্রান্ত কাজ, শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণসংক্রান্ত কাজ, বিচারসংক্রান্ত কাজ, সরকারী আয় ব্যয় সংক্রান্ত কাজ, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ এবং সংবিধান সংক্রান্ত কাজ।

আইন সভার গঠন ঃ

আইন সভা এক কক্ষ অথবা দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট হতে পারে। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে উচ্চতন কক্ষের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন রকমের।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ঃ

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার স্বপক্ষে যুক্তিগুলি হচ্ছে—(১) আইনসভার বিল বিভিন্ন দিক হতে বিবেচনা ও সংশোধনের সুযোগ থাকে, (২) বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থাকে, (৩) স্থিরভাবে বিবেচনার করার সুযোগ থাকে, (৪) জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের পরামর্শের সুবিধা গ্রহণ করা যায়। (৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় এই ব্যবস্থা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার বিপক্ষে যুক্তিগুলি হচ্ছে—(১) উচ্চতন কক্ষ ধনী ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থায় পর্যবসিত হয়, (২) আবেসিয়ে বলেছেন, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার উচ্চতন কক্ষ নিম্নতন কক্ষের সঙ্গে একমত না হলে তা ক্ষতিকর আর যদি একমত হয় তাহলে সেটি নিষ্প্রয়োজন, (৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার অপরিহার্যতায় অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের শ্রেণীবিভাগ :

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে (১) নামসর্বস্ব এবং প্রকৃত কর্তৃত্বের ভিত্তিতে, (২) আইন সভার সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং (৩) এককপরিচালক ও বহুপরিচালকের ভিত্তিতে ভাগ করা যেতে পারে।

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিয়োগ পদ্ধতি :

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ—(১) সৈন্যবাহিনীর প্রভাব কর্তৃত্ব অথবা কৌশলের দ্বারা (২) অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন, (৩) প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং (৪) আইন সভার নির্বাচনের দ্বারা নিযুক্ত হতে পারে।

শাসন বিভাগের কাজ ঃ

শাসন বিভাগের কাজগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে দেখান যেতে পারে—(১) শাসন সংক্রান্ত কাজ, (২) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ, (৩) পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ, (৪) সামরিক বিভাগ পরিচালনা সংক্রান্ত কাজ, (৫) অর্থসংক্রান্ত কাজ এবং (৬) বিচার সংক্রান্ত কাজ।

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পারদর্শিতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত ঃ

শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে যথাযথভাবে তার কর্তব্য পালন করতে হলে তাকে—(১) সংহত ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী এবং (২) স্থায়ী হতে হবে।

বিচার বিভাগের কাজঃ

বিচার বিভাগের কাজগুলি হচ্ছে—(১) আইনের ব্যাখ্যা, (২) নূতন আইনের সৃষ্টি, (৩) সংবিধানের ব্যাখ্যা, (৪) ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা, (৫) কয়েকটি প্রশাসনিক কর্তব্য সম্পাদন এবং (৬) সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতাঃ

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নির্ভর করে তার—(১) নিয়োগ পদ্ধতি, (২) কার্যকাল, (৩) পদচ্যুতির পদ্ধতি, (৪) বেতন ও ভাতা এবং (৫) শাসন বিভাগের প্রভাব মুক্তির উপর।

Exercise

1. "If a second chamber dissents from the first, it is mischievous, if it agrees with it, it is superfluous" —Discuss

2. Is a second chamber indispensable in a Federal Constitution? Examine the advantages and disadvantages of a second chamber in any constitution (C. U. 1944)

3. Classify and describe the nature of functions performed by the Legislature in a modern State. (C. U. 1944)

4. Argue for and against Bicameralism

5. What are the political, administrative and Legislative functions of the Executive (C. U. 1954)

6. Explain the role of the Judiciary in a modern State, and indicate the factors on which the independence of the Judiciary depends (C. U. 1961)

চতুর্দশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ

(Aims and function of the State)

১। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য (Aims of the State):

রাষ্ট্রের যথার্থ উদ্দেশ্য কি এই প্রশ্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রের স্বরূপ-উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি চরমগৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান হিসেবে কল্পনা করে রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রের চরম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেছেন (The State is an end in itself)। মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্খা চরমপরিণতি লাভ করেছে রাষ্ট্রের মধ্যেই, সুতরাং রাষ্ট্রের উর্ধে কোন মহত্তর উদ্দেশ্য তার থাকতে পারে না। অপরপক্ষে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি অনিষ্টকর কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তাদের মতে মানুষ নিজের চেষ্টায় তার সম্ভাবনার পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানুষের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা দান করে। অতএব রাষ্ট্রের মধ্যেই মানুষের সম্ভাবনার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এই ধারণা ভুল।

নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের অপেক্ষা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে রাষ্ট্রের ভিত্তিকে পশুশক্তি বলে বর্ণনা করে মানুষের স্বাধীনতা ও নীতিবোধের সার্বভৌম গতির জন্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ কামনা করেছেন।

মধ্যযুগে খৃষ্টীয় ধর্মযাজকেরা রাষ্ট্রের চাইতে চার্চের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের হেয়ত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। হিতবাদী বেন্থাম (*Bentham*) প্রভৃতি দার্শনিকেরা বলেছেন 'রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে অধিকতম জনসমষ্টির অধিকতম কল্যাণ (Greatest good of the greatest number)। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন: যথা--প্রাথমিক উদ্দেশ্য (Primary end), মাধ্যমিক উদ্দেশ্য (Secondary end) এবং চরম উদ্দেশ্য (Ultimate end)। রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রেখে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করা। দ্বিতীয়তঃ, সমাজের সামগ্রীক কল্যাণের চেষ্টা ও তৎসংক্রান্ত কাজ রাষ্ট্রের মাধ্যমিক উদ্দেশ্য

এবং শেষ পর্যায়ে রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এর কার্যাবলীকে চরম উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। ল্যাস্কির মতে, "সমাজের সর্বাধিক কল্যাণসাধনে মানুষকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্র একটি সংগঠন মাত্র।"[1] এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্র কোন্ কাজ করবে, না করবে তা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও অভিজ্ঞতার উপর। রাষ্ট্র মানুষের জীবনের সমস্ত দিককে নিয়ন্ত্রণ করার দাবী করতে পারে না, কারণ রাষ্ট্র ও সমাজ এক নয়।

২। রাষ্ট্রের কার্যাবলী (Functions of the State):

রাষ্ট্রের যথার্থস্বরূপ রহস্যাবৃত। কেউ রাষ্ট্রকে দেখেছেন 'পৃথিবীতে ঈশ্বরের পদক্ষেপ' বলে, কেউবা দেখেছেন এক অনিষ্টকর কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে। রাষ্ট্রের কাজ কেমন হওয়া উচিত তা নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের যাথার্থ বিচারের উপর। রাষ্ট্রকে যদি 'ঈশ্বরের পদক্ষেপণ' বলে এক মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বকে বিনা প্রতিবাদে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতে হয়, আর রাষ্ট্রকে এক অনিষ্টকর কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখলে, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে সংকুচিত করার প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে এসে পড়ে। এই মাপকাঠির পরিপেক্ষিতে রাষ্ট্রের স্বরূপ যে সকল ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যাত হয়েছে এমন কথা নয়, রাষ্ট্রকে এক অনিষ্টকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেও এর কর্তৃত্বকে প্রসারিত করার মতবাদও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এই মতবাদ—**মার্কসবাদ**। মার্কসবাদ রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে প্রসারিত করার পক্ষপাতী হয়েও, প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাকে মঙ্গলময় সংস্থা হিসেবে দেখতে পারে নি।

রাষ্ট্রের প্রকৃতির উপর এর কাজের সীমা নির্ণয় নির্ভর করে

প্রাচীন গ্রীসে নাগরিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রস্বচ্ছ রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাই তাদের রাষ্ট্রের বাইরে কোন পৃথক সমাজজীবন বলে কিছু ছিল না। সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল এখানে এক এবং অভিন্ন। এমতাবস্থায়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের সীমাকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সীমিত রাখা চলে না। রাষ্ট্রই সমাজ, অতএব সমাজজীবনের যত কিছু নিয়ন্তা হবে রাষ্ট্র স্বয়ং।

প্রাচীন গ্রীক যুগ

1 "In this aspect it (state) becomes an organisation for enabling the mass of men to realise social good on the largest possible scope"

— *Laski*

রোম নগররাষ্ট্রের নাগরিক জীবনের কোন কোন ক্ষেত্র রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকার নীতি প্রবর্তিত থাকলেও, রাষ্ট্রের চরম নির্দেশকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই মেনে নিতে হত। রোমের ক্ষেত্রে—রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সীমানা নিরূপণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের ইচ্ছাধীন ছিল।

রোমান যুগ

রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রিত করার সুস্পষ্ট মতবাদের উত্থান হয় মধ্যযুগে। এই যুগে খ্রীষ্টধর্ম এবং টিউটন জাতির উত্থানের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত করার স্বপক্ষে মতবাদ প্রচারিত হতে শুরু করে। মধ্যযুগের চিন্তানায়কেরা চার্চের মহিমা ও গুরুত্বকে প্রচার করতে গিয়ে, রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সংকুচিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

মধ্যযুগ

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিলে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উদ্ভব হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ নাগরিকের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে সংকুচিত করার পক্ষপাতী।

যান্ত্রিক উন্নতির ফলে শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদনবৃদ্ধি এবং উপনিবেশ সৃষ্টির ফলে শিল্পপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর ব্যবধান তীব্রতর হতে শুরু করলে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। স্বভাবতঃই শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য, বেকার সমস্যা সমাধান, সাধারণ ক্রেতাসম্প্রদায়ের স্বার্থসংরক্ষণ ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, উনবিংশ শতকের ভোটাধিকারের ও রাজনৈতিক অধিকারের প্রসার এবং বর্তমান যুগে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধানকে সংকুচিত করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার প্রয়োজনীয়তায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী আজ পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রেই অপ্রতিহত ভাবে বেড়ে চলেছে

রাষ্ট্রের কার্যাবলী বৃদ্ধির কারণ

৩। নৈরাজ্যবাদ (Anarchism):

নৈরাজ্যবাদের মতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষকে সত্যিকারের স্বাধীন হতে হলে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন যে, রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্যই মানুষ অপরাধপ্রবণ, সুতরাং

রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবসান ঘটলে মানুষের অপরাধ প্রবণতাও কমে যাবে। রাষ্ট্র শুধু মানুষের স্বাধীনতাকেই হরণ করে না, মানুষের নীতিবোধকেও আচ্ছন্ন করে তোলে। মানুষ তার নিজস্ব নীতিবোধ থেকে যে কাজ করে তারই উপরে কোন কাজের যাথার্থ নির্ভর করে। রাষ্ট্র সর্বাবস্থায় শক্তির সাহায্যে মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করার ফলেই মানুষের নিজস্ব নীতিবোধ জাগ্রত হয় না।

নৈরাজ্যবাদের মূল কথা

নৈরাজ্যবাদীদের দুটি পৃথক শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে: একটি হচ্ছে দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী (Philosophical Anarchist) এবং অপরটি হচ্ছে বিপ্লবপন্থী নৈরাজ্যবাদী (Revolutionary Anarchist)। দার্শনিক নৈরাজ্যবাদীরা মানুষকে রাষ্ট্রের অপ্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রহীন সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষপাতী। রুশ দার্শনিক টলস্টয় এই মতবাদের প্রবক্তা। অপর পক্ষে বাকুনিন (*Bakunin*), ক্রোপট্‌কিন (*Kropotkin*) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদীরা বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধনে বিশ্বাসী ছিলেন।

নৈরাজ্যবাদের দুটি শ্রেণী

নৈরাজ্যবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে তারা মানুষের নিজস্ব নীতিবোধের উপর অতিরিক্ত আস্থা স্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্যই মানুষের পক্ষে সমাজজীবন নির্বাহ সম্ভব হয়। যে পশুশক্তিকে নৈরাজ্যবাদীরা ঘৃণার চক্ষে দেখেছেন, রাষ্ট্রের অভাবে সেই পশুশক্তিই শেষ পর্যন্ত সমাজজীবনকে অসম্ভব করে তুলবে। সুতরাং মানুষ যতদিন তার স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিপ্সা প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তিগুলি থেকে যতদিন সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও ততদিন অপরিহার্য।

সমালোচনা

৪। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism):

ব্যক্তি-স্বাধীনতার মূল নীতিটি নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে: মানুষ নিজের শুভাশুভ নিজেই ভাল বোঝে। তাই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ যত কম হয়, ব্যক্তির পক্ষে ততই মঙ্গলজনক। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি প্রয়োজনীয় অনিষ্টকর (necessary evil) জিনিস বলে আখ্যা দিয়েছেন। মানুষের জীবনযাত্রার নিরাপত্তা বিধান ও তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যতটুকু না করলে নয়, রাষ্ট্র ততটুকু কাজ করবে মাত্র। রাষ্ট্রের কাজ হওয়া উচিত আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের কাজের পরিধি বৃদ্ধি করার

অর্থই হচ্ছে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করা। সুষ্ঠুভাবে জনকল্যাণমূলক কার্যাদির দ্বারা ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিককে নিয়ন্ত্রিত করার তাঁরা বিরোধী। অ্যাডাম স্মিথ (*Adam Smith*), রিকার্ডো (*Ricardo*), ম্যালথাস (*Malthus*), জন স্টুয়ার্ট মিল (*J S Mill*), হার্বার্ট স্পেনসার (*Herbert Spencer*) প্রভৃতি চিন্তানায়কগণ এই মতবাদের প্রচারক।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা

অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সময়ে ইউরোপের মার্কেনটাইলিস্টরা (Mercantilist) শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের স্বপক্ষে মত প্রচার করতেন। কিন্তু শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অবাধ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বাধা স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শিল্পপতিরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধির পথে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। তাই তারা ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পজ দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অপসারণ কামনা করতেন। অ্যাডাম স্মিথ ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর '*Wealth of Nations*' নামক গ্রন্থে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল চূড়ান্তভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী না হলেও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী ছিলেন।[1]

মিল তাঁর বিখ্যাত '*Liberty*' নামক প্রবন্ধে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "মানুষের যে সমস্ত কাজ অপরের সঙ্গে জড়িত কেবলমাত্র সেই সমস্ত ক্ষেত্রেই তাকে সমাজের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হবে। কিন্তু যে কাজের ক্ষেত্রে সে নিজে মাত্র জড়িত, সেখানে তার স্বাধীনতা চূড়ান্ত। মানুষ তার নিজের উপর তার নিজস্ব শরীর ও মনের উপর, নিজেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধীশ্বর।"[2] হার্বার্ট স্পেনসার (*Hurbert Spencer*) তাঁর '*The Man versus the State*' (1881) এবং '*Social Statics*' নামক গ্রন্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেন।

---

1 "Laissez faire, in short, should be the general practice every departure from it, unless required by some great good, is a certain evil"

2 "The only part of the conduct of anyone for which he is amenable to society is that which concerns others In that part which merely concerns himself, his independence is, of right, absolute. Over himself, over his own body and mind, the individual is sovereign"

—*John Stuart Mill*

হার্বার্ট স্পেনসারের মতে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষা করা ও আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করা ব্যতীত রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে বাড়ানোর অর্থই হচ্ছে মানুষের সবলীল ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করা। মানুষ তার নিজস্ব যোগ্যতায় তার সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। রাষ্ট্র যদি কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে চললে ব্যক্তি-স্বাধীনতায় ক্রমাগত হস্তক্ষেপের ফলে মানুষ অনিবার্যভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তাছাড়া, রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার অর্থই হচ্ছে দুর্বলের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং সবলের শ্রেষ্ঠতর গুণরাজিকে নিরুৎসাহ দেওয়া।

হার্বার্ট স্পেনসার তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ইত্যাদির সমস্ত প্রকার সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে ছিলেন। বাধ্যতামূলক শিক্ষাব্যবস্থা, গরীবদের সাহায্য দেওয়া অথবা অন্যান্য তথাকথিত উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়ন করার অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা। তিনি '*Sins of Legislators*' নামক এক প্রবন্ধে পার্লামেণ্ট প্রণীত অতীত আইনগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে তার থেকে সমাজের উন্নতির পরিবর্তে ক্ষতিসাধনই সংগঠিত হয়েছিল।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা তাদের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তাদের মতে বলা হয়, মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য ব্যক্তি-জীবনে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ কম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মানুষের নিজস্ব বিচারশক্তি ও ন্যায় অন্যায় বোধ আছে। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হচ্ছে মানুষের এই বোধশক্তিকে আচ্ছন্ন ও পঙ্গু করে তোলা। মানুষের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপে অবিরত হস্তক্ষেপের ফলে মানুষ তার চিন্তাশক্তি ও ন্যায়বোধকে হারিয়ে কালক্রমে যন্ত্রবৎ হয়ে উঠবে। আত্মনির্ভরশীল হয়ে স্বাধীনভাবে আত্মোন্নতির প্রচেষ্টার মধ্যেই ব্যক্তি-জীবনের সার্থকতা। ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে এইটিই একটি বড় নৈতিক যুক্তি (Ethical argument)।

নৈতিক যুক্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে যে ব্যক্তি নেকড়ে বাঘের কবল থেকে মেষশাবককে রক্ষা করে, সে অন্যায় কাজ করছে। এতে নেকড়ে বাঘের শ্রেষ্ঠতর গুণরাজিকে নিরুৎসাহ দেওয়া হয় এবং মেষশাবকের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। ডারউইন দেখিয়েছেন, অবিশ্রাম প্রতিযোগিতাই সামাজিক বিবর্তনের মূলসূত্র। এই প্রতিযোগিতা-মূলক সংগ্রামে দুর্বলকে পরাজিত করে সবল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং

বিবর্তনবাদী যুক্তি

রাষ্ট্র যদি কর্মের পরিধিকে বিস্তৃত করে দুর্বলের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয় এবং সবলের শ্রেষ্ঠতর গুণরাজিকে নিরুৎসাহ দেয় তা হলে সে জীবজগতের এই চিরন্তন নিয়মটির বিরুদ্ধে যাবে। উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজের অগ্রগতি সেক্ষেত্রে ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকলে শিল্পপতিরা নিজেদের সুবিধার কথা চিন্তা করে অধিক উৎপাদনের দিকে মনোযোগী হবে। এই অধিক উৎপাদন সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু যদি শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকের মজুরী নির্ধারণ করে, কাজের সময় বেঁধে দিয়ে বা এই জাতীয় নানা-প্রকার বাধা-নিষেধের দ্বারা শিল্পপতির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তাহলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হওয়াই স্বাভাবিক। চাহিদা ও সরবরাহের স্বচ্ছন্দ প্রতিযোগিতার ফলেই উপযুক্ত পরিমাণ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে এই সাবলীল চাহিদা ও সরবরাহের ক্ষেত্রকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রিত করলে উৎপাদন ব্যবস্থা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসব কারণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তির গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অর্থনৈতিক যুক্তি

শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের পথকেই যথার্থ পথ বলে ধরে নিতে হয়। সরকারী হস্তক্ষেপের ফলে জাতীয় জীবনকে বিপর্যস্ত হতে দেখা গেছে। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অতীতের বহু আইনই সামাজিক অনর্থের জন্য দায়ী। আইনের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা যে উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করা হয় ব্যক্তির স্বতঃপ্রণোদিত কাযের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য আরও যথার্থভাবে সফল হতে পারে।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে যুক্তি

পরিশেষে বলা বলা যেতে পারে যে, মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় যতটা তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে পারে, রাষ্ট্রের প্রচেষ্টার দ্বারা তা সম্ভব নয়। কারণ, ব্যক্তি কোন কাজের জন্য যে পরিমাণ ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং বিশ্বস্ততা নিয়োগ করে রাষ্ট্রের পক্ষে সেই পরিমাণ বিশ্বস্ততা সহকারে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষমতা এবং সমস্ত প্রকার প্রভাব সত্ত্বেও কোন ক্রমেই তা ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও উৎসাহের সমকক্ষ হতে পারে না।

রাষ্ট্রের অক্ষমতার যুক্তি

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against Individualism): রাষ্ট্রের কার্যাবলীর বৃদ্ধি হওয়ার জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে যুক্তি দিয়ে থাকেন, তা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দুর্বল ও বিত্তহীনের কোন স্বাধীনতাই থাকত না। রাষ্ট্র তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গুলি প্রয়োগ করে যথার্থ স্বাধীনতা উপভোগের জন্য একটি প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে। তা না হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হত। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ বিপরীতমুখী নয়। সরকার যদি তার আইনসমষ্টি দিয়ে ব্যক্তি-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত না করত তাহলে সকলের পক্ষে ব্যক্তিস্বাধীনতা উপভোগ করা সম্ভব হত না। রাষ্ট্রের আইনসমষ্টি সকল নাগরিকের পক্ষে স্বাধীনতার উপভোগ সম্ভব করে তোলে।

তাছাড়া, রাষ্ট্রের কার্যাবলীর পরিসর বৃদ্ধি উন্নত ধরনের চরিত্রসৃষ্টির পরিপন্থী বলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা যে মত প্রকাশ করেন তা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ব্যক্তি-জীবনে রাষ্ট্রের দ্বারা ক্রমাগত হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয় একথা মেনে নিলেও রাষ্ট্রের কার্যাবলী উন্নত চরিত্র সৃষ্টির পরিপন্থী—এ মতবাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি না। রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ মানুষকে নিয়মানুবর্তী করে তার সামাজিক কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করে তোলে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বিবর্তনবাদের যুক্তিতে তাদের মতবাদের যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন, তার বিপক্ষে বলা যেতে পারে যে জীবন সংগ্রামে কে অধিকতর যোগ্য বা অযোগ্য তার স্থির করতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। সমান সুযোগ না থাকলে মানুষের যোগ্যতা বিচার করা যায় না। উপযুক্ত শিক্ষা ও পরিবেশের অভাবে অনেক প্রতিভারই অপমৃত্যু ঘটতে দেখা যায়। সুতরাং রাষ্ট্র যে নিয়ন্ত্রণসমষ্টি দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশসাধনের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করে মাত্র, তা না হলে যোগ্যতার উপযুক্ত বিচার সম্ভব নয়।

বাস্তব অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিচার করলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের অসারত্ব প্রতিপন্ন হয়। আধুনিক রাষ্ট্র তার জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনাগুলির সাহায্যে সাধারণ মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনে তার কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে চলেছে এবং তা দিয়ে সে ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। বর্ধিত কার্যাবলীর সাহায্যে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে যথাযথভাবে উপভোগ করাই সম্ভব করে তুলেছে।

তাছাড়া, মানুষের পক্ষে সব সময় তার নিজস্ব বিচারশক্তির সাহায্যে তার উপযুক্ত পথটিকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষ অনেক সময় সাময়িক প্রলোভন এবং অন্ধভাবাবেগে নিজ স্বার্থের পরিপন্থ' অনেক কাজও করে থাকে। অধ্যাপক গার্ণার যথার্থই বলেছেন, "The truth is tne society may be a better judge of man's intellectual, moral or physical needs than he is himself, and it may rightfully protect him from disease and danger against his own wishes and compel him to educate his children and live a decent life"

৫। সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism) :

সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা বহন করে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশে পক্ষপাতী। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। ঊষর মরুভূমিতে

সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা

ন, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের সম্ভাবনার তেমনি পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে না। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের পথকে যদি সুগম করতে হয়, তাহলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটিকেও সমান হতে হবে—দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে যাদের নিষ্পেষিত হতে হয়, সম্ভাবনার সেখানে অপমৃত্যু ঘটাই স্বাভাবিক। সমাজতন্ত্রবাদীরা তাই প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা এবং উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুপ্রশস্ত করার পক্ষপাতী। এই পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সমাজতন্ত্রবাদীরা রাষ্ট্রের কাজের পরিধিকে বিস্তৃত করার সপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন।

সমাজতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য ও স্বপক্ষে যুক্তি : সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদীরা উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলির মালিক। এই ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের সুযোগ নিয়ে তারা সমাজের অধিকাংশ লোককে শোষণ করে নিজেদের বিলাসব্যসনের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। সমাজতন্ত্রবাদীরা তাই ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্বের উৎখাত করে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করণের পক্ষপাতী। উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে সমাজতন্ত্রবাদ ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধানকে সংকুচিত

করতে চায়। বৈষম্যমূলক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শিল্পপতিরা নিজেরাই সমস্ত লাভ উপভোগ করে। সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রায়ত্ত করণের সাহায্যে উপযুক্ত কর্মসংস্থান, উপযুক্ত বেতন ব্যবস্থা, কারখানার অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার পক্ষপাতী। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের মূল লক্ষ্য শিল্পপতির লাভ। স্পষ্টতঃই সমাজের প্রয়োজনে এখানে উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না। তাই পুঁজিবাদী সমাজে জীবন ধারণের অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তুর উৎপাদনের পরিবর্তে অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বিলাসের উপকরণ উৎপাদিত হতে দেখা যায়।

প্রয়োজনীয় ভোগ্য-বস্তুর উৎপাদন

উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের করায়ত্ত হলে ধনবণ্টনের বৈষম্যকে সংকুচিত করা হয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি ব্যক্তির হাতে দেশের সম্পদ পুঞ্জীভূত হলে, সাধারণের অভাবের মাত্রা তীব্রতর হয়। সমাজতন্ত্রবাদ রাষ্ট্রের পরিচালনায় উৎপাদিত সম্পদ ন্যায়সঙ্গত ভাবে বণ্টন করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে চায়। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে ধনবণ্টনের বৈষম্যকে সংকুচিত করার লক্ষ্যকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, বেকার সমস্যা ও শ্রমিক শ্রেণীর অসন্তোষ-জনিত সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

সমাজতন্ত্রবাদ ধনবণ্টনের বৈষম্য সংকুচিত করে

শ্রমিকশ্রেণীর অসন্তোষ ও বেকার সমস্যার সমাধান

সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি সাধন করে সমাজতন্ত্রবাদ সমাজের কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির মানটিকে উন্নততর করতে সক্ষম হবে। মানুষ দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় যেখানে নিষ্পেষিত, শিল্প, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেখানে তারা আত্মনিয়োগ স্ফূর্তি পাবে না। আগামী দিনের অন্নসমস্যার প্রশ্ন যেখানে উৎকট, শিল্প ও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নততর চিন্তার প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। সমাজতন্ত্রবাদ মানুষকে অভাবের তাড়না থেকে মুক্ত করে উচ্চতর সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সৃষ্টিতে মানুষের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে মানব সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করতে চলেছে।

উন্নততর কৃষ্টি ও সংস্কৃতি

সমাজতন্ত্রবাদীরা আরও বলেন, রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,

অর্থনৈতিক বৈষম্য যেখানে প্রবল, সার্বজনীন ভোটাধিকার সেখানে অর্থহীন। প্রাথমিক ভোগ্যবস্তুর অভাবে অভাবগ্রস্ত মানুষ কখনই তার ভোটাধিকারের যথার্থ প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় না।

রাজনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের অপরিহার্যতা

উপসংহারে বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতার উপরে জোর দিয়ে মানুষের নৈতিক সমাজ-চেতনাকে জাগ্রত করে। প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রতিযোগিতা মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এবং মানুষের স্বার্থপরতার উগ্রতাকে বাড়িয়ে দেয়, সমাজের পক্ষে তা অবশ্যই ক্ষতিকারক।

সমাজতন্ত্রবাদের নৈতিক দিক

আমরা দেখলাম, সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের মত রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমিত করার পক্ষপাতী নয়। এঁদের মতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের কার্যের পরিধিকে বিস্তৃত করতে হবে—শুধু উৎপাদনের ক্ষেত্রগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করণের দ্বারা নয়—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এমন কি সংস্কৃতি এবং কৃষ্টিমূলক জীবনের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের কল্যাণময় স্পর্শকে প্রসারিত করে ব্যক্তি জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের কাজে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি (Arguments against Socialism): সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, ব্যক্তি জীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ট্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবে। মানুষ নিজেই নিজের স্বার্থ বোঝে। রাষ্ট্র যদি প্রতিনিয়তই তার কর্মপ্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে, মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ তা হলে অবরুদ্ধ হবে। কেননা, পরানুগ্রহশীল মানুষ যন্ত্রবৎ।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালিত হলে প্রতিযোগিতার ফলে সস্তাদরে দ্রব্য উৎপাদিত হয় এবং এর দ্বারা সাধারণ ক্রেতা উপকৃত হয়। তাছাড়া, উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকলে যে বুদ্ধি ও উৎসাহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায়, রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় তা সম্ভব হয় না। প্রকৃত পক্ষে, রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পারদর্শিতার অভাব দেখা যায়।

উৎপাদনের ক্ষেত্রকে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের কুফল

তাছাড়া, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতির পথকেও রুদ্ধ করে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফলকে উপভোগ করতে পারলেই, সমাজের যোগ্যতা-সম্পন্ন লোকেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠতর গুণাবলীকে প্রয়োগ করার চেষ্টা করবে। যোগ্যতার পরিপূর্ণ প্রয়োগ সামাজিক অগ্রগতিকে সম্ভব করে তোলে।

সমাজতন্ত্রবাদ সামাজিক অগ্রগতির পরিপন্থী

বৈচিত্র্যই সমাজ জীবনের মাধুর্য। রাষ্ট্র সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করলে, একই প্রকার নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমাজ জীবনের মাধুর্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত করবে সন্দেহ নেই।

৬। সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপ (Different Forms of Socialism):

(ক) **মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদ** (Scientific or Marxian Socialism): কার্ল মার্কস (*Karl Marx*) ও ফ্রেডারিক এংগেলস (*Frederic Engels*) এই মতবাদের স্রষ্টা। এই মতবাদকে বুঝতে হলে মার্কসবাদের চারটি প্রধান সূত্রকে জানা দরকার। এগুলি হচ্ছে (১) **ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা** (Materialistic interpretation of history), (২) **শ্রেণী সংগ্রাম** (Class struggle), (৩) **উদ্বৃত্ত মূল্যের মতবাদ** (Theory of surplus value) এবং (৪) **সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব** (Dictatorship of the Proletariat)।

হেগেল (*Hegel*) প্রভৃতি আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি ভাবগত সত্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা রাষ্ট্রের আইনকানুন, উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপকে ব্যাখ্যা করেছেন।

অপরপক্ষে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, কার্যকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের ব্যাখ্যা বস্তুভিত্তিক। তাদের মতে বাস্তব জীবনের ধনোৎপাদনের রীতিই সমাজব্যবস্থার নিয়ামক এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন গড়ে ওঠে। সৃষ্টির আদি অবস্থা থেকে শুরু করে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি স্তরের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণীগত বৈষম্য। শোষক-শ্রেণী তার শ্রেণীগত স্বার্থকে বজায় রাখার জন্যই রাষ্ট্রকে যন্ত্রবৎ ব্যবহার করে এসেছে সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে—দাসযুগে,

ভূমিদাসযুগে এবং বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায়। অর্থনৈতিক ভিত্তিতে যে বৈষম্য সমাজব্যবস্থায় গড়ে ওঠে তারই মধ্যে নিহিত থাকে শ্রেণী সংগ্রামের বীজ। আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করে ধনিকশ্রেণী উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) নিজেরাই ভোগ করে বলে শ্রেণীসংগ্রাম উগ্রতর রূপ ধারণ করেছে। এই শ্রেণীসংগ্রামের পরিণতিতে শ্রমিকশ্রেণী সশস্ত্র বিপ্লবের সাহায্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এবং সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) প্রতিষ্ঠিত করে। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং [illegible] শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা (Communistic Society) সম্ভব হয়ে ওঠে।

(খ) সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদ (Communism in U S S R): ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বে রুশ দেশে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন করে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন [illegible] রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর উৎপাদন সাময়িক ভাবে কমে [illegible] পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় [illegible] সুস্পষ্টভাবে সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। বৃহৎ কল-কারখানাগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত করার সুফল প্রথম থেকেই অনুভূত হয় কিন্তু কৃষির ক্ষেত্রে যৌথ পরিচালনা ব্যবস্থা প্রচলন করায় কৃষক শ্রেণীর অনিচ্ছার ফলে কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন সাময়িকভাবে কমে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য, যৌথ পরিচালনা ব্যবস্থার সুফল অনুভূত হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সাম্যবাদ সুস্পষ্টভাবেই নিয়ন্ত্রণমূলক। শিল্প, কলা, সাহিত্য, জনমত, দলীয় নীতির পরিপ্রেক্ষিতে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রুশ বিপ্লবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এবং বর্তমান কর্ণধারেরা মার্কসবাদী হলেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তিত সাম্যবাদের সঙ্গে মার্কসের নীতিগত সাম্যবাদের পার্থক্য আছে।

মার্কসের আদর্শ অনুসারে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হয়নি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হয়নি। স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদী রাষ্ট্র ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সাথে সহযোগিতা করেই তাদের নিজ রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে এসেছে। বর্তমানে ক্রুশ্চভের নেতৃত্বে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যভাবেই সহ-অবস্থানের নীতিকে মেনে নিয়েছে। মাও সেতুং এর নেতৃত্বে

পরিচালিত চৈনিক সাম্যবাদের সঙ্গে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সাম্যবাদের মৌলিক পার্থক্য এইখানেই। চৈনিক সাম্যবাদ প্রকাশ্যভাবেই যুদ্ধবাদী। ধর্মের ক্ষেত্রেও বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র সহনশীলতায় বিশ্বাসী যদিও সাম্যবাদী শাসনব্যবস্থার প্রথম পর্যায়ে ধর্মের ক্ষেত্রে সহনশীলতার অভাব সেখানে হয়েছিল।

(গ) সিণ্ডিক্যালিজম (Syndicalism): 'সিণ্ডিক্যালিজম' কথাটি ফরাসী শব্দ *Syncat* থেকে এসেছে। *Syndicat* শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রমিক সংঘ (*Trade union*)। জর্জ সোরেল (*George sorel*) এবং পেলুটার (*Pelloutiar*) প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদের প্রধান প্রচারক। এই মতবাদ ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে প্রথমে ফ্রান্সে প্রসার লাভ করে এবং পরে স্পেন, ইতালী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি কয়েকটি রাষ্ট্রে ছড়িয়ে পড়ে।

এই মতবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত করে এই মতবাদীরা তার পরিবর্তে শ্রমিক সংঘের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চান। মার্কসবাদীদের মত তারা রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদীদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের একটি উপায়মাত্র বলে প্রচার করেছেন। সুতরাং শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করতে চান। এইখানে নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের মিল আছে; রাষ্ট্র বিলুপ্ত হলে কিভাবে শাসনকার্য চালিত হবে এ বিষয়ে এই মতবাদীরা কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতে পারেনি।

এই মতবাদীরা রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করতে চান

এই মতবাদীরা মার্কসবাদীদের মত শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। পুঁজিবাদী ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয় বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। সুতরাং পুঁজিবাদীদের উৎখাত করে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষ অর্থনৈতিক সংগ্রাম। শ্রমিক সংঘগুলিকে তাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হলে ধর্মঘট (strike), সম্পত্তি ক্ষতিসাধন (Sabotage), অল্পপরিমাণ কাজ করা, মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রচার, অসহযোগিতা ইত্যাদির মাধ্যমে অবিশ্রাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। এইভাবে তারা এক বৃহত্তর ধর্মঘটের (General strike) ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। এই সর্বব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে শ্রমিক সংঘের কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে।

এই মতবাদ অনুসারে লক্ষ্যে পৌঁছবার নির্দিষ্ট পথ

এই মতবাদের বিরুদ্ধে দুটি প্রধান সমালোচনা করা যেতে পারে, যথা—

প্রথমতঃ এই মতবাদীরা রাষ্ট্রব্যবস্থার লোপ করে যে নূতন সমাজ ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন তার গঠন প্রণালী সম্বন্ধে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নেই। রাষ্ট্রব্যবস্থার লোপ হলে—সমাজ শৃঙ্খলার দায়িত্ব থাকবে কার হাতে? তাছাড়া, বৈদেশিক শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে সমাজকে রক্ষা করবে কে?—এই জাতীয় প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁরা দিতে পারেননি।

সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, যে বিভিন্ন উপায়ে তাঁরা শ্রমিক সংঘগুলিকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বলেছেন তার কার্যকারিতার মধ্যেও যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। হিংসাত্মক পন্থায় অবিরত বিরোধ চালিয়ে গেলে শ্রমিকশ্রেণী নিজেদের নৈতিক চরিত্র কতদিন ঠিক রাখতে পারবে তা অবশ্যই চিন্তার বিষয়। তাছাড়া, অর্থনৈতিক জীবন পুনঃ পুনঃ বিপর্যস্ত হলে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

(ঘ) গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদ (Guild Socialism): কোল (*Cole*), হবসন (*Hobson*) প্রভৃতি লেখকেরা এই মতবাদ প্রচার করেন।

গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদীরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বৈষম্য নিরসনের পক্ষপাতী; তবে এই উদ্দেশ্যে তাঁরা শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কলকারখানাগুলি রাষ্ট্রের জাতীয়করণ নীতিতে বিশ্বাসী নন। তাদের মতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান বা কারখানা উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে। এই সংস্থাগুলি আজকালকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির মত কেবলমাত্র একশ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত হলে চলবে না। তাদের মতে এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমিক, কেরানী, ম্যানেজার প্রভৃতি সকল শ্রেণীর কর্মীদের দ্বারা গঠিত হতে হবে। শুধু বেতন বৃদ্ধি নয়, পরিচালনা সংক্রান্ত সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত হতে হবে এদের উপর। এককথায় শিল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠাই গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদীদের মূল কথা।

গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদের মূল কথা

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা যখন পেশা বা বৃত্তির ভিত্তিতে গঠিত সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হবে তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারিত হবে কি প্রকারে? এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে। রাষ্ট্র কিভাবে বিভিন্ন পেশাগত

গিল্ড সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্রের স্থান

সংস্থাগুলির মধ্যে সংগতি বজায় রাখবে সে সম্বন্ধে গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে দুটি বিশিষ্ট মতের উল্লেখ করতে হয়।

এই উদ্দেশ্যে হবসন (*Hobson*) গিল্ড সমন্বিত সমাজব্যবস্থার নিয়ামক হিসেবে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন, অপর পক্ষে কোল (*Cole*) রাষ্ট্রকে কোন বিশেষ সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে রাজী ছিলেন না। কোল (*Cole*) রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংস্থার মত একটি সংস্থা মাত্র বলে গণ্য করার পক্ষপাতী ছিলেন। কোলের মতে জাতীয় পার্লামেণ্ট কেবলমাত্র ক্রেতাশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করবে আর হবসনের মতে রাষ্ট্র বিভিন্ন গিল্ডের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। কোল (*Cole*) ক্রেতাশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে জাতীয় পার্লামেণ্ট এবং সমগ্র গিল্ডদের নিয়ে গঠিত একটি জাতীয় গিল্ড পরিষদ গঠন করতে চেয়েছেন। এই উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে তার সমাধানের জন্য উভয় প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি ক্ষুদ্র সামঞ্জস্য বিধানকারী সমিতির কথা তিনি কল্পনা করেছেন। পরবর্তী কালে কোল (*Cole*) বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী ভৌগোলিক নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় পরিষদের পরিবর্তে পেশাগত ভিত্তিতে নির্বাচিত আঞ্চলিক ও জাতীয় পরিষদ গঠন করে তার হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পণের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদীরা ভৌগোলিক ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থার বিরোধী। তাদের মতে নির্বাচন ব্যবস্থা পেশাভিত্তিক হওয়া উচিত। সমব্যবসায়ী ব্যক্তিরাই যথার্থ প্রতিনিধিত্বের অধিকারী। সুতরাং কোল (*Cole*) পার্লামেণ্টকে পেশাগত প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার পক্ষপাতী ছিলেন।

গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদীরা পেশাগত ভিত্তিতে গঠিত শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বর্তমান শিল্পজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয়তার দিকে আলোক সম্পাত করেছেন। তবে এই ব্যবস্থাকে পরিচালনার জন্য তারা যে বিভিন্ন প্রকারের সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কথা কল্পনা করেছেন, তা বাস্তবে কার্যকরী হলে সমাজজীবনে অনেক জটিলতার সৃষ্টি হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

গিল্ড সমাজতন্ত্রের গঠন

(৬) বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ (Fabian Socialism): এই মতবাদীরা বিবর্তনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কার্থেজের নায়ক হ্যানিবালের বিরুদ্ধে রোম নেতা ফেবিয়াস যেমন পূর্ণ সুযোগের জন্য ধৈর্য

সহকারে অপেক্ষা করেছিলেন, ফেবিয়ান সমাজবাদীরা সেইরকম তাদের অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন না করে প্রচার কার্যের দ্বারা শিক্ষিত জনমত তৈরী করে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। সিডনে এবং বিয়েট্রিস ওয়েব (Sidney and Beatrice Webb), বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw), এচ জি ওয়েলস (H. G. Wells), অ্যানি বেশান্ত (Annie Besant), গ্রাহাম ওয়ালেস (Graham Wallas) প্রভৃতি বিখ্যাত চিন্তানায়কেরা এই মতবাদের সমর্থক।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র-বাদের প্রধান চিন্তানায়কগণ

এই মতবাদীরা জাতীয় সম্পদের উৎসগুলিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে রাষ্ট্রের আওতাধীনে এনে বর্তমান ধনবণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্যকে নিরসন করতে চান। তবে মার্কসবাদীদের মত এই উদ্দেশ্যে তারা বিপ্লবের আশ্রয় গ্রহণ করে রাতারাতি সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে রাজী নন। সমাজে শ্রেণীগত বৈষম্য থাকলেও তারা বিশুদ্ধ ন্যায়বিচার এবং সামাজিক সহানুভূতিতে বিশ্বাসী। সুতরাং যথোপযুক্ত প্রচার কার্যের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ করার উপযুক্ত জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তার উপর এঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রচার কার্যের দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী প্রতিনিধিদের পার্লামেন্টে নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার বিলোপ সাধনের জন্য জনসাধারণের তরফ থেকে সক্রিয় আবেদন সরকারের দরবারে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করাও উচিত। এইভাবে সরকার সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম স্তরে শ্রমিকদের উপযুক্ত বেতন, বিশ্রামের ব্যবস্থা, বেকার সমস্যার সমাধান, বৃদ্ধ ও রোগীদের উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমাজের বৈষম্য নিরসনমূলক (ameliorative legislation) আইন প্রচলন করতে পারেন। এইভাবে সুশিক্ষিত জনমত ও সরকারের মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজতন্ত্রবাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে ধীরে ধীরে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটবে।

ফেবিয়ান সমাজতন্ত্র-বাদের লক্ষ্য

ফেবিয়ান মতবাদ সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠার উপায়

৭। সমাজকল্যাণকর রাষ্ট্র ও তার কার্যাবলী (Welfare State and its Functions):

আধুনিক রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্রবাদকে গ্রহণ না করলেও নির্জলা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ সকল রাষ্ট্রেই পরিত্যক্ত হতে চলেছে। দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধের পর থেকে রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী জটিল সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য রাষ্ট্রের কাজ অনিবার্যরূপে বেড়ে চলেছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের যুক্তিতে আস্থা স্থাপন করে কোন রাষ্ট্রই আজ জাতির সমস্যাসংকুল জীবনে নীরব দর্শকের ভূমিকা অবলম্বন করতে রাজী নয়। তাই গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্র প্রকাশ্য ভাবেই সমাজকল্যাণমূলক কাজের পথকে বেছে নিয়েছে। বেকার সমস্যার সমাধান, সাধারণ নাগরিকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং সর্বোপরি নাগরিকদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়ন কল্পে সকল রাষ্ট্রই তার কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে চলেছে। ভারতের সংবিধানের চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে সুস্পষ্ট ভাবেই সমাজকল্যাণমূলক কার্যাদি গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত হয়েছে। সমস্যা-সংকুল সমাজব্যবস্থায় রাষ্ট্র শুধু রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা আর নিরাপত্তা বজায় রেখেই তার কর্তব্যের পরিধিকে শেষ করে না। এই কাজের পরিধিকে বাড়িয়ে সে চায় অধিকতম জনসাধারণের অধিকতম কল্যাণ (Greatest good of the greatest number)। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে যেমন একদিকে তার শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী রাখতে হয়, অন্যদিকে তেমনি সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনে শিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। শিল্প ও বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে রাষ্ট্রকে একাধারে শ্রমিক, শিল্পপতি ও সাধারণ ক্রেতাশ্রেণীর (Consumer) স্বার্থের দিকে নজর রাখতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় আইন ও নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সৃষ্টি করে বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। আবার, রাষ্ট্র শিল্পের জাতীয়করণের দ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থাকে জাতির স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত করে। গ্রেট ব্রিটেনে সরকার রেলপথ, বেসরকারী বিমান চলাচল ব্যবস্থা, কয়লা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শিল্পগুলি জাতীয়করণ করে সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সরকারের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতে রেলপথ, ডাক ও তার প্রভৃতি বহু পূর্বেই জাতীয়কৃত হয়েছে এবং বর্তমান সরকার দেশের বৃহত্তর প্রয়োজনে নিজেই কতকগুলি নূতন শিল্পের পত্তন ও পরিচালনা করছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা রাউরকেল্লা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে উন্নত ধরনের ইস্পাত শিল্পের কারখানা, চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানা, সিন্ধিতে সার উৎপাদনের কারখানা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে পারি। স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষা, পথঘাটের নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, বিদ্যুৎ ও জলসরবরাহের কাজ আজকাল সকল দেশের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-

মূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনাধীন। তাছাড়া, কোন রাষ্ট্র বীমা পদ্ধতির মাধ্যমে বৃদ্ধ ও বেকারদের ভাতা দেবার ব্যবস্থাও করেছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যেক রাষ্ট্রই আজ জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। কোন কোন রাষ্ট্রে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানে চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিতে বাধ্যতামূলকভাবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ইচ্ছা ব্যক্ত করা হয়েছে। উচ্চতর বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও সরকারী সাহায্যপুষ্ট হয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণের গণ্ডীতে এসে পড়েছে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, আধুনিক কালে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ একমাত্র আদর্শ রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয় না। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মত উৎপাদন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করে জাতীয় জীবনের সমস্ত দিককে নিয়ন্ত্রণ করলে সেটি সুস্থ সমাজজীবনের অনুপন্থী কিনা সে সম্বন্ধে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে—কিন্তু দেশের সমগ্র জনসাধারণের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের কাজে রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্রকে বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

৮। রাষ্ট্রের কাজের শ্রেণীবিভাগ (Classification of State Functions):

রাষ্ট্রের কার্যকলাপগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা—প্রাথমিক কাজ (Essential or Primary Functions) এবং ঐচ্ছিক (Non-essential or Optional Functions)। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত কাজকে রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজ বলা যেতে পারে। রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সকল মতবাদই রাষ্ট্রের দ্বারা এই কাজগুলি পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। নাগরিকদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনী বজায় রাখা এবং দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনী প্রতিপালন করার প্রয়োজনীয়তা রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে সকল মতবাদই স্বীকার করেন। শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজের জন্য রাষ্ট্রকে শুধু পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণ করলেই চলে না, এই কাজের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের প্রশ্নটিও জড়িয়ে আছে। তাই বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে আন্তর্জাতিক

প্রাথমিক কাজ

সম্পর্ক বজায় রাখাও রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজের অন্তর্গত। সাধারণ জীবনযাত্রার অনিবার্য প্রয়োজনের খাতিরে পারিবারিক সম্পর্কের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা ব্যবস্থার পরিচালনা, বিচারবিভাগ পরিচালনাও রাষ্ট্রের প্রাথমিক কাজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ঐচ্ছিক কাজ

সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্র যে জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকে সেগুলিকে ঐচ্ছিক (Non-essential or optional) কাজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। রাষ্ট্র শ্রমিক ও সাধারণ ক্রেতাদের সুবিধার্থে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করে সেগুলিকে প্রত্যক্ষভাবে সরকারের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা করে থাকে। অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা না করে সেগুলি বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে অনেক সময় শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণে অনেক আইন প্রণয়ন করতে হয়। ভারতে ১৯৪৮ সালের ফ্যাক্টরী আইন (Factories Act 1948) নামক এতজ্জাতীয় একটি আইনের দ্বারা শ্রমিকদের চাকুরির স্থায়িত্ব এবং স্বাস্থ্যের নিরাপত্তা বিধান করা হয়। পথঘাটের উন্নতি সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ, শিক্ষার সুব্যবস্থা করা, বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য ব্যক্তিদের ভাতার ব্যবস্থা করা, পরিবহন ব্যবস্থার পরিচালনা, কৃষির উন্নতি, মাদক দ্রব্য নিষেধীকরণ এবং সঙ্গীত ও কৃষ্টির উন্নতিকল্পে উপযুক্ত উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি রাষ্ট্রের ঐচ্ছিক (Optional) কাজের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রের জনমতে হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়

রাষ্ট্রের কাজ অনিবার্যভাবে বেড়ে চললেও কতকগুলি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। জনমতের উপর রাষ্ট্রের বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত নয়, অবশ্য যদি সেই মত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণকারী না হয়। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং মত প্রকাশ করার অধিকার এক অনন্য মৌলিক অধিকার বলে বিবেচিত হয়। এই অধিকারেও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। অধ্যাপক ল্যাকসাইভার যথার্থই বলেছেন— 'The State should not seek to control opinion, no matter what the opinion may be.'

সমাজে প্রচলিত আচার ব্যবহার, চিরাচরিত প্রথা এবং মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও রুচিবোধের ক্ষেত্রেও সরকারের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য কোন প্রথা মানবতা বিরোধী এবং বিবেক বর্জিত হলেও সেগুলিতে সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়—এই মত গ্রহণযোগ্য নয়।

মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (private liberty), যেমন—ব্যক্তিগত নীতিবোধ এবং ধর্মমতেও সরকারী হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

সংক্ষিপ্তসার

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী :

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী নির্ভর করে প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের স্বরূপ বিচারের উপর। আদর্শবাদীরা রাষ্ট্রকে চরম উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রকার কাজকে সমর্থন করেছেন। অপর পক্ষে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রকে একটি অনিষ্টকর কিন্তু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমিত করার পক্ষপাতী। হিতবাদীদের মতে অধিকতম জনসাধারণের অধিকতম কল্যাণসাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং চরম—এই তিন ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছেন। আধুনিক কালে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্বন্ধে যে মতভেদ দেখা যায় সেগুলিকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে, যথা—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ :

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীরা মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের কাজকে সীমাবদ্ধ করার পক্ষপাতী। তাঁরা (ক) নৈতিক, (খ) বিবর্তনবাদ, (গ) অভিজ্ঞতাপ্রসূত এবং (ঘ) রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক যুক্তির দিক থেকে তাঁদের যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় যে—(১) রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা থেকে ব্যক্তির স্বাধীনতা সবল ও বলবানের স্বাধীনতার নামান্তর মাত্র, (২) বিবর্তনবাদী যুক্তি দিয়ে মানুষের প্রকৃতিগত বৈষম্যকে সর্বাবস্থায় স্বীকার করা যায় না, (৩) অজ্ঞ ও অশিক্ষিত মানুষের বিচারশক্তি অনেক সময় ঠিক পথে পরিচালিত হয় না।

সমাজতন্ত্রবাদ :

সমাজতন্ত্রবাদীরা মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির কাজে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী। (১) ধন বণ্টনের বৈষম্যকে সংকুচিতকরণ (২) প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন, (৩) শ্রমিক শ্রেণীর অন্নসংস্থান ও বেকার সমস্যার সমাধান এবং (৪) উন্নততর সামাজিক সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সৃষ্টি সমাজতন্ত্রবাদের স্বপক্ষে যুক্তি। (১) ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা, (২) উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করা এবং (৩) সমাজের সামাজিক অগ্রগতির পথকে রুদ্ধ করা সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি। সমাজতন্ত্রবাদের বিভিন্ন রূপগুলির মধ্যে—(১) সাম্যবাদ, (২) সিণ্ডিকেলবাদ (৩) গিল্ড সমাজতন্ত্রবাদ এবং (৪) বিবর্তনমূলক সমাজতন্ত্রবাদ উল্লেখযোগ্য।

সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্রঃ

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং কোন বিশেষ ধরনের সমাজতন্ত্রবাদের পথ অনুসরণ না করে সমাজকল্যাণমূলক নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কার্যের পরিধিকে বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলির সমাধান করে চলেছে। রাষ্ট্রের কাজগুলিকে পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে (১) প্রাথমিক ও (২) ঐচ্ছিক—এই দুই ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে।

Exercise

1. Discuss the various theories of the end and the purpose of the state (C U 1952)

2. Discuss the proper sphere of the state (C U 1955)

3. What in your opinion, should be the proper sphere of the state? Give reasons for your answer. (C U 1961)

4. How far do you agree with the materialistic conception of History as expounded by Karl Marx? Give reasons for your answer.

5. Discuss the theory of Individualism. (B U. [illegible])

6. Classify state functions. What are the Individualistic and Socialistic theories of state functions? Why is it said that neither Individualism nor Socialism represents the modern view of the functions of state.

7. Write Short notes on
   (a) Guild socialism, (b) Syndicalism (c) Fabian Socialism.

———

নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দিকে এক প্রবণতাও সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। এরূপ অবস্থায় সংহতির মাত্রাভেদের পরিপ্রেক্ষিতে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থাগুলির সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করণের প্রয়োজনীয়তাও আজ অনস্বীকার্য।

বাস্তব প্রয়োজনে তাই সরকারের গঠনপ্রণালী নির্ণয় এবং তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা সংবিধানের অন্যতম কাজ।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সংবিধানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার পর সংবিধানের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব।

সংবিধান বলতে আমরা এমন কতকগুলি উচ্চতর ও মৌলিক আইন সমষ্টিকে বুঝি, যগুলি প্রথাগত নিয়মের উপর গড়ে উঠে অথবা লিখিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ হয়ে সরকারের গঠন, তার বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা ও সম্পর্ক নির্ণয় এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে সরকার পরিচালনা এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত করে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় সংবিধান (১) সরকারের গঠনপ্রণালী, (২) পরিচালনা ব্যবস্থা, (৩) তার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক এবং (৪) রাষ্ট্র ও নাগরিকের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক এবং উচ্চতর মর্যাদাসম্পন্ন আইন-কানুনের সমষ্টি মাত্র। এই আইন কানুন যে সর্বাবস্থায় লিখিতভাবে থাকবে তার কোন কথা নেই। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান যেহেতু লিখিত অবস্থায় কোন এক রাষ্ট্রীয় দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ নেই, সেইজন্য টকভিলে (*Tocqueville*) বলেছেন, 'গ্রেট ব্রিটেনের কোন সংবিধানই নেই'—এই ধারণাটি ঠিক নয়। গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইন— প্রথাগত নিয়মের মাধ্যমে এক সুস্পষ্ট মৌলিক আইনসমষ্টি। লিখিত না হলেও সেখানকার সংবিধানের আইনকানুন অন্যদেশের সংবিধান অপেক্ষা শ্রেয় বা কম মর্যাদা সম্পন্ন নয়। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানেও কিছু কিছু লিখিত আইন আছে।

অলিখিত সংবিধান যেমন প্রথাগত নিয়মের ভিত্তিতে গড়ে উঠে, লিখিত সংবিধানও তেমনি শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকালীন পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুবিধার ভিত্তিতে সাধারণভাবেই গড়ে উঠে। তাছাড়া, সাংবিধানিক নিয়মগুলি দেশের বিচারবিভাগ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়ে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়। কোন দেশের সংবিধানকে তাই যথাযথভাবে বুঝতে হলে লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার নিয়ম সমষ্টি এবং বিচারবিভাগ কর্তৃক পরিমার্জিত অবস্থায় তার সামগ্রিক দিকটি বিচার করতে হবে।

২। অলিখিত ও লিখিত সংবিধান (Unwritten and Written Constitution):

সংবিধানকে অনেক সময় অলিখিত (Unwritten) ও লিখিত (Written)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। অলিখিত সংবিধান কোন এক বিশেষ সময়ে গণপরিষদ দ্বারা সৃষ্টি হয় না। যে প্রাচীন সংবিধান প্রথা-ভিত্তিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে তাকে অলিখিত সংবিধান (Unwritten Constitution) বলা হতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান একটি অলিখিত সংবিধান। কোন এক বিশেষ দলিলের মধ্যে লিখিত অবস্থায় গ্রেট ব্রিটেনের কোন সংবিধানকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতএব গ্রেট ব্রিটেনের কোন সংবিধান নেই, এমন কথা বলা যায় না। সেখানকার সংবিধান প্রাচীন প্রথাগত নিয়মকে ভিত্তি করে প্রয়োজনের তাগিদে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেচে। এক নির্দিষ্ট সময়ে কোন গণপরিষদ প্রস্তাব গ্রহণ করে লিখিত ভাবে একটি দলিলের মধ্যে এই সংবিধানের ধারাগুলিকে লিপিবদ্ধ করেনি। অতএব বলা যেতে পারে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রাচীন প্রথাগত নিয়মই এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

অলিখিত সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

লিখিত সংবিধান কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে আহুত এক বিশেষ গণপরিষদের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে সৃষ্ট হয়। এই সংবিধানের বিধানগুলি অলিখিত সংবিধানের মত প্রথাগত নিয়মের মাধ্যমে গড়ে ওঠেনি। গণপরিষদের বিধানগুলি এক বিশেষ সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রণীত হয়ে কোন এক দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। লিখিত সংবিধানের এইটিই হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য।

লিখিত সংবিধান কোন এক সময়ে গণপরিষদ দ্বারা সৃষ্ট

লিখিত সংবিধান সরকারের গঠনপ্রণালী এবং ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে বলে এর বিধানগুলি এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অলিখিত সংবিধানের বিধানগুলি সাধারণ আইনসভা কর্তৃক সাধারণভাবে যে কোন সময়ে তৈরী হয় বলে এর বিধানগুলি লিখিত সংবিধানের মত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারে না।

লিখিত সংবিধান সাধারণতঃ দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। সংবিধানের ধারাগুলি সাধারণভাবে পরিবর্তিত হলে গণপরিষদের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না। অবশ্য সকল লিখিত সংবিধান যে একই ধরনের দুষ্পরিবর্তনীয় হবে

এমন কথা নেই। দুষ্পরিবর্তনীয়তার আবার মাত্রাভেদ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন উপায় অনুসৃত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সংবিধান লিখিত হলেই যে তাকে অনিবার্যভাবে দুষ্পরিবর্তনীয় হতে হবে, তার কোন কথা নেই। নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত হলেও সুপরিবর্তনীয়।

লিখিত সংবিধান সাধারণতঃ দুষ্পরিবর্তনীয়

লিখিত সংবিধান সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির গঠন ও ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে। সংবিধানের নির্দেশ অনুসারেই সরকারের বিভাগগুলিকে ক্ষমতা পরিচালিত করতে হয়। সুতরাং সংবিধানের নির্দেশ অনুসারে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করাই লিখিত সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এক বিভাগ অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অলিখিত শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ আইনসভাই সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং লিখিত সংবিধানের দ্বারা পরিচালিত সরকারের মত অলিখিত সংবিধানের সরকারের ক্ষমতা সংকুচিত নয়।

লিখিত সংবিধানে সরকারের ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট, অলিখিত সংবিধানে ততটা নয়

লিখিত সংবিধানে আইনসভার ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা নির্দিষ্ট করে দেওয়ায় তার কাজ বিচার বিভাগের দ্বারা অবৈধ ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্য লিখিত সংবিধানের চূড়ান্ত বিচারালয়কে 'সংবিধানের অভিভাবক' (Guardian of the Constitution) বলা হয়। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে লিখিত সংবিধানের অন্তর্গত আইনসভার আইনগুলি উচ্চ বিচারালয় কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হবে এমন কোন কথা নেই। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধান লিখিত কিন্তু সেখানকার উচ্চ বিচারালয় সেখানকার কেন্দ্রীয় আইনসভার (Federal Assembly) আইনগুলি অবৈধ ঘোষণা করতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, লিখিত ও অলিখিত এই দুইশ্রেণীতে সংবিধানকে ভাগ করা অনেকে বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীকরণ বলে মনে করেন না। কারণ লিখিত সংবিধানে যেমন অনেক অলিখিত অংশ থাকে, অলিখিত সংবিধানেও তেমনি অনেক লিখিত অংশ থাকে। তাছাড়া, লিখিত সংবিধানের আইনসভা প্রণীত আইনও অনেকক্ষেত্রে উচ্চবিচারালয় কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সুইজারল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। লিখিত সংবিধানে

লিখিত সংবিধানে সরকারের কাজ অবৈধ ঘোষিত হওয়ার সম্ভাবনা, অলিখিত সংবিধানে এই সম্ভাবনা নেই

লিখিত ও অলিখিত শ্রেণীকরণ বিজ্ঞানসম্মত নয়।

ব্যক্তিস্বাধীনতা অধিকতর রক্ষিত হয় বলে যে ধারণা করা হয় সেটিও ক্ষেত্রে ভ্রামাত্মক। কারণ গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত হলেও ব্যক্তিস্বাধীনতা যথেষ্ট পরিমাণে রক্ষিত হয়েছে। সংবিধানের লিখিত বা অলিখিত অবস্থার উপর ইহা নির্ভর করে না। গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও রাজনৈতিক চেতনাই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রকৃত রক্ষা কবচ। সুতরাং আমারা দেখতে পাচ্ছি, লিখিত ও অলিখিত উভয় প্রকার সংবিধানের পার্থক্য সুস্পষ্ট নয়, তাই এই শ্রেণী বিভাগকে অনেকে বিজ্ঞান সম্মত শ্রেণী বিভাগ বলে মনে করেন না।

পরিশেষে উল্লেখযোগ্য যে, লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য মাত্রাভেদের পার্থক্য মাত্র মূলগত পার্থক্য নয়। অলিখিত সংবিধানেও অনেক লিখিত অংশ থাকে। গ্রেট ব্রিটেনে ম্যাগনাকার্টা (Magnacarta), বিল অব রাইটস (Bill of Rights), ১৯২৩ সালের স্ট্যাটুট অব্ ওয়েস্টমিনস্টার (Statute of Westminister), ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেণ্ট আইন (Parliament Act of 1911 and Parliament Act of 1949) প্রভৃতি সেখানকার অলিখিত সংবিধানের লিখিত অংশ। আবার লিখিত সংবিধানও প্রথা, বিচারকদের রায় ইত্যাদির দ্বারা নিয়তই পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিসভার কোন উল্লেখ সংবিধানে নেই। প্রয়োজনের অভাব মেটাতে গিয়ে কালক্রমে মন্ত্রিসভা আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে।

৩। অলিখিত সংবিধানের গুণ ও ত্রুটি (Merits and defects of Unwritten Constitution):

অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা যায়। শাসনব্যবস্থা সহজে পরিবর্তন করা হলে, জনগণের মনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয় না বা গণবিক্ষোভের প্রয়োজন হয় না।

পরিবর্তনশীলতা জনিত সুবিধা

এই পরিবর্তনশীলতাই আবার অলিখিত সংবিধানের একটি ত্রুটি। সরকারের তরফ থেকে তাদের বিশেষ সুবিধা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তারা শাসনযন্ত্রকে সুবিধামত রদবদল করে নিতে পারে, আবার জনসাধারণের অন্যায় উত্তেজনা অথবা ভাবপ্রবণতাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যও সংবিধান পরিবর্তিত হবার

পরিবর্তনশীলতা জনিত অসুবিধা

সম্ভাবনা থাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবিধানের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন এক কাম্য ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হতে পারে না।

অস্পষ্টতাজনিত অসুবিধা

অস্পষ্টতা অলিখিত সংবিধানের আর একটি ত্রুটি। সরকার এই অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। সংবিধান অলিখিত হলে সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে সংবিধানের যথার্থ স্বরূপ বোঝা এবং তাদের স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না।

৪। লিখিত সংবিধানের গুণ ও ত্রুটি (Merits and defects of Written Constitution):

লিখিত সংবিধানে শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত অবস্থায় থাকে বলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের কাজের সীমা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।

সুস্পষ্টতাজনিত সুবিধা

সামগ্রিকভাবে সরকারের পক্ষেও দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিধি নির্ণয় করা সম্ভব হয়। জনসাধারণের পক্ষেও এই সংবিধান সহজে বোধগম্য হওয়ায় সরকারের কার্যাবলীর যাথার্থ নির্ণয় করতে সক্ষম হয় এবং অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান অপরিহার্য। কারণ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমরা দু' শ্রেণীর সরকার দেখি এবং এই দু' শ্রেণীর সরকারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতা বণ্টিত হতে হলে সংবিধান লিখিত হওয়াই উচিত।

যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের অপরিহার্যতা

অনমনীয়তা-জনিত ত্রুটি

লিখিত সংবিধানের প্রধান ত্রুটি তার অনমনীয়তা। পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে না পারলে গণবিক্ষোভ সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলে শাসনযন্ত্রেরও দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে কোন বিশেষ সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয় না।

৫। সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible and Rigid Constitution):

পরিবর্তনশীলতার ভিত্তিতে সংবিধানের শ্রেণীকরণকেই আধুনিককালে বিজ্ঞানসম্মত শ্রেণীকরণ বলে মনে করা হয়।

সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতির নিয়মের ভিত্তিতে সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যে পদ্ধতিতে

আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন করে সেই পদ্ধতির সাহায্যেই যদি সংবিধানকে পরিবর্তন করা যায় তবে তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible Constitution) বলা হয়। অপরপক্ষে সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য যদি কোন বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হয় তবে তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় (Rigid Constitution) বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেন ও নিউজিল্যাণ্ডের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান। ডাইসের (*Dicey*) মতে, "একই আইনসভার দ্বারা যখন সমস্ত প্রকার আইন—(অর্থাৎ সাধারণ ও সাংবিধানিক আইন) একই প্রকার সমান সহজসাধ্য পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা যায় তখন তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়।"[1] তার মতে, "দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান যার অধীনে সাংবিধানিক অথবা মৌলিক আইনগুলিকে সাধারণ আইনের মত পরিবর্তন করা যেতে পারে না।"[2]

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞা দুটির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য নির্দেশ করতে পারি।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণ আইনসভা যে সাধারণ পদ্ধতিতে আইন প্রণয়ন করে, সংবিধানের বিধানগুলিকেও সেইভাবে পরিবর্তন করতে পারে। অপরপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সংবিধানের বিধানগুলিকে পরিবর্তন করতে হলে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। এখানে দেশের সাধারণ আইনসভা সাধারণ উপায়ে সংবিধানসংক্রান্ত আইনগুলি পরিবর্তন করতে পারে না। স্বভাবতঃই সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে দেশের সাধারণ আইন- এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে কোন পার্থক্য বজায় রাখা হয় না, আর দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সাধারণ এবং সাংবিধানিক আইনের মধ্যে পার্থক্য।

সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হচ্ছে সার্বভৌম এবং অসার্বভৌম আইনসভার মধ্যে পার্থক্য। সুপরিবর্তনীয়

---

1 "A flexible constitution is one under which every law of every description can legally be changed with the same ease and in the same manner by one and the same body "—*Dicey*

2 "A rigid constitution is one under which certain laws generally known as constitutional or fundamental laws cannot be changed in the same manner as ordinary laws "—*Dicey*

সংবিধানে আইনসভাই সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। যেহেতু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভার কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য অন্য কোন উচ্চতর পর্যায়ের আইন সমষ্টি নেই—এখানে আইনসভা যে কোন আইন সাধারণভাবে প্রণয়ন করতে পারে। অপরপক্ষে, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে আইনসভার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সংবিধান আইনসভাকে যে বিষয়গুলির উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে, সেই বিষয়গুলির উপরই আইন সভা আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম।

এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের আর একটি পার্থক্য উল্লেখ করতে পারি। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের আইনসভার ক্ষমতা যেহেতু সংবিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, সেহেতু সংবিধান বহির্ভূত বা বিরোধী কোন আইন প্রণয়ন করলেই, দেশের চূড়ান্ত বিচারালয় তাকে অবৈধ ঘোষণা করে নাকচ করে দিতে পারে। অর্থাৎ দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের আইনসভা প্রণীত আইন বিচারালয় কর্তৃক সংবিধান বহির্ভূত বলে অবৈধ ঘোষণা করার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে যেহেতু আইনসভাই সার্বভৌম এবং তার আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অন্য কোন উচ্চতর বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, সেহেতু এই আইনসভার প্রণীত আইন কোন বিচারালয় সংবিধান বহির্ভূত বলে ঘোষণা করে নাকচ করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

পরিশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারগুলি সংবিধানে উল্লেখ থাকে। লিপিবদ্ধ অবস্থায় এগুলি সংবিধানে উল্লেখ রাখাই দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য। অপরপক্ষে, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সমস্ত নাগরিক অধিকারগুলি সংবিধানের এক বিশেষ অংশে লিপিবদ্ধ অবস্থায় না-ও থাকতে পারে।

৬। সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ-গুণ (Merits and defects of Rigid and Flexible Constitution)।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান সুবিধা এই যে, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানকেও সুবিধামত পরিবর্তন করা সহজসাধ্য। ব্রাইস (*Bryce*) যথার্থই বলেছেন, গাছের ডালপালা রাস্তার দিকে প্রসারিত থাকলে যেমন সহজেই সেগুলিকে ধরে সরিয়ে দিয়ে গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করা

পরিবর্তন সহজসাধ্য

যেমনভাবে, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকেও তেমনি জরুরী অবস্থায় সাময়িকভাবে সংশোধিত ও অবনমিত করা যেতে পারে এবং জরুরী অবস্থা কেটে গেলে তাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাও যেতে পারে। সংক্ষেপে বলা যায়, পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সুবিধাই সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জনসাধারণের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রশমিত করা যায়

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হলে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে পারে। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের পরিবর্তন সহজসাধ্য বলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা থাকে না।

সহজ পরিবর্তনশীলতা সংবিধানের যেমন গুণ, এক হিসেবে সেটি দোষও বটে। জনসাধারণ অনেক সময় সাময়িকভাবে উচ্ছ্বাস অথবা উন্মাদনার বশবর্তী হয়ে কোন প্রচলিত ব্যবস্থার উচ্ছেদ কামনা করতে পারে। এই উচ্ছ্বাস বা ভাবপ্রবণতার ফলে সংবিধান পরিবর্তিত হওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। তাছাড়া, এই জাতীয় সংবিধান দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় দলীয় স্বার্থসিদ্ধি অথবা সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে শাসনকর্তৃপক্ষ অতি সহজেই সংবিধানের পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

যে সংবিধান সরকারের গঠন ও প্রকৃতি নির্ণয়, তার কর্তৃত্বের সীমারেখা নির্দেশ এবং নাগরিক জীবনের অধিকার ও কর্তব্যের নিরাপত্তা সাধন করে তার একটি পৃথক মর্যাদা আছে। দলীয় স্বার্থসিদ্ধি অথবা সাময়িক উচ্ছ্বাসকে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে তাকে যখন তখন পরিবর্তন করে শাসন কর্তৃপক্ষের ক্রীড়াযন্ত্রে পর্যবসিত করা সকল ক্ষেত্রে এক বাঞ্ছিত ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হতে পারে না।

স্থায়িত্ব

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান সুবিধা হচ্ছে তার স্থায়িত্ব। বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে সংবিধান পরিবর্তন করতে হয় বলে শাসন বিভাগের ক্ষমতার পরিধি এবং জনসাধারণের অধিকার সুনির্দিষ্ট এবং সুরক্ষিত হয়।

সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত

যে সংবিধান অতি সহজেই পরিবর্তিত হয়, তার অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বিধানগুলি সুস্পষ্ট ও মোটামুটি স্থায়ীভাবে সংবিধানের মধ্যে

লিপিবদ্ধ অবস্থায় থাকে বলে, শাসন পরিচালনার ভিত্তিও সুদৃঢ় বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুষ্পরিবর্তনের সংবিধান বিশেষ কার্যকরী। কারণ কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের ক্ষেত্রগুলি সহজে পরিবর্তিত হলে আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হবার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনি কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনাও বিদ্যমান থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের কার্যকরিতা

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানকে পরিবর্তন করা দুরূহ হলে, দেশের শাসনব্যবস্থাও পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। ফলে জনসাধারণের মনে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। সরকারকে যে কোন পরিবর্তিত অবস্থার সম্মুখীন হওয়া উচিত এবং তার সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত। কিন্তু সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হলে, সরকারের পক্ষে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার কার্যাবলীর সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয় না।

পরিবর্তনশীলতার অভাবজনিত অসুবিধা

৭। সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধতি (Methods of Amendment of Constitution):

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে অতি সহজেই পরিবর্তন করা যেতে পারে। এখানে যে আইনসভা সাধারণ আইন প্রণয়ন করার মালিক সেই আবার সাধারণ উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের পার্লামেণ্ট যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন তৈরী করে সেখানে ঐ একই পদ্ধতিতে সংবিধানও সংশোধন করতে পারে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বিধানগুলিকে পরিবর্তন করতে হলে এক বিশেষ নিয়মের মাধ্যমে তা করতে হয়। সাধারণ আইনসভা আইন প্রণয়নের সাধারণ পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করতে পারে না। অবশ্য দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে সংশোধন করার জন্য সব রাষ্ট্রে একই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানকে যে বিভিন্ন উপায়ে সংশোধন করা হয় তার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি আলোচনা নিম্নে করা হল।

(১) কোন কোন দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে কেন্দ্রীয় আইসভাকে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়া হয়। অবশ্য এই পরিবর্তনের জন্য আইনসভার

এক... বিশেষ সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন হয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় ...নসভা সুপ্রীম সোভিয়েতের দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের সংখ্যাধিক্যে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের অধিকাংশ বিধানগুলি কেন্দ্রীয় আইনসভার দ্বারা সংশোধিত হতে পারে। কেন্দ্রীয় আইনসভার যে কোন কক্ষ সংবিধানের সংশোধনের জন্য প্রস্তাব আনতে পারে এবং প্রত্যেক কক্ষের সদস্যদের অন্ততঃ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং ভোটদানের মাধ্যমে উক্ত কক্ষের সমস্ত সদস্যের সংখ্যাধিক্যে পাস হলে তবে সেটিকে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে উক্ত বিধান পরিবর্তিত হয়। এই নিয়ম ছাড়া কতগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। যেমন, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় সংবিধানের ক্ষমতা বণ্টন পরিবর্তন করতে হলে মোট অঙ্গরাজ্যগুলির অর্ধেক সংখ্যকের সম্মতির প্রয়োজন। অবশ্য সংবিধানের কোন কোন বিধান কেন্দ্রীয় আইনসভা সাধারণ সংখ্যাধিক্যে পরিবর্তন করতে পারে।

(২) কোন কোন সংবিধানের সংশোধনের জন্য গণসম্মতির প্রয়োজন হয়। অষ্ট্রেলিয়া এবং সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের পরিবর্তন করতে হলে অধিকাংশ ভোটদাতার সম্মতি প্রয়োজন।

(৩) কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তনের ভার একটি পৃথক সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্র আবেদন করলে কংগ্রেসকে ঐ সংশোধন প্রস্তাব করার জন্য একটি পৃথক সম্মেলন (Convention) আহ্বান করতে হয় এবং উক্ত প্রস্তাব তিন চতুর্থাংশ সদস্য রাষ্ট্রগুলির আইনসভা অথবা এতদুদ্দেশ্যে গঠিত সম্মেলনের দ্বারা সমর্থিত হলে তবে সেটি পরিবর্তন করা যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সংবিধান পরিবর্তনের জন্য তিন চতুর্থাংশ সংখ্যক সদস্য রাষ্ট্রের সমর্থন প্রয়োজন।

৮। ভাল সংবিধানের লক্ষণ (Characteristics of a Good Constitution):

আধুনিক কালে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশ বিদেশী-শক্তির অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সব দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সুতরাং স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠতে পারে—ভাল সংবিধানের লক্ষণ কি?

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন, সংবিধানটি সুস্পষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সংবিধান সুস্পষ্ট হলে তাকে বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে না।

সুস্পষ্টতা

সংবিধান অস্পষ্ট হলে, তাকে শাসনব্যবস্থায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে। তাছাড়া, অস্পষ্ট-সংবিধান বিচার বিভাগের দ্বারা বিভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা থাকে।

সংবিধান লিখিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ, লিখিত সংবিধান সাধারণ মানুষের বোধগম্য। অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত হলেও সেখানকার সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবিধান। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানকে পৃথিবীর অন্যান্য মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থার জনক বলা যেতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনের উন্নত জাতীয় চরিত্র এবং গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যই তাদের অলিখিত সংবিধানের সাফল্যের জন্য দায়ী। জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে যখন যেমনটি প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কতকগুলি প্রথাগত সাংবিধানিক নিয়মকে কেন্দ্র করে শাসনকার্যের স্বচ্ছন্দ গতিটিকে তারা সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

লিখিত সংবিধান

লিখিত সংবিধানের আর একটি সুবিধা হচ্ছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে এখানে লিখিত অবস্থায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এমত অবস্থায় তাদের প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে তারা যেমন অবহিত থাকে তেমনি রাষ্ট্রের পক্ষে এই অধিকারগুলিতে সহজে হস্তক্ষেপ করাও কঠিন হয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অধিকার লিখিত অবস্থায় থাকলেই যে তা যথাযথভাবে রক্ষিত হবে, এমন কথা নেই। "Eternal vigilance is the price for liberty"—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র। গ্রেট ব্রিটেনের নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যই তাদের ব্যক্তিস্বাধীনতার রক্ষাকবচ। অবশ্য ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা থেকে সত্মমুক্ত জাতিগুলির এই ধরনের রাজনৈতিক চেতনা আশা করা যায় না। তাই এই রাষ্ট্রগুলির সংবিধানে মৌলিক অধিকারগুলি লিপিবদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও সাধারণতঃ এই কথাই প্রযোজ্য।

মৌলিক অধিকার

সংবিধানের পরিবর্তনশীলতার উপর তার কার্যকারীতা অনেকাংশে নির্ভর করে। সংবিধান খুব বেশী নমনীয় হলে তার স্থায়িত্বের অভাবহেতু শাসনকার্য পরিচালনায় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে। আবার খুব বেশী

[illegible]নীয় হলে পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থাকে খাপ খাইয়ে চালান সম্ভব হয় না। এর ফলে গণবিক্ষোভের উদ্ভব হতে পারে।

পরিবর্তনশীলতা

সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সংশোধনের ক্ষেত্রে সংবিধান মধ্যপন্থী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ সংবিধান এত অনমনীয় হওয়া উচিত নয় যাতে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব হয় না, আবার এত সুপরিবর্তনীয় হওয়াও উচিত নয় যাতে নাকি সংবিধানটি জনসাধারণের সাময়িক উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য অথবা শাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুসারে যখন তখন পরিবর্তন করা যেতে পারে।

শাসনতন্ত্রের ব্যাপকতার (Comprehensiveness) উপর সংবিধানের সার্থকতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সংবিধান অতিরিক্ত ব্যাপক হওয়া উচিত নয়।

ব্যাপকতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সাতটি ধারা সম্বেও, পৃথিবীর কোন ব্যাপক সংবিধানের চাইতে নিম্ন পর্যায়ের নয়। সংবিধান অত্যন্ত ব্যাপক হলে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রথাগত নিয়ম গড়ে উঠার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সংবিধানের এই অলিখিত বিধানগুলি শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শাসনব্যবস্থাকে সুবিধামত পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা চলে না। সংবিধান বিস্তৃতভাবে লিখিত হলে প্রয়োজনীয় রদবদল সম্ভব অনেক সময় হয় না।

সংক্ষিপ্তসার

সংবিধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে—(১) শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং (২) সরকারের গঠন এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধা করা।

সংবিধান—(১) লিখিত ও অলিখিত, এবং (২) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় হতে পারে। অলিখিত সংবিধান কোন এক গণপরিষদ দ্বারা সৃষ্ট না হয়ে প্রথাগত নিয়মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। লিখিত সংবিধান কোন এক সময়ে গণপরিষদ দ্বারা সৃষ্ট [illegible] এক বিশেষ রাষ্ট্রীয় দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়। লিখিত এবং অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য মাত্রার পার্থক্য, মূলগত পার্থক্য নয়। (১) অলিখিত সংবিধান পরিবর্তনশীল হওয়ায় পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার খাপ খাইয়ে চলা যেমন সুবিধা হয়, জনসাধারণের ভাবপ্রবণতা অথবা উচ্ছ্বাস হেতু সংবিধান অযথা পরিবর্তিত হবারও তেমনি সম্ভাবনা থাকে। (২) অস্পষ্টতাও অলিখিত সংবিধানের অন্যতম ত্রুটি।

লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট হওয়ায় জনসাধারণের সহজ বোধগম্য হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষে লিখিত সংবিধান অপরিহার্য। লিখিত সংবিধান অনমনীয় হওয়ায় পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা সম্ভব হয় না।

রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণ উপায়ে সংবিধান পরিবর্তন করতে পারলে সেই সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন বিশেষ নীতি অনুসৃত হলে তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের সুবিধা হচ্ছে—(১) সুবিধামত সংবিধান পরিবর্তন, (২) জনসাধারণের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ প্রশমিতকরণ।

সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের অসুবিধা হচ্ছে—(১) জনসাধারণ উচ্ছ্বসিত বা ভাবপ্রবণ হলে সংবিধানের পরিবর্তন দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে। (২) দলীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার নিজের খেয়ালখুশিমত সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে।

দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান সুবিধা হচ্ছে—(১) স্থায়িত্ব, (২) সুস্পষ্টতা এবং (৩) যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে কার্যকরীতা। এই শাসন ব্যবস্থার অসুবিধা হচ্ছে—(১) সরকার পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তার শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে পারে না যার ফলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হতে পারে।

অলিখিত সংবিধান সাধারণ আইনসভা কর্তৃক পরিবর্তিত হতে পারে। আর লিখিত সংবিধান পরিবর্তনের জন্য চারটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

ভাল সংবিধানের লক্ষণ—(১) সুস্পষ্টতা, (২) লিখিত অবস্থায় অবস্থিতি ও মৌলিক অধিকারের লিপিবদ্ধকরণ, (৩) পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অনুসরণ এবং (৪) ব্যাপকতা।

Exercise

1. Distinguish between a Rigid and a flexible constitution. Are the constitutions of (*a*) U S A, (*b*) England, (*c*) India rigid or flexible? Give reasons for your answer

2. "Constitutions grow and are not made" Criticise the doctrine with reference to the constitution of India

3. "The distinction between states with written and those with unwritten constitutions is an illusory basis of division."—Examine the statement

4. What are the contents of a good constitution?

ষোড়শ অধ্যায়

নির্বাচকমণ্ডলী

(Electorate)

১। ভূমিকা (Introduction) :

আধুনিক গণতন্ত্র অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র ছিল, তখন সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সরাসরিভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল। তাই সেই গণতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলা যেতে পারে। আধুনিককালে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমা ও জনসংখ্যা বৃহৎ। ফলে সমগ্র জনসাধারণের পক্ষে সরাসরিভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই জনসাধারণের তরফ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনসাধারণের পক্ষে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাই আধুনিক গণতন্ত্রকে অপ্রত্যক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র বলা হয়।

আধুনিক প্রতিনিধি-মূলক গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের গুরুত্ব

আধুনিক গণতন্ত্র যেহেতু জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত হয় সে কারণে নির্বাচন-সংক্রান্ত সমস্যাকে স্বভাবতঃই বর্তমানকালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে গণ্য করা হয়। নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত কাদের। এই নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমস্ত নাগরিকবৃন্দের। যত অধিক সংখ্যক লোক নির্বাচনের অধিকার লাভ করবে সেই রাষ্ট্র তত বেশী গণতান্ত্রিক হবে। অধিক সংখ্যক লোক নির্বাচনের অধিকার লাভ করলে গণতন্ত্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রাপ্তবয়স্কের ভোট দেবার অধিকার কিন্তু বেশী দিন স্বীকৃত হয়নি। ইংলণ্ডে পিলের আমলে (*Report Peel*) ১৮৩২ সালের রিফর্ম অ্যাক্ট (Reform Act of 1832) পাস হবার আগে কয়েকটি ঐতিহাসিক শহরের অধিবাসীরাই এই অধিকার ভোগ করত। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে, ১৮৩২ সালের আইনের ফলে ইংলণ্ডে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ডিজরেলীর আমলে ১৮৬৭ সালের রিফর্ম অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর শ্রমিক শ্রেণীর ভোট দেওয়ার অধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯১৮

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সম্বন্ধে একটি মোটামুটি জ্ঞাতব্য ইতিহাস

সালের একটি আইনের দ্বারা ত্রিশ বৎসর ও ঊর্ধ্ব স্ত্রীলোকদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। ১৯২৮ সালের আইনে ভোট দেবার ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষকে সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ২১ বৎসর বয়স্ক সকল নাগরিক ভোট দেওয়ার অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের উনবিংশ সংশোধনে (19th Amendment) বলা হয়েছে যে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কোন নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ভারতবর্ষের জনসাধারণকে ভোট দেবার অধিকারী হতে হলে কয়েকটি বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হতে হত। সম্পত্তির মালিকানা, শিক্ষা প্রভৃতি এই যোগ্যতার শর্ত বলে বিবেচিত হত। এই আইনে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১৬ জন নরনারী ভোট দেবার অধিকার পেয়েছিল। সুখের কথা ভারতে বর্তমান সংবিধানের ৩২৬ ধারায় ২১ বৎসর বয়স্ক সকল প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোট দেবার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক লোকের ভোট দেবার অধিকারকে বোঝায় না। স্পষ্টতঃই বিদেশীদের এই অধিকার দেওয়া হয় না। তাছাড়া নাবালক, পাগল এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এক্ষণে আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

২। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for and against adult suffrage):

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, এই নীতি গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। গণতান্ত্রিক শাসন বলতে যদি সর্বসাধারণের জন্য সর্বসাধারণের শাসন বুঝি, তাহলে প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোটাধিকার থাকা উচিত। ভোট দেওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের উপর ন্যস্ত হলে গণতন্ত্রের ভিত্তিও সুদৃঢ় হবে। এই অধিকার সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছু সংখ্যক নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে অংশ গ্রহণ থেকে তাদের বঞ্চিত করা। এক্ষেত্রে এই বঞ্চিত নাগরিকসম্প্রদায়ের কাছ থেকে নৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্র কোন আনুগত্য দাবি করতে পারে না।

গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত

1, যে নাগরিক সম্প্রদায়কে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, ারিক হিসেবে তাদের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা অস্বীকৃত হয়। সাম্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে নাগরিকদের মধ্যে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়, গণতন্ত্রের নৈতিক ও কার্যকরী ভিত্তিকে তা দুর্বল করতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যার মধ্যে শ্রেণী নির্বিশেষে সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে। এই নীতিকে কার্যকরী করতে হলে শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের ভোটাধিকার থাকা উচিত। যে শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষিত নাও হতে পারে।

সর্বসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে

তৃতীয়তঃ, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে শাসক শ্রেণী স্বৈরাচারী হতে পারে না। কোন সরকার জনস্বার্থবিরোধী কাজ করলে জনসাধারণ পুনর্বার তাদের নির্বাচন না করে শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করতে পারে। যেহেতু শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়, স্বভাবতঃই তারা সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে সাহস করে না।

শাসক শ্রেণী স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না

চতুর্থতঃ, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃত না হলে রাষ্ট্রের মধ্যে অশান্তি ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সকল নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারের দিক থেকে সমপর্যায়ভুক্ত করলে দেশের মধ্যে যে স্বাস্থ্যকর রাজনৈতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তা একান্ত আবশ্যক।

অশান্তি ও বিদ্বেষের সম্ভাবনা থাকে না

মিল (*J. S. Mill*), লেকী (*Lecky*), মেইন (*Sir Henry Maine*), ঐতিহাসিক মেকলে (*Macaulay*) প্রভৃতি লেখকেরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক মেকলে বলেছেন, সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হলে 'বিরাট ধ্বংসকে' (Vast Spoliation) ডেকে আনা হবে। মিল বলেছেন, প্রত্যেককে ভোটাধিকার দেওয়ার আগে তাদের শিক্ষিত করে তোলা উচিত ("Universal teaching must precede universal enfranchisement)। অন্যথায় এই গুরুত্বপূর্ণ অধিকারের

অসদ্ব্যবহার হবে। তাঁর মতে, যে লোককে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হবে, তাঁর লিখতে, পড়তে এবং সামান্য অঙ্ক কষতে জানা উচিত। মিলের এই অভিমতের যৌক্তিকতাকে একেবারে অস্বীকার করা চলে না। দেশের সাধারণ সমস্যাগুলিকে বুঝতে হলে কিছু পরিমাণে শিক্ষিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলিকে ঠিকমত বোঝা সম্ভব নয় এবং অতি সহজেই তাদের বিপথে পরিচালিত করা যেতে পারে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, দেশের সাধারণ সমস্যাগুলি বোঝা এবং ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহারের সঙ্গে লেখাপড়া জানার কোন সম্পর্ক নেই। সাধারণ ভালমন্দ জ্ঞান সকলেরই থাকে এবং ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহারের জন্য সেইটুকুই যথেষ্ট। ভারতে যে তিনটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেল তার থেকে এই যুক্তির সারবত্তা আমরা অনুধাবন করতে পারি। ভারতে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত, কিন্তু তাই বলে তারা ভোটাধিকারের অসদ্ব্যবহার করেছে এমন কথা আমরা বলতে পারি না। ভারতে সাধারণ লোক অশিক্ষিত বা নিরক্ষর হলেও তাদের সাধারণ হিতাহিত জ্ঞানের অভাব নেই এবং সেইজন্যই তারা এই রাজনৈতিক অধিকারটিকে ঠিকমত ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিরুদ্ধ নীতি

লেকী (*Lecky*) তাঁর "*Democracy and Liberty*" নামক গ্রন্থে শিক্ষা ও সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, আইনসভা এমন এক যন্ত্র যা জনসাধারণের উপর কর বসায়, সুতরাং আইনসভার প্রতিনিধিরা করদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, এইটিই সংগত। সম্পত্তির অধিকারীরাই সাধারণতঃ কর দেয় সুতরাং তাঁর মতে সম্পত্তির অধিকারীদেরই প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। অন্যথায় সাধারণের তরফ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা করদাতাদের প্রদত্ত সরকারী অর্থের অপব্যয় করবে। মিল-ও কর প্রদানের ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়ার নীতিকে সমর্থন করেছেন।

সম্পত্তির অধিকার ভোটাধিকারের অন্যতম যোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে এই নীতিকে আমরা কখনই গ্রহণ করতে পারি না। কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ গণতন্ত্রকে বিকৃত করা। দারিদ্র্যের অপরাধে এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। কেবলমাত্র সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ বিত্তবান শ্রেণীর

স্বার্থ...দের জন্যই সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। আধুনিক কালে ...ণতন্ত্র বিগর্হিত নীতি আমরা কোনমতেই সমর্থন করতে পারি না।

৩। মেয়েদের ভোটাধিকার (Woman Suffrage):

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে স্ত্রীপুরুষ সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটাধিকারকে বোঝায়। পৃথিবীর প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মেয়েদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে পুরুষের ভোটাধিকার স্বীকৃতির অনেক পরে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকে ইউরোপের দেশগুলিতে মেয়েদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু হয় এবং এই সময়ের পর থেকে ইউরোপের গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানী, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রধান রাষ্ট্রগুলিতে পুরুষের অনুরূপ মর্যাদা দান করে স্ত্রী-ভোটাধিকার নীতি গৃহীত হতে থাকে

ইংলণ্ডের বিশিষ্ট চিন্তানায়ক জন স্টুয়ার্ট মিল (*J S Mill*) স্ত্রী ভোটাধিকারের একজন বড় সমর্থক। তিনি বলতেন, স্ত্রীলোকদের অধীনতা পাশ (subjection) থেকে 'মুক্ত' ('emancipation') না হলে সমাজের কল্যাণ নেই। মিল নারীজাতির প্রকৃতিগত অক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে তারা পুরুষের সমান পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে পারে, এই ছিল তার দৃঢ় বিশ্বাস। তাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সামাজিক পরিবেশ ও রীতিনীতিগুলিকে অপসারিত করে নারী জাতিকে পুরুষের সমান অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে সমাজের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা হবে বলে তিনি মনে করতেন।

মেয়েদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে যুক্তিস্বরূপ বলা হয় যে প্রকৃতি তাদের কতকগুলি বিশেষ কাজের উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছে। এই কাজ প্রধানতঃ গৃহস্থালির কাজ। গার্হস্থ্যধর্ম পালনের মধ্যেই মেয়েদের স্বাভাবিক গুণের সম্যক বিকাশ সাধন হয়। সুতরাং এই গার্হস্থ্য জীবনকে অবহেলা করে তারা যদি রাজনৈতিক জীবনে অংশগ্রহণ করে তবে তারা প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাবে। গৃহকর্ম অবহেলা করলে গৃহের শান্তিও বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। মেয়েদের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে আরও বলা হয় যে, স্ত্রী যদি স্বামীর পছন্দ মত ব্যক্তিকে ভোট দেয় তাহলে তা হবে স্বামীর ভোটেরই দ্বৈতকরণ, আবার যদি বিরুদ্ধে ভোট দেয় তাহলে ভোটের ব্যাপার নিয়ে গৃহবিবাদ শুরু হবার সম্ভাবনা। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই অবাঞ্ছিত অবস্থা যদি এড়াতে হয় তা হলে মেয়েদের ভোটাধিকার না দেওয়াই যুক্তিসংগত।

এই অধিকারের স্বপক্ষে যুক্তিস্বরূপ বলা হয় যে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানবিজ্ঞানের উচ্চতর ক্ষেত্রে এবং বাস্তব জীবনে মেয়েরা পুরুষের সমান পারদর্শিতা দেখিয়েছে। সুতরাং পুরুষকে ভোটাধিকার দিলে মেয়েদেরও সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়। তাছাড়া, কেবলমাত্র পুরুষকে যদি ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং নারীকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাহলে নারী জাতির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আইন সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগে নারীজাতির ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইন ও সামাজিক কু-প্রথা মিলের মত দার্শনিকও মেয়েদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে সক্রিয় আন্দোলনের মধ্যে টেনে এনেছিল। মেয়েদের ভোটাধিকারের আরও একটি বড় যুক্তি এই যে, স্ত্রীজাতি রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ করলে তাদের নারীসুলভ সংগুণ সমাজজীবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এক সুষ্ঠু এবং স্বাস্থ্যকর সামাজিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া, অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার পথ রুদ্ধ হলে যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির যোগ্যতাকে কাজে লাগান যায় না। মেয়েদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের অধিকার না দেওয়ার অর্থই হচ্ছে এই অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করা। যোগ্যতাসম্পন্নেরা যদি ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় সমাজ সেক্ষেত্রে যে দুর্বল হবে তাতে সন্দেহ নেই।

৪। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন (Direct and Indirect Election):

আধুনিক গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক বা পরোক্ষ গণতন্ত্র। বৃহৎ জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক সীমারেখা বড় হওয়ার জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মত এ-যুগের নাগরিকদের শাসনব্যবস্থায় সরাসরি অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই আজকের দিনের সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনসাধারণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতি দু'রকমের হতে পারে: (১) প্রত্যক্ষ এবং (২) পরোক্ষ। নাগরিকবৃন্দ যখন আইনসভায় তাদের প্রতিনিধিদের সরাসরি নির্বাচন করে থাকে তখন সেটি প্রত্যক্ষ নির্বাচন। বর্তমানযুগে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই আইন সভায় নিম্ন কক্ষের প্রতিনিধিরা সরাসরি ভাবে নির্বাচিত হন। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসাধারণ প্রথমে এক নির্বাচনী সংস্থার প্রতিনিধিদের

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন বলতে কি বোঝায়

নির্বাচিত করেন এবং এই নির্বাচিত সদস্যরা পরে আইনসভা অথবা শাসনযন্ত্রের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এইভাবে নির্বাচিত হন। ভারতের রাষ্ট্রপতিও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন।

এখন আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার গুণ ও দোষগুলি আলোচনা করা দরকার।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের সপক্ষে যুক্তি

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রধান সুবিধা এই যে এখানে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে হয় বলে তারা সরকারের নীতি এবং ক্রিয়াকলাপগুলি অনুধাবন করার চেষ্টা করে, সাধারণ সমস্যাগুলির সম্বন্ধে চিন্তা করতে শেখে এবং নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে চেষ্টা করে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্য অধিকার সম্বন্ধে নাগরিক সম্প্রদায়ের চেতনা ও আগ্রহের উপর গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। নির্বাচন পরোক্ষ হলে দেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা স্তিমিত হতে শুরু করে এবং নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে তারা উদাসীন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় সরকারের দিক থেকে স্বৈরাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার আর একটি বড় সুবিধা এই যে, এখানে প্রতিনিধি বা সরকারের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা জনসাধারণের দ্বারা সরাসরিভাবে নির্বাচিত হন যার ফলে জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তারা সজাগ থাকেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক্ষেত্রে স্বাভাবিক কারণেই নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি দায়িত্বশীল হন। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি জনসাধারণ। কাজেই জনগণের কাছে সরকারের দায়ী থাকা উচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং জনগণের মধ্যে কোন মধ্যবর্তী সংস্থা থাকলে জনগণের প্রতি নির্বাচিতের দায়িত্ব স্বভাবতই কমে যাবে।

তাছাড়া, প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় সরকারের দিক থেকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ হলে জনগণ অতি সহজেই তাকে কর্তৃত্বের অধিষ্ঠান থেকে অপসারিত করতে পারে। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় জনসাধারণের কাছ থেকে তার এই হাতিয়ার কেড়ে নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা সকল প্রকারে ত্রুটিমুক্ত এমন কথা বলা যায় না। জনসাধারণ সাময়িক উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে, অথবা রাজনৈতিক নেতাদের বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক সময় উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে না।

চতুর রাজনৈতিক ধুরন্ধরদের নানা প্রকার নির্বাচনী চাতুর্যও অনেক সময় সাধারণ মানুষকে বিপথে চালিত করে। ক্ষুদ্রতর নির্বাচনী সংস্থার সদস্যগণ জনসাধারণের চাইতে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন হবেন আশা করা যেতে পারে। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। তাই এই নির্বাচনের দায়িত্ব সাধারণের হাতে ছেড়ে না দিয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই অনেকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে এই কারণেই পরোক্ষ নির্বাচনের দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য রাজনৈতিক দলপ্রথা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এই উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি

প্রত্যক্ষ নির্বাচনের অসুবিধার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধার দিকটি আলোচনা করেছি। পুনরুল্লেখ হলেও পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধাগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি যে, যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচনের পথকে সুপ্রশস্ত করাই এর [illegible] গুণ।

পরোক্ষ নির্বাচনের স্বপক্ষে যুক্তি

এই নির্বাচন ব্যবস্থার একটি সুবিধা হচ্ছে যে নির্বাচনের দুটি স্তর থাকায় শেষোক্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু সময় অতিক্রান্ত হয়, যার ফলে ধীরভাবে বিচার বিবেচনা সহকারে উপযুক্ত প্রার্থীদের নির্বাচন করা নির্বাচকদের পক্ষে সম্ভব হয়। নির্বাচনের প্রথম অবস্থায় সাময়িক উচ্ছ্বাস ও প্রবল রাজনৈতিক পরিবেশকে প্রভাবিত করে— দ্বিতীয় পর্যায়ে, সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ফলে, এই ভাবাবেগ কিছুটা স্তিমিত হলে যে সুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, নির্বাচন কার্যের জন্য তা একান্ত প্রয়োজন।

পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় পরোক্ষ নির্বাচনের আর একটি প্রয়োজনীয়তা আছে। পার্লামেন্ট পরিচালিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন তাঁর পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। বৃহৎ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসাধারণ দ্বারা ক্ষমতাবিহীন এক নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচনের কোন যুক্তি থাকতে পারে না। তাছাড়া, এর ফলে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার পরিচালনার দিক থেকেও নানা অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে। এই শাসনব্যবস্থা অনুসারে সপরিষদ প্রধানমন্ত্রীই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনিই আইনসভার কাছে দায়ী। এমত অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যদি জনসাধারণ

সরাসরিভাবে নির্বাচিত হন, প্রধানমন্ত্রী অথবা মন্ত্রিপরিষদের সাথে তাঁর ...টি প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্ভাবনা থেকে যায়।

রাষ্ট্রপতি ভাবতে পারেন যে তিনিও জনসাধারণের প্রতিনিধি এবং তাঁরও কার্যাবলীর পিছনে জনগণের সমর্থন আছে। এই বোধ তাঁকে অনিবার্যভাবে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিপরিষদের সাথে এক অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। এর ফলে শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়াও বিচিত্র নয়। এই দিক থেকে পার্লামেণ্টারী অথবা প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত আমরা মনে করি। অবশ্য আইনসভার নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য নয়।

পরোক্ষ নির্বাচনের বিপক্ষে যুক্তি

পরোক্ষ নির্বাচনের সুবিধাগুলি এতক্ষণ আলোচনা করা হল। এইবার এর অসুবিধার দিকটি আমাদের দেখতে হবে। পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা যথার্থ গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী, বিশেষ করে আইনসভার নিম্নতন কক্ষের প্রতিনিধিদের কোন মতেই এই প্রথায় নির্বাচিত হওয়া উচিত নয়। এই প্রথার দ্বারা নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালিত হলে নির্বাচিত প্রতিনিধি কিছু পরিমাণে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবেন; নির্বাচিত প্রতিনিধি জনসাধারণের প্রতি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ থাকবেন না। সরাসরিভাবে নির্বাচনের সুযোগ থাকলে জনসাধারণ দেশের সমস্যাগুলি চিন্তা করতে শেখে এবং রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হয়। পক্ষান্তরে, নির্বাচন পরোক্ষ হলে জনসাধারণ দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের অধিকার এবং কর্তব্য বোধও স্তিমিত হতে শুরু করে। পরোক্ষ নির্বাচনের প্রধান অসুবিধা হচ্ছে, অল্প-সংখ্যক নির্বাচকমণ্ডলীকে অতি সহজেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের আয়ত্তে আনা সুবিধা হয়। সাময়িক প্রলোভনে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতার জন্য সাধারণ স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়াও বিচিত্র নয়। সারা ভারতে যে বিকেন্দ্রিত স্বায়ত্ত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হতে চলেছে তার বিভিন্ন স্তরের সংস্থাগুলি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সংগঠিত হবে। রাজনৈতিক দলপ্রথা বিবর্জিত এই নীতির স্বপক্ষে জয়প্রকাশ নারায়ণের মত চিন্তাশীল ব্যক্তি মত প্রকাশ করেছেন। দলনীতির কবলমুক্ত হয়ে এই ব্যবস্থা কি পরিমাণে তার উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করার সময় এখনও আসেনি।

৫। নির্বাচনী এলাকা (Electoral Districts বা Constituencies):

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রকে নানা ক্ষুদ্র বা বৃহৎ এলাকার ভিত্তিতে বিভক্ত করা নির্বাচন সংক্রান্ত আর একটি সমস্যা। এই উদ্দেশ্যে এলাকাগুলিকে কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেক এলাকা থেকে একজন মাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়, আবার কখনও বা বৃহৎ নির্বাচনী এলাকা থেকে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা হতে পারে। প্রথম নীতিটিকে বলা হয় **এক-আসনব্যবস্থা** (Single district method) এবং দ্বিতীয়টিকে বলা হয় **বহু-আসনব্যবস্থা** (General ticket method)। গ্রেট ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম নীতিটি অনুসৃত হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এক-আসনব্যবস্থা (Single district method) সাধারণতঃ প্রচলিত ব্যবস্থা হলেও অনুন্নত সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে বহু আসনব্যবস্থাও (General ticket method) অনুসৃত হয়েছে।

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নির্বাচনী এলাকার সুবিধা ও অসুবিধা

ক্ষুদ্র নির্বাচনী এলাকার প্রধান সুবিধা এই যে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং ছোট রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়। নির্বাচনী এলাকা বড় হলে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজনৈতিক দল অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীগুলিই সাধারণতঃ প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ লাভ করে। ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলগুলি বিশেষ এলাকায় তাদের শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। কোন এলাকায় কোন ক্ষুদ্র শ্রেণীর লোক বেশী থাকলে এই ব্যবস্থায় তারাও প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে আশা করা যায়। কিন্তু বৃহৎ এলাকায় এই সম্ভাবনা কম। অবশ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলে এই প্রথায় তাদের সংখ্যানুপাতে নির্বাচনের সুযোগ কমে যেতে পারে।

ক্ষুদ্র এলাকায় ভোট গণনার এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ সহজসাধ্য হয়। তাছাড়া, নির্বাচিত প্রতিনিধিরাও অতি সহজেই নির্বাচকমণ্ডলীর সাথে তাঁদের যোগসূত্র বজায় রাখতে পারেন। বৃহৎ এলাকায় সবসময় তা সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র নির্বাচন এলাকায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেক সময় সংকীর্ণ হতে দেখা যায়। নির্বাচনের সুযোগ লাভ করার জন্য তাঁরা দেশের সাধারণ স্বার্থের পরিবর্তে তাঁদের স্থানীয় স্বার্থের উপরই

জোর দেন। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে আইনসভার প্রতিনিধিদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী দেশের সাধারণ স্বার্থের পরিপন্থী। এই ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর পছন্দের পরিসর অনেক সময় সংকুচিত হয় বলে মনে করা হয়। বৃহৎ এলাকায় এই সম্ভাবনা কম।

ক্ষুদ্র এলাকার বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত দুটি যুক্তি খুব শক্তিশালী নয়। আধুনিক কালে আইনসভার প্রতিনিধিদের পক্ষে সাধারণ স্বার্থের বিরুদ্ধে স্থানীয় স্বার্থের উপর গুরুত্ব দেওয়ার অবকাশ কম থাকে। আইনসভার আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি দেশের সাধারণ সমস্যারূপেই বিবেচিত হয়। স্থানীয় সমস্যাগুলি সমাধানের ভার আজকাল সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া, জাতীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত স্থানীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি একটি বৃহত্তর পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং এক্ষেত্রে কেবলমাত্র আঞ্চলিক বা স্থানীয় সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে প্রধান সমস্যাগুলির বিচার করার অবকাশ কম থাকে।

পছন্দের পরিসরকে সংকুচিত করা হয় বলে যে যুক্তি দেখানো হয় তার বিপক্ষে বলা [illegible] যে, আজকাল প্রায় সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই কোন একটি বিশেষ কেন্দ্র থেকে নির্বাচনপ্রার্থী হবার অধিকার সেই বিশেষ এলাকার অধিবাসীদের [illegible] সীমাবদ্ধ থাকে না। দেশের যে কোন স্থানের বাসিন্দা যে কোন এলাকা থেকে নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য আসন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধি প্রেরণের সুবিধা ইত্যাদি কারণে বৃহৎ নির্বাচনী এলাকা ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজন হলেও ক্ষুদ্রতর এলাকার ভিত্তিতে নির্বাচনী এলাকা বিভক্তীকরণ শ্রেষ্ঠতর ব্যবস্থা বলে মনে হয়।

৬। একাধিক ভোটদান (Plural or Weighted Voting):

প্রতি নির্বাচককে একটি মাত্র ভোট দেওয়ার অধিকার গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত। অনেক সময় কয়েকটি বিশেষ গুণ বা যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিক ভোট দিতে দেওয়া হয়। যেমন, কোন লোক যদি একাধিক জায়গায় সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহলে সে এই বিভিন্ন স্থানে ভোট দেবার অধিকারী হয়। ভারতে বর্তমান আইন অনুসারে আইনসভার

নিম্নতন কক্ষে প্রতি নির্বাচক একটি মাত্র ভোট দিতে পারবে—নির্দিষ্ট বা যোগ্যতার অধিকারী হলে নির্বাচক আইনসভার উচ্চতন কক্ষের নির্বাচনের বেলায় একাধিক ভোট দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত অথবা ন্যূনপক্ষে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার উচ্চতন কক্ষের নির্বাচনে অতিরিক্ত পৃথক ভোট দেবার অধিকারী। পূর্বে বেলজিয়ামে একাধিক ভোটদান প্রথা প্রচলিত ছিল।

একাধিক ভোটদান পদ্ধতির উদাহরণ

একাধিক ভোটদান পদ্ধতির স্বপক্ষে সাধারণতঃ বলা হয় যে, শিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত ও বিচার অশিক্ষিত ব্যক্তিদের মতামত ও বিচার অপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য এবং মূল্যবান। স্টুয়ার্ট ও মিলের মতে এই কারণে শিক্ষিত বা যথার্থ গুণী ব্যক্তিদের অশিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা বেশী ভোট থাকা উচিত। সম্পত্তিশালী ব্যক্তিদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এবং অনেক সময় উচ্চতর যোগ্যতার কারণে বিশেষ শ্রেণীর নির্বাচকদের একাধিক ভোটের অধিকার থাকা উচিত বলে যুক্তি দেওয়া হয়। শিক্ষিত ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তিরা সাধারণ লোকের অপেক্ষা সংখ্যায় কম। সুতরাং সাধারণ লোকের ভোটের সংখ্যাধিক্যের ফলে তাঁদের স্বার্থ যাতে ব্যাহত না হয় তার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

এই পদ্ধতির স্বপক্ষে যুক্তি

একাধিক ভোটদান পদ্ধতির এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা যেতে পারে শিক্ষিত ব্যক্তিই যে সব সময় রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্বন্ধে অধিক বিচক্ষণতাসম্পন্ন হবে এমন কোন কথা নেই। সাধারণ লোকেরও দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ বোঝবার, বিশ্লেষণ করার এবং উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে। ভারতে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত কিন্তু তাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাব নেই। দেশের পরিস্থিতি বুঝবার জন্য যে সাধারণ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তার সঙ্গে সব সময় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ যোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে সাধারণ লোক শিক্ষিত ব্যক্তিদের অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এমন অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুক্তি

একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীকে তার উচ্চতর শিক্ষার জন্য একাধিক ভোট দেওয়ার অধিকারকে স্বীকার করার সময় আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে মতামতের গুরুত্ব নির্ধারণ করার এমন কোন মানদণ্ড নেই যার ফলে আমরা একটি মতকে অধিক মূল্যবান এবং অপরটি কম মূল্যবান বলে আখ্যা দিতে

[illegible]ধারী। একজন ডিগ্রীধারীর একাধিক ভোট থাকলে, একজন কৃতী শিল্পী বা দক্ষ শ্রমিকের সেই অধিকার থাকবে না কেন—এর কোন সদুত্তর আমরা খুঁজে পাই না। এদের বিচারশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারীর চাইতে কম হবে—এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই অমূলক এবং যুক্তিহীন। সম্পত্তির অধিকার অধিকতর যোগ্যতার মানদণ্ড বলে বিবেচিত হতে পারে না। ধনীর সন্তানেরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পত্তি পান তার জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং সাম্যনীতির ভিত্তিতে গঠিত আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই জাতীয় বৈষম্যমূলক নির্বাচন পদ্ধতি অনুসরণ না করাই যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি।

৭। প্রকাশ্য অথবা গোপন ভোট (Open or Secret Voting):

গোপন ভোট পদ্ধতি প্রচলিত হবার পূর্বে ভোটদাতারা প্রকাশ্যে ভোট দিতেন এবং অনেকে এইটিকেই ন্যায়সংগত বলে বিবেচনা করতেন। এই পদ্ধতির স্বপক্ষে বলা হত যে নাগরিক মাত্রেরই তার নির্দিষ্ট অভিমতকে সকলের সামনেই প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করা উচিত। আধুনিক কালে অবশ্য এই যুক্তি আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না। চক্ষুলজ্জা অথবা পরবর্তী পীড়নের ভয় ইত্যাদি কারণে সকলের পক্ষে প্রকাশ্যে তার পছন্দমত ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। ভোটপ্রার্থীরা সাধারণতঃ সাধারণ ব্যক্তিদের অপেক্ষা প্রভাবশালী বা আর্থিক ও অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাদের সমক্ষে নির্ভীকভাবে প্রত্যেক ভোটদাতার ইচ্ছাকে ব্যক্ত করা সম্ভব নয় এবং হলেও পরবর্তী কালে নির্বাচককে হয়ত অত্যাচার, উৎপীড়ন এবং প্রতিহিংসামূলক নানা প্রকার অপ্রীতিকর পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে, অন্ততঃপক্ষে সে বিপদ সব সময়েই থাকা সম্ভব।

এই সব প্রতিক্রিয়াশীল সম্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য আধুনিককালে পৃথিবীর সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই গোপন ভোটদান পদ্ধতির ব্যবস্থা অনুসৃত হয়।

৮। আঞ্চলিক ও বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্ব (Territorial and Functional Representation):

বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে আইনসভার প্রতিনিধিরা ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন। কিন্তু

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক শ্রেণীর লেখকেরা ভৌগোলিক এলাকার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রথাকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে ভৌগোলিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রকৃতপক্ষে প্রতিনিধি বলে নিজেকে দাবী করতে পারেন না। কোন এক নির্বাচনী এলাকায় বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার লোক বাস করে এবং এই সমস্ত বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশার প্রতিনিধিত্ব করা একজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। একজন লোক তার সমব্যবসায়ীর সমস্যা বুঝতে পারেন এবং তাঁদের প্রতিনিধিত্ব তিনিই কেবল করতে পারেন কিন্তু কোন এক সমাজে যে সমস্ত বৃত্তি, পেশা এবং সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোক বাস করেন তার সকলের প্রতিনিধিত্ব করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। একজন ডাক্তারের সমস্যা একজন শ্রমিক বা উকীলের সমস্যা থেকে পৃথক, আবার একজন শিল্পপতির সমস্যা ও একজন শ্রমিকের সমস্যাও ভিন্ন রকমের। তাই আধুনিক কালে সমাজকে যথার্থভাবে প্রতিনিধিমূলক করতে হলে সমাজের এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী বা পেশার তরফ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। [illegible] (Duguit) [illegible] Sieyes [illegible], কোল (Cole) প্রভৃতি লেখকেরা এই নীতির সমর্থক। [illegible] মতে সমাজের [illegible] সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য, উৎপাদনকারী [illegible] অন্তর্ভুক্ত ও বুদ্ধিজীবীদের [illegible] তরফ থেকে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা উচিত। [illegible] (Graham Wallas) [illegible] আইনসভা এমনভাবে গঠিত হওয়া উচিত যাতে নাকি নিম্নতন কক্ষের প্রতিনিধিরা ভৌগোলিক ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচনী এলাকা থেকে নির্বাচিত হন এবং উচ্চতন কক্ষের প্রতিনিধিরা বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী ও বৃত্তিগুলির তরফ থেকে নির্বাচিত হন। সিডনে এবং বিয়েট্রিস ওয়েব (Sidney and Beatrice Webb) একটি সামাজিক পার্লামেণ্ট (Social Parliament) এবং আর একটি রাজনৈতিক পার্লামেণ্টের (Political Parliament) কথা কল্পনা করেছেন। কোলের মতে আইনসভাকে যেহেতু বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হয় সেহেতু আইনসভার প্রতিনিধিদেরও এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার তরফ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত।

বৃত্তিগত প্রতিনিধিত্বের পক্ষে কথা

[illegible] প্রধান সমর্থক [illegible]

জার্মানীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওয়েমার সংবিধানের অধীনে যে National Economic Council তৈরী হয় তার প্রতিনিধিরা কৃষক, শ্রমিক, কুটিরশিল্পী,

বর্তমানে আইনসভার প্রতিনিধিদের পক্ষে ব্যক্তিগত মতামত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার অবকাশ কম।

কিন্তু রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের আগে আইনসভায় প্রতিনিধিরা আইনসভায় তাদের নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করবেন, না তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করবেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল। ইংলণ্ডে ১৭৭৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এডমণ্ড বার্ক (*Edmund Burke*) ব্রিস্টল থেকে পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে বার্ক আমেরিকার ঘটনাবলী এবং আয়ারল্যণ্ডের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তা ব্রিস্টলের নির্বাচকমণ্ডলীর মনঃপূত হয়নি এবং কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের বার্কের বিরুদ্ধে এক বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ১৭৮০ সালের পুনঃ নির্বাচনের সময় ঐ বছরের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে পার্লামেন্টের সদস্যদের কি কর্তব্য হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিক বিবৃতি দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন পার্লামেন্টের সদস্যদের স্বাধীনভাবেই তাদের মতামত ব্যক্ত করা উচিত। পার্লামেন্ট কোন সমস্যা বিশদভাবে আলোচিত হওয়ার আগে নির্বাচকমণ্ডলীর নির্দেশ অনুসারে কোন বিশেষ মতের বাহক হিসেবে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত নয়। পার্লামেন্টের সদস্যদের আলোচনার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব বিবেক এবং বিচারবোধ অনুসারে অভিমত ব্যক্ত করাই যুক্তিসংগত।

বার্কের এই অভিমত সমর্থন করে ল্যাস্কি বলেছেন—"Burke's classical explanation of the relationship is as true to-day as when it was first spoken to the misguided electors of Bristol" প্রতিনিধির যথার্থ কর্তব্য সম্বন্ধে ল্যাস্কি এই অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, প্রতিনিধি তাঁর নিজস্ব বুদ্ধি ও বিবেকের পরিপ্রেক্ষিতে যা ভাল বোঝেন তাই করার জন্যই তিনি নির্বাচিত হন ("He is elected to do the best he can in the light of his intelligence and conscience")। অবশ্য আধুনিককালে আইনসভার অধিকাংশ প্রতিনিধিরা রাজনৈতিক দলের সদস্য হলেও তাদের কোন দলের রবার স্ট্যাম্প বলে মনে করা উচিত নয়। রাজনৈতিক দলগুলি সব সময় জনমতকে সঙ্গে নিয়েই তাদের নীতি নির্ধারণ করেন। স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তারা জনমত সংগ্রহ করে সেই মতকে যথাসম্ভব স্বপক্ষে রেখেই তাঁরা আইনসভায় তাদের নীতি নির্ধারণ করেন।

১০। নির্বাচক মণ্ডলীর কর্তব্য (Duties of the Electorate):

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থাকে বুঝায়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থায় নির্বাচক মণ্ডলী তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করতে না পারলে গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে। এজন্য কোন এক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নির্বাচক মণ্ডলীর কি কর্তব্য হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বিশেষ দরকার।

প্রথমে উল্লেখ করতে হয়, জনসাধারণের প্রকৃত প্রার্থীকে নির্বাচন করার জন্য দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। শুধু অবহিত হলেই চলবে না, এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্বন্ধে তাদের চিন্তা করতে হবে এবং সেই চিন্তিত অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে হবে। বর্তমানের গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলভিত্তিক গণতন্ত্র। তাই নির্বাচকমণ্ডলীকে নির্বাচন কালীন যে নির্বাচনী ঘোষণাপত্র (Election manifesto) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কর্তৃক প্রচারিত হয় সেগুলি অনুধাবন করে তাদের প্রার্থী নির্বাচনে এগিয়ে আসা উচিত। নির্বাচনে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জনসাধারণের প্রার্থীর যোগ্যতা [illegible] দায়িত্ববোধ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ভাবে অবহিত হওয়া উচিত।

নির্বাচনের পর জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ জনস্বার্থবিরোধী কাজ করলে নির্বাচক মণ্ডলীর সংগঠিত জনমতের মাধ্যমে তাতে বাধা দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, সংবাদপত্র ইত্যাদির দ্বারা জনসাধারণ তাদের অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে সরকারের জনস্বার্থবিরোধী কাজে বাধা দিতে পারে। জনসাধারণ গণভোট, গণপ্রস্তাব, প্রত্যাবর্তনের আবেদন ইত্যাদির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

সুতরাং দেখা যায় যে, নির্বাচক মণ্ডলীর যথোপযুক্তভাবে তাদের কর্তব্য পালন করতে হলে নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক কর্তব্যগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। জাগ্রত জনমতের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে। অতএব দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া এবং সরকারের কার্যাবলীর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা নির্বাচকমণ্ডলীর অবশ্য কর্তব্য।

১১। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব (Representation of Minorities)

বর্তমান যুগে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে শেষোক্ত শাসনব্যবস্থাই প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণ তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এ কারণে এই গণতন্ত্র প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র নামেই সমধিক পরিচিত। গণতন্ত্রের সার্থক রূপদানের জন্যে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের শাসন ব্যাপারে অংশ বা প্রতিনিধিত্ব থাকা প্রয়োজন। প্রত্যেক রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা সম্ভব; জাতি, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে এই শ্রেণীবিভাগ আত্মপ্রকাশ করে। এই শ্রেণীবিভাগ যেখানে বর্তমান সেখানে শ্রেণীস্বার্থ নিয়ে বিরোধ দেখা দেওয়াও সম্ভব এবং আধুনিক কালে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই এই বিরোধের ফলে নানারকম সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। বহু ক্ষেত্রেই নির্বাচন ব্যবস্থার ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার জন্য নির্বাচনে সকল শ্রেণী বা স্বার্থের—বিশেষ করে সংখ্যালঘু স্বার্থের, যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয় না। অথচ গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরু শ্রেণী শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলেও, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ যাতে বিপন্ন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। আইনসভায় সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের স্বার্থ উপেক্ষিত হবার আশংকা থাকে; সে-কারণে সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলে না। কাজেই নির্বাচন ব্যবস্থা এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সংখ্যালঘু শ্রেণীর লোকেরাও তাদের শক্তি বা সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হন। সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থাই (Proportional Representation) প্রধান, সে পদ্ধতির বিশদ আলোচনার পূর্বে অন্যান্য পদ্ধতিগুলির উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হবে।

সীমাবদ্ধ ভোট ব্যবস্থা (Limited Vote System): এই ব্যবস্থায় প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র তিন বা ততোধিক আসন সমন্বিত হবে। প্রতি কেন্দ্রে যতজন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন বলে নির্দিষ্ট থাকে, প্রতি নির্বাচকের তদপেক্ষা কমসংখ্যক ভোট প্রদানের অধিকার থাকে—অর্থাৎ কোন কেন্দ্রে যদি তিনটি বা অপর কোন কেন্দ্রে পাঁচটি আসন থাকে তবে কোন নির্বাচককেই সমসংখ্যক ভোট দিতে দেওয়া হয় না, তিন জনের স্থলে দুজনকে বা পাঁচজনের স্থলে তিন বা চারজনকে নির্বাচক ভোট প্রদান করতে পারবেন, এরকম নির্দিষ্ট করে দেওয়া

হয়। এর ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পক্ষে সকল আসন অধিকার করা সম্ভব হয় না এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও কিছুসংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হন।

একত্রিত ভোট ব্যবস্থা (Cumulative Vote System): এই ব্যবস্থাতেও প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র বহু আসন সমন্বিত এবং এক্ষেত্রে প্রতি কেন্দ্রে নির্বাচক নির্দিষ্ট আসনের সমসংখ্যক ভোটের অধিকারী। এরূপ ক্ষেত্রে নির্বাচক তার ইচ্ছামত ঐ ভোট বিভিন্ন প্রার্থীদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন বা একজন প্রার্থীকে নির্দিষ্ট ভোটের সব ক'টিই একত্রে প্রদান করতে পারেন, যেমন পাঁচ আসন বিশিষ্ট কোন কেন্দ্রে কোন নির্বাচক পাঁচজন প্রার্থীকে পাঁচটি ভোট দিতে পারেন অথবা একজন প্রার্থীকেই সমস্ত ভোট একত্র করে দিতে পারেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল নির্বাচক যদি তাদের সম্প্রদায়ের কোন প্রার্থীকে সমস্ত ভোট এভাবে একত্রিত করে প্রদান করার নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরাও নির্বাচনে কিছুসংখ্যক আসন অধিকার করতে সক্ষম হবেন।

দ্বিতীয় ব্যালট প্রথা (The Second Ballot System): কোন কেন্দ্রের নির্বাচন প্রার্থী, যাতে সেই কেন্দ্রের অধিকসংখ্যক ভোটদাতার আস্থাভাজন বলে বিবেচিত হতে পারেন, সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। বিশেষ কেন্দ্রের কোন প্রার্থী নির্বাচনে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে, দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রথার সাহায্যে নির্বাচকমণ্ডলীর অধিক সংখ্যকের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হয়। দ্বিতীয় ব্যালটে প্রথম নির্বাচন দ্বন্দ্বের নিম্নসংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীকে বাদ দিয়ে পুনরায় ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যেতে পারে যে কোন কেন্দ্রের নির্বাচন প্রার্থী তিন ব্যক্তি ক, খ ও গ-এর মধ্যে প্রথম নির্বাচনে তারা যথাক্রমে ৫০০০, ৭৫০০ ও ৩৫০০ ভোট পেয়েছেন। এক্ষেত্রে প্রথম প্রার্থীকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করলে তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকাংশের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন বলে ধরা যাবে না। তাই দ্বিতীয়বার ভোট গ্রহণের সময় গ-কে বাদ দিয়ে ক ও খ-এর মধ্যে নির্বাচন সীমাবদ্ধ করলে নির্বাচকমণ্ডলীর রায় অধিকতর যথাযথ হবে। এই অবস্থায় ক ও খ-এর মধ্যে পুনর্বার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে, এমন হতে পারে যে, ক ৬০০০ ও খ ৭০০০ ভোট পেয়েছেন। তা হলে প্রথম ব্যালটে যিনি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী, দ্বিতীয় ব্যালটে দেখা গেল যে তিনিই অধিক সংখ্যক ভোটদাতার

আস্থাভাজন বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন। কাজেই এই পদ্ধতিতে নির্বাচকমণ্ডলীর অভিমতকে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২। সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা (System of Proportional Representation):

অধুনা প্রায় সর্বদেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা এক প্রধান সমস্যা: যদিও তত্ত্বের দিক থেকে গণতন্ত্র বলতে আমরা এমন এক শাসনব্যবস্থাকে বুঝি যেখানে সকল নাগরিকের প্রতিনিধিত্ব বা অংশ আছে, কিন্তু কার্যত: দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠেরাই শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করেন এবং সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। এর জন্য প্রধানত: অনেকে নির্বাচন ব্যবস্থাকে দায়ী করেন। সাধারণত: কোন নির্বাচনে যে প্রার্থী সর্বোচ্চ ভোট পান, তিনি আইনসভার সভ্য নির্বাচিত হন এর ফলে সংখ্যালঘু দল বা সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অনেক সময় দেখা যায় যে, সাধারণ নির্বাচনে সামান্য ভোটাধিক্যের বলে কোন দল প্রাপ্ত ভোটের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক আসন অধিকার করেছে এবং সংখ্যালঘু দল বা গোষ্ঠী তাদের সংখ্যা বা প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে তেমন কিছু আসন লাভ করতে পারেন নি, এমনও হতে পারে যে বিশেষ কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি ধরা যায় যে, কোন এক নির্বাচনকেন্দ্রে দু'জন প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একজন প্রার্থী মোট ভোট সংখ্যার শতকরা ৫২ ও অপরপ্রার্থী শতকরা ৪৮ ভাগ ভোট লাভ করেছেন, বা অন্য আর একটি নির্বাচনকেন্দ্রে তিনজন প্রার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রথম প্রার্থী মোট ভোটসংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ, দ্বিতীয় প্রার্থী শতকরা ৩৫ ভাগ ও তৃতীয় প্রার্থী শতকরা ২৫ ভাগ ভোট লাভ করেছেন—তা হলে প্রথম ক্ষেত্রে সামান্য ভোটাধিক্যের জোরে অর্থাৎ শতকরা ৫২টি ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, অপর ব্যক্তি শতকরা ৪৮টি ভোট পেয়েও নির্বাচিত হতে পারবেন না এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভোটের মাত্র ৪০ ভাগ ভোট পেয়ে একজন প্রার্থী নির্বাচিত হবেন, অথচ শতকরা ৬০ ভাগ ভোটদাতারা যে প্রার্থীদ্বয়কে ভোট দিয়েছেন তাঁদের কেউই প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবেন না। এ-অবস্থায় সংখ্যালঘু শ্রেণী প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে সক্ষম না হলে বা সংখ্যার তুলনায় তাঁদের নামমাত্র প্রতিনিধিত্ব থাকলে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে পারে; কেননা, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আইন প্রণয়নের

সমূহ যদি তাঁদের স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন তা হলে অবশিষ্টাংশের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে বাধ্য। এই বিপদের কথা মনে রাখলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা চলে না। গণতন্ত্র বলতে যদি আমরা সকল শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের শাসন বুঝি তাহলে প্রত্যেক শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের অধিকার স্বীকার করা উচিত। যাঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব সমর্থন করেন, তাঁদের মধ্যে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের (*J S Mill*) নাম উল্লেখযোগ্য। মিলের মতে আইনসভায় প্রত্যেক দলের সংখ্যানুযায়ী প্রতিনিধিত্ব না থাকলে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না। অর্থাৎ তাঁর মতে গণতন্ত্রে সকল দলেরই সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত। তা না হলে সাম্যের পরিবর্তে অসাম্য দেখা দেবে এবং নির্বাচনে তাঁদের ন্যায্য অংশ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা বঞ্চিত হবেন। এ জন্যে মিল নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। কেনন, সাধারণতঃ নির্বাচনে যে পদ্ধতি প্রচলিত তাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নায্য প্রতিনিধিত্ব সম্ভব নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখে তিনি সমানুপাতিক বা সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার সমর্থন করেছেন।

সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় যে দুটি পদ্ধতির প্রয়োজন দেখা যায় তার মধ্যে 'হেয়ার' পদ্ধতি অন্যতম। হেয়ার পদ্ধতিতে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে সমানুপাতিক নির্বাচন (Proportional Representation by Single Transferable Vote) সম্ভব হয়। ইংরেজ লেখক টমাস হেয়ার (*T Hare*) ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *Treatise on the Election of Representatives* নামক গ্রন্থে এই পদ্ধতির বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেন এবং এই পদ্ধতিকে প্রচারিত করায় তাঁর বিশেষ ভূমিকা থাকায়, এই পদ্ধতির সঙ্গে হেয়ারের নাম যুক্ত করা হয়ে থাকে।

এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতি নির্বাচন কেন্দ্র বহু আসনবিশিষ্ট হয়ে থাকে, প্রতি নির্বাচককে নির্বাচন প্রার্থীদের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক নির্বাচকের একটি মাত্র ভোট থাকে। প্রয়োজন হলে এই ভোট নির্বাচক কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রথম প্রার্থীর পরিবর্তে অন্য কোন প্রার্থীর স্বপক্ষেও গণ্য হতে পারে। এ জন্য প্রত্যেক নির্বাচক প্রার্থীদের তালিকার মধ্য থেকে ১, ২, ৩, ৪ ইত্যাদি সংখ্যার দ্বারা তাঁর পছন্দের ক্রম হিসেবে কয়েকজনের নামে নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। এই পদ্ধতিতে কোন কেন্দ্রের নির্বাচকদের প্রদত্ত

ভোটসংখ্যাকে ঐ কেন্দ্রের নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয় এবং এই ভাগফল যত হবে কোন প্রার্থী সমসংখ্যক ভোট পেলে নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। ঐ সংখ্যাকে **কোটা** (**Quota**) বা নির্বাচন সূচক সংখ্যা বলা হয়। মনে করা যাক, কোন পাঁচ আসনবিশিষ্ট নির্বাচনকেন্দ্র পাঁচটি আসনের জন্য দু'হাজার ভোট প্রদত্ত হয়েছে, তা হলে দু'হাজারকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে ($\frac{২০০০}{৫} = ৪০০$) কোটা পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে এই কেন্দ্রে কোন প্রার্থী ৪০০ ভোট পেলে নির্বাচিত বলে ঘোষিত হবেন। এখানে ভোটগণনার পদ্ধতিও একটু স্বতন্ত্র ধরনের। প্রার্থী তালিকায় নির্বাচকেরা যে প্রার্থীকে '১' সংখ্যার দ্বারা প্রথম ভোট দিয়েছেন সেই প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কোটার সমান সংখ্যক অর্থাৎ, ৪০০ ভোট পেলে নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন। এই '১' সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট প্রথম ভোটপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ ৪০০এর অতিরিক্ত ভোট পেলে, '২' সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট দ্বিতীয় মনোনয়ন প্রাপ্ত বা দ্বিতীয় পছন্দের নির্বাচন প্রার্থীদের নামে সেই ভোট বণ্টন করে দ্বিতীয় মনোনয়ন প্রাপ্তদের ভোট গণনা করা হয়। এইভাবে দ্বিতীয় মনোনয়ন প্রাপ্তদের মধ্য থেকে প্রার্থী নির্বাচিত হন। নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মনোনয়নের ক্রম অনুসারে ভোট গণনা চলে। অর্থাৎ, প্রয়োজন হলে, '৩' বা '৪' সংখ্যার দ্বারা নির্দিষ্ট তৃতীয় বা চতুর্থ মনোনয়ন প্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ব মনোনয়ন প্রাপ্তদের অতিরিক্ত ভোট যুক্ত করে ভোট গণনা করা হয়। এই পদ্ধতির সাহায্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদের সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে সক্ষম হন।

হেয়ার পদ্ধতিরই একটু পরিবর্তিত রূপ '**ড্রুপ কোটা**' (*Droop Quota*) নামে খ্যাত। ইংরেজ ব্যারিস্টার ড্রুপ (*H. R. Droop*) এই প্রথার উদ্ভাবন করেন। এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট আসন সংখ্যার সঙ্গে ১ যোগ করে সেই সংখ্যা দিয়ে প্রদত্ত ভোটসংখ্যাকে ভাগ করতে হয় এবং পরিশেষে ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ করে 'কোটা' নির্ধারণ করতে হয়। পূর্বে হেয়ার প্রথার ব্যাখ্যায় আমরা যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি তাকে ড্রুপ প্রথার ছকে ফেললে এইরকম দাঁড়াবে $\frac{২০০০}{৫+১}+১$ অর্থাৎ ৩৩৩$\frac{১}{৩}$ + ১ বা ৩৩৪। এই প্রথায় ৩৩৪ সংখ্যক ভোট পেলে প্রার্থী নির্বাচিত বলে গণ্য হবেন।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য দ্বিতীয় যে পদ্ধতি প্রচলিত তা **তালিকা পদ্ধতি** (**The List System**) নামে খ্যাত। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নির্বাচন কেন্দ্রের আসনের ভিত্তিতে একটি প্রার্থী তালিকা

প্রস্তুত করেন। নির্বাচন কেন্দ্রের যতগুলি আসন তার মধ্যেই প্রত্যেক দলকে তাঁর প্রার্থী-তালিকা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। নির্বাচক এ-ক্ষেত্রে তাঁর মনোমত কোন দলের তালিকায় তাঁর সকল ভোট প্রদান করবেন। এই ব্যবস্থায় তালিকায় প্রদত্ত ভোটসংখ্যার অনুপাতে রাজনৈতিক দলগুলি আসন সংগ্রহ করবে। এখানেও প্রতি কেন্দ্রের প্রদত্ত ভোটসংখ্যাকে মোট আসনসংখ্যার দ্বারা ভাগ ক'রে যে ভাগফল পাওয়া যাবে, তাই হবে 'কোটা'। এই কোটার যতগুণ ভোট একটি রাজনৈতিক দল লাভ করবে, দলের প্রতিনিধিত্ব সংখ্যাও তার ভিত্তিতে স্থির হবে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই পদ্ধতির ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অনুমান করা যাক যে ছয় আসন সমন্বিত কোন নির্বাচনকেন্দ্রে ৩টি রাজনৈতিক দল প্রার্থীতালিকা প্রস্তুত করে নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। মনে করা যাক, এই কেন্দ্রে প্রদত্ত মোট ভোটসংখ্যা হল ৬৬,০০০, তা হলে $\frac{৬৬০০০}{৬}$ = ১১,০০০ হবে কোটা নির্ধারক সংখ্যা। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দল যদি ৩৩,০০০ বা অনুরূপ সংখ্যক ভোট পেয়ে থাকে তা হলে তারা তিনটি আসন, দ্বিতীয় দল যদি ২২,০০০ বা অনুরূপ সংখ্যক ভোট পেয়ে থাকে তাহলে তারা ২টি আসন এবং তৃতীয় দল ১১,০০০ ভোট পেলে একটি আসন লাভ করবে।

একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটের সাহায্যে সমানুপাতিক নির্বাচন প্রথায় ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রথা ভারতীয় আইনসভাগুলির উচ্চতন কক্ষের প্রতিনিধি নির্বাচনের কাজেও প্রযুক্ত হয়েছে।

সুইজারল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি যুরোপের বিভিন্ন দেশে এই তালিকা পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

১৩। সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার গুণাগুণ:
Merits and Defects of Proportional Representation :

সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হল এই যে, এ ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত, কেননা, এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক শ্রেণী বা স্বার্থের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকে। ফলে, কোন শ্রেণীরই স্বার্থ উপেক্ষিত হবার ভয় থাকে না। প্রত্যেক নাগরিকের দাবি বা বক্তব্য তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আইন-সভায় গোচরীভূত হয়। এই ব্যবস্থার ফলে আইনসভায় বিশেষ দলের প্রাধান্যলাভ সম্ভব হয় না—এক্ষেত্রে সকল দলের প্রতিনিধিত্ব থাকায় রাষ্ট্র-পরিচালনায় প্রত্যেক দলেরই কিছু না কিছু অংশ থাকে। এর ফলে

নাগরিকদের রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষার প্রসার ঘটে এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ও কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

নির্বাচনকেন্দ্র বৃহৎ হওয়ায় এই ব্যবস্থায় প্রকৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে। এই ব্যবস্থাতেই প্রকৃত জ্ঞানী বা গুণী নির্বাচনপ্রার্থী বিত্তশালী বা অনুরূপভাবে প্রতিপত্তি সম্পন্ন না হয়েও নির্বাচকের ভোটলাভে সক্ষম হতে পারেন।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা বিভিন্ন দলের শক্তির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব হয় এবং কোন দল প্রকৃতই কি পরিমাণ জনসাধারণের আস্থাভাজন তা জানা যায়। এই প্রথায় আইনসভায় সকল দলের প্রতিনিধিত্ব থাকায়, আইনসভা সত্যিকারের প্রতিনিধিমূলক হয়ে ওঠে এবং সেখানে জনমতের সার্থক অভিব্যক্তি ঘটে।

তত্ত্বের দিক থেকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের স্বপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা সম্ভব হলেও, বাস্তব অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করা শক্ত। তা ছাড়া, এই ব্যবস্থার অতিরিক্ত জটিলতার জন্য ব্যাপক ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থাকে। সাধারণ ভোটদাতা অনেক সময়েই এই পদ্ধতিকে বুঝে উঠতে পারেন না এবং ভোটগণনাকারী কর্তৃপক্ষ এই জটিলতার সুযোগ নিয়ে জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারেন।

তত্ত্বগত দিক থেকেও সিজউইক (*Sidgwick*), ফাইনার (*Finer*), ল্যাস্কি (*Laski*) প্রমুখ বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থার ফলে দেশে বহুসংখ্যক দলের সৃষ্টি হবে, আইনসভায় কোন দলই হয়তো এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। বহু দলের সংযোগে কোয়ালিশন সরকার গঠন করা সম্ভব হলেও, তা দুর্বল এবং অস্থায়ী হতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, এই প্রথায় নির্বাচন সংখ্যাভিত্তিক বা শ্রেণীভিত্তিক হওয়াতে প্রতিনিধিরা দলীয় স্বার্থ সম্পর্কে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হয়ে জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেন। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা যদি সব কিছু সমস্যার বিচার করেন, তা হলে ভেদবুদ্ধির প্রসার ঘটবে এবং জাতীয় সংহতি বিপন্ন হবে।

তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় নির্বাচনকেন্দ্র বৃহৎ হওয়ায়, অনেক সময় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাচকমণ্ডলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোন যোগ থাকবে না। এতে আঞ্চলিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এবং সাম্প্রদায়িক ও দলীয় ভিত্তিতে আইনপ্রণয়নের নীতি অবলম্বিত হতে পারে। এইভাবে সংকীর্ণ স্বার্থের প্রাধান্য হলে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে তা হানিকর হয়ে উঠবে।

চতুর্থতঃ, অস্থবতাকালীন উপনির্বাচনে এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন করা সম্ভব নয়, কাজেই সেরূপ ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা অচল।

উপসংহারে বলা চলে যে, অশুভশক্তির কবল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত রাখা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় এবং গণতন্ত্রে ন্যায়সংগত ভাবে সকল স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চয়ই বিধেয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র প্রতিনিধিত্ব প্রথার সংস্কার সাধনের দ্বারা গণতন্ত্রে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন সাধারণ নাগরিকের আর্থিক, নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিধান—একমাত্র সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি দানের ভিতর দিয়ে যা সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। অভাব থেকে, দারিদ্র্য থেকে এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা সম্ভব না হলে, অন্য কোন পন্থায় গণতন্ত্রের সংকট রোধ করা যে কঠিন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সংক্ষিপ্তসার

আধুনিক অপ্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইনসভায় প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ব্যবস্থায় (১) সকল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষিত হয়, (২) শাসক শ্রেণীর স্বেচ্ছাচার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না এবং (৩) অশান্তি বিক্ষোভের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে বলা হয়—(১) নাগরিকসম্প্রদায় শিক্ষিত না হলে অথবা (২) কিছু সম্পত্তির অধিকারী না হলে ভোটাধিকারের অসদ্ব্যবহার হবার সম্ভাবনা থাকে।

প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার বলতে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারকেও বোঝায়।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধে বলা হয়—(১) তারা ভোটাধিকার পেলে গার্হস্থ্য কর্তব্য অবহেলিত হবে, (২) গার্হস্থ্য শান্তি বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং (৩) রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ তাঁদের স্বভাব-ধর্মের বিরুদ্ধ।

স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে বলা হয়—(১) যেহেতু, তারা জীবনের সকলক্ষেত্রেই সমান যোগ্যতা ও কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছে—তাই এই রাজনৈতিক অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা উচিত নয়, (২) তারা স্বাভাবিকভাবে দুর্বল বলে আইনের দ্বারা রক্ষা দাবী করতে পারে এবং (৩) তাদের রাজনৈতিক জীবনে অংশ গ্রহণ সমাজজীবনে এক স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া সৃষ্টি করে।

নির্বাচনের দুটি পদ্ধতি আছে—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে—(১) জনসাধারণ সরকারের নীতিগুলি অনুধাবন করে, (২) প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ

পায় এবং (৩) জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত হয়। অপরপক্ষে এই ব্যবস্থায়—(১) উচ্ছ্বাসপ্রবণ জনসাধারণ অথবা রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা বিপথে চালিত হয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

(১) পরোক্ষ নির্বাচনে যোগ্যতর ব্যক্তি নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা থাকে, (২) কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না, (৩) ফলে, সরকারের পক্ষে জনসাধারণের কাছে দায়িত্ববোধ কমে যায়, (৪) রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে পরোক্ষ নির্বাচনের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যহত হয়েছে, (৫) জনসাধারণ দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হয় এবং (৬) স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা অতি সহজেই স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের বশে আনতে সক্ষম হয়।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের জন্য উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলি হচ্ছে—(১) সীমাবদ্ধ ভোট ব্যবস্থা (২) দ্বিতীয় ব্যালট প্রথা এবং (৩) সমানুপাতিক নির্বাচন ব্যবস্থা।

Exercise

1 Briefly discuss the various methods that have been suggested for the representation of minorities in the legislature (C. U 1955)

2 Summerise the arguments for and against universal franchise.

3 Distinguish between Direct and Indirect Election Discuss their respective merits and defects

4. Distinguish between territorial representation and functional representation (C. U. 1960)

5 To what extent, if any, should a member of a legislative be bound by instructions of his Constituency? Discuss the functions performed by the electorate in a modern State.

সপ্তদশ অধ্যায়

রাজনৈতিক দলপ্রথা
(Party System)

১। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and nature of political parties):

ব্যক্তিবিশেষের অভিমত কোন এক সংগঠনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ না হলে তাকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। তাই দেশের সাধারণ সমস্যাগুলির সমাধান কল্পে যারা এক মতাদর্শে বিশ্বাসী তারা এক সংগঠনের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হয়ে সরকার গঠনের সুযোগ লাভ করে তাদের মতাদর্শকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে। বিভিন্ন লেখক রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বার্কের (*Barke*) মতে

সংজ্ঞা

কতকগুলি লোক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে যখন সংঘবদ্ধ হয়, তখন তাদের একটি রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে। অধ্যাপক গিলক্রিষ্টের (*Gilchrist*) মতে এক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কতকগুলি নাগরিক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করলে সেই সংগঠনকে রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে। অধ্যাপক গেটেল (*Gettell*) বলেছেন, রাজনৈতিক দল বলতে অল্পবিস্তর সংগঠিত এক নাগরিক সম্প্রদায়কে বোঝায় যারা একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করে এবং যারা তাদের নির্বাচনী শক্তির দ্বারা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের সাধারণ নীতিগুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করে।[1]

উপরোক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা রাজনৈতিক দলের নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমতঃ, দেশের সাধারণ সমস্যা ও তার সমাধানগুলির নীতি সম্পর্কে কতকগুলি লোককে এক মতাবলম্বী হতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতিকে কার্যকরী করার জন্য একটি সংগঠন সৃষ্টি করতে হবে যার নিয়মকানুন উক্ত দলের সদস্যদের সাধারণভাবে মেনে চলতে হবে।

1 "A political party consists of a group of citizens, more or less organised, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies",

—*Gettell*

তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হবে সাধারণের কল্যাণ সাধন করা কুচক্রী দল (faction) বা চাপ গোষ্ঠীর (Pressure group) সঙ্গে রাজনৈতিক দলের পার্থক্য এইখানে। রাজনৈতিক দল দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়। কুচক্রীদল এবং চাপগোষ্ঠী নানা প্রকার অবৈধ এবং অবাঞ্ছিত উপায়ে তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে।

রাজনৈতিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চেষ্টা করে। অগণতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ কৌশলে বা শক্তি প্রয়োগ করে যে দল শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে তাকে প্রকৃত রাজনৈতিক দল বলা যেতে পারে না।

২। রাজনৈতিক দলের কাজ (Functions of Political Parties):

নীতি নির্ধারণ

রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন করে দেশের প্রধান সমস্যাগুলির সমাধান করা। এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে তার নীতি নির্ধারণ করা। দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলির মধ্যে প্রধান সমস্যাগুলি বেছে নিয়ে এক সুচিন্তিত পদ্ধতির মাধ্যমে তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা রাজনৈতিক দলের প্রধান কাজ।

প্রচারকার্য

শুধু পদ্ধতি নির্ণয় করলেই হয় না, সমাধান পদ্ধতির যাথার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করাও রাজনৈতিক দলের অন্যতম লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজনৈতিক দলকে সভাসমিতি, সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কার্য চালিয়ে গণসমর্থন লাভ করার চেষ্টা করতে হয়। এইজন্য অধ্যাপক লাউয়েল (Lowell) রাজনৈতিক দলগুলিকে 'বিভিন্ন মতের দালাল' ('*brokers of ideas*') বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক দল এইভাবে প্রচার কার্য চালিয়ে গণসমর্থন লাভ করে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের চেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কার্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আইনসভার সদস্য পদের জন্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন করা। নির্বাচনের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন করে রাজনৈতিক দলগুলি গণতন্ত্রের পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য

সম্পাদন করে। রাজনৈতিক দলগুলি এই কাজে এগিয়ে না এলে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে এগিয়ে আসত। সাধারণ নাগরিকের সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা দুরূহ হয়ে ওঠে। তাছাড়া, অধিক সংখ্যক লোক নির্বাচনে অবতীর্ণ হলে প্রত্যেক প্রার্থীই সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলীর কিছু অংশের সমর্থন লাভ করে, যার ফলে গণতন্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।

প্রার্থী মনোনয়ন

রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনয়নের পর নির্বাচনী প্রচার কায চালিয়ে অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন আদায় করে সরকার-গঠনের চেষ্টায় যত্নবান হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা সংবাদ-পত্র, সভাসমিতি, বেতার, প্রাচীরপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কায চালিয়ে যায়।

নির্বাচনী প্রচার

এই পর্যায়ের পর, রাজনৈতিক দলের কাজগুলিকে দু'দিক থেকে আলোচনা করা উচিত। যে রাজনৈতিকদল অধিকাংশ নির্বাচকের সমর্থন পেয়ে আইন-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে তার কাজ হয় একধরনের, আর যে দল আইন সভায় অধিকাংশ আসন লাভ করতে সক্ষম হয় না তাদের কাজ ভিন্ন ধরনের। যে দল সরকার গঠনের সুযোগ পায়, রাজনৈতিক দল হিসেবে তার কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে নীতি জনসাধারণের মধ্যে নির্বাচন সময় প্রচার করা হয় সেই নীতিকে কাজে রূপ দেওয়া এই দলের অন্যতম প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে আইনসভায় তাদের বিল আনয়ন করতে হয়, সরকারী নীতির ব্যাখ্যা করতে হয় এবং গণসংযোগ বজায় রেখে সরকারী নীতির ও কার্যপ্রণালীর যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করতে হয়। আর যে রাজনৈতিক দল বিরোধীপক্ষ হিসেবে কাজ করে তাদের কাজ হচ্ছে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে সরকারী কাজের সমালোচনা করা।

সরকারপক্ষ ও বিরোধী পক্ষের কাজের প্রকারভেদ

আইনসভায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের আর একটি কাজ হচ্ছে সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার কাজে সহায়তা করা। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় সাধারণতঃ শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও আইনসভার অধিকাংশ সদস্য একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত। শুধু তাই নয়, শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা অর্থাৎ মন্ত্রিসভার সদস্যেরা আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃস্থানীয়

শাসনবিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা

ব্যক্তি। সুতরাং সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ—এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাসহকারে সুষ্ঠুভাবে শাসনযন্ত্র পরিচালনা করা সম্ভব হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা ক্ষমতাস্বাতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে মতানৈক্যের ফলে শাসনকার্য পরিচালনায় অচল অবস্থা সৃষ্টির সম্ভাবনা রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে অনেকাংশে দূরীভূত হয়েছে।

৩। রাজনৈতিক দলের উদ্ভবের কারণ। Reasons for the growth of political parties :

আদিম প্রবৃত্তি

নানা কারণে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হতে পারে। মানুষের মধ্যে সংঘবদ্ধ লিপ্ত হবার যে আদিম প্রবৃত্তি দেখা যায় অনেকে সেই প্রবৃত্তিকেই রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রকৃতিগত ভিত্তি

মানুষের প্রকৃতিগত পার্থক্যকে অনেকে রাজনৈতিক দলপ্রথার ভিত্তি বলে মনে করেন। প্রকৃতির দিক থেকে সমস্ত মানুষকে সংরক্ষণশীল (conservative) এবং উদারনৈতিক (liberal)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; সংরক্ষণশীলদের আবার মধ্যপন্থী সংরক্ষণশীল (moderate conservative) এবং প্রতিক্রিয়াশীল (reactionary)—এই দুই ভাগে ভাগ করে দেখান যেতে পারে। উদারনৈতিকদের আবার মধ্যপন্থী উদারনৈতিক (moderate liberal) এবং প্রগতিবাদী (radical)—এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই বিভিন্ন প্রকার মনোবৃত্তির ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। প্রকৃতিগত পার্থক্য সাধারণতঃ অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। সম্পত্তিশালী এবং ধনিক শ্রেণীরা সাধারণতঃ রক্ষণশীল হন আর যারা সম্পত্তিহীন তারা স্বভাবতই পরিবর্তন চায়, কারণ তারা ভাবে যে পরিবর্তনের ফলেই বোধ হয় তাদের অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়গত ভিত্তি

অনেক সময় সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতেও রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলপ্রথার ভয়াবহ পরিণামের সাক্ষ্য বহন করে ভারতের প্রাক্ স্বাধীনতা পর্যায়ের মসীলিপ্ত ইতিহাস।

৪। রাজনৈতিক দলের দোষ গুণ (Merits and defects of Party System) :

রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী থেকে আমরা রাজনৈতিক দলের কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারি। রাজনৈতিক দল আধুনিক রাষ্ট্রের সমস্যা সংকুল ঘটনাবলীর সমাধান কল্পে পথ নির্দেশ করে জনমতকে সুগঠিত এবং সুসংবদ্ধ হতে সাহায্য করে ; দেশের সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে মানুষ এককভাবে চিন্তা করলে সেই চিন্তা ও সিদ্ধান্তকে কাজে পরিণত করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, চিন্তাকে সুষ্ঠুপথে পরিচালনার জন্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তাকেও অস্বীকার করা চলে না। রাজনৈতিক দল অপেক্ষাকৃত যোগ্যতর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনসাধারণের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারাকে তা নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত হতে সাহায্য করে।

সুগঠিত জনমত

দ্বিতীয়তঃ, দেশের বিভিন্নমুখী সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িত করণ রাজনৈতিক দলের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। কোন দল যে নীতি ও পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে সরকার গঠনের সুযোগ পায়, সেই নীতি বাস্তবে রূপায়িত করতে তাকে সচেষ্ট হতে হয়। অন্যথায় আগামী নির্বাচনে দলটির আবার ক্ষমতাসীন হবার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাই যদি সরকারের একমাত্র কাজ বলে বিবেচিত হয় তাহলে কোন পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র। তাই যে কোন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তার প্রতিশ্রুত পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হতে হয়। স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক দল ব্যতিরেকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে রূপায়িতকরণ সুদূর পরাহত।

নীতির রূপায়ণ ও কর্ম-পরিকল্পনা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আর এক বিশেষ অর্থে শাসনকার্যের সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব করে তোলে। মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য এক রাজনৈতিক দলভুক্ত হওয়ার জন্য শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতার অভাব হয় না। সরকারের গঠন প্রণালী একটি জীবদেহের মত। জীবদেহের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা যেমন

শাসন ও আইন বিভাগের সহযোগিতা

জীবদেহকে বাঁচিয়ে রাখে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতাও তেমনি সরকারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

মন্ত্রিসভা চালিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভার বৃহত্তর অংশ এবং মন্ত্রিসভা এক রাজনৈতিক দলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য সহযোগিতা সহকারে শাসনযন্ত্রকে পরিচালনা করা সহজসাধ্য হয়। রাষ্ট্রপতি চালিত শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বাতন্ত্র্যীকরণ নীতির প্রয়োগের জন্য যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে সেই সম্ভাবনা অনেকটা তিরোহিত হয়েছে, আমাদের স্বীকার করতে হবে।

তাছাড়া, দলপ্রথা প্রবর্তিত থাকার জন্য ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল তার সমর্থনের ভিত্তির দৃঢ়তা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উৎসাহের সঙ্গে তাদের নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে নিজেদের নিয়োগ করতে পারে।

নীতি রূপায়িত করণে সুবিধা

সমর্থনের ভিত্তি দুর্বল হলে কোন সরকারের পক্ষে দৃঢ়তা সহকারে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন বা তাকে রূপায়ণের কাজে এগিয়ে আসা সম্ভব নয়। বিশেষ ক'রে আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে শাসনকর্তৃপক্ষের এই দৃঢ়তার অভাব দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

তৃতীয়তঃ, সরকারের স্থায়িত্ব বিধানের জন্যও রাজনৈতিক দলপ্রথার প্রবর্তন অপরিহার্য। এক সুগঠিত সমর্থনের অভাবে, শাসনকর্তৃপক্ষকে তাদের স্থায়িত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান থাকতে হয়। এক নীতির ভিত্তিতে গঠিত কোন এক সংগঠনের সমর্থনের

স্থায়িত্ব

অভাবে, আইন সভার সঙ্গে শাসনকর্তৃপক্ষের মতান্তর ও মতানৈক্যের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই মতানৈক্য পুনঃ পুনঃ ঘটতে থাকলে অথবা তীব্র আকার ধারণ করলে শাসন বিভাগের কর্তৃপক্ষস্থানীয় কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর পক্ষে এক নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা সম্ভব হয় না। শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের অর্থই হচ্ছে দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক তথা সমাজনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হওয়া।

রাজনৈতিক দলপ্রথা শিক্ষামূলক। রাজনৈতিক দলগুলি প্রচার কার্যের দ্বারা দেশের সমস্যা ও তার সমাধানের পথ জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে এই সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তাদের চিন্তা করতে শেখায়।

রাজনৈতিক দলপ্রথা শিক্ষামূলক

রাজনৈতিক দল সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি ক'রে নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার ও কর্তব্য-বোধকে জাগ্রত করে। রাজনৈতিক দলের এই শিক্ষামূলক দিকটিও অনস্বীকার্য।

রাজনৈতিক দলপ্রথার এই সুবিধাগুলি স্বীকার করে নিলেও এর কতকগুলি বিশেষ অসুবিধা আছে। রাজনৈতিক দলপ্রথার জন্য কোন এক বিশেষ নীতি বা সমস্যা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে বিবেচিত হয় না। সরকারের তরফ থেকে কোন প্রস্তাব পেশ হলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল তাকে অন্ধভাবে সমর্থন করে এবং বিরোধী দলগুলি প্রতিবাদ করার জন্যই প্রতিবাদ করে। এই কৃত্রিম রাজনৈতিক আবহাওয়া দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক।

নিরপেক্ষ বিচারের অভাব

তাছাড়া, রাজনৈতিক দলপ্রথা সদস্যের নিরপেক্ষ বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাজনৈতিক দলের সদস্যরা দলের স্বার্থকে দেশের স্বার্থের উপরে স্থান দেয়। দেশের ও জাতির সমস্যাগুলি সম্বন্ধে এই নিরপেক্ষ ও সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবকে এক সুস্থ রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না।

দলীয় স্বার্থ দেশের ঊর্ধ্বে

চতুর্থতঃ, রাজনৈতিক দলের জন্যই দেশের উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনেক সময় সরকার পরিচালনায় নিযুক্ত করা সম্ভব হয় না। দেশের চিন্তাশীল ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা অনেক সময় রাজনৈতিক দলাদলির আবর্তের মধ্যে নিজেদের লিপ্ত করতে চান না। দেশের উচ্চতর চিন্তা ও ধ্যানধারণার পক্ষে তা ক্ষতিকারক নয়। রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ায় এই উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা দেশ পরিচালনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। কিন্তু সরকারের কাজ দেশের বহুসংখ্যক লোকের ভালমন্দের সঙ্গে জড়িত, তাই দেশের চিন্তাশীল এবং উচ্চতর যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সরকারী পরিচালনায় নিযুক্ত হবার সুযোগ থাকা উচিত। প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগের পথ প্রশস্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভবের ফলে এই সম্ভাবনা অনেকাংশে তিরোহিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ব্যক্তি রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ায় এই পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা এক শুষ্ক সংবিধানগত অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়েছে।

জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিদের অনেক সময় দেশের কাজে পাওয়া যায় না

দেশের সাধারণ মানুষও অনেক সময় তাদের স্বাধীন চিন্তাধারা ও রাজনৈতিক দলের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারেন না। ফলে তাঁদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক দলপ্রথা বিভিন্ন প্রহসনের মাধ্যমে দেশের নৈতিক মানকে অনেকখানি অবনত করে। ভোটযুদ্ধে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য দলীয় সদস্যরা অনেক সময় অবাঞ্ছিত প্রচার কার্যের মাধ্যমে জনগণকে প্রতারিত করে। এই প্রতারণার ফলে তারা তাদের স্বীয় যুক্তি ও চিন্তাশক্তিকে হারিয়ে ফেলে এবং এই চিন্তাশক্তির আত্মাহুতি গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

হিংসা ও অপপ্রচার

দলীয় সরকার অত্যন্ত দুর্বল, অসংযত, কালের গতির সাথে খাপ খাওয়াতে অক্ষম। ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় দেশের চরম বা আপৎকালীন মুহূর্তে। যে সময়ে দেশের স্বার্থই প্রধান, দলীয় সদস্যগণ সে সময় দলীয় স্বার্থকেই প্রাধান্য দেন। ফলে দলীয় সরকার নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করে।

আপৎকালীন অবস্থায় দলপ্রথার অসুবিধা

৫। দ্বি-দলীয় বনাম বহুদলীয় ব্যবস্থা (Bi-party System Vs Multiple Party System):

আধুনিক গণতন্ত্রের পক্ষে রাজনৈতিক দলপ্রথা অপরিহার্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, দ্বি-দলীয় না বহুদলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত, অপর পক্ষে ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি রাষ্ট্রে বহু রাজনৈতিক দল আছে। এখন দ্বি-দলীয় এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

৬। দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার দোষ-গুণ (Merits and defects of Bi-party System):

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় একটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠনের সুযোগ পায় এবং অপর রাজনৈতিক দল বিরোধী পক্ষ হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থায় সংখ্যা-গরিষ্ঠ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় বলে সরকার পরিচালনায় কোন বিচ্যুতির জন্য সেই দলকে দায়ী সাব্যস্ত করা চলে। সুতরাং দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় দায়িত্বের অবস্থিতি নির্ণয় সহজসাধ্য। ফ্রান্সে একাধিক রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভায় সরকারের কার্যাবলীর জন্য কোন এক বিশেষ দলকে দায়ী করা সম্ভব হয় না। দায়িত্ব বিভক্ত হলে শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হওয়াই স্বাভাবিক।

দায়িত্বের অবস্থিতি নির্ণয়

দুটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে যে দল আইনসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করে তারা সরকার গঠন করে এবং নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর ধরে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত

থাকতে পারে। অপর পক্ষে, আইনসভায় বহু রাজনৈতিক দল থাকলে কোন একটি দলের পক্ষে সব সময় আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হয় না, ফলে একাধিক রাজনৈতিক দল নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে হয়। একাধিক রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন কিছু দিন আগেও ফ্রান্সের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। মন্ত্রিসভার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন ঘটলে কোন পরিকল্পনাকেই বলিষ্ঠভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় না। দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থাকে এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। সরকারী দল নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর ধরে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থেকে তার পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়। সুতরাং শাসন কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় স্থায়িত্ব দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাতেই সম্ভব।

শাসন কর্তৃপক্ষের স্থায়িত্ব

তাছাড়া, দুটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে নির্বাচক মণ্ডলীর পক্ষে প্রার্থী নির্বাচনও সহজ হয়। একাধিক রাজনৈতিক দলের বিতর্কমূলক নির্বাচনী প্রচারকার্যের ফলে সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর পক্ষে সংশয় ও সন্দেহের ঘূর্ণাবর্তে অনেক সময় উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে, দুটি মাত্র রাজনৈতিক আদর্শ জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করলে, অতি সহজেই তারা পছন্দমত আদর্শটিকে বেছে নিতে পারে।

প্রার্থী নির্বাচনের সুবিধা

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা হচ্ছে জনমতের বিভিন্ন দিক প্রকাশিত হবার অসুবিধা। দুটি রাজনৈতিক দল দুটি প্রধান মতাদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। কিন্তু জনমত এই মতাদর্শ দুটির কোন একটির সমর্থক নাও হতে পারে। সুতরাং নির্বাচক মণ্ডলীর পছন্দের ক্ষেত্রকে কৃত্রিমভাবে সীমিত করা দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি। তাই জনমতের বিভিন্ন দিককে আইনসভায় যথোপযুক্ত ভাবে প্রতিফলিত করতে হলে এই মতের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলের সৃষ্টিও বাঞ্ছনীয় বলে অনুমতি হয়।

কোন একটি বিষয়ের পরিপূর্ণ আলোচনার জন্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিচার্য হওয়া উচিত। বহু রাজনৈতিক দলের অবস্থিতি কোন এক বিষয়কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে তার সামগ্রিক রূপটি পরিস্ফুট হতে সাহায্য করে।

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয় বিবেচিত হয়

দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান অসুবিধা এই যে, কোন এক দল আইনসভায় এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে সেই দলের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। আজকের দিনে মন্ত্রিসভার একনায়কত্ব গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় অন্যতম প্রধান ত্রুটি বলে অনেকে মনে করেন। দুটিমাত্র রাজনৈতিক দলের অবস্থিতিই এই পরিণতির অন্যতম কারণ।

গণতন্ত্র অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা

৭। বহুদলীয় ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা (Merits and defects of multiple party System):

বহুদলীয় ব্যবস্থায় প্রধান সুবিধা এই যে, বিভিন্ন শ্রেণী এই ব্যবস্থায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায়। দুটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে সমস্ত শ্রেণী প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ পায় না। বহু রাজনৈতিক দল থাকলে বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায় ও শ্রেণী তাদের পছন্দ অনুসারে প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পায়। আইনসভায় কোন প্রস্তাব বা উত্থাপিত বিল বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দুটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলে বিভিন্ন মত আইনসভায় প্রতিফলিত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ

বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধান সুবিধা এই যে, কোন বিশেষ রাজনৈতিক দল তার একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য স্বৈরাচারী হতে পারে না। যে আইনসভায় অনেক রাজনৈতিক দল থাকে সেখানে কোন রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা (Coalition Ministry) গঠন করতে হয়। বহুদলীয় মন্ত্রিসভার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে বিভিন্ন বিরোধী মতের কষ্টার্জিত সামঞ্জস্য। তাছাড়া, বহুদলীয় মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের জন্যও আইনসভার একাধিক রাজনৈতিক দলের সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব কারণে দ্বি দলীয় মন্ত্রিসভায় কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিচালনায় শাসন কর্তৃপক্ষের যে স্বৈরাচারী হবার সম্ভাবনা থাকে, বহুদলীয় ব্যবস্থা সেই সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

শাসনকর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী হবার সম্ভাবনা থাকে না

বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় এই সুবিধাগুলি সত্ত্বেও, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই শাসনব্যবস্থা দুর্বল। কোন এক সুসংহত এবং সুনির্দিষ্ট নীতির

বাস্তবে রূপান্তরিত করণ এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয় না। জোড়াতালি দিয়ে সাময়িকভাবে যে নীতি নির্ধারিত হয় তা দুর্বল হতে বাধ্য। আইনসভার সমর্থনের পরিমাপ নির্ধারণে অসুবিধা থাকায় পরিকল্পিত ব্যবস্থাকে কার্যকরী করারও অসুবিধা হয়।

দুর্দলীয় মন্ত্রিসভা দুর্বল

তাছাড়া, বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সাময়িক সুবিধার জন্য পুনঃ পুনঃ দিক পরিবর্তন করার ফলে, মন্ত্রিসভাও পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হয়। ফ্রান্সে অনেকগুলি দলীয় সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের ফলে কোন মন্ত্রিসভাই স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। মন্ত্রিসভার পুনঃ পুনঃ পতন ঘটলে সেই দেশের সর্বাঙ্গীণ প্রগতি ব্যাহত হওয়াই স্বাভাবিক। মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে কোন দলই স্থিরভাবে তার নীতি ধরে রাখতে পারে না।

মন্ত্রিসভার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন জনিত অসুবিধা

জোড়াতালি দিয়ে মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্দেশ্যে অনেক সময় দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে হয়। কোন এক নীতিতে স্থির না থাকা, দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া এবং প্রয়োজন মত নানা অবাঞ্ছিত উপায় গ্রহণ করার অনিবার্য পরিণতি দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে দূষিত করে তোলে।

বহুদলীয় ব্যবস্থার অন্যান্য ত্রুটি

তাছাড়া, দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী কোন এক বিশেষ দলকে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রতিষ্ঠিত করে সরকার গঠন করার ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়। কিন্তু বহুদলীয় ব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবে তাদের পছন্দমত সরকারটিকে বেছে নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

দ্বি-দলীয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থায় সুবিধা-অসুবিধাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনার পক্ষে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাই অধিকতর কার্যকরী। ফ্রান্সে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রিসভার পরিবর্তনের জন্য সেখানকার রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থায় যে স্থায়িত্বের অভাব পরিলক্ষিত হয় দেশের সর্বাঙ্গীণ প্রগতির পক্ষে তা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাগ্মীতা এবং তর্কযুদ্ধ পার্লামেন্টকে এক সরস আলোচনার ক্ষেত্রে পর্যবসিত করে। আজকের দিনে পার্লামেন্টকে জনসাধারণ আর এক সরস আলোচনা ক্ষেত্ররূপে দেখতে রাজী নয়। জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানকল্পে মানুষ আজ চায় কাজ। দ্বি দলীয় ব্যবস্থার ফলে আজ পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভা বলিষ্ঠ নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে জনকল্যাণমূলক

উপসংহার

পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত করণে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়। দ্বি-দলীয় শাসন ব্যবস্থা মন্ত্রিসভাকে যে ক্ষমতা ও স্থায়িত্ব দান করে তার জন্য মন্ত্রিসভা এই গুরুদায়িত্ব পালনে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

৮। একদলীয় রাষ্ট্রে কি গণতন্ত্র সম্ভব ? (Can democracy function in one-party state ?) :

একদলীয় গণতন্ত্র সম্ভব কিনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইহা অন্যতম সমস্যা। গণতন্ত্রে মত ও পথের পার্থক্যকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। মত ও পথের পার্থক্য থাকলে সেই বিভিন্ন পার্থক্যের ভিত্তিতে দল গঠনের পরিণতিও অপরিহার্য। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানী ও ইটালীতে একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে সমগ্র শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হত। জার্মানীতে নাজী পার্টি এবং ইতালীতে ফ্যাসিস্ট পার্টি ছাড়া বিরোধী দলের অস্তিত্ব লোপ করা হয়েছিল। এই শাসনব্যবস্থাগুলিকে আমরা নিঃসন্দেহে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে পারি। কিন্তু সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল থাকলেও সেখানকার শাসনব্যবস্থাকে অনেকে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলে থাকেন। আমাদের বিচার করা প্রয়োজন, একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় কি সত্যিকারের গণতন্ত্র সম্ভব ?

এই বিষয়টিকে আলোচনা করতে হলে আমাদের প্রথমেই আলোচনা করা প্রয়োজন, আমরা গণতন্ত্র বলতে কি বুঝি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সমার্থবোধক। যে রাষ্ট্র সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সেখানে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। একদলীয় শাসন ব্যবস্থাতেই স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় না। নাজী ও ফ্যাসিস্ট পার্টির নেতারা বিশ্বাস করতেন, যে নীতিতে তাঁরা বিশ্বাস করেন সেইটিই চরম আদর্শ, সেখানে দ্বিমত বা মতবিরোধের অবকাশ নেই। এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জাতির জীবনের প্রত্যেকটি দিককে তাঁরা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করায় পক্ষপাতী ছিলেন। যথার্থ গণতন্ত্র এখানে সম্ভব নয়। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাও একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

এখানে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে কার্যতঃ এই দলটিকে একমাত্র রাজনৈতিক দল বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যেখানে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল আছে, সেই দলের নেতৃত্বে একনায়কতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের

ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"অধুনা অথবা ভবিষ্যতে দলীয় একনায়কত্ব একদলীয় রাষ্ট্রের অনিবার্য পরিণতি। পারস্পরিক সহ অবস্থিতির প্রেরণা শেষ পর্যন্ত এখান থেকে লোপ পায়।" সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রেও এই নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আইন, শাসন-এমনকি বিচার বিভাগ পর্যন্ত সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দেশে পরিচালিত হয়। কম্যুনিস্ট পার্টির চূড়ান্ত নেতৃত্বে পরিচালিত শাসনব্যবস্থায় চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয় না। 'সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়' (Socialist social order) নিরাপত্তার খাতিরে চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকারকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ইহাই একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পরিণতি। তাই একদলীয় ব্যবস্থা যে দেশে প্রচলিত, সত্যিকারের গণতন্ত্র সেখানে থাকতে পারে না।

৯। নির্দলীয় গণতন্ত্র (Partyless Democracy):

সম্প্রতি ভারতে আচার্য বিনোবাভাবে, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি সর্বোদয় নেতারা রাজনৈতিক দলভিত্তিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও ভারতের শাসনব্যবস্থাকে যথার্থভাবে গণতান্ত্রিক হতে হলে রাজনৈতিক দলের বিলোপ সাধন একান্ত প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলের প্রভাবমুক্ত হয়ে পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত বিভিন্ন স্তরের আঞ্চলিক সংস্থাগুলির দ্বারা সর্বভারতীয় গণতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনার কথা তারা কল্পনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খাঁ রাজনৈতিক দলগুলির উচ্ছেদ সাধন করে যে বুনিয়াদী গণতন্ত্র (Basic Democracy) প্রতিষ্ঠার কথা প্রচার করেছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ সেই নতুন শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে সমর্থন জানিয়েছেন।

সর্বোদয়ী নেতাদের অভিমত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন রাজনৈতিক দলপ্রথার বিরুদ্ধে তার দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভব হবে না আশা করেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা পরোক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলপ্রথা উদ্ভব হওয়ার ফলে এই পদ্ধতি এক শুষ্ক সাংবিধানিক নিয়মে পর্যবসিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সূচনায় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না

রাজনৈতিক দলপ্রথা যে সর্বপ্রকার ত্রুটিমুক্ত একথা আমরা বলতে পারি না। এই প্রথায় দেশের স্বার্থের উর্ধে দলের স্বার্থকেই বড করে দেখা হয়।

রাজনৈতিক দলের ত্রুটি

শাসনকর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্তই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে বিচার হয় না। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল অন্ধ ভাবেই তাদের নেতৃস্থানীয় শাসকগোষ্ঠীর সমস্ত কার্য-কলাপকে সমর্থন জানায়। বিরোধী দল বিরোধিতা করার জন্যই বিরোধিতা করে। দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থায় আস্থা স্থাপন করে শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচার বৃদ্ধির প্রবণতাও দেখা গেছে। তাই বলে দলীয়ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করলেই শাসনব্যবস্থা যে যথার্থ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হবে এমন কথা আমরা মেনে নিতে পারি না। চিন্তার স্বাধীনতা থাকলে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকেও স্বীকার করতে হয়। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকলে তাকে কার্যকরী করার জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অধিকারকেও স্বতঃসিদ্ধভাবে মেনে নিতে হয়। তাই রাজনৈতিক দলপ্রথার উদ্ভব আধুনিক গণতন্ত্রের এক অনিবার্য পরিণতি। শাসন কর্তৃপক্ষ যদি আইন সভার আস্থার পরিমাণ নির্ধারণ করতে

রাজনৈতিক দলের অপরিহার্যতা

সমর্থ না হন, প্রতিটি প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ যদি আইনসভার প্রতিনিধিদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং সর্বোপরি যে কোন সিদ্ধান্তের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শাসন গোষ্ঠীকে যদি অবিরত সংশয়ের দোলায় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে হয়— কোন শাসনব্যবস্থাই তাহলে বলিষ্ঠভাবে কোন নীতিকে কার্যকরী করার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হয় না। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে তাই নিদলীয় শাসনব্যবস্থা আদৌ সম্ভব কিনা তা গভীরভাবে চিন্তার বিষয়। রাজনৈতিক দলের সংকীর্ণ দলীয় মনোভাবের দিকটি নিন্দার্হ সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন নৈতিক আদর্শের ভিত্তিতে মানুষ একটি বিশেষ সূত্রে গ্রথিত না হলে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিংসা বিদ্বেষের কুৎসিত রূপ উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে— একথাটিও আমাদের ভুললে চলবে না।

সংক্ষিপ্তসার

এক রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কতকগুলি নাগরিক সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে সরকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করলে তাকে রাজনৈতিক দল বলে। রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) সাধারণ সমস্যা ও তার সমাধান সম্বন্ধে সদস্যদের একমত হওয়া, (২) সংগঠন, (৩) সাধারণের কল্যাণ-সাধন করা এবং (৪) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়

জনমত

(Public Opinion)

১। ভূমিকা (Introduction) :

'জনমত' (*Public opinion*) শব্দটি কখন থেকে প্রথম ব্যবহৃত হতে শুরু হয় তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন গ্রীক এবং রোমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এবং মধ্যযুগের চিন্তানায়কেরা জনমতের অস্তিত্ব এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন গভীর এবং বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা সমকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভলটেয়ার (*Voltaire*), হবস (*Hobbes*), লক (*Locke*) এবং হিউম (*Hume*) প্রভৃতি চিন্তানায়কদের লেখার মধ্যে জনমতের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের উল্লেখ থাকলেও বিষয়টির উপর বিস্তৃত এবং সম্যক আলোচনার প্রচেষ্টা দেখা যায় ফরাসী দার্শনিক রুশোর (*Rousseau*) লেখার মধ্যে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বাক্‌লে (*Buckle*), ড[illegible]ফাস (*Do[illegible]us*), ব্লানস্‌লি (*Bluntschli*), মেইন (*Maine*), ব্রাইস (*Bryce*), লাওয়েল (*Lowell*) এবং লিপম্যান (*Lippmann*) প্রভৃতি লেখকেরা এই বিষয়টির উপর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

জনমত সম্বন্ধে আলোচনা

এখন আমাদের বোঝা দরকার 'জনমত' (Public Opinion) বলতে কি বোঝায়। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জনমত সম্বন্ধে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য কোন সংজ্ঞাই উপযুক্ত লেখকেরা দিতে পারেন নি। জনমত শব্দটি বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। জনমতের স্বরূপ ও সংজ্ঞা সম্বন্ধে এই মতভেদের অবকাশকে মেনে নিয়েও, কিভাবে এই বিষয়টি বিভিন্ন লেখকের দ্বারা বিবেচিত ও আলোচিত হয়েছে জানতে চেষ্টা করলে, আমরা জনমত সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হব।

জনমত বলতে কি বোঝায়

প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'জনমত' একটি যৌগিক শব্দ। 'জন' এবং 'মত' এই দুটি পৃথক শব্দ একত্রিত হয়ে জনমত শব্দটির সৃষ্টি করে। কাজেই জনমতের মধ্যে 'জন' এবং 'মত'—এই দুটি শব্দ কি অর্থ বহন করে আমাদের জানা দরকার। 'জন' শব্দটির প্রকারভেদ আছে। কোন বৃত্তি, সংস্থা বা জীবিকার সদস্যরা জনগণের অন্তর্ভুক্ত, গ্রামের অধিবাসীরাও জনগণের অন্তর্ভুক্ত, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত সদস্যরাও জনগণের অন্তর্গত। সমাজবিজ্ঞানের

'জন' শব্দটির ধারণা 'দল' বা গোষ্ঠীর ধারণার সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। ওয়ালটার লিপম্যান (*Walter Lippmann*) 'জন' অর্থাৎ *Public* বলতে এমনি এক জনসমষ্টিকে বুঝিয়েছেন যারা কোন এক ঘটনার ফলে সমান ভাবে প্রভাবিত হয়। কোন কোন লেখক আবার 'জন' (Public) বলতে সেই সমস্ত লোকদের বুঝেছেন যারা সরকার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই মত আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ সে ক্ষেত্রে 'জন' এবং 'নাগরিক' একই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু জনগণ এবং নাগরিক শব্দ দুটির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এমত অবস্থায় জনগণের ধারণাকে আমরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সংগঠনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। বিশেষ ঐক্যসূত্রে সংঘবদ্ধ কতকগুলি লোকের সমষ্টিবদ্ধ আকার হচ্ছে জনগণ (Public)। জনগণের মধ্যে একধর্মে বিশ্বাসী লোক আছে, শহরের এবং গ্রামের অধিবাসী আছে এবং এক রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী লোক আছে। এমনি ভাবে বিভিন্ন যোগসূত্রে আবদ্ধ পৃথক পৃথক দল গোষ্ঠী নিয়ে হয় জনগণ। সুতরাং জনমতের জনগণ বলতে যোগসূত্রহীন বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত জনসমষ্টিকে বুঝলে চলবে না।

জনমত বলতে কি বোঝায় আমরা বোঝার চেষ্টা করব। অধ্যাপক লাওয়েল (*Lowell*) তাঁর *Public Opinion in War and Peace* নামক গ্রন্থে বলেছেন "দুই বা ততোধিক বিকল্প নীতির মধ্যে যেটি যুক্তিবাদী, মনের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, সেইটিকেই মত বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।" অন্য এক লেখক মতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন "বিতর্কমূলক কোন বিষয়ে প্রকাশিত বক্তব্যই হচ্ছে মত ("An opinion is an expression about a controversial point")।

জনমত সম্বন্ধে অন্য একজন লেখক বলেছেন, মত বলতে এক বিশেষ রকমের পছন্দকে বোঝায়। এর মধ্যে মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রশ্ন অনিবার্য ভাবে জড়িয়ে আছে।

'জন' ও 'মত' বলতে কি বোঝায় পৃথকভাবে সেটা আলোচনার পর আমরা জনমত বলতে কি বোঝায় আলোচনা করতে পারি। পূর্বেই বলা হয়েছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেখকেরা যে বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে জনমতের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। লিপম্যান (*Lippmann*) জনমত বলতে সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষ ব্যক্তির অভিমতকে বুঝেছেন। অনেক ক্ষেত্রে যে মত অনুসারে কতকগুলি লোক পরিচালিত হয় তাকেই আবার তিনি জনমত বলেছেন। লাওয়েল বলেছেন, জনমত বলতে শুধু সংখ্যাধিক্যের

মতকেই বুঝলে চলবে না, এটি তার চাইতেও বেশী কিছু। একে এমন হতে হবে যাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ও এর যুক্তির বলে একে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

সুতরাং জনমতের ক্ষেত্রে অভিমতের দৃঢ়তা বড় কথা (Intensity of opinion is important)। কতকগুলি অজ্ঞ লোকের বিশ্বাসের চাইতে কতকগুলি জ্ঞানী লোকের মতের বেশী ওজন আছে, স্থির সিদ্ধান্তসম্পন্ন লোকের মত, অস্পষ্ট ধারণাসম্পন্ন লোকের মতের চাইতে বেশী কার্যকরী। প্রকৃতপক্ষে, কোন মত সুসংবদ্ধ ও সুস্পষ্ট হয়ে এক বিশেষ লক্ষ্যের দিকে যতক্ষণ পরিচালিত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে জনমত বলা যেতে পারে না। জনমতের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে একজন লেখক বলেছেন, "Public Opinion is composed of a current of individual opinions that have been subjected to a process of consolidation and clarification until they have attained unity of direction"—*Smith*: Public Opinion in a Democracy

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে জনমত হল সেই সুচিন্তিত ও সুগঠিত অভিমত যা সরকারকে সমস্ত প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম। তত্ত্বের দিক থেকে, নানা মতের দ্বন্দ্বে, সেই মতই জনমতের মর্যাদা-লাভের অধিকারী যা বহুজনচিত্তে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম এবং শেষ পর্যন্ত যা সর্বসাধারণের পক্ষে হিতকর। এদিক থেকে দেখলে, সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সুচিন্তিত ও নিঃস্বার্থ মতকে জনমত বলতে কোন বাধা নেই। আবার সংখ্যা-গরিষ্ঠের স্বার্থান্ধ মতকে কোনক্রমে জনমত বলে গ্রহণ করা যাবে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের এই হিতকর ভূমিকা অবশ্যই থাকবে [illegible], জনমত বলতে সুচিন্তিত, সুগঠিত এবং জনসাধারণ ও সরকারকে [illegible] প্রভাবিত করতে সক্ষম এমন সক্রিয় অভিমতকেই বুঝাতে হবে।

২। জনমতকে প্রকাশিত ও প্রভাবিত করবার উপায় (Agencies through which Public Opinion is expressed and moulded):

আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি জনমত। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সরকারের স্থায়িত্ব এবং কার্যকলাপ জনমতের উপর নির্ভর করে; তাই যে উপায়ের মাধ্যমে জনমত প্রকাশিত ও প্রভাবিত হয়, প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সরকারই সেগুলির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। সরকার গঠনেচ্ছু রাজনৈতিক দলগুলি ও নানাপ্রকার প্রচারকার্যের মাধ্যমে জনমতকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করে। জনমত প্রকাশের এই বিভিন্ন উপায়গুলি আমাদের জানা দরকার।

আধুনিক কালে জনমত প্রকাশের এবং জনমতকে প্রভাবিত করবার শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্রই জনমতের ধারক ও বাহক। কোন এক বিষয়ের উপর যথোপযুক্ত অভিমত পোষণ করতে গেলে সততা এবং নিরপেক্ষতা সহকারে সংবাদ পরিবেশিত হওয়া উচিত। অধ্যাপক ল্যাস্কি (*Laski*) রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য 'সৎ এবং অবিকৃত' সংবাদ পরিবেশনের ("honest and straightforward supply of news") প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। জনসাধারণের কোন বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্ত মত পোষণ করতে গেলে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তাদের সরবরাহ করতে হবে। সংবাদপত্র ও জনমত প্রকাশের অন্যান্য বাহনগুলি এই তথ্যাদি সরবরাহ করে থাকে। স্বভাবতই এই বাহনগুলি যদি স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হয় তা হলে দেশের ঘটনাবলী নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশিত না হবারই সম্ভাবনা বেশী। কায়েমী স্বার্থ নিজের সুবিধা অনুসারে কোন সংবাদকে একবারেই প্রচার না করতে পারে অথবা বিকৃতভাবে পরিবেশন করে। এক্ষেত্রে যথার্থ জনমত গঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

সংবাদপত্র

জনমত গঠনের ব্যাপারে স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রজীবনের শান্ত পরিবেশে যে শিক্ষা শিক্ষার্থীরা লাভ করে পরবর্তীকালে পরিণত বয়সে মতামত পোষণ করতে তা অনেকাংশে সাহায্য করে। এইজন্য একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল তাদের বিশেষ মতাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করে।

শিক্ষায়তন

জনমত সংগঠনে রাজনৈতিক দলের প্রভাবও অস্বীকার করা চলে না। আধুনিক কালে রাজনৈতিক দলগুলি সংবাদপত্র, পত্রিকা, প্রচার পুস্তিকা, পোষ্টার, সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। জনমতকে স্বপক্ষে সংগঠন করার উপরেই তাদের সরকার গঠনের সম্ভাবনা নির্ভর করে।

রাজনৈতিক দল

বেতার ও চলচ্চিত্রের সাহায্যেও জনমতকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা হয়। বেতারের মাধ্যমে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভাষণ, বার্তা ইত্যাদি সুদূর পল্লী অঞ্চলেও পৌঁছে দেওয়া হয়। বেতার ও চলচ্চিত্র আজ সরকারের অন্তর্ভুক্ত। সরকার এগুলির মাধ্যমে শুধু জনমতকে প্রভাবিতই করে না—জনশিক্ষার প্রসারকল্পে এই বাহনগুলিকে ব্যবহার করে থাকে।

বেতার ও চলচ্চিত্র

আইনসভায় সরকার পক্ষ ও সরকার বিরোধী দল কোন বিষয়ের উপর যে বিতর্কের সূত্রপাত করে সেগুলি সংবাদপত্র বেতার, সভা-সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে জনমতকে বহুল পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে।

আইন সভা

এইগুলি ছাড়া, অনেক সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠান—যেমন জাতীয় অথবা স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, আইনজীবী, শিক্ষাজীবী এবং চিকিৎসাজীবীদের সংস্থা ইত্যাদি নানা প্রকার প্রতিষ্ঠান বার্ষিক বিবরণ পরিসংখ্যানমূলক সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করে জনমত সংগঠনে সহায়তা করে। অবশ্য যে দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী, সেই সমস্ত দেশেই এই জাতীয় পদ্ধতিগুলির গুরুত্ব বেশী।

সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ পরিসংখ্যানমূলক সংবাদ ইত্যাদি

৩। গণতন্ত্রে জনমতের ভূমিকা— Role of Public Opinion in Democracy):

কি আইন বিষয়ক ব্যাপারে, কি শাসন কার্যে, জনমতকে উপেক্ষা করতে পারে এমন শাসন পদ্ধতি খুব কমই আছে। শুধু গণতন্ত্রে নয়, একনায়কতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের মত শাসন ব্যবস্থায় জনমতের প্রভাব যথেষ্ট। আমাদের দেশের প্রাচীন মহাকাব্য রামায়ণে আছে যে, আদর্শ রাজা রামচন্দ্র জনমতকে স্বীকার করে সীতাদেবীকে বনবাসে দিয়েছিলেন, বর্তমান পৃথিবীর [illegible] বা একনায়ক হিটলারও জনমত গঠনের যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, যে কোন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে জনমতের স্থান সর্বাগ্রে

তবে, জনমতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গণতন্ত্রে। গণতন্ত্র আর জনমত এত ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে আমরা জনমতের দ্বারা শাসিত সরকারকে বলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি। জনগণের মঙ্গলের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত এবং জনগণের সরকার হওয়ার প্রথম ধাপই হল দেশের নাগরিকগণের 'সাধারণ ইচ্ছা' অনুযায়ী সরকার পরিচালনা।

অন্যদিকে, এও সত্য যে জনমত গঠন করতে হলে যে স্বাধীন পরিবেশ দরকার হয়, তা গণতন্ত্রেতেই পাওয়া যায়। রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রে জনসাধারণের ভাবপ্রকাশের স্বাধীনতা বেশী থাকে না বলে জনমত গঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে হতে পারে না।

গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্যের উপর সুগঠিত জনমতের অসীম প্রভাব রয়েছে। কোন্ সরকার কতটা গণতান্ত্রিক তা নির্ভর করে সেই সরকারের

শাসনব্যবস্থায় জনমতের সমর্থন কতটা হয়েছে তার উপর। আজকালকার এই পরোক্ষ গণতন্ত্রে দেশের নাগরিকরা প্রত্যক্ষ ভাবে শাসনকার্যে অংশ নিতে পারে না। কিন্তু দেশের যাবতীয় গুরুতর সমস্যাবলী সম্পর্কে তারা তাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করে। তারা নিজেদের অভাব অভিযোগ এবং স্বার্থ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত রাখে। সরকারও জনগণের অভিমত অনুসারে তাদের কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করে এবং শাসনকার্য চালায়। শুধু গতানুগতিক আইন তৈরী ও শাসন কার্যেই নয়, সংবিধান সংস্কার বা সরকারের পুরাতনপন্থী নীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সরকার জনমত অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক সরকারকে চালনা করে দেশের সুগঠিত জনমত। যদি কোন দেশে এই জনমত গঠন ও প্রকাশে ত্রুটি থাকে, সেই দেশে গণতন্ত্র সাফল্যলাভ করতে পারে না। জনগণ যদি সরকারের কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখে এবং সরকারের দোষত্রুটির নির্ভীক সমালোচনা না করে, সেই দেশের সরকারের স্বেচ্ছাচারী [illegible] প্রবণতা দেখা দেয়। [illegible] যে দেশে জনমত গঠন ও প্রকাশের উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে সেখানে সরকার জনস্বার্থ বিরোধী কোন কাজ করতে সাহসী হয় না। একথা [illegible] সুষ্ঠু জনমত গণতন্ত্রের প্রধান [illegible]।

সংক্ষিপ্তসার

জনমত সম্বন্ধে আমাদের [illegible] সংজ্ঞা [illegible]। [illegible] দুটি—(১) [illegible] এবং (২) সমাজের [illegible] কল্যাণ [illegible]।

জনমতের প্রধান বাহন হচ্ছে (১) সংবাদপত্র (২) [illegible] (৩) [illegible] (৪) বেতার ও চলচ্চিত্র (৫) আইনসভা এবং (৬) সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিবরণ, পরিসংখ্যানমূলক সংবাদ ইত্যাদি।

আধুনিক গণতন্ত্রে জনমতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র [illegible] জনমত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। জনমত [illegible] গণতন্ত্রই সম্ভব। গণতন্ত্রের সাফল্য সুগঠিত জনমতের উপর নির্ভর করে।

Exercise

1. What do you mean by Public Opinion? Describe the agencies that influence public opinion in a democracy.

2. Discuss the role of Public Opinion in a democracy.

উনবিংশ অধ্যায়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ

(The United Nations Organisation)

এক আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বাস্তব প্রচেষ্টা আমরা আধুনিক কালের লীগ অব নেশনস (*League of Nations*) এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (*United Nations Organisation*) প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করলেও, রাষ্ট্র গণ্ডী অতিক্রম করে এক বিশ্বসংগঠনের কল্পনা আগের দিনের অনেক চিন্তাশীল মনীষীর লেখার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই। ইটালীর বিখ্যাত কবি দান্তের (*Dante*) নামই এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কতকগুলি নিয়মের মাধ্যমে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা সপ্তদশ শতকের ওলন্দাজ লেখক হিউগো গ্রোটিয়াসের লেখার মধ্যেও আমরা দেখতে পাই।

উনবিংশ শতকে হোলি এ্যালায়েন্স (*Holy Alliance*) এবং কনসার্ট অব্ ইউরোপের (*Concert of Europe*) মাধ্যমে তদানীন্তন ইউরোপের কতকগুলি রাষ্ট্রের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত করার প্রচেষ্টা দেখা যায়। অবশ্য কতকগুলি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের স্বার্থসিদ্ধিই এই জাতীয় মৈত্রীবন্ধনের উদ্দেশ্য ছিল।

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার স্থান ও কালের ব্যবধানকে সংকুচিত করায় আন্তর্জাতিক আদান প্রদানের ক্ষেত্র যেমন প্রশস্ত হতে থাকে, যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামকেও তেমনি প্রত্যক্ষ করা হল বিংশ শতকের প্রথমার্ধে প্রথম মহাযুদ্ধে। তাই এই মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সালের ভার্সাই চুক্তিতে (*The Treaty of Versailles*) লীগ অব নেশনের (*League of Nations*) এর মত এক আন্তর্জাতিক সংঘের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা তথা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সুনিয়ন্ত্রিত করার এক বাস্তব প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু লীগ অব নেশনসও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার মহান আদর্শকে সার্থক করতে পারেনি। ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ এবং ১৯৩৫ সালে ইটালীর বর্বরোচিত আবিসিনিয়া আক্রমণের বিরুদ্ধে লীগের সদস্যরা কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেনি। লীগ অব নেশনের ব্যর্থতার কারণ তার সদস্য রাষ্ট্রদের বিশ্বস্ততার অভাব এবং তার সাংগঠনিক ত্রুটি। তাই দ্বিতীয়

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের জন্ম

মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর ১৯৪৫ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে সম্মিলিত রাষ্ট্রবর্গ লীগের এই ত্রুটি-বিচ্যুতির পরিপ্রেক্ষিতে এক উন্নততর সংগঠনের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (*United Nations*) সংবিধান আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ করে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তাবনায় আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের প্রচেষ্টাকে সুসংবদ্ধ করে আগামী দিনের মানুষকে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে রক্ষা করার ("to save the succeeding generations from the scourge of war") সংকল্প ব্যক্ত করা হয়েছে। সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রচেষ্টাকে *Collective Security* বলা হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং মানবিক সমস্যাগুলির আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা সমাধান করা, মানবীয় অধিকারগুলিকে শ্রদ্ধা ও রক্ষা করা এবং জাতি ধর্ম, ভাষা ও স্ত্রী পুরুষ নিরপেক্ষে সকলের জন্য মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করা ('International co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion.')

উদ্দেশ্য

এই উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকরী করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি সাধারণ সভা (General Assembly), স্বস্তি পরিষদ (Security Council), দপ্তরখানা (Secretariat), আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) এবং অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council) আছে। ইউ এন চার্টারের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় সাধারণ সভা আলোচনা করতে পারে এবং স্বস্তি পরিষদ ও সদস্য রাষ্ট্রদের এই সম্বন্ধে সুপারিশ করতে পারে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার বিষয়গুলি আলোচনা করতে পারলেও, যে সব বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তার জন্য সাধারণসভা স্বস্তি পরিষদের কাছে সুপারিশ করতে পারে মাত্র। এগুলি ছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক.

সংগঠন

সাধারণ সভা

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য এবং মানবীয় ও মৌলিক অধিকারগুলিকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ অথবা গবেষণার ব্যবস্থা করতে পারে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য এই সংস্থায় উর্ধতন পক্ষে পাঁচজন করে সদস্য পাঠাতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকে একটি করে ভোট দেবে মাত্র। বিশেষ অধিবেশন ব্যতীত—সভার নিয়মিত বাৎসরিক অধিবেশনের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন করে সভাপতি নির্ধারণের ব্যবস্থা আছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান কর্মকর্তা সাধারণ সম্পাদক (Secretary General) স্বস্তি পরিষদের সুপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্য নিৰ্বাচিত হন। তিনি আবার পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন। সাধারণ সম্পাদকের অধীনে একটি দপ্তরখানা (Secretariat) থাকে। এই দপ্তরখানা স্বস্তি পরিষদ সংক্রান্ত, অর্থনৈতিক সংক্রান্ত, সামাজিক এবং আইনগত সমস্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা তার কার্য পরিচালনা করে।

কর্মদপ্তর

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ স্বস্তি পরিষদ (Security Council)। স্বস্তি পরিষদে পাঁচজন স্থায়ী ও ছয়জন অস্থায়ী সদস্য আছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন স্বস্তি পরিষদের স্থায়ী সদস্য। অস্থায়ী সদস্যেরা সাধারণ সভার দ্বারা দু'বছরের জন্য নিৰ্বাচিত হন। স্বস্তি পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের একটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার আছে এবং কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য সাতজন সদস্যের সম্মতি সূচক ভোটের প্রয়োজন। পদ্ধতিগত প্রশ্ন ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে সাতটি সম্মতি জ্ঞাপক সদস্যের ভোটের মধ্যে স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের প্রত্যেকের সম্মতি জ্ঞাপক ভোটের প্রয়োজন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় নিরাপত্তা রক্ষা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের সম্মতি জ্ঞাপক ভোট না থাকলে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না। অর্থাৎ স্থায়ী পাঁচজন সদস্যের কোন একজন সদস্য নেতিবাচক ভোট দিলে আন্তজাতিক নিরাপত্তার জন্য শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হলেও তাকে কার্যকরী করা সম্ভব হয় না। স্পষ্টতই শান্তিভঙ্গকারী রাষ্ট্র স্থায়ী সমস্যদের কোন এক রাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় না।

স্বস্তিপরিষদ

স্বস্তিপরিষদ যদি মনে করেন যে কোন বিবাদের ফলে আন্তর্জাতিক শান্তি ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা আছে তাহলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার সমাধানের জন্য নির্দেশ দিতে পারে। কোন অমীমাংসিত বিবাদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতিবন্ধক মনে করলে তার সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনীয় শর্তগুলিও সুপারিশ করতে পারে। আবার স্বস্তি পরিষদ কোন শান্তিভঙ্গ, তার সম্ভাবনা অথবা আক্রমণ ঘটেছে (threat to peace, breach of peace or act of aggression) মনে করলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে তা স্থির করতে পারে। এই ব্যবস্থা শান্তিভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হতে পারে অথবা প্রয়োজনবোধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের Military Staff Committeeর পরিচালনায় সদস্য রাষ্ট্রদের পদাতিক, নৌ অথবা বিমানবাহিনী নিযুক্ত করা যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক বিচারালয়

স্বস্তি পরিষদ এবং সাধারণ সভার ভোটের দ্বারা নির্বাচিত পনেরো জন বিচারপতি নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (International Court of Justice) গঠিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যদের প্রেরিত যে কোন বিষয় এবং বিশেষ করে ইউ এন চার্টারের অন্তর্গত বিষয়গুলি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের বিচারাধীন হতে পারে

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

সাধারণ সভা দ্বারা নির্বাচিত আঠারো জন সদস্য নিয়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council) গঠিত। সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্য রাষ্ট্রদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক উন্নয়ন সাধন করাই এই সংস্থার উদ্দেশ্য। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে—যেমন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, খাদ্য ও কৃষিপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সৃষ্টিমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সংস্থা তার কাজ করে থাকে।

অভিভাবক পরিষদ

এই প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অধীনে একটি অভিভাবক পরিষদ (Trusteeship Council) আছে। কতকগুলি অনুন্নত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও শিক্ষানৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য এবং স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে তাদের সাহায্য করাই এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সংবিধানে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে সুপ্রশস্ত করার চেষ্টাও

চলেছে নানা প্রকার [illegible] কার্যাবলীর মাধ্যমে। এগুলি সত্ত্বেও আমরা এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করে পারি না। কারণ বৃহৎ পঞ্চশক্তির নেতিবাচক ভোট দেবার বিধান এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিজস্ব শক্তির অভাবকে অনেকে এর প্রধান দুর্বলতা মনে করেন। কিন্তু এই দুর্বলতার পরিপ্রেক্ষিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কাঠামোকে উন্নত করলেই যে বিশ্ব সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে—একথাও আমরা মনে করতে পারি না। পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তিগুলির সহযোগিতার আবহাওয়ায় যে বিশ্ব সংস্থার জন্ম হয়, যে সহযোগিতা আর নেই। দুটি বৃহৎ শক্তিকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবী আজ দ্বিধাবিভক্ত। বিশ্ববিধ্বংসী অস্ত্র সজ্জার ভয়াবহ পরিণতিকে আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন সাংগঠনিক বাধা দিয়ে প্রশমিত করা সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ইতিহাসে ব্যর্থতার কলঙ্ক যে নেই, এমন কথা আমরা বলতে পারি না, তবে অতীতের আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির চাইতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অধিকতর সাফল্যের সঙ্গে যে এগিয়ে চলেছে, আমরা একথা নিঃসন্দেহে মনে করতে পারি।

উপসংহার